সেলিম রেজা নিউটন

অচেনা দাগ

সম্পর্ক স্বাধীনতা সংগঠন

অরুণা দাগ

সম্পর্ক স্বাধীনতা সংগঠন

মানুষ নেটওয়ার্ক গ্রন্থমালা: তিন

লেখকের অন্যান্য বই

অভ্যাসের অন্ধকার: প্রেম বিয়ে পরিবার ও সম্পর্ক-জিজ্ঞাসা
আগামী প্রকাশনী ঢাকা ২০১৫

নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য: এমএন রায়ের মুক্তিপরায়ণতা প্রসঙ্গে
আগামী প্রকাশনী ঢাকা ২০১৩

পরিস্থিতির বিবরণ
উলুখড় প্রকাশনী ঢাকা ২০১৫ (কাব্যগ্রন্থ)

বিদ্রোহের সপ্তস্বর: বিডিআর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়
যেহেতু বর্ষা ঢাকা ২০১০

গণমাধ্যম পরিবীক্ষণের সহজ পুস্তক
বাংলা একাডেমি ঢাকা ২০০৯

মানুষ: মানুষ ও প্রকৃতি বিষয়ক পত্রিকা
সমাবেশ ঢাকা ২০০৩ (সম্পাদিত)

জুলফিকার মতিন: চিন্তা সৃজন সংগ্রাম
সাম্যবাদী চিন্তা ও চর্চা কেন্দ্র রাবি ১৯৯৮ (সম্পাদিত)

সেলিম রেজা নিউটন

অচেনা দাগ

সম্পর্ক স্বাধীনতা সংগঠন

আগামী প্রকাশনী

মানুষ নেটওয়ার্ক গ্রন্থমালা

অকুপাই-উইকিলিকস-অ্যানার্কি সিরিজ: তিন

সেলিম রেজা নিউটন

অচেনা দাগ: সম্পর্ক স্বাধীনতা সংগঠন

প্রথম সংস্করণ: ফাল্গুন ১৪২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রকাশক: ওসমান গনি, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ফোন: ৯৫৯১১৮৫, ৭১১০০২১

মুদ্রণ: স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স, ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা

প্রচ্ছদ: অ্যান্ড্রু বাথ ওরফে সমারসেট বিন, অস্ট্রেলিয়া

অক্ষর ও পৃষ্ঠাসজ্জা: সেলিম রেজা নিউটন

মূল্য: ৮৫০ টাকা

Salim Reza Newton

The Trail of the Unknown:

Relationship Freedom and Organization

First Edition: February 2015

Published by: Osman Gani, Agamee Prakashani,

36 Bangla Bazar, Dhaka 1100, Phone 9591185, 7110021

Cover: Andrew Bath aka Somerset Bean, Australia (andrewbath.com)

Compose and page makeup: Salim Reza Newton

Price: Tk 850. US$ 12

The Trail of the Unknown (Ochena Daag) by Salim Reza Newton is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

ISBN: 978 984 04 1792 6

মামুন হুসাইন
শিক্ষক চিকিৎসক গল্পকার

> প্রায়ই আমাদের ঘরে ফিরতে দেরি হয়। অথবা এমন হয়েছে কেউ সকালে বের হয়ে আর ফেরেনি। কতদিন আমরা দীর্ঘ বনের ভেতর হেঁটে গেছি। কোনো রকমের তৈরী পথ নেই। কিছু পর-পরই একটি গাছ লুটিয়ে পড়ছে এম.পি চেকপোস্টের মতো। পকেট হাতড়াই। আঁতি-পাঁতি পরিচয়পত্র খুঁজতে থাকি। দেখি পশ্চিমে চাঁদের অর্ধেক পুরো আকাশ ঘষটাতে ঘষটাতে পাহাড়ের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। ...
>
> ঘুমায়ে পড়িব আমি। মামুন হুসাইনের গল্প সংগ্রহ। ঢাকা: সমাবেশ। পৃ. ১৮৫

আমার মনের ডাক্তার, আমার মখদুম, আমার অগ্রজের সমীপে

অচেনা দাগ

ঊনপ্রচলিত জীবন নিয়েছি বেছে
অচেনা পাখির পালকের রঙে হারায়েছি মন যেচে

প্রচলন প্রতি পদে ধেয়ে আসে বৈধ প্রশ্ন নিয়ে
অবৈধ মন সীমানা ডিঙায়, মুসাফির-পথ চাখে
হাঁটতে হাঁটতে দিন চলে যায় অচেনা রাস্তা দিয়ে
অপরাহ্নের পাতায় পাতায় অচেনা চিহ্ন দেখে

কানে বাজে কোন অশ্রুত গান, অসৃজিত স্বরলিপি
অচেনা স্বরের অর্থমুখর ভবিতব্যের স্মৃতি
গেয়ে যাই আমি, কাটে সুর-লয়, অভিজ্ঞ হয় ভীতি
বেগানা বাতাস ঝাপ্টা হাওয়ায় ওড়ায় কালের ঝাঁপি

নেচে ওঠে প্রাণ, আকাশ বাজায় অকালের ডম্বরু
কালসন্ধ্যায় ওঠে ঝড়, ছেঁড়ে জীর্ণ-পুরনো পুঁথি
মুখস্ত রাগে কালোয়াতি শেষ; সন্নিকটেই শুরু
নতুন গানের নব অভিধান লেখে নয়া অনুভূতি

প্রকৃতির কাছে সব কিছু প্রচলিত
যে গান হয়েছে গাওয়া, আর আজও হয় নি যে গান গীত

সেলিম রেজা নিউটন, ১৩ই ডিসেম্বর ২০১৩

সূচিপত্র

প্রারম্ভিক পদ্য: সেলিম রেজা নিউটন ৭
নির্মিতির আভাষ: শিল্পী আমানউল্লাহ ১৯
সূত্রপাত: মনোয়ার মোস্তফা ২১

কৈফিয়ৎ ও কৃতজ্ঞতা: সেলিম রেজা নিউটন ২৯

০.১ বাজার, বসন্ত আর বন্দুকের বিধি ২৯
০.২ মুক্ত সম্পর্ক, ব্যক্তির স্বাধীনতা, সমাজ-সংগঠন ৩১
০.৩ নৈরাজ্যিক প্রাকরূপায়ণের রাজনীতি, জ্যাক র‍্যানসিয়ার গণতান্ত্রিক রাজনীতি ৩২
০.৪ বন্ধুত্ব বসন্ত বিপ্লব: প্যারিস থেকে শাহবাগ ৩৭
০.৫ বাহিরের কর্তা, স্বাধীন আত্মকর্তৃত্ব এবং রবীন্দ্রনাথের অচেনা দাগ ৪৪
০.৬ অচেনা দাগ, চেনা বন্ধুত্বের ব্যূহ ৪৯

প্রথম দাগ: বলাৎকার কারাগার দণ্ডনীতি ৫৭

১। ধর্ষণ বলপ্রয়োগ বলাৎকার ৫৯

১.১ গণধর্ষণের গণতন্ত্র ৫৯
১.২ প্রলোভন: বিদ্যমান গণতন্ত্রের পলিটিক্যাল ইকনোমি ৬০
১.৩ ধর্ষণ – আইনের শাসনের বিজ্ঞাপন ৬০
১.৪ বলাৎকারের শব্দার্থতত্ত্ব ৬১
১.৫ আত্মমর্যাদার বিকার, সম্পর্কের বিকার ৬২
১.৬ বিবাহ, ব্যক্তিগত মালিকানা, ধর্ষণ ৬২
১.৭ কাম প্রেম ধর্ষণ ৬৩
১.৮ ধর্ষণ কোনো ফৌজদারি মামলা নয় ৬৪
১.৯ মুক্ত প্রেমময় সমাজের দিকে ৬৫

২। বিড়ালের জেলখানা ৬৭

২.১ জেলখানার জেনেসিস ৬৭
২.২ কয়েদির হাসি ও হেঁয়ালি ৬৭
২.৩ বিড়ালের স্বাধীনতা, মানুষের দাসত্ব ৬৮
২.৪ প্রত্যেক কারাগারই আদিতম কারাগার ৬৯

২.৫ নির্যাতনের জাদুঘর ৬৯
২.৬ স্বাধীনতার দিন গণনা, নিরন্তর পাপচক্র ৭১
২.৭ বন্দিত্ব প্রাকৃতিক নয়, দাসপ্রথা ঐশ্বরিক নয় ৭২

৩। আদর্শ দাসত্ব-মহাগ্রাম ৭৩

৩.১ বাধ্যতামূলক শ্রমশিবির ৭৩
৩.২ জোঁয়াল-বন্দি কয়েদি, মলবাহী মানুষ ৭৪
৩.৩ বিনামূল্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল উৎপাদন ৭৫
৩.৪ আকাশে যত তারা, জেলকোডে তত ধারা ৭৫
৩.৫ আত্মার গভীরে বন্দিত্বের অনুবাদ ৭৬
৩.৬ টাকাতন্ত্র আমলাতন্ত্র কারাতন্ত্র ৭৭
৩.৭ গরিবের জেলখানা, বড়লোকের আইন-আদালত ৭৮
৩.৮ স্বাভাবিকতার স্বর্ণচিন্তা: স্বাভাবিকতার স্বর্ণশৃঙ্খল ৭৮

৪। পিওতর ক্রপোৎকিনের 'কারাগার কি দরকারি' রচনার বঙ্গানুবাদ ৮১

৫। রাজনীতি সংস্কৃতি কারাগার ১১১

৫.১ শাহবাগ-জাগরণ: রাজনীতি না সংস্কৃতি? ১১১
৫.২ রাজনীতি ও বলপ্রয়োগ ১১২
৫.৩ বলশেভিক কারাগার, লিবারাল কারাগার ১১৭
৫.৪ জাতীয় শত্রুর রাজনৈতিক বিনির্মাণ ১১৯
৫.৫ রাজনীতি বনাম সমাজ-সংস্কৃতি ১২০
৫.৬ সমাজ-স্বাধীনতার পথে যাক শাহবাগ ১২৪

৬। রাজা এবং রাষ্ট্রের ধর্ম: দণ্ডনীতির উৎপত্তির গল্প ১২৭

৬.১ নৈরাজ্যের বুৎপত্তি: রাজা ও রাষ্ট্র ১২৭
৬.২ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন: রাজাগিরির যুক্তি ১৩০
৬.৩ আদি রাজা, আদি বুদ্ধিজীবী, আদিতম শাস্ত্র ১৩২
৬.৪ আদিতম দণ্ডনীতির উৎপত্তি ১৩৩
৬.৫ উপসংহার ১৩৫

দ্বিতীয় দাগ: মুক্তিযুদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লব কর্তৃত্বতন্ত্র ১৩৭

৭। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট: কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতন্ত্রের প্রচ্ছন্ন রূপকল্প ১৩৯

৭.১ স্বাধীন রাষ্ট্রের উপযুক্ত রূপকল্প ছিল না ১৩৯

৭.১.১ স্বাধীনতার দুই কর্তব্য ১৪১
৭.১.২ কর্তৃত্বের হাত থেকে স্বাধীনতার প্রশ্নে কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতান্ত্রিক রূপকল্প ১৪২
৭.১.৩ শ্রমশোষণের হাত থেকে স্বাধীনতার প্রশ্নে কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতান্ত্রিক রূপকল্প ১৪২
৭.১.৪ বড়লোক-বুর্জোয়াদের মধ্যে মৌলিক রূপান্তরের ধারণা না থাকার কারণ ১৪৩
৭.১.৫ বামপন্থীদের মধ্যে মৌলিক রূপান্তরের ধারণা না থাকার কারণ ১৪৫
৭.১.৬ কৃষকদের মধ্যে মৌলিক রূপান্তরের ধারণা না থাকার কারণ ১৪৬

৭.২ একাত্তরের জনযুদ্ধ এবং কর্তৃত্বপরায়ণ বামপন্থা ১৪৮

৭.২.১ পরাশক্তি, প্রচারণা ও স্নায়ুযুদ্ধ ১৪৯
৭.২.২ কর্তৃত্বপরায়ণ বামপন্থার করুণ ক্যারিকেচার ১৫০
৭.২.৩ দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু মানুষ স্বাধীন হয় নি ১৫২

৭.৩ জনযুদ্ধ, ইতিহাস ও অ্যানার্কি ১৫৩

৭.৩.১ একাত্তরের জনযুদ্ধ এবং জনসাধারণের নিজস্ব সক্রিয়তার আভাস ১৫৪
৭.৩.২ সর্বাত্মক জনযুদ্ধ সর্বব্যাপ্ত মুক্তিবাহিনী ১৫৭
৭.৩.৩ ইতিহাসের অসম্পাদিত কর্তব্য ১৫৯

৭.৪ আজকের সংকটের গোড়া থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপযুক্ত দিশা ১৬১

৮। কর্নেল-তাহের-রূপকথার ৩৭ বছর: কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা ১৬৫

৮.১ আজকেও কি আমরা তাহেরের পথে হাঁটতে চাই? ১৬৫
৮.২ রূপকথার মতো সময় ১৬৭
৮.৩ মুক্তিযুদ্ধের মহাজাগরণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো ১৬৯
৮.৪ ঘুটঘুটে অন্ধকারে টিমটিমে লণ্ঠনের আলো ১৭৩
৮.৫ প্রিফিগারেটিভ পলিটিক্স বা প্রাক-রূপায়নের রাজনীতি ১৭৭
৮.৬ প্রথম আন্তর্জাতিক: প্রিফিগারেটিভ পলিটিক্স বনাম রাষ্ট্রপন্থা ১৭৯

৮.৭ শাস্ত্র, সায়েন্স এবং স্বাধীনতা ১৮৭
৮.৮ তাহেরের কাছ থেকে কী শিখতে পারি আমরা? ১৯২
৮.৯ এখনকার কর্তব্য নির্ধারণের প্রশ্ন ১৯৩

তৃতীয় দাগ: সুশীল-সামরিক জরুরি জমানা ১৯৭

৯। মহামান্য ভয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ১৯৯

৯.১ অবতরণিকা ১৯৯
৯.২ আইন-শৃঙ্খলার ব্যথা ২০০
৯.৩ জনপরিসর নিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টা ২০১
৯.৪ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনাক্যাম্প আপত্তিকর ২০১
৯.৫ সেনাসমর্থিত সরকার এবং সুশীল সমাজের মিডিয়া ২০২
৯.৬ অপ্রকাশ্য আতঙ্ক হয়ে উঠেছেন মহামান্য ভয় স্বয়ং ২০৩

১০। অক্টোবর-মহাসংকট: মাৎস্যন্যায়-পর্ব ২০৫

১১। আইনের শাসন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা, এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ ২০৯

১১.১ কানাকে হাইকোর্ট দেখানো ২০৯
১১.২ আইনের শাসন কী বস্তু? ২১১
১১.৩ আইনের শাসনের মূর্তিমান সীমাবদ্ধতা ২১৩
১১.৪ রাষ্ট্র, বলপ্রয়োগ, দীক্ষায়ন-প্রকৌশল ২১৪
১১.৫ জুলুম, প্রতিরোধ এবং বিদ্রোহ ২১৫
১১.৬ আইনের শাসন ও কারাগার ২১৭
১১.৭ বলপ্রয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয়, গণতন্ত্র ২১৮

১২। জরুরি জমানার রাজনীতি ও প্রচারণা-প্রকৌশল ২২১

১২.১ রাজনীতি নিয়ে জনগণের নির্লিপ্ততা ২২১
১২.২ রাজনীতি হচ্ছে আধিপত্যের আর্ট ২২২
১২.৩ ক্ষমতা-ভাগাভাগির সংকট ও জরুরি গণতান্ত্রিক ঐকতান ২২২
১২.৪ ক্ষমতা ও সম্পদের নিওলিবারাল বিন্যাস ২২৪
১২.৫ রাজনৈতিক প্রচারণা কৌশলসমূহ ২২৪
১২.৬ খারাপ গণতন্ত্র ভালো স্বৈরতন্ত্রের চেয়ে ভালো ২২৫

১৩। স্বৈরতন্ত্রী গণতন্ত্র: দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ২২৭

১৪। জনগণের সক্রিয়তা: গণমানুষের গণতন্ত্র ২৩৩

১৫। সমাজের বেসামরিক রূপান্তরের কর্তব্য ২৪১

চতুর্থ দাগ: হিংসা বিদ্বেষ বসন্ত ২৪৭

১৬। বাংলা-বসন্ত: আসছে ফাল্গুনের আগাম ইশতেহার ২৪৯

১৭। বাংলা-বসন্ত: উদ্দেশ্য ও উপায় ২৫৭

১৭.১ বৈষম্য-বঞ্চনা-বলপ্রয়োগের সভ্যতা ২৫৭
১৭.২ সংগঠনের উপায়-প্রণালী ২৫৮
১৭.৩ উদ্দেশ্য ও উপায়ের অসঙ্গতি ২৫৯
১৭.৪ যুদ্ধাপরাধের বিচার ও শাস্তি এড়ানোর সুযোগ নেই ২৬০
১৭.৫ খুনোখুনির দুর্বিপাক ও অন্তঃসারশূন্য স্বাধীনতার আশঙ্কা ২৬১
১৭.৬ পারস্পরিক হিংসার রাজনীতিতে নবীর ইমেজ ব্যবহার ২৬২
১৭.৭ স্রেফ আইন-আদালত দিয়ে ইতিহাসের মীমাংসা হয় না ২৬৩
১৭.৮ অ্যানার্কিস্টদের ভুল থেকে জামায়াত শিখতে পারে ২৬৪
১৭.৯ ইসলাম ঈমান বিবেক বিচারবুদ্ধি ও স্বাধীনতা ২৬৫
১৭.১০ কর্তৃত্বপরায়ণ সংগঠনপ্রণালীই আসল সমস্যা ২৬৬

১৮। আমাদের বিড়াল, আমাদের ঘণ্টা ২৬৯

১৮.১ আমাদেরকে কেন রাস্তায় লাশ হতে হবে? ২৬৯
১৮.২ সর্বদলীয় দুষ্কৃতকারীদের সুবর্ণ সময় ২৭২
১৮.৩ দরকার ব্যাপক জাতীয় ঐকমত্য ২৭৪
১৮.৪ ঘণ্টা বাঁধবে কে? ২৭৬

১৯। জর্জ অরওয়েলের উনিশ শ' চুরাশি: তোমার দ্বেষ আমার দ্বেষ ২৭৯

১৯.১ কে ছিলেন অরওয়েল? ২৭৯
১৯.২ কর্তৃত্বের প্রতি বিরাগ, স্বাধীনতা প্রতি অনুরাগ ২৮০
১৯.৩ চিন্তাপরাধ, চিন্তাপুলিশ ২৮১
১৯.৪ বেআইনী ডায়েরি এবং মিনিস্ট্রি অফ ট্রুথ ২৮২
১৯.৫ বিগ ব্রাদারের প্রতি ভালোবাসা ২৮৩

১৯.৬ নয়া-জবান, দ্বৈতচিন্তা, অর্থোডক্সি ২৮৪
১৯.৭ আজকের যুগে বাস্তবতা নিয়ন্ত্রণ ২৮৬
১৯.৮ ঘৃণার পতাকা ২৮৭

২০। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নৈরাজ্য **২৮৯**

২০.১ মুখের মহাত্মা নয়, অহিংস প্রতিরোধ ২৮৯
২০.২ গান্ধী কি অ্যানার্কিস্ট ছিলেন? ২৯০
২০.৩ আত্মাহীন মেশিনের কথা ২৯১
২০.৪ স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ২৯৪
২০.৫ রাষ্ট্রীয় হিংসানীতির ক্রমবর্ধমান বিপদ ২৯৫

২১। চাঁদে সাঈদী: যোগাযোগ-বার্তার অর্থ নির্ধারণ প্রসঙ্গে **২৯৭**

২১.১ চাইলেই কি যা খুশি তাই গুজব ছড়ানো যায়? ২৯৮
২১.২ যোগাযোগ-বার্তার অর্থ কি যোগাযোগকর্তাই নির্ধারণ করতে পারেন? ২৯৮
২১.৩ যোগাযোগ-বার্তার অর্থ নির্ধারণে বার্তা-গ্রাহকদের
সামাজিক-মতাদর্শিক সম্পর্কজাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ২৯৮
২১.৪ এনকোডিং-এর চেয়ে ডিকোডিং জরুরি ২৯৯
২১.৫ প্রশ্নহীন বিশ্বাস বনাম বিচার-সক্ষমতা ২৯৯
২১.৬ টেকনোলজিকে বুঝতে সামাজিক জটিলতা বুঝতে হবে ২৯৯

২২। হেফাজতে ইসলাম নিয়ে অল্প কয়টা কথা **৩০১**

২৩। কপট অহিংসা, অকপট হিংসা **৩০৭**

২৩.১ হেফাজতের কপট অহিংস নীতি ৩০৭
২৩.২ রাজনীতি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের অকপট হিংসাধর্ম ৩০৯
২৩.৩ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, উইকিলিকস এবং বলিভিয়া-সমাচার ৩১১
২৩.৪ হেফাজতের হিংসা, রাষ্ট্রের মারাত্মক জুলুম ৩১৩
২৩.৫ ফরহাদ মজহারের মার্কসীয় শ্রেণী-সহিংসতা ৩১৬
২৩.৬ অকপট অহিংসার আন্তরিক নীতিধর্ম ৩২২

২৪। নির্বাচন ও গণতন্ত্র: আইন, ক্ষমতা আর সম্পত্তির লীলা **৩২৫**

২৪.১ গণতন্ত্র বনাম গুটিকয়তন্ত্র ৩২৫
২৪.২ সততা, দণ্ডবিধি, নীতিবোধ ৩২৬

২৪.৩ পঞ্চবার্ষিক ভোট: বৃহত্তম সেকুলার রাষ্ট্রীয় উৎসব ৩২৯
২৪.৪ আগে ভোট দিন, পরে দেখা যাবে ৩৩১

২৫। স্বৈরতান্ত্রিক শুভবোধ ও চিন্তাদাসত্বের রাষ্ট্রপ্রণালী ৩৩৩

২৫.১ সর্বদলীয় রাজতান্ত্রিক ইশতেহার ৩৩৩
২৫.২ রাজনীতির রাক্ষসতন্ত্র ৩৩৬
২৫.৩ রাষ্ট্রপ্রণালীর সপক্ষে গণবৈধতার দৃশ্যমান অভাবের বিপদ ৩৩৯

পঞ্চম দাগ: মতাদর্শ নয়– পথ ৩৪৩

২৬। স্বাধীনতা সহিষ্ণুতা সংগঠন ৩৪৫

২৬.১ স্বাধীনতা দায়িত্বশীলতা প্রভুত্ব ৩৪৫
২৬.২ সর্বপ্রকার স্বাধীনতাবিরোধীদের তাণ্ডব ৩৪৮
২৬.৩ চিন্তাপুলিশের ভূমিকায় রাষ্ট্র ৩৪৯
২৬.৪ অজ্ঞতার সংঘাত এবং স্বাধীনতার তাড়না ৩৫১
২৬.৫ গরিবের ধর্ম, বঞ্চিতের রাষ্ট্রমর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা ৩৫২
২৬.৬ আসছে-বসন্তের ব্যাকপ্যানেল: স্বাধীনতা-আত্মসংগঠন-নেটওয়ার্কিং ৩৫৪
২৬.৭ আসন্ন ঘূর্ণিঝড় ৩৫৭

২৭। স্বাধীনতা সবসময় ৩৫৯

২৭.১ পরাধীনতার পরাকাষ্ঠা ৩৫৯
২৭.২ অসংবিধিবদ্ধ অসতর্কীকরণ ৩৫৯
২৭.৩ বাসদ = বামপন্থী সমস্ত দল ৩৬০
২৭.৪ বলশেভিক পিতৃবৃন্দ ৩৬০
২৭.৫ আশুতোষের হদিস ৩৬০

২৮। একুশের এক নম্বর কথা হচ্ছে আইন লঙ্ঘন করা ৩৬৩

২৮.১ ভিন্ন ধরনের জিনিসের দিকে মনোযোগ দেওয়া ৩৬৪
২৮.২ একুশ কোনো সরকারি অমলাতান্ত্রিক অনুষ্ঠান ছিল না ৩৬৪
২৮.৩ পার্টিগুলো নির্বাচনী হিসাবনিকাশে ব্যস্ত ছিল ৩৬৪
২৮.৪ আইন লঙ্ঘনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা ৩৬৫
২৮.৫ বিদ্রোহকে অনুষ্ঠানে পর্যবসিত করা ৩৬৬
২৮.৬ একুশ ছিল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ৩৬৭

২৮.৭ একুশ মানে রাষ্ট্রের বিপরীতে সমাজ ৩৬৭

২৯। সাম্রাজ্য স্বাধীনতা ইন্টারনেট ৩৭১

২৯.১ প্রাইভেসি, সিক্রেসি, ট্রান্সপারেন্সি, ট্রাস্ট ৩৭১
২৯.২ অনলাইন প্রাইভেসি এবং ক্রিপ্টোগ্রাফি ৩৭৪
২৯.৩ রাষ্ট্র-কর্পোরেট নজরদারি বনাম ব্যক্তি-মানুষের প্রতিরোধ ৩৭৬
২৯.৪ লাভাবিট এবং সাইলেন্ট মেইল বন্ধের ঘটনা ৩৭৯
২৯.৫ ফিসা-আদালত, এনএসএ এবং এডওয়ার্ড স্নোডেন ৩৮২
২৯.৬ গোপন আদালতের গণতন্ত্র ৩৮৩
২৯.৭ সেনা রাষ্ট্র-কর্পোরেট নজরদারি ঠেকানোর পথ কী? ৩৮৪
২৯.৮ অনলাইন অ্যানোনিমিটি অথবা পরিচয়ের রাজনীতি ৩৮৯
২৯.৯ মার্কিন সাম্রাজের পতনের শব্দ ৩৯৫
২৯.১০ সাম্রাজ্য নয়, স্বাধীনতা ৩৯৬

৩০। আমার লিনাক্স, আমার স্বাধীনতা ৩৯৯

৩০.১ জানালা মানে জেলেরই জানালা ৩৯৯
৩০.২ মনুষ্যগুণাবলীর পুনর্জাগরণ ঘটাচ্ছে লিনাক্স ৪০০
৩০.৩ স্বাধীনতা মানে আনন্দ, স্বাধীনতা মানে সৃজনশীলতা ৪০১
৩০.৪ প্রবন্ধ-পরিশিষ্ট: 'লিনাক্স ফোরাম – নিবন্ধন' ৪০৩

৩১। সম্পর্ক স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথ ৪০৫

৩২। কর্তৃত্বতন্ত্র শিল্পবোধ স্বাধীনতা: সিনেমা ও সমাজ নিয়ে কিছু কথা ৪১৫

৩২.১ শ্রদ্ধেয় সিনেমাশিল্পী আবু সাইয়ীদ ৪১৫
৩২.২ মানুষ কি শিল্পবোধহীন হয়? ৪১৭
৩২.৩ শিল্প-সাহিত্য-আর্ট সংক্রান্ত পুঁজিবাদী, বলশেভিক ও নৈরাজ্যিক ধারণা ৪১৮
৩২.৪ সমাজে শিল্প-সাহিত্য-আর্টের অভিঘাত ৪২০
৩২.৫ সমাজে-সিনেমায়-সর্বত্র নতুনত্বের দাবি ৪২২
৩২.৬ সিনেমায় যৌনতা, অশ্লীলতা ও অপরাধ ৪২৪
৩২.৭ আদিতম সামাজিক আইন: বলপ্রয়োগহীন নিয়মকানুন-বিধিবিধান ৪৩০
৩২.৮ দীক্ষায়ন-প্রকৌশল ও প্রশিক্ষিত শিল্পবোধ ৪৩৫

৩৩। সংগঠন বন্ধুত্ব বিপ্লব: এ রেভোলিউশন টু লিভ! ৪৩৯

৩৩.১ এ রেভোলিউশন টু লিভ ৪৩৯
৩৩.২ ব্যারিকেড ও বন্ধুত্ব ৪৪০
৩৩.৩ রক্তপাত, মর্ষকামিতা ও পুরোনো দিনের বিপ্লব ৪৪২
৩৩.৪ নৈরাজ্যবাদ নয়: স্বাধীনতা, নৈরাজ্য ৪৪৪
৩৩.৫ বন্ধুত্ব বৈচিত্র্য বিপ্লব ৪৪৪
৩৩.৬ ব্যক্তি-রাষ্ট্র-সমাজ: এ রেভোলিউশন টু লিভ! ৪৪৯

৩৪। শাহবাগের স্বাধীনতাই শাহবাগের পথ **৪৫৩**

৩৪.১ ভূমিকার পরিবর্তে শাহবাগের কবিতা: অভিনন্দন, সবাইকে ৪৫৩
৩৪.২ অসংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ ৪৫৫
৩৪.৩ শাহবাগ-আন্দোলনের কাছে বাংলা-বসন্তের প্রত্যাশা ৪৫৫
৩৪.৪ শাহবাগ-আন্দোলন কি নিতান্তই ফাঁসির আন্দোলন? ৪৫৬
৩৪.৫ গণজাগরণ মঞ্চ, গণজাগরণ-আন্দোলন, এবং
নবতর সংগঠনপ্রণালীর প্রয়োজনীয়তা ৪৬০
৩৪.৬ আমরা ঠিকমতো চাইলে আবারও জেগে উঠতে পারে শাহবাগ-আন্দোলন ৪৬৭

৩৫। মতাদর্শ নয়– পথ **৪৭৩**

৩৫.১ মতাদর্শের চক্করে বাংলাদেশ ৪৭৩
৩৫.২ মতাদর্শের মোহ ৪৭৪
৩৫.৩ গুরু-গোঁসাই-গ্রন্থ এবং গুপ্তজ্ঞান প্রসঙ্গে ৪৭৬
৩৫.৪ তর্কবিতর্ক-পর্যালোচনার পদ্ধতি প্রসঙ্গে ৪৭৮
৩৫.৫ মতাদর্শের মোহ নয়, মুক্তিমুখীন পথ ৪৮০

বইপত্রের হদিস **৪৮৫**

মানুষ নেটওয়ার্ক গ্রন্থমালা: প্রকাশিত/প্রকাশিতব্য বইয়ের তালিকা **৪৯৫**

আমানউল্লাহ*

নির্মিতির আভাষ

সময়ের দাবি পূরণ করার অঙ্গীকার থেকে উঠে আসা মানুষগুলি একটা মানুষের মধ্যে দেখা গেল। যে চতুর্মুখী অভিঘাত থেকে মুক্তি নিতে হয় তার ছায়া বিকেলের আলোয় শান্ত স্থির। সে চায় একাগ্র হতে। সবাইকে বলে তোমরা এক থাকো। কিন্তু কেউই থাকে না। এক সময় একটা পুস্তকে তার ভাষ্যগুলো মুদ্রিত করতে চাইল। মুদ্রিত হরফে সবাই দেখছে, এভাবে ভাবতে মানা নেই। আমার ভালো লাগছে পড়তে।

***

মানুষ কেমন ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। যা চলছে, আসলে চলছে না। অসাধারণ যখন সাধারণ গোবেচারায় পরিণত হয়, তার নির্বিকারত্বে নিরেটত্ব যতটুকু তার হিসাব কষতে যেন সমাজকে সামনে রেখে সমাজের উপস্থিত-করণীয় শুশ্রূষার পথ্যসহ ভিতরের খবর নজর করেন নিউটন। ইতিহাস থেকে সহিংস ডামাডোলের ভেতর অহিংস ও বিবেচনার প্রেক্ষিতকে জাতির বিবেকের কাছে সহজ ভঙ্গিতে তুলে আনেন। ঔপনিবেশিক রাজনীতির – বিশেষত আইনগুলির – বিসদৃশতা, ডান ও বামের আচরণ, সমাজের মনকে স্থবিরত্বের দুঃস্বপ্নে ঢেকে দিচ্ছে। আমাদের ক্ষমতার চর্চা বড়ই আদিম। বোধকে শাণিত করে তোলার, সময়ের উপযোগ বোঝার, মানুষটিকে জাগিয়ে রাখার সিদ্ধান্তে যাঁরা রাত্রিদিন ভাবেন এমন মানুষটির অভাব অনুভব করি। সবাই যার যার জড়তা নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরও শিক্ষা নেয়ার আছে। হঠাৎ করে কার্যকর মানুষে রূপান্তরিত হওয়া সহজ কাজ নয়। সময়-উপযোগী চলার ধ্যানধারণায় স্বাভাবিকতা নিয়ে আসতে সময় লাগে। এখনও জাতিগত ভাঙচুরের মতো মধ্যযুগীয় ধ্যানের কারণে আমরা সঠিক বর্তমানকে কখনই দেখতে পারি না। রাজনৈতিকভাবে এর মোকাবেলা করার চিন্তাকে সামনে রেখে যারা জীবনযুদ্ধে জড়িয়ে গেছে তাদের জন্য এই পুস্তক।

***

কথারা রেশসহ থাকুক। ওদের শ্লীলতা রেখা হয়ে যুগ স্পর্শ করে। প্রকৃতির প্রাত্যহিকে

---

* চিত্রশিল্পী। লেখক। চারুকলার শিক্ষক। আশির দশকের বাংলাদেশে নবপরিসরে বিকাশমান ছোটকাগজ-আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ।

যদি ব্যাপক ধারণারা তাদের রেখা দেয় মুছতে শুরু করে, তখন পৃথিবীর নাভিশ্বাস উঠে। বাস্তব এমনই তার শুশ্রূষা নেয় অতি নিজের করে। এই নিজই সবাই হয়ে যায়। একটা ধারণার নয়া উদ্ধারে সম্পূর্ণ মানচিত্রই বদলে যায়। সার্বিক রাজনীতির সত্তাকে মননকে বলাৎকৃত হতে দেওয়া সমীচীন নয়। বিস্তৃত পাঠ দেখা উপলব্ধি থেকে যে বিবেচনা ধরা দেয় তার প্রেক্ষিতই বপনযোগ্য। আমাদের তুরীয় সিদ্ধান্ত-গুলো আরও নির্মেদ রাখতে তাবৎ চিন্তাকেই খোলস ছাড়াতে হবে। আমরা যতটুকু পারি এই জীবিতকালে– চারদিকের অমঙ্গল সব চিহ্নিত করতে, পথের নিশানা খুঁজে পেতে, সঠিক মানুষদের সাহচর্য পাওয়ার সৌভাগ্যকে রচনা করতে।

নির্মিতিকে প্রশ্নবিদ্ধ হলে মানায় না। আমাদের হারানোর জন্য একটি মুহূর্তকেও ছেড়ে দিলে চলে না। চলমানতাকে, মত ও পথের ভারসাম্য খুঁজে পেতে সহজিয়া পার্শ্বচরের দুর্দান্ত উপলব্ধি ও প্রয়োগের খোলা অবকাশ খুবই আশাব্যঞ্জক। ধ্বসে পড়া মরচে পড়া চিন্তার থেকে নিজেকে নিরাপত্তা দিতে যে মত ও পথ খুলে যাচ্ছে তার সহগামী না থেকে উপায় কী।

ঢাকা: ১০ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪

মনোয়ার মোস্তফা*

সূত্রপাত

দাগ মানে রেখা। মত বা পথও এক ধরণের রেখার মতো, চিন্তার পথরেখা। আমরা চেনা পথে হাঁটতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করি। এ পথে ভয় কম, ক্লেশ কম। চেনা পথে চেনা লোকজন, চেনা সম্পর্ক। অচেনা পথ কিছুটা ভয়ের, কেননা হোঁচট খাবার সম্ভাবনা বেশি। তাই ওসব পথ এড়িয়ে চলতে চাই। এই বইয়ে নানা ধরণের অচেনা পথের কথা বলা হয়েছে। লেখকের চিন্তাগুলো সেই সব পথ ধরে হাঁটতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেছে। 'সম্পর্ক','স্বাধীনতা' ও 'সংগঠন' – শব্দ হিসেবে এগুলো কোনোভাবেই 'অচেনা' নয়। তাছাড়া চিন্তার যে পথরেখা ধরে এগুলিকে ব্যাখ্যা করি, প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শিখি, ধরণগুলোকে বুঝতে শিখি, কার্যকরিতা নিয়ে সন্দেহাতীত থাকি – সেগুলোও অনেক চেনা, মুখস্ত প্রায়। যেমন ধরুন, সমাজ বদলের কথা। তার মানে, সামাজিক সম্পর্কের বদল চাই। এটা করতে হলে সংগঠন বানাতে হবে, নেতা বানাতে হবে, নেতার কথা কর্মী-সমর্থকরা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে, বলপ্রয়োগ করতে হবে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে। সুষ্ঠুভাবে এগুলি করতে পারলে মানুষের জীবন ও সম্পর্কের উন্নতি হবে, স্বাধীনতার চৌহদ্দি বিস্তৃত হবে – আমাদের চিন্তাগুলো এই জাতীয় পথের সাথে অতি পরিচিত। লেখক এই বিষয়গুলো বুঝতে ভিন্ন পথে হেঁটেছেন। সেই পথগুলো অনেকের কাছে কিছুটা অচেনা মনে হলেও হতে পারে। অনেকের কাছে তা এমনকি কল্পনাশ্রয়ীও ঠেকতে পারে।

এ বইয়ে পাঁচটি অধ্যায়ে ছোট-বড় মিলে মোট ৩৫টি রচনা আছে। কোনো কোনোটি প্রবন্ধ, আবার কোনো কোনোটি নিবন্ধ আকারে হাজির হয়েছে। সমসাময়িক অনেক প্রসঙ্গ উঠে এসেছে: এক-এগারোর রাজনীতি ও প্রচারণা-প্রণালী, শাহবাগ-আন্দোলন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, চাঁদে সাঈদী, চলমান রাজনৈতিক সংকট, হেফাজতে ইসলাম, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ৫ই জানুয়ারির সংসদ-নির্বাচনের পরবর্তী সার্বিক জাতীয় পরিস্থিতি ইত্যাদি ইত্যাদি। আছে সমাজরাষ্ট্র-পরিচালনা সাধারণ নীতিগত নানা প্রসঙ্গ যেমন বলপ্রয়োগ, কারাগার, দণ্ডনীতি কিংবা রাজা ও রাষ্ট্রের ধারণা নিয়ে কথা; আছে শিল্প-সমাজ-সিনেমা

* উন্নয়ন-অর্থনীতি বিশ্লেষক। নির্বাহী পরিচালক, ডেভেলপমেন্ট সিনার্জি ইন্সটিটিউট।

কিংবা রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ; আছে ইন্টারনেট, কম্পিউটার-প্রযুক্তি, অপারেটিং সিস্টেম ও প্রাইভেসি নিয়ে আলাপ; আবার আছে কর্নেল তাহের এবং মুক্তিযুদ্ধের রূপকল্পের মতো ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ। উৎস বিচারেও রচনাগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে। ফেসবুক-নোট হিসেবে প্রকাশিত রচনা যেমন আছে, আবার দৈনিক পত্রিকা এবং ছোটকাগজে প্রকাশিত লেখা থেকে শুরু করে সেমিনারে তোলা আলোচনাও রচনা হিসেবে স্থান পেয়েছে।

সমাজ-দর্শন ও রাজনীতি নিয়ে যেকোনো লেখা বিচ্ছিন্নভাবে পড়ার একটা বিপজ্জনক দিক আছে। একটার সাথে একটা মেলাতে না পারলে লেখককে বুঝা যায় না। গোটা এই বইটা পড়লে, অনুমান করি, লেখককে বুঝা যাবে। লেখককে বুঝা যাবে মানে, তাঁর চিন্তাকাঠামোটাকে, যেসব পথে তাঁর চিন্তা হাঁটছে, সেই পথ-গুলোকে চেনা যাবে। ব্যক্তি-লেখককে চেনার চেয়ে তাঁর চিন্তার পথচিহ্নগুলো বুঝে নেয়া অনেক বেশি জরুরি।

এই বইয়ের সব লেখাতেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাটা প্রবলভাবে ধরা পড়েছে। স্বাধীনভাবে কাজ করা, চিন্তা করা আর জীবন চালানোর পথের বাধাগুলো চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছেন গ্রন্থকার। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে এই 'স্বাধীনতা'র প্রশ্নটিই সবচেয়ে বেশি বেশি আলোচিত হয়েছে। স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রশ্নে 'উদারবাদ' আর 'মার্কসবাদ'-এর তর্কাতর্কিটা এখনও আমাদের রাজনৈতিক চিন্তার জগতকে ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। আধুনিক রাজনৈতিক মতাদর্শের ইতিহাসে এই দাপুটে ধারা দুটি চূড়ান্ত অর্থে রাষ্ট্রকে সমাজ থেকে তাড়াতে চাইলেও পারেনি, বরং তাকেই পাকাপোক্ত ও আরো বেশি শক্ত-সমর্থ করেছে, সমাজ ও ব্যক্তির মাথার ওপরে তাকে বসিয়ে দিয়েছে। উভয় ধারার মধ্যেই 'রাষ্ট্রবাদী' চিন্তা শক্ত অবস্থান করে নিয়েছে।

উদারবাদ থেকে শুরু করে নয়া-উদারবাদ সবাই সমাজটাকে দেখে 'ব্যবসা-বাণিজ্যের' ফুটো দিয়ে। এটাকে বলা যায় বাজারবাদী চিন্তা। এই উদারবাদ আর নয়া উদারবাদের মধ্যে রেনেসাঁ-জাত ধ্রুপদী উদারবাদের সামাজিক আত্মশক্তি ও ব্যক্তিক স্বাধীনতাশীলতার সামান্য ছায়াও আর অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না। অন্যদিকে প্র্যাকটিসিং মার্কসবাদ (কারো কারো ভাষায় 'সরকারি মার্কসবাদ') রাষ্ট্রের চোখ দিয়ে সমাজকে দেখে। এ দুইয়ের পরিণামে সমাজবাদ চাপা পড়ে যায় বাজারবাদ আর রাষ্ট্রবাদের ভারে। উদারবাদীরা চায় অবাধ বাজার কায়েম করতে – পুঁজির জন্য, মানুষের জন্য নয়। তাদের লক্ষ্য পুঁজি আর পণ্যের অবাধ যাতায়াতের পথ নিশ্চিত করা, মানুষের সাথে মানুষের 'সম্পর্ক' বৃদ্ধি করা নয়। অন্যদিকে রাষ্ট্রবাদ যে সর্বনাশটা করেছে তা হলো, মানুষের ভেতরে এমন একটা সংস্কৃতি/মনঃস্তত্ত্ব তৈরি

করেছে যা একজনকে বাংলাদেশি আরেকজনকে ভারতীয় ভাবতে শেখায়, অথচ খোঁজ নিলে দেখা যাবে হয়তো দুজনের ঘরেই খাবার নেই, দুজনেই হয়তো একই ধরণের শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিদিন লড়াই করে চলেছে। একই সাথে রাষ্ট্রবাদ আরও বড় যে সর্বনাশটা করেছে তা হলো পাড়া-পরিবার-সমাজের প্রায় যেকোনো প্রকার সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের অসহায়-নিরুপায় মুখাপেক্ষিতার অভ্যাস। সমাজশক্তি এতে করে নিঃস্ব হতে বাধ্য। লক্ষণীয় যে, সমাজ থেকে উত্থিত দুই 'সত্তা' – পুঁজি আর রাষ্ট্র – খোদ সমাজটাকেই গিলে ফেলে। স্বাধীনতা-মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। সমাজ-রাজনীতির বিবর্তনের ইতিহাসটা এ বইয়ে এ ভাবেই ধরা পড়েছে।

কেন এমনটা হয়? লেখক দ্বিধাহীনভাবে বলেন, বিদ্যমান রাজনীতি ও রাষ্ট্র-প্রক্রিয়ার ভেতরেই তার বীজ। সে কারণেই তিনি কথা তুলেছেন এই দুই জায়গা নিয়ে। মতাদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দল তার কাছে ভয়ঙ্কর ঠেকেছে। এটা 'চোখের ঠুলি'র মতো কাজ করে। যেকোনো মতাদর্শকে লেখক ভয়ের চোখে দেখেন, কেন? কারণ 'মতাদর্শ টিকে থাকে হিংসার ওপর। হনন করিবার ইচ্ছার ওপর। প্রতিপক্ষকে দমন করবার আকাঙ্ক্ষার ওপর। প্রতিশোধপরায়ণতাই মতাদর্শের প্রাণ।' সমালোচনা আরো সোজাসাপ্টা হয়ে ওঠে এভাবে: 'মতাদর্শ টিকে থাকে মিথ্যার ওপর। বিমূর্ত বিচারে সত্য এক হলেও, তার মূর্ত প্রকাশ বহু-বিচিত্র। যেকোনো একটা বা একসেট প্রকাশকেই শুধু সত্য বলে ঘোষণা করলে তা মিথ্যার নামান্তর হয়। মতাদর্শ সত্যের বহুবিচিত্র, অনন্ত প্রকাশকে সহ্য করতে পারে না। নিজের বিবেচনাবোধ ছাড়া আর কারো বিবেচনাবোধের ওপর সে আস্থা রাখতে পারে না। অন্যকে সন্দেহ করাই তার কাজ। অন্যকে ভ্রান্ত মনে করাই তার কাজ। আত্ম-অনুসন্ধানের সাথে পরিচয় থাকে না মতাদর্শের।' (দ্রষ্টব্য: বর্তমান গ্রন্থের ৪৩৭ পৃষ্ঠা।) সঙ্গত কারণেই 'হিংসা'কে বাদ দিতে পারে না মতাদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দল, তা মার্কসবাদীই হোক আর যে বাদীই হোক। রাজনৈতিক দল আর সংগ্রামের ইতিহাসটাই তাই। হিংসা দিয়ে অর্জিত কোনো কিছুকে রক্ষা করতে হলে আবারও 'হিংসা'রই আশ্রয় নিতে হয়। এই শেষোক্ত কথাটা মহাত্মা গান্ধীর। লেখক গান্ধীজীর প্রসঙ্গ টেনেছেন, আন্দোলনের 'অহিংস' ধরণকে কবুল করার জন্যই শুধু নয়, খোদ রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটির চরিত্র বোঝাতেও। 'সহিংসতা'র উপাদান ছাড়া রাষ্ট্র হয় না। সহিংস আচরণ করার, শাস্তি দেবার, কারারুদ্ধ করার, হত্যা করার একমাত্র 'লেজিটিমেট অথরিটি' আছে রাষ্ট্রের, আর কারো নয়। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা মানে (তা নির্বাচন দিয়েই হোক আর বিপ্লব/গণঅভ্যুত্থান দিয়েই হোক) রাষ্ট্রক্ষমতার ওপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করা। সুতরাং আমার মতাদর্শের পক্ষে সমগ্র সমাজ-জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আসার জন্য

রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কোনো বিকল্প নেই। যেহেতু আমি মনে করি আমার মতাদর্শই শ্রেষ্ঠ, সুতরাং 'হিংসা'টা জায়েজ হয়ে যাচ্ছে। সব ধরণের 'তন্ত্র'তেই ('গণতন্ত্র', 'সমাজতন্ত্র'...) মতাদর্শ আর হিংসার ওপর দাঁড়িয়ে আছে 'রাষ্ট্র' নামক মহাশক্তিধর এক প্রতিষ্ঠান, যা রাজনৈতিক দল মাত্রেরই অভীষ্ট! স্বভাব-সহিংস রাষ্ট্র-প্রক্রিয়াকে নির্মোহভাবে উন্মোচন করতে লেখক যথার্থ সাক্ষী মেনেছেন গান্ধীজীকে যিনি একেবারে খুলে দেখিয়েছিলেন রাষ্ট্রের আত্মাহীন মেশিন-সত্তাকে এ ভাবে: 'সহিংসতার ঘনীভূত ও সুসংহত রূপের প্রতিনিধিত্ব করে রাষ্ট্র। ব্যক্তির আত্মা থাকে, কিন্তু রাষ্ট্র যেহেতু আত্মাহীন একটা মেশিন, সেহেতু তা কখনোই সহিংসতা থেকে মুক্ত হবে পারবে না – কেননা এর খোদ অস্তিত্বটাই তো সহিংসতার কাছে ঋণী'। (দ্রষ্টব্য: বর্তমান গ্রন্থের ২৬৫, ২৬৭, ৩৬৫ ও ৩৯৫ পৃষ্ঠা।)

তাহলে কী করতে হবে? নতুন মতাদর্শ বানাতে হবে? 'ভালো' মানুষ হতে হবে? রাষ্ট্রকে 'ভালো' কাজে ব্যবহার করতে হবে? রাষ্ট্রের ভেতর 'আত্মা'র জন্ম দিতে হবে? লেখক এসব আলোচনার ধার-পাশেও নেই। রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানের মাথার ওপরে একদল ভালো মানুষ বসাতে পারলে এর ভেতরে আত্মা গজাবে এমন স্বপ্ন তিনি দেখেন না। তার আস্থা বরং 'প্রিফিগারেটিভ পলিটিক্স' বা 'প্রাক-রূপায়নের রাজনীতি'তে। এটা হলো সেই রাজনীতি যা লেখকের ভাষায়, 'যা আমি চাই তা এখনই পরিস্ফূট হয়ে উঠবে আমার এই মুহূর্তের কর্মপ্রণালীর মধ্য দিয়ে ... সাংগঠনিক কর্মপ্রণালীর ভেতর দিয়ে। আজকের রাজনৈতিক সংগঠনই আগামী দিনের কাঙ্ক্ষিত সমাজ-সংগঠনের ক্ষুদ্র-কিন্তু-বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তোলে।' আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, 'যে উপায়ে আমি কাজ করি তা যদি আমার উদ্দেশ্যের সাথে মানানসই না হয়, তাহলে সে উপায় বৈধ নয়, কাঙ্ক্ষিত নয়। অহিংসায় পৌঁছানোর একমাত্র পথ এখানে অহিংসা স্বয়ং। সাম্য-সমাজে পৌঁছানোর একমাত্র পথ সাম্য-প্রণালীতে পরিচালিত আত্মসংগঠন-তন্ত্র।' এর মানে হলো: 'আমি যে বৈপ্লবিক রূপান্তর চাই সমাজের, তা আমার বর্তমান চাওয়াচাওয়ির কর্মপ্রণালীর মধ্যেই প্রতিফলিত হতে হবে। আগামীকাল যে শুভ-সুন্দর-ন্যায়পরায়ণ সমাজ আমি চাই, আমার আজকের সংগঠন-প্রণালীই তার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে ... তোলে' যেন। (দ্রষ্টব্য: বর্তমান গ্রন্থের ১৬৯ পৃষ্ঠা।) উপরন্তু, বিদ্যমান বলপ্রয়োগমূলক রাষ্ট্রের উপস্থিতির ফলেই গোটা সমাজটার 'সামরিকীকরণ' ঘটে – এটাই লেখকের সিদ্ধান্ত। সুতরাং 'সমাজের বেসামরিক রূপান্তরের কর্তব্য' নির্ধারণের কথা তোলেন তিনি। প্রেম, ভালবাসা, সহযোগিতা, সংহতি, স্বনিয়ন্ত্রণ, কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বহীনতা, পূর্ণ স্বাধীনতা ও সমান সুযোগ – এগুলো প্রকৃতির বিধান, যা মানুষের সমাজেও চলতে পারে। 'কর্তৃত্ব-কর্তৃপক্ষ-বন্দুক-বরকন্দাজের আইন'ই প্রকৃতির বিধান চালু

করার পথে বাধা। লেখকের স্পষ্ট কথা: 'আমাদের দরকার পারস্পরিক সহযোগিতা-মূলক, সার্বিক সম্মতিমূলক, সামাজিক আইনের শাসন। আমাদের দরকার প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। সামাজিক গণতন্ত্র (রাজনৈতিক গণতন্ত্র নয়)।' (দ্রষ্টব্য: বর্তমান গ্রন্থের ২২৬ পৃষ্ঠা।)

চিন্তার এই পথরেখাটা 'কিছুটা' অচেনা, তবে একেবারে অপরিচিত নয়। এ ধরণের কিছুটা অচেনা-র‍্যাডিক্যাল পথের কথা শোনা গিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, 'প্রথম ইন্টান্যাশনাল'-এ। এ প্রসঙ্গে অনেক কথা উঠেছিল সেখানে। রাষ্ট্রক্ষমতাকে কীভাবে বিবেচনায় নেয়া হবে – এটাই ছিল সেখানকার বিতর্কের অন্যতম ইস্যু। মিখাইল বাকুনিনরা রাষ্ট্র নামক বলপ্রয়োগ-মেশিনটিকে ভয় পেতেন। সে কারণে বৈপ্লবিক পালাবদলের পাবার পর দেরি না করেই তাকে ধ্বংস করে দেবার কথা বলতেন। কেননা 'একবার যদি রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের দিকে শ্রমিক-আন্দোলন যায়, তাহলে গত পাঁচ হাজার বছরের বলপ্রয়োগের যে রাজনীতি (রাজনীতি মানেই বলপ্রয়োগের রাজনীতি), পাঁচ হাজার বছরের যে কর্তৃত্বতন্ত্র সেগুলোই সমাজে নব উদ্যমে ফিরে আসবে। এই ধারার রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র হবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মিথ্যা।' (দ্রষ্টব্য: বর্তমান গ্রন্থের ১৬৯ পৃষ্ঠা।) এই ধারাটাকে তখনই অনেকে বলেছেন, 'কর্তৃত্বকামী' সমাজতন্ত্রের বিপরীতে 'মুক্তিপরায়ণ' সমাজতন্ত্রের ধারা, যেখানে রাষ্ট্র ও নিবর্তনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ-প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, লেখক এই ধারাকে আলিঙ্গন করতে চান।

নিবর্তনমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিপরীতে স্বাধীনতা-মুক্তির কথা অ্যানার্কিস্ট নানা ধারাতেও খুঁজে পাওয়া যায়। আজকের দুনিয়ায় অ্যানার্কি বা নৈরাজ্য শব্দটা শুনলেই 'মারামারি-কাটাকাটি', 'যা ইচ্ছে তাই করা'র মতো একটা ধারণা বা চিত্রকল্প চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে। ব্যাপারটা মোটেও সেরকম নয়। এটা একটা চিন্তাকাঠামো, তবে এককাট্টা নয় কোনোভাবেই। এটা কোনো মতাদর্শ নয়, চিন্তার একটা ঝোঁক। এই ভাবনার কেন্দ্রে থাকে মানুষ ও সমাজ। এটা রাষ্ট্রবাদী বা বাজারবাদী চিন্তা নয়। রাষ্ট্রবাদ আর বাজারবাদ সমাজ আর মানুষকে রাষ্ট্র আর বাজারের পদতলে পিষ্ট করে। সমাজের মুমূর্ষু দেহের ওপরে রাষ্ট্র আর বাজারের বিজয়পতাকা ওড়ায়। 'পণ্যপূজা'র মতো একই তালে চলতে থাকে 'রাষ্ট্রপূজা'। একদল ভাবে পণ্যপূজাই মানুষের স্বাধীনতা এনে দেবে, আরেক দল ভাবে রাষ্ট্রপূজাটা ঠিকমতো করতে পারলে ধীরে ধীরে পণ্যপূজার যুগ শেষ হয়ে যাবে। এই রাষ্ট্রপূজা আর পণ্যপূজাকে ঘিরেই যত মতাদর্শ। কিন্তু ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বলে, এই দুই পূজার কোনোটাই মানুষ ও সমাজের স্বাধীনতা আনতে পারেনি। নৈরাজ্য-চিন্তায় বহু আগেই এটা ধরা পড়েছিল। রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী আর নিপীড়নমূলক

ভূমিকার ব্যাপারটা নৈরাজ্যবাদী তকমা না লাগানো সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধীরও চোখ এড়িয়ে যায়নি। গান্ধী কি তাহলে বাস্তবে একজন নৈরাজ্যবাদী ছিলেন? লেখক নিজেও সে প্রশ্ন আমলে নিয়েছেন। আরেক লেখক-সমাজচিন্তক অম্লান দত্ত অবশ্য অনেক কাল আগেই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। গান্ধীকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অম্লান দত্তের জুড়ি মেলা ভার। তিনি গান্ধীবাদকে নৈরাজ্যবাদ বলতে দ্বিধা করেননি। গত শতাব্দীতে নানা দেশে (আমেরিকা, চীন, ফ্রান্স) তরুণদের বিদ্রোহ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'নতুন এই প্রতিবাদের ভাষা যাই হোক না কেন, এর সঙ্গে গান্ধীবাদ তথা নৈরাজ্যবাদের কোথাও একটা মর্মের যোগ আছে'। গান্ধীর আইন-কানুন বা নিয়ম পালন প্রসঙ্গে অম্লান বলছেন, 'গান্ধী অবশ্য জানতেন যে, নিয়ম ছাড়া কোনো সুস্থ সমাজ বা প্রতিষ্ঠান চলে না। সাধারণ জীবনে নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করে চলবার শিক্ষাই তিনি দিয়েছেন। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও মানুষের নৈতিক কর্তব্য। একথা গান্ধী অন্তরের অন্তস্থল থেকে অনুভব করেছিলেন। প্রতিবাদকে কিভাবে সার্থক করে তোলা যায় এই মূল প্রশ্ন নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। এই চিন্তার ফলশ্রুতি স্বরূপ তিনি যে-সব প্রত্যয়ে উপনীত হন তারই গুণে গান্ধীবাদকে সমসাময়িক সমস্ত নৈরাজ্যবাদের ভিতর সবচেয়ে পরিণত বলা যেতে পারে'। (দ্রষ্টব্য: অম্লান দত্ত, 'গান্ধী ও মাও', 'প্রবন্ধ সংগ্রহ', সম্পাদনা: আরতি সেন ও গৌরকিশোর ঘোষ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা: ৪১৩-১৪।) চিন্তাকাঠামো হিসেবে নৈরাজ্যবাদকে ভালোভাবে বুঝতে গেলে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে হবে না। এই বইয়ের লেখক তার দুটো রচনায় এ কথাটা জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন।

লেখক তাহলে কী 'বাদী'? গান্ধীবাদী, রবীন্দ্রবাদী, বাকুনিনপন্থী...? যদিও প্রথাগত চিন্তাকাঠামো সেই খোঁজটাই আগেভাবে নিতে চাইবে। কিন্তু এই বইয়ের রচনাগুলো নিবিষ্ট মনে পড়লে, ঐ আগ্রহটা হয়তো আর থাকবে না। অনেকের মতো তিনিও মানুষ ও সমাজের স্বাধীনতা চেয়েছেন, মানুষ ও সমাজকে স্থান দিয়েছেন রাষ্ট্র আর বাজারের ওপরে, হতে চেয়েছেন সমাজবাদী, তবে কোনো সুনির্দিষ্ট মত ও পথের 'দাগ' না এঁকেই। লেখায় নৈরাজ্যচিন্তাধারার ছাপ স্পষ্ট, তবে দাগগুলো, পথগুলো, কিছুটা অস্পষ্ট, কিছুটা অচেনা – অন্যরকম।

এই বই 'সিরিয়াস' পাঠকদের জন্য। সমাজ পরিবর্তনে যাঁরা নিবিষ্ট মনে কাজ করছেন তাঁদের জন্য। তবে এ থেকে কেউ যদি সমাজ পরিবর্তনের 'রেডিমেড' রূপরেখা পেতে চান, তিনি হতাশ হবেন, কোনো সন্দেহ নেই। কেননা সেরকম কোনো রূপরেখা এখানে নেই। লেখক তা দিতেও চানওনি, কেননা তিনি এ ধরণের কোনো রূপরেখায় আস্থা রাখেন না। ছকে বাঁধা রূপরেখা অন্ধ করে দেয়, কেবলই চেনা পথে

হাঁটতে শেখায়। কাঠামোবদ্ধ করে ফেলে। প্রথাগত ও প্রণালীবদ্ধ চিন্তা অনেক কিছুকে দৃষ্টির বাইরে রেখে দেয়। আমরা ভাবতে শিখি, এই কাঠামোর বাইরে কিছু নেই, যদিও বা থাকে তাতে ভুল। আমরাই সঠিক, বাকিরা ভুল। এরকম এক শ্রেষ্ঠত্বের বোধ আমাদেরকে পেয়ে বসে। এই বোধই আমাদের চোখগুলোকে অন্ধ করে দেয়। লেখক চোখ দুটোকে অন্ধ না করার পরামর্শ দিয়েছেন মাত্র।

সবাই যে লেখকের বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারবেন, এমনটা মনে হয় না। লেখক নিজেও বোধহয় তা চান না।

জাপান গার্ডেন সিটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
৯ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪

সেলিম রেজা নিউটন

কৈফিয়ত ও কৃতজ্ঞতা

> কিন্তু বর্তমান এ যুগ চিহ্নায়িত বস্তুর চেয়ে বেশি পছন্দ করছে তার চিহ্নকে, মূল জিনিসের চেয়ে বেশি পছন্দ করছে তার নকলকে, বাস্তবতার চেয়ে বেশি পছন্দ করছে তার পরিবেশনাকে, অন্তর্গত সারসত্তার চেয়ে বেশি পছন্দ করছে তার বাহ্যপ্রকাশকে ... এই যুগে এসে সত্যকে দেখা হচ্ছে ঘৃণা আর অশ্রদ্ধার চোখে, আর স্রেফ বিভ্রমকেই মনে করা হচ্ছে পবিত্র। প্রকৃতই – সত্য যত কমছে আর বিভ্রম যত বাড়ছে ঠিক ততটাই যেন বৃদ্ধি পাচ্ছে পবিত্রতা, যেন সর্বোচ্চ মাত্রার বিভ্রমই হয়ে উঠছে সর্বোচ্চ মাত্রার পবিত্রতা।
>
> ফয়েরবাখ, খৃস্টানত্বের সারসত্তা
> দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, বাংলা অনুবাদ – সরন

বসন্ত চলেই এলো। বসন্তবিভ্রম নয়, টেলিভাইজড বসন্ত নয়, বসন্তের পরিবেশনা মাত্র নয় – সত্যিকারের বসন্ত। ভরভরন্ত সেই বসন্ত ভর করেছে এই বইয়ে। কীভাবে কেন কতটা সেটুকু বলতে পারলেই কৈফিয়ৎ ফুরাবে। অভ্যাসের অনর্থকতাকে অতিক্রম করে অর্থ খুঁজে পাবে কৃতজ্ঞতা।

০.১ বাজার, বসন্ত আর বন্দুকের বিধি

এ বইয়ের 'অচেনা দাগ' নামখানির নিচে আদিতে ছিল 'বন্ধুত্ব বসন্ত বিপ্লব' উপশিরোনাম। পরে নানা কারণে করেছি 'সম্পর্ক স্বাধীনতা সংগঠন' – প্রথম তিনটা শব্দের প্রতিশব্দই বলতে গেলে। শব্দ-প্রতিশব্দের মধ্যেই গেল পয়লা ফাল্গুন। গেল ১৪ই ফেব্রুয়ারি। ১৯৮৩ থেকে এই দিনটা বসন্ত আর বিদ্রোহকে দিয়েছে একাকার করে। একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় শিক্ষার্থী-বিদ্রোহের দিন ১৪ই ফেব্রুয়ারি। ল্যাজে-এরশাদের গরম গরম সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর ভয়-ভীরুতার দোনোমোনো-দোটানার ভেতরেও শিক্ষার্থীদের অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহাই ছুঁড়ে দিতে পেরেছিল টানটান চ্যালেঞ্জ। গোটা আশির দশক জুড়ে সামরিক শাসনবিরোধী রক্ষক্ষয়ী শিক্ষার্থী-সংগ্রামের পরিণতিতে নব্বইয়ের সূচনায় যে মিডিয়া-বুম ঘটতে পেরেছিল, সেই মিডিয়ার বিস্মরণের কল্যাণে ১৪ই ফেব্রুয়ারির 'স্বৈরাচার প্রতিরোধ দিবসে' জেঁকে বসেছে ভালোবাসার কাছাখোলা ব্যবসা।

নিওলিবারাল ওরফে কাছাখোলা পুঁজিবাদের প্রধানতম বৈশিষ্ট্যই এই –

সম্ভব-অসম্ভব সব কিছু নিয়ে বাণিজ্যের বেসাতি করা। বাণিজ্য তো খারাপ কিছু নয়। বাণিজ্য চিরদিন ছিল। থাকবে। বাণিজ্য চিরকাল লেনদেন ঘটিয়েছে মানুষে মানুষে। কমিয়েছে পার্থক্য। কমেছে দূরত্ব। বাণিজ্য মানুষই করেছে। বাজার মানুষের সুপ্রাচীন উদ্ভাবন। মনুষ্য-বিনিময়ের পুরাতন তীর্থ। বিনিময় আর লেনদেনের অবকাশ বাড়লে মানুষের স্বাধীনতা বাড়ে, ব্যাপ্তি বাড়ে, শক্তি বাড়ে। বিকশিত হয় ব্যক্তি এবং সেকারণে সমাজ। প্রসারিত আর অবারিত হয় সম্পর্ক এবং সমাজ-সংগঠন। দূরে যায় অপরিচয়ের অসমতা। স্বতঃস্ফূর্ত স্বতঃপ্রতিষ্ঠিত স্বশাসিত এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার স্বনিয়মে পরিচালিত আবহমান কালের আনন্দ-বাজারের ঘাড়ে ধীরে ধীরে যখন কৃত্রিমভাবে চেপে বসে কর্তৃত্ব-কর্তৃপক্ষের কঠোরতা তখন তা অধঃপতিত হতে শুরু বৈষম্য-বঞ্চনা আর আর্থিক বলপ্রয়োগের পরিক্ষেত্রে। জমিদার-রাজাবাদশা-রাষ্ট্রের একপেশে আইনকানুন-দণ্ডবিধির ফাঁস পড়তে থাকে সনাতন সামাজিক বাজারের গলায়। সমাজের নাভিশ্বাস ওঠে। হাঁসফাঁস করে সম্পর্ক। বিনিময়-বঞ্চিত হতে শুরু করে মানুষ। আসে গরিবি। বানানো গরিবি। সাজানো গরিবিকে বন্দুকের বিধি দিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে টিকিয়ে রাখার হুকুমতন্ত্র ষোলকলা পূর্ণতা পেতে শুরু গুটিকয়ের সেনা-রাষ্ট্র-কর্পোরেটতন্ত্রে এসে। কর্পোরেট-বাজারতন্ত্র লোকঠকানোর প্রচারণা হিসেবে মুখে মুখে যে 'মুক্তবাজার'-এর কথা বলে তা মোটেও মুক্ত কোনো বাজার নয়। এ বাজার সুনিয়ন্ত্রিত – রাষ্ট্র-কর্পোরেট বিধিবিধান দ্বারা। এ বাজার কেন্দ্রীভূত কর্পোরেট পুঁজির অবাধ চলাচল নিশ্চিত করে, কিন্তু শ্রমের/শ্রমিকের প্রতিটা পদক্ষেপকে কঠোর নিবর্তনমূলক আইন দিয়ে ঠেকিয়ে রাখে। এ বাজারে অতি সহজে বিনিময় ঘটে কর্পোরেট পুঁজিপতির সাথে কর্পোরেট পুঁজিপতির, কর্পোরেট পুঁজির সাথে রাষ্ট্রের, পণ্যের সাথে ভোক্তার। কিন্তু ভোক্তা মাত্রই থাকেন ভুক্তভোগী হয়ে। ভোক্তার সাথে ভোক্তার ভোগান্তি-অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ও আত্মসংগঠিত হওয়ার পথ হতে থাকে সংকীর্ণ। এ বাজার রক্তমাংশের মানুষকে পরিণত করে স্রেফ ক্রেতা-কনজিউমারে, সমাজকে পর্যবসিত করে দোকানদারিতে, যোগাযোগকে অধঃপতিত করে বিজ্ঞাপনে, সঙ্গীতকে জিঙ্গেলে, আর স্বাধীন সম্পর্ককে পরিণত করে বাধ্যতামূলক চুক্তিতে। মানবীয় সম্পর্ক অধীনস্ত হতে শুরু করে থানা-পুলিশ-দণ্ডবিধির। নিরাপত্তা সংজ্ঞায়িত হয় নজরদারি রূপে। খোদ রাষ্ট্র রূপান্তরিত হতে শুরু করে কর্পোরেট এজেন্টে। এভাবে গোটা রাষ্ট্র-সামাজিক বন্দোবস্তকে একটা সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্রের রূপ ধারণ করতে প্ররোচিত করতে থাকে এই কর্পোরেট বাজারতন্ত্র। মানুষ হতে থাকে একা, বিচ্ছিন্ন, বিচূর্ণ।

০.২ মুক্ত সম্পর্ক, ব্যক্তির স্বাধীনতা, সমাজ-সংগঠন

স্বাধীনতা মানে ব্যক্তিরই স্বাধীনতা। সন্দেহ নেই। কিন্তু সংকীর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বাধীনতা নয়। ব্যক্তির স্বাধীনতার কথা বললেই চট করে লোকে যাবতীয় সমাজ-সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির যাচ্ছেতাই যা তা ধরনের কাণ্ডকারখানা পাকানোর অনুমোদনকেই বোঝে। এ ধারণা নিতান্তই অর্থহীন – দীর্ঘদিনের কর্তৃত্বপ্রণালীগত অপপ্রচারের কুফল। মানুষ মাত্রেই আসলে সমাজ-সম্পর্কে বেড়ে ওঠে – বাঁচে। সম্পর্কহীনতা তার জন্য মৃত্যুর শামিল। অসুস্থ মরোমরো হেরোইন-আসক্তও আরেক জন আসক্তকে পেলে অধিকতর সুখে তার আসক্তি উদযাপন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বিপুল সামাজিক বিচ্ছিন্নতার অসহায়ত্বই মানুষকে আসক্তি ও অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। এ বিচ্ছিন্নতা আসলে আর্থরাজনৈতিক কর্তৃত্বপ্রণালীর কুফল। তরুণ মার্কসের 'অ্যালিয়েনেশন'-রচনাবলীর পর এ নিয়ে আর সংশয়ের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। বিচ্ছিন্নতাই বিপদের সূত্র। বিচ্ছিন্নতাতেই দাসত্বপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা। উদ্ধারের পথ সম্পর্কে, মুক্ত সম্পর্কে, স্বাধীনতায়।

ব্যক্তির স্বাধীনতা মানে তাই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির যাচ্ছেতাই তো নয়ই, এ বরং বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্কবিন্যাসের ভেতরে যাবতীয় বাধ্যতা ও পীড়নের হাত থেকে মুক্ত ব্যক্তির অবাধ বিকাশ। 'লিবারেশন ইজ কানেকশন' (প্যাট্রিস জোন্স, 'ফ্রি অ্যাজ এ বার্ড: ন্যাচারাল অ্যানার্কিজম ইন অ্যাকশন', অ্যামস্টার ও অন্যান্য, ২০০৯ এর ২৩তম অধ্যায়)। সম্পর্কই স্বাধীনতা। সম্পর্ক মানে সুসম্পর্ক। সম্পর্ক মানে যুক্ততার বোধ – যুক্তি। নিযুক্তি নয়। নিয়োগ নয়। চুক্তি নয়। নিয়োগ-চুক্তি তো নয়ই।

সম্পর্ক মানে বোঝাপড়া, ভালোবাসা, সমঝোতা। কিন্তু চুক্তি মানেই বাধ্যতা। সম্পর্ক মানেই স্বাধীন সম্পর্ক। মুক্ত সম্পর্ক। বাধ্যতামূলক সম্পর্ক কোনো মানবিক সম্পর্ক নয়। চুক্তি-নিযুক্তি-নিয়োগ কোনো মানবিক সম্পর্ক নয়। উক্ত বস্তু কর্তৃত্ব-দাসত্বের উভয়পাক্ষিক অসহায়ত্বের গোঁজামিল-বিধান মাত্র। ওটা দমনপীড়নের বাধ্যতামূলক নিরুপায় চুক্তি মাত্র।

যেখানে সম্পর্ক থাকে সেখানে অত্যাচার চলতে পারে না। যেখানে পরিচয় থাকে সেখানে পীড়ন চলতে পারে না। সমস্ত প্রকার দমন-পীড়ন বজায় রাখার জন্য চাই অপরিচয়-অসম্পর্ক-অপরতার প্রশ্নাতীত বোধ। সমস্ত প্রকার অত্যাচারের জন্য চাই যদি-বা কোনো সম্পর্ক থেকে থাকে তাকে সমূলে বিনষ্ট করা।

স্বাধীনতা মানে তাই বৈষম্য-বঞ্চনা-বলপ্রয়োগমূলক চুক্তির হাত থেকে মুক্তি। সকল ধরনের দমন-পীড়ন-শোষণমূলক বাধ্যতার হাত থেকে নিষ্কৃতি। অপরিচয়, অসম্পর্ক ও অপরতার প্রাতিষ্ঠানিক-সাংগঠনিক কাঠামোবিন্যাস থেকে উদ্ধার। মুক্তি

দরকার পীড়ন-আশ্রয়ী প্রতিষ্ঠানবিধি থেকে – সমস্ত সামাজিক-প্রাকৃতিক সম্পর্ক থেকে নয়। স্বাধীনতা বরং অধুনা-নিখোঁজ মানবিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের প্রকল্প। মানুষ ও প্রকৃতির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকা পথ-হারানো মানুষের সাথে মানুষের ও প্রকৃতির সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের প্রক্রিয়া। 'লিবারেশন ইজ এ প্রসেস অফ রিস্টোরিং রিলেশনশিপস' (প্যাট্রিস জোন্স, 'ফ্রি অ্যাজ এ বার্ড: ন্যাচারাল অ্যানার্কিজম ইন অ্যাকশন', অ্যামস্টার ও অন্যান্য, ২০০৯ এর ২৩তম অধ্যায়)।

এ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করা যায় মানবীয় যোগাযোগে – টেলিযোগাযোগে নয়। সম্পর্ক মানে মানুষে-মানুষে যোগাযোগ, যন্ত্রে-যন্ত্রে নয়। তাই 'যোগাযোগ দীর্ঘজীবী হোক, টেলিযোগাযোগ নিপাত যাক' – বলেছিল প্যারিস, ১৯৬৮-র বিশ্ববসন্ত। সত্যিকারের মানবিক সম্পর্ক ও স্বাধীনতার জন্য চাই উপযুক্ত সমাজ-বিন্যাস – মুক্তি-সহায়ক সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস। উচ্চনিচক্রমতান্ত্রিক, হুকুমতান্ত্রিক এবং বাধ্যতামূলক চুক্তি-নিযুক্তি টাইপের বিধিবিধান দ্বারা পরিচালিত সাংগঠনিক-প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কখনও মুক্ত-মানবিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটাতে পারে না। প্রয়োজন তাই আনুভূমিক স্বশাসিত স্বনিয়ন্ত্রিত স্বপরিচালিত পারস্পরিক সহযোগিতা -নির্ভর ব্যক্তি-সামাজিক আত্মসংগঠনের স্বরাজ। সে জন্য চাই সমাজ-সম্পর্কের ও আর্থ-রাজনীতির আমূল পরিবর্তন – তাকে সংস্কার বা বিপ্লব বা পরিবর্তন যে নামেই ডাকা হোক না কেন। দরকার প্রকৃত গণতান্ত্রিক আর্থরাজনৈতিক সমাজ-বিন্যাস।

০.৩ নৈরাজ্যিক প্রাকরূপায়ণের রাজনীতি এবং জ্যাক র‍্যানসিয়ার গণতান্ত্রিক রাজনীতি

প্রশ্ন হলো: এরকম আমূল সামাজিক পরিবর্তনের পথে আমরা এগুবো কীভাবে। কবে সত্যিকারের একজন নেতা আসবেন, তিনি সঠিক পথ দেখাবেন, সঠিক বৈপ্লবিক পার্টি গঠন করবেন, আমাদের সবাইকে এক পতাকার নিচে জড়ো করে সেই পার্টি শক্তি সঞ্চয় করলে একদিন একটা 'বিপ্লব' ঘটে যাবে আর তার পর থেকে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে – সমাজ-পরিবর্তনের এই ধারণায় আছে গুরুতর গোড়ার গলদ। এই ধারণা এলিট-মহাজনী চিন্তা-আচ্ছন্ন। এই ধারণা এলিট-এক্সপার্ট নেতৃত্বের বিপদকে বিবেচনায় নেয় না। এই ধারণা তথাকথিত অগ্রসর চেতনার মালিক ভ্যানগার্ড পার্টির সম্ভাব্য হুকুমতন্ত্র তথা একদলীয় স্বৈরতন্ত্রের ইতিহাস-প্রমাণিত আপদকে আমলে নেয় না। পরিবর্তনের এই 'বৈপ্লবিক' প্রক্রিয়ায় 'অনগ্রসর' 'অসেচতন' আমজনতা যে সেই আহাম্মক অনুসরণকারী হিসেবে অধঃপতিতই থেকে যাচ্ছেন – চাক্ষুস সেই সত্যটাকে দেখতে চায় না এই এলিট থিওরি। এভাবে কোনোদিনই 'একদিন সত্যের ভোর' আসবে না। সর্বপ্রকার বলশেভিক পরিবর্তন-প্রণালীর ইতিহাস তার প্রমাণ।

আমূল সামাজিক পরিবর্তন স্রেফ কোনো আখেরি উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে থাকলে চলে না। এই ধরনের পরিবর্তনকামিতাকে হয়ে উঠতে হবে এই মুহূর্তের প্রক্রিয়াও। উদ্দেশ্য ও উপায়ের সঙ্গতি বিধানের প্রশ্নটাই প্রকৃত পরিবর্তনের আসল প্রশ্ন। এই প্রশ্নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আমলে না নিয়ে দাঁড়াতেই পারে না যে-রাজনীতি তার নাম 'প্রাক-রূপায়নের রাজনীতি' বা প্রিফিগারেটিভ পলিটিক্স (দ্রষ্টব্য: এই বইয়ের বিশেষত ৮.৫ এবং ৮.৬ অংশ)। এর মোদ্দাতম কথাটুকু হলো: আখেরে যা তুমি চাও তোমার এখনকার কর্মপ্রণালীতে তার রূপ ফুটে উঠতে হবে। তা যদি ওঠে তবেই বোঝা যাবে তুমি তোমার উদ্দেশ্যের সাথে উপায়ের অসঙ্গতি ঘটাও নি। তুমি চাও কার্ল মার্কসের 'মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজ', আর এখন তুমি পার্টির মধ্যে 'চিন্তার ঐক্য কথার ঐক্য কাজের ঐক্য' মার্কা লেফটরাইট করতে থাকবে এই অজুহাতে সেই অজুহাতে – তার মানে তুমি শহীদ কাদরীর 'রাষ্ট্র মানে লেফটরাইট'-এর রাষ্ট্রই চাও। বিদ্যমান রাজনীতি নামের জিনিসটাতে সবচেয়ে প্রচলিত অজুহাত রাজনৈতিক কৌশলের অজুহাত। প্রাকরূপায়ণের রাজনীতিতে কৌশল কখনও কলাকৌশল হয়ে উঠতে পারে না। কলাকৌশল্যের কলাকৈবল্যবাদ আদত শিল্পসুরের দফা রফা করে রাখে, আখেরি উদ্দেশ্যকে আসমানে পাঠায়। বাকি থাকে ছলেবলেকৌশলে ছোট-বড়-মাঝারি-আহাজারির চেয়ারে-সিংহাসনে আরোহন করার বাদশাহী ভ্রান্তি-বিলাস। কিন্তু তার চেয়েও বড় অজুহাত অভ্যাসের অজুহাত। অভ্যাসের অদৃশ্য অজুহাত। অদৃশ্যতার আড়ালে সবার অজান্তেই কীভাবে যে তা জাঁকিয়ে বসে থাকে পথ রোধ করে কেউ তা দেখতে পায় না সহজে। কিন্তু এসব ডানহাত বামহাত আর অজুহাতের গল্প সবাই জেনে গেছে। যেকোনো প্রকার অজুহাতই রাজনীতির নীতি-নিষ্ঠতার প্রশ্নে ছলনা-কপটতা-শঠতার নামান্তর মাত্র – এ কথা আজ আমাদের মানুষের কমনসেন্স। অনেক ঐতিহাসিক মূল্যের বিনিময়ে সবাই আজ জানেন, কথায় বলে, 'খলের ছলের অভাব হয় না'। দেশের অবস্থা ভালো না বলে আমরা পরস্পরকে ভালোবাসা বন্ধ করে দিতে পারি না। ভালোবাসা এমন একটা ঘটনা, কোনো অজুহাতেই তা স্থগিত রাখা চলে না। এটিকে কোনঠাসার করার একটাই অর্থ – হিংসার অবাধ বিস্তার। উদ্দেশ্যের সাথে উপায়ের সঙ্গতিবিধান তাই বাধ্যতামূলক – প্রাকরূপায়ণের রাজনীতিতে।

প্রাকরূপায়ণের রাজনীতি এক অর্থে জ্যাক র‍্যানসিয়ার 'গণতান্ত্রিক রাজনীতি'ই বটে। সাম্প্রতিক ফরাসি দর্শনের অত্যুজ্জ্বল দিকপাল ফুকো, জিল ডেলুজ, লিওতার্দ, অ্যালান বাদিউ-দের উত্তরসূরী, আলথুজারের সাক্ষাৎ শিষ্য-সহলেখক জ্যাক র‍্যানসিয়া ক্ষমতা ও রাজনীতি নিয়ে বলতে গেলে নৈরাজ্য ধারার চিন্তনের অবিকল্প কেন্দ্রীয় ধারণাগুলোর সীমাবদ্ধতার ঘাটতি-কমতি যা ছিল চিহ্নিত করেছেন, ঘাটতি

-গুলোকে পূরণ করেছেন এবং প্রকারান্তরে মুক্তিপরায়ণ রাজনীতির তাত্ত্বিক হাতিয়ারগুলোকে আরও বিকশিত ও শানিত করেছেন (দ্রষ্টব্য: টড মে 'অ্যানার্কিজম ফ্রম ফুকো টু র‍্যানসিয়া': পিটার লাডলো, ২০০১: ১১-১৭)। এখানে সে আলাপে না গিয়ে আমরা শুধু অল্প একটু দেখব রাজনীতিকে সত্যি যদি গণতান্ত্রিক হতে হয় তাহলে তার ধারণাগত ও অনুশীলনগত ভিত্তি কী হবে সে ব্যাপারে র‍্যানসিয়ার বিশ্লেষণ। প্রফেসর টড মে বুঝিয়ে বলছেন র‍্যানসিয়ার কথা:

> র‍্যানসিয়ার মতে, রাজনীতিকে যদি *গণতান্ত্রিক* রাজনীতি হয়ে উঠতে হয় তবে তাকে অবশ্যই সমতাপরায়ণ হতে হবে। সমতা এখানে বিশেষ অর্থে। এটা এমন রাজনীতি যা জেগে ওঠে সমতার *পূর্বধারণা* নিয়ে। অন্য কথায় বললে, গণতান্ত্রিক রাজনীতির ভিত্তি হতে হবে এই পূর্বধারণা যে যাঁরা সংগ্রাম করছেন তাঁরাও পরস্পরের সমান। এবং এমনকি তাঁরা তাঁদেরও সমান যাঁরা তাঁদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছেন। কিংবা তাঁদেরও সমান যাঁরা তাঁদেরকে নিজেদের সমান বলে গণ্য করেন না। যে বিধি-বন্দোবস্ত মানুষের দায়িত্বকর্তব্য-ভূমিকা-কাজ বন্টন করে উচ্চনিচ ক্রমবিচারের পূর্বধারণাকে ভিত্তি করে, সেরকম একটা বন্দোবস্তের সমস্ত কায়দাকানুন-পদ্ধতিপ্রণালীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চ্যালেঞ্জই আসলে গণতান্ত্রিক রাজনীতি। শেষ বিচারে তা-ই।

জ্যাক র‍্যানসিয়ার মতে উচ্চনিচ ক্রমবিচারমূলক এইসব 'কায়দাকানুন-পদ্ধতি-প্রণালী'গুলোকে থামানো না-গেলে গণতান্ত্রিক রাজনীতি দাঁড়াতে পারবে না। যে বন্দোবস্ত 'যেকোনো মানুষের সাথে যেকোনো মানুষের এবং প্রত্যেকের সাথের প্রত্যেকের সমতার পূর্বধারণা'কে যাবতীয় অনুশীলনের আগাম ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়ে কাজ করে না তা 'রাজনীতি'ই নয়। এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য তিনি অ্যারিস্টটল থেকে ফুকো পর্যন্ত পরিব্রাজন করেন। পরিণামে, বিদ্যমান যে বিধি-বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তবেই রাজনীতি হয়ে ওঠে গণতান্ত্রিক রাজনীতি সেই বিধিবন্দোবস্তকে তিনি 'রাজনীতি' নামটা বরাদ্দ করতে চান না। তাঁর কাছে গণতান্ত্রিক রাজনীতিটুকুই আসলে 'রাজনীতি'। বাকিটা রাজনীতির নামে – র‍্যানসিয়ার ভাষায় – 'পুলিশী বন্দোবস্ত'।

> মনুষ্যগোষ্ঠীসমূহের সম্মতি ও সম্মিলন ঘটানোর প্রক্রিয়া, ক্ষমতাবিন্যাসের প্রক্রিয়া, স্থান ও ভূমিকাসমূহ বন্টনের প্রক্রিয়া, এবং সেই বিন্যাস-বন্টনকে বৈধ প্রতিপন্ন করার প্রক্রিয়াসমূহের সমস্টি হিসেবেই রাজনীতিকে সাধারণত দেখা হয়ে থাকে। আমি এই বন্টন ও বৈধতার সিস্টেমটার অন্য একটা নাম প্রস্তাব করতে চাই। আমি একে *পুলিশ* নামে ডাকার প্রস্তাব করছি। (জ্যাক র‍্যানসিয়া, ২০০৬: ২৮)

বাকুনিন থেকে শুরু করে নিউটন পর্যন্ত আমরা অনেকেই রাজনীতিকে এভাবে সহিংস ক্ষমতাবিন্যাস হিসেবে দেখে এসেছি বৈকি। এ চোখে দেখলে 'সমাজ' নামক সত্তাকে খারিজ করেই তবে 'রাজনীতি' নামের একটা সত্তা গড়ে উঠতে পারে। এ দেখা ভুল নয়। বর্তমান এই বইয়েরই আগাগোড়া এ দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ পাওয়া যাবে। মুশকিল হয়: প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজবিন্যাসে বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক যৌথতার স্বাধীনতাশীল পদ্ধতিপ্রণালী-কায়দাকানুন-বন্দোবস্তকে তাহলে কী নামে ডাকব? এটা তখন সামাজিকভাবে বেড়ে ওঠা একটা প্রক্রিয়াই বটে কিন্তু এখানে সামাজিক ক্ষমতার স্ফূরণ ও ব্যবহার বিকশিত হয় যথাসম্ভব বলপ্রয়োগহীন/অহিংস কর্তৃত্ব-প্রণালীর মধ্য দিয়ে। অহিংসতা ও আনুভূমিকতাকে আশ্রয় করলেও তো এ বস্তু ক্ষমতারই বিন্যাস বটে। তার মানে আমাদের দেখা চোখেই এ বস্তুকে কোনো না কোনোভাবে 'রাজনীতি' বলে শনাক্ত করতেই হয়। *রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমাজ* গ্রন্থে ফরাসী নৈরাজ্যমুখিন নৃতাত্ত্বিক পিয়েরে ক্লস্ত্রে জঙ্গলের আদিবাসীদের সচেতনভাবে বিন্যস্ত রাষ্ট্রবিরোধী সমাজে প্রয়োগকর্তৃত্বহীন এবং উচ্চনিচক্রমতন্ত্রহীন যে ক্ষমতা-বন্দোবস্ত দেখেছেন তাকেও তিনি রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বলেই অভিহিত করেছেন (পিয়েরে ক্লস্ত্রে, ১৯৮৯)। তাহলে তখন জঙ্গলবিরোধী বর্তমান রাষ্ট্রের বিদ্যমান 'পুলিশী বন্দোবস্ত'টাকে আর 'রাজনীতি' নামে ডাকা যায় না। উপরন্তু এই সহিংস কর্তৃত্বমূলক উচ্চনিচক্রমতন্ত্রকে 'রাজ' বা 'রাজনীতি' বলে ধরে নিয়ে তার বিপরীত অবস্থানটাকে 'অরাজ' বা 'অরাজনীতি' হিসেবে আখ্যায়িত করার সুযোগও আর থাকে না। ফলে 'রাজনীতি' তখন গণতান্ত্রিক রাজনীতিই মাত্র। রাজনীতিকে বিকশিত হতে হয় তখন পুলিশী বন্দোবস্তকে চ্যালেঞ্জ করতে করতে। এভাবে একদিকে রাজনীতি হয়ে ওঠে 'বিরাজ-নীতি' – সমঅধিকার ও মর্যাদায় প্রত্যেকের সুষমভাবে 'বিরাজ' করতে পারার বন্দোবস্ত। এ হলো রবীন্দ্রনাথের 'আমরা সবাই রাজা'র ব্যক্তি-সামাজিক বিন্যাস। এভাবে রাজনীতি হয়ে ওঠে মানুষের। রাজনীতি হয়ে ওঠে গণতান্ত্রিক। রাজনীতি দাঁড়ায় ব্যক্তি-সামাজিক স্বরাজ ও সমতার পূর্বধারণার ওপর। গণমানুষের রাজনীতি করার জন্য তাহলে আর এমনকি 'নৈরাজ্যবাদ' বা অন্য কোনো নামের কোনো ফিলসফির দরকার পড়ে না। গণমানুষের গণতান্ত্রিক রাজনীতি মুক্তি পায় মতবাদ-মতাদর্শের গণ্ডিবদ্ধতা আর অন্ধতার হাত থেকে। মার্কস মুক্তি পান মার্কসবাদের হাত থেকে। নৈরাজ্য মুক্তি পায় নৈরাজ্যবাদের হাত থেকে।

বোঝাই যাচ্ছে: প্রাকরূপায়ণের রাজনীতি আর র‍্যানসিয়ার গণতান্ত্রিক রাজনীতি আদতে একই বস্তু। খেয়াল না করে উপায় নেই যে 'যেকোনো মানুষের সাথে যেকোনো মানুষের এবং প্রত্যেকের সাথের প্রত্যেকের সমতার পূর্বধারণা' কিন্তু

গণতান্ত্রিক রাজনীতির কোনো দাবি নয়, ভবিষ্যতের চাওয়া নয়, আখেরি লক্ষ্য নয় – এ হচ্ছে পূর্বধারণা, খোদ গণতান্ত্রিকতার সূচনাবিন্দু, তৎপরতা-পাটাতন, আগাম বিশ্বাস, *পূর্বধারণা*। র‍্যানসিয়ার রাজনীতিতে সমতার এই ধারণাটা কীভাবে কাজ করে সেটাই কেন্দ্রীয় মনোযোগের বিষয়। পুলিশী বন্দোবস্ত উচ্ছেদের এই রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের আন্দোলনকারীরা সকলেই সমান – এই পূর্বধারণা খোদ এই প্রতিরোধ-আন্দোলনটার ভেতরে কোনো হায়ারার্কি বা উচ্চনিচ কর্তৃত্বপ্রণালী গড়ে উঠতে দেয় না। সঙ্গতি ঘটে উদ্দেশ্যের সাথে উপায়ের। সমতাপূর্ণ যে সমাজ গড়ে উঠুক বলে আমরা চাই, সেই চাওয়ার আন্দোলন-সংগঠন-তৎপরতার মধ্যেই এভাবে ফুটে ওঠে তার আগাম চেহারা। অরাজপন্থার প্রাক-রূপায়ণের রাজনীতির সাথে র‍্যানসিয়ার রাজনীতির মিলন ঘটে এই জায়গায় এসে। বাকুনিনরা প্রথম আন্তর্জাতিকের ভেতরে এই চাওয়ার ছবি ফুটিয়ে তোলার রাজনীতিকেই এক পর্যায়ে 'নৈরাজ্য' দিয়ে বর্ণনা করেছিলেন। এভাবে, আসলে – একদিকে নৈরাজ্যচিন্তনের প্রণালীটাকেই আরও পোক্ত করে তুলেছেন জ্যাক র‍্যানসিয়া; অন্যদিকে প্রসার ঘটিয়েছেন তিনি ফুকোর ক্ষমতাতত্ত্বের; এবং তার পর যোগ ঘটিয়েছেন উভয়ের – ফরাসী দর্শনের সাথে নৈরাজ্য-তৎপরতার।

ফুকোর চিন্তাধারার বিশেষ একটা অভিমুখ মোতাবেক, সার্বিক আধিপত্য-প্রক্রিয়া স্রেফ রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করে না; এবং তা শুধু বলপ্রয়োগের ওপরও নির্ভর করে না। আধিপত্য আসলে অনেক বেশি সর্বগ্রাসী। এক প্রকার সর্বাত্মক পুলিশী প্যানোপটিকন বা নজরদারির সর্ব্ব্যাপী জালে তা আটকে ফেলে গোটা সমাজকে। র‍্যানসিয়া তাঁর পুলিশী বন্দোবস্তের আলাপ শুরু করেন ফুকোর এই জায়গাটা থেকে। পুলিশী বন্দোবস্ত শুধু বলপ্রয়োগ করে ক্ষান্ত হয় না। কিংবা তার পাশাপাশি স্রেফ মগজধোলাই আর নজরদারিতেই তা সীমাবদ্ধ নয়। এ আমাদের বাস্তবতার সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়। এঁকে দেয় সীতার লক্ষ্মণ-গণ্ডী। আমরা কতটুকু দেখতে পাব, কতটুকু শুনতে পাব[১], কতটুকু অনুধাবন করতে পারব – কোনো একটা পরিস্থিতিতে আদৌ কতটা শব্দ-দৃশ্য-ধ্বনি-তথ্য-বিবরণী আমাদের সামনে হাজির থাকবে অথবা থাকবে না (থাকতে দেওয়া হবে অথবা হবে না) – এবং আমরা কতটা কীভাবে বলতে পারব বা পারব না তা নির্ধারণ করে দেয় এই সর্বাত্মক পুলিশী-প্রণালী। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মিডিয়াসহকারে এ প্রণালী কাজ করে কতকগুলো রীতি-নীতি-মূল্যবোধ তৈরি করা এবং তা জারি রাখার মধ্য দিয়ে। এটা এক প্রকার অলিখিত আচরণবিধির মতো – কোড অফ কন্ডাক্ট। (জ্যাক র‍্যানসিয়া, ২০০৬)

---

১ স্মরণ করুণ প্যারিস-বসন্তের গায়েবি আওয়াজ: 'দেয়ালেরও কান আছে। আর তোমার কানেরও দেয়াল আছে।'

এ পুলিশী বন্দোবস্ত একেবারে বিনষ্ট করে ফেলতে থাকে যাবতীয় কল্পনা-প্রতিভা, উদ্যোগপরায়ণতা এবং স্বাধীনতাশীলতাকে। আমরা আর দেখতে পাই না আমাদেরই বাস্তবকে। এভাবে গড়ে ওঠে ফয়েরবাখের 'পবিত্র' সমাজ যা 'বাস্তবতার চেয়ে বেশি পছন্দ করে তার পরিবেশনা'কে। এভাবেই গড়ে ওঠে গাই ডেবর্ডের 'চোখধাঁধানো সমাজ' (গাই ডেবর্ড, ১৯৬৯)। এখানেই আসে 'বিপ্লব মানে উদ্যোগ' কিংবা 'ক্ষমতা হোক কল্পনাপ্রতিভার; কল্পনাপ্রতিভায় ঘাটতি যার, সে কল্পনা করতে পারে না ঘাটতি কোথায়'-এর মতো মে ১৯৬৮-র স্লোগান।

এই অবকাশে স্মরণ করা যেতে পারে: জ্যাক র‍্যানসিয়ার কল্পনাপ্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছিল কিন্তু প্যারিস-বসন্তেই। তখন তিনি ছিলেন শিক্ষার্থী। তাঁর শিক্ষক-গুরু লুই আলথুজার প্যারিস-বসন্তকে ইতিবাচক চোখে দেখতে না-পারায় আলথুজার এবং তাঁর মার্কসবাদের সাথে দূরত্ব গড়ে ওঠে র‍্যানসিয়ার। দীর্ঘকাল তিনি গবেষণা করেছেন উনিশ শতকের প্রাক-মার্কসীয় শ্রমিক-আন্দোলন নিয়ে। আর তা থেকেই গড়ে ওঠে তার এখানে আলোচিত চিন্তাধারা। ফরাসী দার্শনিকদের এলিট জৌলুষ তিনি সযত্ন এড়িয়ে চলেছেন। অনেকে তাঁকে ডাকে 'পাল্টা-দার্শনিক' বা অ্যান্টি-ফিলোসফার বলে। বসন্তেরই রোগলক্ষণ বৈকি।

০.৪ বন্ধুত্ব বসন্ত বিপ্লব: প্যারিস থেকে শাহবাগ

জ্যাক র‍্যানসিয়ার গণতান্ত্রিক রাজনীতি তথা অরাজপন্থার প্রাক-রূপায়ন-রাজনীতিরই বসন্ত এসেছিল প্যারিসে। আজকের অকুপাই-আন্দোলন, আরব-জাগরণ, শাহবাগ-আন্দোলন প্রভৃতির পথিকৃত ছিল ১৯৬৮-র প্যারিস-বসন্ত। ফুটেছিল মুক্তিপরায়ণ সমাজস্বপ্নের শতফুল। বিকশিত হয়েছিল শতমত-শতপথের শতদল। প্যারিস-বসন্ত শুধু প্যারিসেরই ছিল না। ১৯৬৮-র বাসন্তী আলো গোটা ইউরোপ ভাসিয়ে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পেরিয়ে ল্যাটিন আমেরিকা ছুঁয়ে এসে পৌঁছেছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পর্যন্ত। প্যারিস-বসন্ত ছিল বিশ্ব-বিদ্যালয়-জীবন ও কারখানা-জীবনের যূথবদ্ধতার উপলব্ধি ও অনুশীলনের নতুন অঙ্কুরোদ্গম। এ ছিল শিক্ষা ও শ্রমের কৃত্রিম বিচ্ছিন্নতার অবসানের ইশারা। জ্ঞান ও কর্মের মিথোজীবিতার স্বাভাবিক সঞ্চার। প্যারিস-বসন্ত তাই নিখিল মানুষের বসন্ত।

আটষট্টির প্যারিসে শিক্ষার্থী-শ্রমিকের যূথবদ্ধ বৈচিত্র্য দেয়ালে লিখেছিল মানবাত্মার ভবিষ্যৎলিপি: 'ইট ইজ ফরবিডেন টু ফরবিড' – 'মানা করা নিষেধ' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। এটা প্যারিস-বসন্তের অন্যতম স্লোগান, দেয়াললিখন, চিকা।[২] বসন্ত যখন জাগে, জাগে যখন নিখিল মানুষের কল্পনাপ্রতিভা, তখন সৃজিত

২ পরে আরও বেশ কিছু দেয়ালবাক্য টুকেছি এ রচনায়। আসলে এ রচনার যাবতীয়

হয় নতুন ভাষা। মূর্ত হয়ে ওঠে স্বাধীনতা-সৃজন-কল্পনাপ্রতিভার অচেনা দাগগুলো। ১৯৬৮ সালের প্যারিসে দেয়ালে দেয়ালে ফুটে উঠেছিল নতুনতর এসব চিন্তাচিহ্ন। প্যারিসের দেয়ালে লেখা হয়েছিল নবতারুণ্যের নবকল্পনাপ্রতিভার নতুন বাণী: 'ক্ষমতা হোক কল্পনাপ্রতিভার; কল্পনাপ্রতিভায় ঘাটতি যার, সে কল্পনা করতে পারে না ঘাটতি কোথায়' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। কল্পনাপ্রতিভার চোখ খুলে দিয়েছিল প্যারিস, ১৯৬৮। খুলে দিয়েছিল কানও। 'দেয়ালেরও কান আছে – তোমার কানেরও দেয়াল আছে' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। সব কি তুমি শুনতে পাচ্ছ পরিষ্কার কানে? কানের ময়লা সাফ করো। পাখিদের গান আর ভ্রমরের গুঞ্জন শোনার যোগ্য হয়ে উঠছে কি তোমার শ্রবণ? তাহলে তুমি শুনতে পাবে কোকিলের কাজ তথা কালের আওয়াজ। ভবিষ্যত তোমাকে ডাকছে। সেই ডাক যে শোনে সে আর ভবিষ্যতের অপেক্ষা করে না, বর্তমান মুহূর্তেই রচনা করতে শুরু করে ভবিষ্যতকে। ভবিষ্যত তো আর কিছু নয় – 'আজকে আমরা যা কিছু করছি তাকেই ধারণ করবে ভবিষ্যত' (কেন ন্যাব, ২০০৬)।

স্বপ্ন দেখার ডাক দিয়েছিল আটষট্টির সেই মুক্তির বসন্ত। 'যা কিছু শিখেছ ভুলে যাও, শুরু করো তোমার স্বপ্নের হাত ধরে' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। বিপ্লব কখনোই অর্থনীতির ডেবিটক্রেডিট নয় – আসলে 'স্বপ্ন থেকে বাস্তবে পৌঁছানোর সক্রিয় রাস্তাটুকুই বিপ্লব' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। পার্টি দিয়ে আর কমিটি দিয়ে বিপ্লব হয় না। বিপ্লব হয় তোমার-আমার সংগঠিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে। 'বিপ্লবের মালিক কোনো অমুক-তমুক কমিটি নয় – বিপ্লব তোমার' (কেন ন্যাব, ২০০৬), বিপ্লব আমার। হ্যাঁ, বিপ্লব তো আমারই! 'আমাকে মুক্ত করতে এসো না – তার ব্যবস্থা আমি নিজেই করব' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। এই 'আমি' কোনো গড্ডলপ্রবাহ-পার্টির লাইন ধরে লেফট-রাইট করতে থাকা ভেঁড়া নয়, এই আমি স্বয়ং-সক্ষম, সংহতিপরায়ণ, স্ববিকশিত ব্যক্তি – 'আমি আমার বাসনাকেই বাস্তবতা মনে করি কারণ আমি আমার বাসনাসমূহের বাস্তবপরায়ণতায় বিশ্বাস করি' (কেন ন্যাব, ২০০৬)।

বলশেভিক ধাঁচের পার্টিগুলো চিরকাল অবিশ্বাস করেছে এই আমাকে। ভয় পেয়েছে তারা স্বাধীন ব্যক্তিকে। অথচ স্বাধীন ব্যক্তিকে স্বাগত জানিয়েই বিপ্লব রচনা করেছে প্যারিস-বসন্ত। পাল-বাঁধা পশুদের প্রশ্নাতীত আনুগত্যের সাথে স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের স্বাধীন সংহতির পার্থক্যটুকুর নামই প্যারিস, ১৯৬৮। এরকম স্ব-তৎপর ও আত্মসংগঠিত ব্যক্তির জন্য বিপ্লব শুধু বাস্তবতার হিসেবনিকেশ নয় – বিপ্লব তাঁর প্রাণের স্বপ্ন। 'বাস্তবতার বাসনা চমৎকার! আর তোমার বাসনাগুলো চরিতার্থ করা

উদ্ধৃতিই প্যারিস-বসন্তের দেয়াল-বার্তা। সবই কেন ন্যাব (২০০৬) সম্পাদিত 'সিচুয়েশানিস্ট ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্থোলজি' বইয়ের 'গ্রাফিতি' অংশ থেকে নেওয়া।

আরও চমৎকার!' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। বিপ্লব হচ্ছে বাসনা বাস্তবায়নের সক্ষমতা। বিপ্লব মানে স্বপ্ন দেখার সক্ষমতা। 'গড়ে তোলো স্বপ্ন-দেখা-কমিটি' (কেন ন্যাব, ২০০৬) – বাস্তবকে অতিক্রম করে যাওয়ার স্বপ্ন। আপাত-অসম্ভব নতুন বাস্তবকে নিজের হাতে রূপায়িত করার স্বপ্ন। বুড়োরা সবাই ভুলে যায় যে: কেউ একজন বাস্তবায়িত না করা পর্যন্ত সব স্বপ্নই অবাস্তব মনে হয়। 'বাস্তববাদী হও, সম্ভব করো অসম্ভবকে' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। অসম্ভবকে সম্ভব করার মানবীয় সৃষ্টিশীলতাই বিপ্লব – রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ছককষা-বিপ্লবের 'মানি না, মানব না' টাইপের নেতি-প্রতিক্রিয়া দিয়ে বিপ্লব হয় না, সমাজ বদলায় না। সমাজবদলের জন্য চাই সৃজনশীল ইতিবাচক ক্রিয়াশীলতা। 'ক্রিয়া যেন স্রেফ প্রতিক্রিয়া না হয় – ক্রিয়া মানে সৃজনক্রিয়া' (কেন ন্যাব, ২০০৬)।

বিপ্লবকে যাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের যুদ্ধ বলে ভাবেন তাঁরা স্রেফ যুদ্ধজয়পূর্বক সিংহাসনে আরোহনটুকুই জানেন। বৈপ্লবিক সৃজনশীলতার ধারণা তাঁদের কাছে অচেনা অপ্রয়োজন মাত্র। আসলে সেই পুরনো লঙ্কার নতুন রাবণ হতে চান তাঁরা। নিজেদের নাম দেন 'জনগণের রাবণ'। তাঁরা জানেন না: বিপ্লব কোনো রাম-রাবনের যুদ্ধ নয়। বিপ্লব কোনো রাতারাতি-রামরাজ্য নয়। কিংবা লঙ্কাবিজয়ও নয়। বিপ্লব বরং রাম-রাবণ-লঙ্কাপুরির আবহমান কমনসেন্সটাকেই বদলে দিতে থাকা। সত্যিকারের মূলজ্ঞান আর কাণ্ডজ্ঞানের ওপর চাপানো লৌহকপাটের আগল উন্মোচন করার নাম বিপ্লব। বিপ্লব করা মানে ইতিহাসের খিল খুলে দেওয়া – যেন উন্মোচিত হতে শুরু করে মানুষের আত্মকর্তৃত্বের ও সামাজিক স্বরাজের নিখিল আত্মবিশ্বাস।

বিদ্যমান কমনসেন্স মানুষকে বলে: তুমি অক্ষম, তুমি পারবে না – হুজুর লাগবে, তাত্ত্বিক লাগবে, নেতা লাগবে, বৈজ্ঞানিক লাগবে। আর প্রকৃত বৈপ্লবিক কাণ্ডজ্ঞান বলে: নেত্র আছে যাঁর, নেত্রী লাগে না তাঁর। চোখ থাকলেই চোখা হওয়া যায় – সক্ষম হওয়া যায়। বিপ্লব মানে 'আনাল হক' – নিজের ভেতরে আল্লার নূরের আভা ফুটিয়ে তোলা। নিজের ও নিজেদের সক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠাই বিপ্লব। ব্যক্তিই সমাজ; আমরাই রাষ্ট্র; আমি পারি; আমরাই পারি – নতুন এই বিশ্বাসের নামই বিপ্লব। এই উপলব্ধি যত বেশি করে জাগবে তত বেশি সক্রিয়, তত বেশি আত্মসংগঠিত হয়ে উঠবে ব্যক্তি ও সমাজ। চর্চা বাড়তে থাকবে আত্মশক্তির, আত্মকর্তৃত্বের। প্যারিস-নৈরাজ্যের অন্যতম উত্তরসূরি, অকুপাই-আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ নৃবিদ্যার প্রফেসর ডেভিড গ্রেইবার ধরেছেন চরম দুর্দান্ত এই কমন -সেন্স বদলানোর জায়গাটাকে। বিদ্যায়তনিক বিচারে ইদানিংকার সবচে গ্রহণযোগ্য বিশ্বইতিহাস-প্রণেতার নাম ইম্যানুয়েল ওয়ালার্স্টেইন। প্রবীণ এ প্রফেসরের দোহাই

দিয়ে গ্রেইবার শেখালেন নতুন করে: বিপ্লব মানে বিশ্ববিপ্লব – '১৭৮৯-এর বিশ্ব-বিপ্লব', '১৮৪৮-এর বিশ্ববিপ্লব', '১৯৬৮-র বিশ্ববিপ্লব'। বিপ্লবের সাথে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কোনো সম্পর্কই নাই – প্রকৃত বৈপ্লবিক বসন্ত বদলে দেয় আসলে হাজার বছরের কমনসেন্সকে (ডেভিড গ্রেইবার, ২০১৩)।

আজকের বাংলাদেশের মুক্তিমুখিন পরিবর্তনকামী তরুণদের জন্য যা এখনও কমনসেন্স হয়ে ওঠে নি তারই ওঙ্কার বেজে উঠেছিল প্যারিসে – পরিবর্তনের শিঙা মুখে করে। আমি জানি আমার সন্তান-প্রেমিক-বান্ধবীদের কর্ণকুহরে অচিরেই গুঞ্জরিত হতে শুরু করবে সেই সুর। ওপরে দেখেছি, আরও খানিকটা দেখব, খোদ বিপ্লব সংক্রান্ত মুখস্ত-যান্ত্রিক-ছকবাঁধা চিন্তাপ্যারেডের পক্ষীবুলিকে কীভাবে বদলে দিয়েছিল প্যারিস-বসন্ত। বদলে দিয়েছিল খোদ বিপ্লবের কমনসেন্স। আমরা কি কোনোদিন ফিচেল বা রাশভারি কোনো পার্টি-আমলার মুখে ভুলেও শুনেছিলাম যে বিপ্লব মানে আনন্দ? হ্যাঁ, বিপ্লব মানে আনন্দ। বিপ্লব মানে 'টোটাল অর্গাজম' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। বিপ্লব চায় পূর্ণাঙ্গ পুলকে ভরে উঠুক হোক আমাদের যাপিত জীবন – আজ, আগামীকাল, প্রতিদিন।

কবে একদিন সকল প্রাণী সুখী হবে – সে আশায় আমার আজকের জীবনটাকে ব্যথাবেদনায় উৎসর্গ করা তো মৃত্যুসাধনা। নবীন বিপ্লব চায় জীবন্ত যাপন – প্রতিদিন পূর্ণাঙ্গ পুলক – সৃজনে সংহতিতে সংগ্রামে প্রেমে কামে ভালোবাসায়। বিপ্লব মানে মৃত্যু নয় আর। 'যে-বিপ্লবের জন্য দরকার আমাদের আত্মবলিদান তা আসলে আব্বুদের বিপ্লব' (কেন ন্যাব, ২০০৬) – আমাদের বিপ্লব নয়। তারুণ্যকে ডাক দিয়েছিল আটষট্টির বসন্ত – 'তোমার বয়স বাইশ, তোমার পার্টির বয়স বাহাত্তর' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। এ তাহলে তোমার পার্টি নয়, তোমার দাদুর পার্টি। 'বিপ্লব মানে উদ্যোগ' (কেন ন্যাব, ২০০৬) – সুতরাং তুমি তোমার নিজের পার্টি বানাও। তোমার পার্টির নাম আত্মসংগঠন। আত্মসংগঠন ছাড়া, নিজেরা নিজেদের মতো করে সংগঠিত হওয়া ছাড়া, বাড়বাড়ন্ত বাঁচার কোনো উপায় নাই। 'আমরা বাঁচতে চাই' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। বাঁচার জন্য স্রেফ অন্ন-চাই-বস্ত্র-চাই-ই নয় – প্রেম চাই, আনন্দ চাই, অ্যাডভেঞ্চার চাই। এ হলো বাঁচার জন্য বিপ্লব – এ রেভোলিউশন টু লিভ। তুমি আর 'বাঁচার অধিকার চেয়ে বেড়ায়ও না – বাঁচতে শুরু করো' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। বাঁচো নিজের মতো করে, বন্ধুদের সাথে করে, নতুন প্রণালীতে। এ সমাজ কী দেবে তোমাকে ম্যাড়মেড়ে ভেড়ুয়ার মতো দেহদাসত্ব আর মনোযন্ত্রণা ছাড়া? আটষট্টি লিখেছিল আজকের আমাদের জন্য – 'সকল প্রকার অ্যাডভেঞ্চার বিলুপ্ত করেছে যে সমাজ, একটাই যে-অ্যাডভেঞ্চার তার বাকি আছে তা হলো এই সমাজটাকেই বিলুপ্ত করে দেওয়া' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। বাকি আছে ঐ একটাই

রোমাঞ্চ – নতুন সমাজ গড়ে তুলতে শুরু করা; এখনই। 'এমন পৃথিবী আমরা চাই না যেখানে ক্ষুধায় না-মরার গ্যারান্টি পেতে গিয়ে একঘেঁয়েমিতে মরার ঝুঁকি তৈরি হয়' (কেন ন্যাব, ২০০৬)।

মৃত্যুগন্ধী মরবিডিটির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল প্যারিস-বসন্ত। 'ইত্য-অবসরে শ্বাস নিতে চাচ্ছেন সকলেই এবং পারছেন না কেউই এবং অনেকেই বলছেন: পরে আমরা নিশ্বাস ফেলব; এবং এঁদের অধিকাংশই আসলে মারা যান না, কেননা আরও আগেই মরেছেন তাঁরা' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। তাঁরা কখনও জানবেনও না 'সুখ একটা নতুন আইডিয়া' (কেন ন্যাব, ২০০৬), এবং তাঁরা কখনও বুঝবেনও না প্যারিস-বিপ্লবের এই ঘোষণা: 'স্থায়ী সুখের অবস্থা ঘোষণা করছি আমি' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। তাঁদের মর্মে পৌঁছাবে না আটষট্টির এই আহ্বান: 'দুনিয়ার মজদুর – আনন্দ করো!' কিংবা 'একঘেঁয়েমি ছাড়া আমাদের হারানোর কিছু নেই – জয় করবার জন্য রয়েছে আস্ত একটা আনন্দ-পৃথিবী'।

কোত্থেকে আসে এই একঘেঁয়েমি? একঘেঁয়েমির ক্লান্তি আসে বাধ্যতামূলক কাজ থেকে। আনন্দহীন চাপিয়ে-দেওয়া কাজ। প্যারিসের তরুণরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন: 'যেসব লোক কাজ করেন তাঁরাই ভোগেন একঘেঁয়েমিতে। আর কাজ করেন না যাঁরা তাঁদের কখনও একঘেঁয়েমি আসে না' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। এই গ্রন্থের অন্যত্র 'কর্তৃত্বতন্ত্র শিল্পবোধ স্বাধীনতা' নামের রচনায় আমি দেখিয়েছি: কাজ যখন স্বরচিত, কাজ যখন কৌতূহলের সাথী, কাজ যখন আত্ম-উৎসারিত সৃষ্টি-শীলতার তাগিদ – কাজই তখন আনন্দ। এবং আনন্দই বিপ্লব। আনন্দ আর সুখ ছাড়া সার্থকতা কীসে! তাকালে দেখা যাবে: কারখানা-মালিক বুর্জোয়ারা সুখ বোঝেন না, আনন্দ বোঝেন না। তাঁরা বোঝেন টাকা-পুঁজি-মুনাফা। কিন্তু টাকা দিয়ে তো কেনা যায় না ঘুম। পাহাড়সমান পুঁজিও নিশ্চয়তা দেয় না সুখ এবং আনন্দের। আটষট্টি জানত: আনন্দ বসত করে আত্মমগ্ন সৃজনের স্বাধীন যূথবদ্ধতায়। প্যারিস-বসন্ত জানত: 'সমস্ত ধরনের সুখের বারোটা বাজানো ছাড়া বুর্জোয়াদের অন্য কোনো সুখ নেই' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। মানুষকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এমনকি সুখ-আস্বাদন এবং আনন্দযাপনের ওপরও বিধিনিষেধ আরোপ করে বুর্জোয়া কর্তৃত্বতন্ত্র। কিন্তু তারা ভুলে যায় 'সুখের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ থেকেই উৎপন্ন হয় বিধিনিষেধ-হীন জীবনযাপনের সুখ' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। এ বিধিনিষেধহীন জীবনযাপনের সুখেই রচিত হয় প্যারিস-বসন্ত। এ সুখেই বলতে পারে ১৯৬৮: 'যত বেশি আমি প্রেম করি, তত বেশি আমি রচনা করতে চাই বিপ্লব; আর যত বেশি আমি রচনা করি বিপ্লব, তত বেশি আমি প্রেম করতে চাই' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। বসন্ত মাত্রেই জানে: 'তরুণরা করে প্রেম, আর বৃদ্ধরা করে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি'। বিপ্লব তাই তারুণ্যের।

বিপ্লব বার্ধক্যের নয়।

তাই বলে ছোকরা ছেলেমেয়েদের রোমান্টিক রসিকতা এ নয়। এ রীতিমতো হাজার হাজার ছাত্র-শ্রমিক-জনতার সত্যিকারের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার মুহূর্তে সৃজিত নবমানবসত্তার ঐতিহাসিক লিপিকা। 'সৃজনশীল মার্কসবাদ' 'সৃজনশীল মার্কসবাদ' বলে যে ফেনা আমাদের নেতারা তুলে চলেছেন দুই দশক ধরে এ হলো সেই বস্তু – সত্যিকারের হাতেকলমের সৃজনশীল মার্কসবাদ। উনিশ শতকের নামতা-পড়া মুখস্ত মার্কসবাদ এ নয়। প্যারিস-বসন্তের প্রধানতম শক্তি ছিল মুক্তি ও স্বাধীনতার ধারণা। মুক্তি স্বয়ং বাস্তব রূপ ধারণ করেছিল 'সিচুয়েশনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল'-এর সংগঠনে; আর স্বাধীনতা বরাবরের মতোই নৈরাজ্যবাদে।

বাংলাদেশের মুখস্ত মার্কসবাদীরা কতটা খবর রাখেন তা তাঁদের বাক্যপ্রকাশ থেকে আন্দাজ করা মুশকিল যে সিচুয়েশনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল আদতে মার্কসবাদের মুক্তিপরায়ণ ঘরানার শক্তিশালী একটি ধারা। এঁদের মুক্তিপরায়ণতার ভিত্তিভূমি ছিল উনিশ শতকের র‍্যাডিক্যাল মার্কসবাদকে।

নৈরাজ্যবাদী নোম চমস্কি বারবার দেখিয়েছেন: উনিশ শতকের র‍্যাডিক্যাল মার্কসবাদের সাথে নৈরাজ্যবাদের প্রকৃত কোনো পার্থক্য নাই। নৈরাজ্যবাদীদেরকে পাশে নিয়ে মার্কসবাদী 'সিচুয়েশনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল' যে-সৃজনমুখর 'সিচুয়েশন' তৈরি করেছিল আটষট্টির প্যারিসে, সেটাই কিন্তু নোম চমস্কিকে নিয়ে গিয়েছিল 'মুক্তিপরায়ণ সমাজতন্ত্র'র ধারণা পরিগঠনের সুনির্দিষ্ট মুহূর্তের দিকে। ড্যানিয়েল গুয়েরিনের ১৯৭০ সালের বই *অ্যানার্কিজম: ফ্রম থিওরি টু প্র্যাক্টিস*-এর ভূমিকা হিসেবে রচিত 'নোটস অন অ্যানার্কিজম' রচনায় নোম চমস্কি সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন 'মুক্তিপরায়ণ সমাজতন্ত্র'র ধারণা। বিপ্লবী মার্কসবাদ থেকে শুরু করে সমাজতান্ত্রিক নৈরাজ্য পর্যন্ত পুরো ধারাসমগ্রটাকেই 'মুক্তিপরায়ণ সমাজতন্ত্র' বলে ডাকেন মার্কিন অরাজপথিক এই প্রফেসর। তাঁর ভাষায়: 'মুক্তিপরায়ণ সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা বলতে আমি বোঝাতে চাই বাম-অভিমুখীন মার্কসবাদ থেকে শুরু করে নৈরাজ্যবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত চিন্তাধারার মোট পরিসরটিকে' (নোম চমস্কি, ১৯৭০; নোম চমস্কি, ২০০৫)। প্যারিস-বসন্তের মহাসড়কে মুক্তিপরায়ণ মার্কসবাদ আর নৈরাজ্য-বাদের সম্মিলনই ড্যানিয়েল গুয়েরিনকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল ১৯৭০ সালের ঐ বই – *নৈরাজ্যবাদ: অনুশীলন থেকে তত্ত্বের দিকে*। আর, বলতে গেলে প্যারিস-বসন্তের ফুল প্রস্ফুটিত থাকতে থাকতেই, ১৯৬৯ সালে, তিনি লিখেছিলেন 'টুওয়ার্ডস এ লিবার্টারিয়ান কমিউনিজম' এবং 'হোয়াই লিবার্টারিয়ান মার্কসিজম?' ধরনের বাঁক-বদলানো রচনা। তাঁর উপলব্ধি ছিল, দ্বিতীয় রচনাটা থেকে উদ্ধার করছি: 'মে ১৯৬৮-তে ফুটে ওঠা আধুনিক মুক্তিপরায়ণ মার্কসবাদ অতিক্রম করে যায়

[একাধারে] মার্কসবাদকে এবং নৈরাজ্যবাদকে।'

নোম চমস্কি এবং ড্যানিয়েল গুয়েরিনের এই তত্ত্বায়ন তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম ইন্টারন্যাশনালের সময় থেকে বাকুনিনপন্থা এবং মার্কসবাদের মধ্যে তর্কাতর্কির মধ্য দিয়ে যে সময়-শক্তি ক্ষয় হয়েছে তার সবটাই বৃথা গেছে তা নয়, তবে তা ক্ষতি কম করে নি গোটা বাম পক্ষের। চমস্কি তাঁর উপরের রচনাটাতেই দেখিয়েছেন, আদতে মার্কস-এঙ্গেলস-বাকুনিনরা সবাই-ই রাষ্ট্রের বিলোপ চেয়েছেন – পার্থক্যটা তাঁদের স্রেফ আসলে কৌশলগত বা স্ট্র্যাটেজিক – মূলনীতিগত নয় মোটেও। এ কথা ঠিক, কবুল করেছেন চমস্কিও, রাষ্ট্রের বিদ্যমান কাঠামোকে বহাল রেখে সমাজবদলের এক্সপেরিমেন্ট চালালে তা যে স্রেফ একটা 'লাল আমলাতন্ত্রে' পরিণত হবে – বাকুনিনদের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে আর কোনো ভবিষ্যদ্বাণী এরকম অকাট্য সত্য বলে প্রতিভাত হয় নি – চমস্কির সূচিমুখ মন্তব্য। কিন্তু এ কথাও তো ঠিক যে মার্কসবাদী ছাউনির বিরাট একটা অংশ – র‍্যাডিক্যাল মার্কসবাদ – আগাগোড়াই বলশেভিক রাষ্ট্রপন্থাকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন। স্বাধীনতাশীল মার্কসের মুক্তিপরায়ণতার স্পৃহাকেই বেশি করে ধারণ করতে চেয়েছেন তাঁরা। এঁদের সাথে তাহলে আজকের নৈরাজ্যপথিকদের রাস্তার সমঝোতা হবে না কেন?

নৈরাজ্যবাদ বলে যে জিনিস উনিশ শতকে প্রচলিত ছিল আজকের নৈরাজ্য তার মতাদর্শিক গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে অজস্র অভিমুখে বিকশিত হয়েছে। নিজেকে এমনকি 'নৈরাজ্যবাদ' নামে ডাকার আগ্রহও তার কাছে বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হচ্ছে কেননা তাতে করে নতুন মতাদর্শিক চক্করে পড়ে যাওয়ার ভয়। সবচেয়ে বেশি করে এসেছে তাই এই উপলব্ধি যে: কোনো প্রকার ধ্যানধারণা-বিশ্বাসের পক্ষেই 'থিওরি', 'থিওক্রেসি', 'থিওলজি' বা 'মতবাদ' বা 'অভ্রান্ত বিজ্ঞান' হিসেবে অধঃপতিত হওয়ার ঝুঁকি উপেক্ষণীয় নয়। আগাম অভ্রান্ততার ঝোঁক মতান্ধতা ছাড়া আর কোথাও গিয়ে পৌঁছায় না।

সুতরাং অনেক বড় প্রশ্ন হলো পথের ওপর গুরুত্ব দেওয়া। পথ হলো উপায়। উদ্দেশ্যের সাথে উপায়ের সঙ্গতিটাই সবচে বড় কথা। জ্যাক র‍্যানসিয়ার 'গণতান্ত্রিক রাজনীতি' কিংবা অধুনা বিকশিত নৈরাজ্যিক 'প্রাকরূপায়নের রাজনীতি'ই এক্ষেত্রে 'পয়েন্ট অফ ডিপার্চার' বা পার্থক্যবিন্দু হয়ে ওঠার কথা। এই বিন্দুতে সকল প্রকার স্বাধীনতাশীল তথা মুক্তিপরায়ণ ধারা-পথ-প্রণালী-তৎপরতার বাস্তব নেগোসিয়েশন ও নেটওয়ার্কিং দাঁড় করানোটা অতীব সম্ভব। এটা পারার ওপরই আমাদের আর্থসামাজিক মুক্তিপ্রয়াসের সাফল্য নির্ভর করছে। সারা দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের শতমুখী আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসকে সার্বিকভাবে অধ্যয়ন করতে ও বিবেচনায়

নিতে শুরু করলে, চিন্তা-তৎপরতার সহস্র স্রোতোধারার সাথে বাংলাভাষী তরুণ-সমাজকে পরিচিত করে তুলতে পারলে বাংলাদেশের তরুণরা নিজেরাই নিজেদের পথ বুঝে নিতে পারবেন।

প্রথম হাঁটিতে শেখার মতো করে, সাঁতার শেখার মতো করে ঠেকতে ঠেকতে ভুল করতে করতে শিখতে শিখতে এগুনোর মতো আনন্দ আর নাই। সৃজনশীল সমাজ বিকাশের আকাঙ্ক্ষা খোদ সৃজনচর্চার ভেতর দিয়ে বিকশিত হওয়া ছাড়া কোনো শর্টকাট-প্রেসক্রিশন-শাস্ত্রবিধানের বাঁধা গৎ ধরে যেতে চাইলে আমরা স্বরচিত অন্ধকূপে হাবুডুবু খেতে থাকব – কেউ আমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। শাহবাগে বাংলা-বসন্তের যে কোকিলের ডাক শোনা গিয়েছিল তাকে প্যারিস ১৯৬৮-র বিশ্ববসন্তের আভায় উদ্ভাসিত করে তোলার উপলব্ধি দাঁড়ালে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। চমস্কি-গুয়েরিন-ডেবর্ড-গ্রেইবারদের তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা এই এখানেই। শাহবাগেই।

বন্ধুত্ব বসন্ত বিপ্লব জীবন মৃত্যু প্রেম সম্পর্ক আনন্দ স্বাধীনতা থেকে শুরু করে পার্টি-সংগঠন এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন পর্যন্ত বিস্তৃত ধ্যানধারণা, বিশ্বাস আর মূল্যবোধ-গুলোর চিরনতুন-চিরপুরাতন মানবীয় সংজ্ঞা ভোরের আকাশের মতো ফর্সা হয়ে উঠতে শুরু করেছিল প্যারিস, ১৯৬৮-তে। প্যারিস-বসন্তের কালোত্তীর্ণ যে লিপিমালা এখানে টুকে রাখা গেল, তাই নানা ভাবে নানা ভাষায় ভেঙে বলার চেষ্টা হয়েছে গোটা বই জুড়ে। এ বইয়ের ডাক নাম তাই 'প্যারিস-বসন্ত ১৯৬৮'। এ বইয়ের ডাক নাম তাই 'বাংলা-বসন্তের আগমনী বার্তা'ও বটে। বসন্ত আসবে – 'যখন প্রত্যেকে জেগে উঠবে নিদেন পক্ষে নিজের নিকটে'।[৩] কত দিন ভেবেছি, কতবার বলেছি: অপেক্ষাই সম্পর্ক। যে আসে নি, তার জন্য অপেক্ষা করাই তো তার সাথে সম্পর্ক। আজ বলি: অপেক্ষাই বসন্ত। উপযুক্ত কর্মময় অপেক্ষাই ডেকে আনে অশেষ বসন্ত। কীসের অপেক্ষায় আছ তুমি, পাঠক?

০.৫ বাহিরের কর্তা, স্বাধীন আত্মকর্তৃত্ব এবং রবীন্দ্রনাথের অচেনা দাগ

উত্তরের চেয়ে প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। কী প্রশ্ন আমরা তুলতে পারলাম তার ওপরই নির্ভর করে কী ধরণের উত্তরের দিকে এগুনোর সম্ভাবনা তৈরি হবে না হবে। নিরন্তর সপ্রশ্ন অনুসন্ধিৎসার পথ সমস্যাসংকুল, সন্দেহ নাই – কিন্তু এই পথই মনুষ্যত্বের মর্যাদার

৩ কবি হেনরি ম্যাকে'র 'নৈরাজ্য' নামক কবিতার শেষ লাইন। বর্তমান গ্রন্থকার এটির অনুবাদ করেছিলেন। ছাপা হয়েছিল বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোরডটকম-এর সাহিত্যপাতা বিডিআর্টসে।

মূল্য উপলব্ধি করতে পারে। প্যারিস-বসন্তের তরুণরা তাই বলতে পেরেছিল: 'কেউ যখন পরীক্ষা নিতে আসে, উত্তর দাও প্রশ্ন দিয়ে'। উত্তর অচেনা – সন্দেহাতীত সত্য। প্রশ্ন কিন্তু আরও অচেনা – মনে রাখতে ভুলে যাই আমরা। প্যারিস-বসন্ত বলেছিল: 'আনুগত্যের সূচনা হয় চেতনা দিয়ে; আর চেতনার সূত্রপাত ঘটে অবাধ্যতা দিয়ে'। বসন্ত মানে অচেনা অবাধ্যতা। যেমন কোকিল। আবার, অচেনা মানে তো চেনা-ই। চেনা-চেনা নয় যা তাকে নিয়ে কথা বলি কীভাবে আদৌ! যা কিছু নিয়ে কথা বলি সে তো আমার অভিজ্ঞতায়-কল্পনায় আছেই কোনো না কোনোভাবে। তা ছাড়া তার কথা আদৌ আসে কোত্থেকে! অচেনা দাগ মানে তাই চেনা চেনা দাগ।

যা আমাদের চিরচেনা কিন্তু সমাজের উপরতলার সম্পর্কশাস্ত্রে এখনও এখনও অচিহ্নিত তাকেই আমাদের অচেনা মনে হতে থাকে আজন্ম অভ্যাসের কারুকার্যে। এ কারুকার্য আর্ট নয়, দারিদ্র্যের অভ্যস্ততায় দিশাবঞ্চিত কাঠমিস্ত্রির একঘেঁয়ে বিজ্ঞাপন-কলা মাত্র। যা মানুষের অচেনা, যা তার রক্তমাংশের চোখের আড়ালের ইশারা হয়ে হাস্য করে গেছে – চিরদিন তাকেই তো লোকে চিনেছে সবার আগে। চির-অচেনা নিজেকে চেনার গল্প তো মানুষের চিরন্তন। আত্মাকে চেনা আনন্দকে চেনা আল্লাহকে চেনা তাই সনাতন। নিজেকে চেনা মানে জগৎসত্তাকে চেনা। নিজেকে চেনা মানে নিজের সীমাকে চেনা – সীমার মাঝে অসীমকে চেনা। নিজেকে চেনার গল্প তাই সীমাবদ্ধতার গণ্ডি ছাড়িয়ে অচেনা অসীমে অতিক্রান্ত হওয়ার গল্প। নিজেকে চেনা মানে তাই নিজের সীমা-সক্ষমতা-স্বরাজের বিন্দুসম অদৃশ্যতাকে অতিক্রম করার সাধনা। নিখিল পরিসরের সাথে সম্পর্ক পাতানোর সাধনা। উপনিষদের আত্মানং বিদ্ধি, ইসলামের আনাল হক, আর ইউরোপের নো দাইসেল্ফের সাধনাই স্বাধীনতা সাধনা। এ সাধনা চেনা-অচেনার লীলায় হিল্লোলিত। অচেনা দাগ অতএব চেনা আর অচেনা যুগপৎ। হয়ত দাগ মানেই স্পষ্টতা আর অস্পষ্টতার সমাবেশ – দেখা না-দেখার ফারাক ও ফিউশনের শিল্পকলা।

দাগ মানে ছবি, ইমেজ, কল্পনাপ্রতিভা। দাগ মানে রেখা, চিহ্ন। দাগ মানে পথ। পথচিহ্ন। পথরেখা। প্যারিস-বসন্তের প্রবাদপ্রতিম গাই ডেবর্ড জার্মান দার্শনিক ফয়েরবাখের যে-বাক্য মাথায় করে তাঁর ১৯৬৭ সালে গ্রন্থ 'দ্য সোসাইটি অফ দ্য স্পেকট্যাকল' বা 'চোখধাঁধানো সমাজ' শুরু করেছিলেন, সেই বাক্যে বর্ণিত আজকের চোখধাঁধানো সমাজের চোখ যে-চিহ্নকে অধিক মূল্য দেয় সত্যিকারের জিনিসের চেয়ে, সেই চিহ্ন বহন করে না বক্ষ্যমান 'অচেনা দাগ।'

অচেনা দাগ দেখতে অচেনা চোখ লাগে। চেনা-চেনা মুখস্থ চোখে অভ্যাসের চিহ্নগুলো চোখে পড়ে না অনায়াসে, অবলীলায়। প্রজাপতির পাখার বিন্যাস-

বৈচিত্র্যের অন্তহীনতা কিংবা সাপের গায়ের অনন্তকোমল নকশা-বিকাশের অলৌকিকতা ধরা দেয় না তার চেনা চোখে। 'চেনা দুঃখ চেনা সুখ চেনা চেনা হাসিমুখ চেনা আলো চেনা অন্ধকার' মনে কোনো আবেদন জাগায় না। চোখটা বদলে গেলে পরেই বদলে যায় আলো-আঁধারের সরণ-প্রতিসরণ। নতুন হয়ে ওঠে সব। অচেনা চোখ মানে শিশুর দৃষ্টি। সব কিছু নতুন। প্রতি পদে বিস্ময়। প্রতি পদে উৎকণ্ঠা উত্তেজনা আবিষ্কার রহস্য রোমাঞ্চ – বৈরাগ্য আসে না, বিষাদ বিমল হয়।

অচেনা চোখ অর্জন করতে গেলে অভ্যাস আনলার্ন করতে হয়; 'মোহের দাসত্ব' থেকে 'মন মুক্ত' করতে হয় – খেয়াল করেছেন আমাদের চিরবসন্তের কবি রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুর দেখেছিলেন, 'যাকে চোখ বুজিয়া চালানো অভ্যাস করানো হইয়াছে, চোখ খুলিয়া চলিতে তার পা কাঁপে, অনুগত দাসের মতো যে কেবল মনিবের জন্যই প্রাণ দিতে শিখিয়াছে, আপনি প্রভু হইয়া স্বেচ্ছায় ন্যায়ধর্মের জন্য প্রাণ দেওয়া তার পক্ষে অসাধ্য। ... আত্মশক্তি না জাগাইতে পারিলে ... উদ্ধার নাই।' (রবীন্দ্রনাথ, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'।) অথচ এই সত্যটুকু না বুঝে 'সত্যের জায়গায় আমরা কর্তাকে মানি, চোখের চেয়ে চোখের ঠুলিকে শ্রদ্ধা করাই আমাদের চিরাভ্যাস।' এই চির অভ্যাসের প্রশিক্ষণ থেকে মুক্তি অর্জন করা ছাড়া জীবনের অচেনা রেখাগুলোকে দেখতে পারা যায় না। যতই

> তাই আমরা জীববিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞানই পড়ি আর রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাসে পরীক্ষাই পাশ করি, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' এই বীজমন্ত্রটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি না। ... কোথা হইতে খামকা একটা-না একটা কর্তা ফুঁড়িয়া ওঠে। (রবীন্দ্রনাথ, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম')

অভ্যাস আমাদের যায় না। আত্মশক্তি জাগে না। আমাদের ধর্ম-সমাজ-রাষ্ট্র একযোগে-একাধারে তার সন্তান-নাগরিকদেরকে জন্ম-মৃত্যুর পূর্ণদৈর্ঘ্যে পরিচালনা করতে থাকে দীক্ষায়ন-প্রশিক্ষণের পরাধীন পথে। সুতরাং,

> যখন আপন শক্তির মূলধন লইয়া জনসাধারণের কারবার না চলে তখন সকল ব্যাপারেই মানুষ দৈবের কাছে, গ্রহের কাছে, পরের কাছে, হাত পাতিয়া ভয়ে ভয়ে কাটায়। ... মানিবার পাত্র যতই যথেচ্ছাচারী ততই সে ভয়ংকর, ততই তার কাছে নতিস্তুতি। ... আইন নাই, বিচার নাই, জোর যার মুলুক তার; প্রবলের অত্যাচারে বাধা দিবার কোনো বৈধ পথ নাই; দুর্বলের একমাত্র উপায় স্তবস্তুতি, ঘুষঘাষ এবং অবশেষে পলায়ন। দেবচরিত্রকল্পনাতেও যেমন, সমাজেও তেমন, রাষ্ট্রতন্ত্রেও তেমনি। (রবীন্দ্রনাথ, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম')

স্বরাজ-স্বাধীনতা-আত্মকর্তৃত্ব আমাদের বড়ই অচেনা – তাই তা বিপজ্জনক

বলে বিবেচিত। নিজেকে অপরের-উন্নততরর-হুজুরের দাস হিসেবে সমর্পণ করাতেই প্রশিক্ষণের আনন্দ। আমরা তাই উপলব্ধি করি না, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এ অঞ্চলের আর কেউ আমাদেরকে এত স্পষ্ট করে বলেন না: **'কর্তৃত্বকে কাঁধে চাপাইলেই বোঝা হইয়া ওঠে, ওটাকে এমন একটা চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ির উপর নামানো হোক যেটাকে আমরাও নিজের হাতে ঠেলিতে পারি'** (রবীন্দ্রনাথ, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম')। সেটা না করে 'আমরা কিন্তু দুই হাত উল্টাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছি – কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। সেই কর্তাটিকে – ঘরের বাপদাদা, বা পুলিসের দারোগা, বা পাণ্ডা পুরোহিত, বা স্মৃতিরত্ন, বা শীতলা মনসা ওলাবিবি দক্ষিণরায়, শনি মঙ্গল রাহু কেতু – প্রভৃতি হাজার রকম নাম দিয়া নিজের শক্তিকে হাজার টুকরা করিয়া আকাশে উড়াইয়া দেই।' (রবীন্দ্রনাথ, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম')

তারপরও, অচেনাকে যথাসম্ভব পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলার সাধনাই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা। সারা জীবন ধরে এই সাধনাই তো করে গেলেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ। তার সেই সাধনার পেছনে লাগাতারভাবে কাজ করে গেছে মনুষ্য-স্বাধীনতাশীলতার ধ্রুববোধ। আত্মকর্তৃত্বের আত্মোপলব্ধিই রবীন্দ্রধারণাবিশ্বের প্রধানতম চালিকাশক্তি। এ আমাদের পরাধীনতাপরায়ণ রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞরা সহজে দেখতে পান বলে মনে হয় না। বাংলা ভাষায় মুক্তিপরায়ণতার সবচেয়ে সৃষ্টিশীল দাগের নাম রবীন্দ্রনাথ। আমার *নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য* গ্রন্থে আমি তার এক পশলা দেখিয়েছি। এই অচেনা দাগ বইয়ে মুক্তিপরায়ণ রবীন্দ্রনাথকে আরেক পশলা আবিষ্কারের বিকল্প নাই। মুক্তি-আন্দোলনের বিশ্বতরঙ্গকে বাংলা ভাষায় এরকম নমনীয় দার্ঢ্যের সাথে সারাজীবনের সাধনায় প্রস্ফূটিত করে তোলার মতো মানুষ তাঁর মতো আর দেখি না। তাঁর দার্শনিক উপলব্ধি, বাস্তব ব্যক্তি-সামাজিক এক্সপেরি-মেন্টেশন এবং সর্বোপরি মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে তাঁর সতেজ অন্তর্দৃষ্টি আমাদের মনোযোগ চায়। বাংলা ভাষার এই মুক্তিপরায়ণ সাহিত্য বিশ্ব-অরাজ-সাহিত্যকে নতুনতর আভায় উজ্জ্বল করে তোলার মতোই উন্নত মানের– অঙ্গে অভিমুখে অন্তরঙ্গতায়। এ আভা আমাদের অচেনা এখনও– সেজন্যেই তা এ বইয়ের বিষয়:

> **কোথাও আমাদের কোনো কর্তৃত্ব আছে এটা আমরা কিছুতেই পুরামাত্রায় বুঝিলাম না।** বইয়ে পড়িয়াছি, মাছ ছিল কাঁচের টবের মধ্যে; সে অনেক মাথা খুঁড়িয়া অবশেষে বুঝিল যে কাঁচটা জল নয়। তার পরে সে বড়ো জলাশয়ে ছাড়া পাইল, তবু তার এটা বুঝিতে সাহস হইল না যে, জলটা কাঁচ নয়; তাই সে একটুখানি জায়গাতেই ঘুরিতে লাগিল। ওই মাথা ঠুকিবার ভয়টা আমাদের হাড়েমাসে জড়ানো, তাই যেখানে সাঁতার চলিতে পারে সেখানেও মন চলে না। ... মানুষকে, পুঁথিকে, ইশারাকে,গণ্ডিকে বিনাবাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া

চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনো মতেই ঠাহর হয় না, এমন-কি, বিলাতি চশমা পরিলেও না।

মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার। নানা মন্ত্রে, নানা শ্লোকে, নানা বিধিবিধানে এই কথাটা যে-দেশে চাপা পড়িল, বিচারে পাছে এতটুকু ভুল হয় এই জন্য যে-দেশে মানুষ আচারে আপনাকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধে, চলিতে গেলে পাছে দূরে গিয়া পড়ে এইজন্য নিজের পথ নিজেই ভাঙিয়া দেয়, সেই দেশে ধর্মের দোহাই দিয়া মানুষকে নিজের 'পরে অপরিসীম অশ্রদ্ধা করিতে শেখানো হয় এবং সেই দেশে দাস তৈরি করিবার জন্য সকলের চেয়ে বড়ো কারখানা খোলা হইয়াছে।

আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন, 'তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া চলিবে না।'

... আমরা বলি, **ভুল করাটা তেমন সর্বনাশ নয় স্বাধীন কর্তৃত্ব না পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁত নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জীব হইতে হয় তবে তার চেয়ে না হয় ভুলই করিলাম।** (রবীন্দ্রনাথ, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', মোটা হরফ সংযোজিত)

'নিরঙ্কুশ নির্জীব'তার মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধারের সাধনাই *অচেনা দাগ*-এর সাধনা। এ সাধনা 'নিখুঁত নির্ভুল' হওয়ার সাধনা নয়। এ হচ্ছে ভুল করতে করতে 'স্বাধীন কর্তৃত্ব' পাওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠার স্বাধীনতা। 'অতএব', ঠাকুরের মুক্তির গানে গলা মিলিয়ে আমরা বলতে চাই, '**ভুলচুকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়াও আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই**। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব– দোহাই তোমার, আমাদের এই পড়ার দিকেই তাকাইয়া আমাদের চলার দিকে বাধা দিয়ো না।' (রবীন্দ্রনাথ, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম') আনন্দ-আর্ট-আত্মকর্তৃত্বের তপস্যার যে একত্ব-সূত্র রবীন্দ্রনাথকে আমার অগ্রপথিক-সহযাত্রী করে তুলেছে, সেই একত্বসূত্রের অন্যতম ডাকনাম 'অ্যানার্কি'। *অচেনা দাগ* তারই একটা স্বতন্ত্র অ্যান্থোলজি। এ বই মনুষ্য-স্বাধীনতাকে নিজ দেহে নিজ আত্মায় আস্বাদনের তরিকা। স্বাধীনতা ছাড়া সব কিছু স্বাদহীন। 'আজকের দিনে এই প্রার্থনা পৃথিবীর সব দেশেই জাগিয়া উঠিয়াছে যে **বাহিরের কর্তা**র সম্পূর্ণ একতরফা শাসন হইতে মানুষ ছুটি লইবে' (রবীন্দ্রনাথ, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম')। বাহিরের কর্তাকে 'করতে বলব না আমরা কোনোকিছুই; চাইব না আমরা কোনোকিছুই; আমরা স্রেফ নিজের হাতে নিয়ে নেব; অধিগ্রহণ করব' (কেন ন্যাব, ২০০৬)। প্যারিস-বসন্তের মতো। অকুপাই-আন্দোলনের মতো।

গোষ্ঠীতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র আর রাষ্ট্রতন্ত্রের হাত থেকে এই আমাদের মুক্তির পথ।

০.৬ অচেনা দাগ, চেনা বন্ধুত্বের ব্যূহ

বন্ধুত্বের জ্যোতির্বলয়ে ঘেরা এই বই। তাছাড়া এ বই পারত না হয়ে উঠতে। প্রতি পদেই কোনো না কোনো বন্ধুর বাড়িয়ে দেওয়া যষ্ঠি হাতে নিয়ে এ বইয়ের অন্ধ অথর চলেছেন পথ। বইয়ের ন্যূনতম কারিগরি থেকে শুরু করে ক্রমসমাপ্তি পর্যন্ত বন্ধুত্ব-ভালোবাসা-কৃতজ্ঞতায় সিক্ত হয়ে আছে এই গ্রন্থ।

বইটা দাঁড়ানোর পর এখন দেখছি রাজশাহীর দৈনিক *সোনার দেশ*-এর কার্য-সম্পাদক হাসান মিল্লাতের একান্ত প্ররোচনায় 'আমার অরাজ আমার স্বরাজ' নামে সাপ্তাহিক কলাম লেখার প্রতিশ্রুতি যদি আমি না করতাম, তারপর ইত্তেফাকের অনুজ বান্ধব সৌরভ জাহাঙ্গীর কিছু দিনের জন্য 'খর বায়ু বয় বেগে' নামের পাক্ষিক কলাম আর ঢাকার দৈনিক বণিক বার্তার ম্যাগাজিন 'অষ্টপ্রহর'-এর মিতভাষী নিষ্ঠাপরায়ণ সংগঠক মুসা মিয়ার প্রশ্রয়ে 'আত্মঘাতী পরিস্থিতি' নামের প্রথমে-পাক্ষিক-পরে-সাপ্তাহিক কলাম যদি সারা বছর লিখে যেতে না পারতাম, তাহলে এরকম একটা ভার মাথা থেকে চিরতরে নামিয়ে ফেলার আনন্দ আমি পেতাম না। দীর্ঘদিনের শুভানুধ্যায়ী অনুরাগী অগ্রজ মিল্লাত ভাই আমাকে লেখার স্বাধীনতার ব্যাপারে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়েছিলেন বলেই আমি লাফিয়ে রাজি হয়েছিলাম। প্রিয়ভাজন সৌরভ জাহাঙ্গীর সোনার দেশের লেখাটাই ইত্তেফাকে (একই দিনে) ছাপার মতো ঔদার্য দেখিয়েছিলেন বলে আরাম হয়েছিল। প্রতি সপ্তায় একাধিক লেখার চাপ তৈরি হয় নি। বণিক বার্তার সিনিয়র সাবএডিটর এম. এম. মুসা আর সোনার দেশের সহ-সম্পাদক শামীম রাহমান কি যে ধৈর্য্য ধরে আমার নিত্য-বিলম্ব সহ্য করেছেন – আমার জন্য ছিল তা জরুরি পৃষ্ঠপোষকতার স্বস্তি।

কিন্তু এই যে লাফ দিয়ে রাজি হয়ে গেলাম লিখতে – এ আমার জন্য অলৌকিক একটা স্বপ্ন মাত্র যা আমি কুড়ি বছর ধরে দেখেছি প্রতিদিন। তা হয়ে উঠেছিল এক অলীক কল্পনার ডিলিউশন বা আত্মবিভ্রম। জন্মসূত্রে ব্রোকেন জীবনের বিষাদসিন্ধুর বিষ বদহজম হয়ে গেছিল। ঘাড়ে চড়ে বসেছিল বিভ্রমের বিলাস। নিতান্ত খাসলতে। আয়ত্তাতীত কসমিক আলামতে মাত্র। ডিপ ডিপ্রেশনের চাপ নিভিয়ে দিয়েছিল প্রায় মনোদীপশিখা। মনোনিম্নচাপের সেই অতল থেকে ওঠা গেল খাসলতেরই কারণে কিন্তু মনোচিকিৎসক মামুন হুসাইনের হাত ধরে– বলতে গেলে আসলে হাসি ধরে। চূড়ান্ত আকারের নিম্নচাপের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে জমে ওঠা শারীরিক অগতিকে গতি করতে তাৎক্ষণিক এমার্জেন্সি হিসেবে হাজির হওয়া অস্ত্রোপচারের কর্তব্য ম্যানেজ হলো মামুন ভাইয়েরই তাৎক্ষণিক ম্যাজিকে। ২০১৩ সালের শীতকাল।

রোজার মাস। ইফতারির সময়। চাপ গিয়েছিল চূড়ায়। আর তাতে সুবিধাই পেলাম। টোকা দিতেই পড়ে গেল তা। উঠে দাঁড়াতে পারল অচল এক লেখক।

আদিতম বিন্দু থেকে – এ বই অপারেট করতে শুরু করেছে অচেনা পথে। নিওলিবারাল উইন্ডোজ পরিত্যাগ করে জিএনইউ-লিনাক্সভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম 'উবন্টু'কে আশ্রয় করে। আফ্রিকার একটা আদিবাসী ভাষার এই শব্দ 'উবন্টু'র অর্থ হলো 'হিউম্যানিটি থ্রু আদার্স' – তোমার মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ে উঠি আমি। পুঁজিবাজারি জানলা-খিড়কি-উইন্ডোজের নিয়ন্ত্রিত জলাবদ্ধতার তুলনায় এ জিনিসের জাতই আলাদা – বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু নিজে নিজে উইন্ডোজ মুছে উবুন্টু ইন্সটল করতে গিয়ে ক্যাচাল বাধিয়ে ফেলেছিলাম এক পর্যায়ে – অচল করে ফেলেছিলাম খোদ 'লিব্রা অফিস'টাকেই। হৃদরোগ নিয়ে কলকাতার হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে অনলাইনে লাইভ সাপোর্ট দিয়ে উদ্ধার করেছেন ফাউন্ডেশন ফর ওপেন সোর্স সলিউশন্স (এফওএসএস) এর মহাসচিব রিংদা ওরফে সাজেদুর রহিম জোয়ারদার। পেশায় প্রকৌশলী পাগল এই লোক ছাড়া আমার মতো আহাম্মককে অবাধ আশ্রয়-প্রশ্রয় আর কে দিতেন কে জানে!

গত কয়েক বছর ধরে বিপুল সময় দিয়ে, শত রকমের কম্প্যুকারিগরি দিয়ে, সাহায্য করেছেন রাবি-র কম্পিউটার সায়েন্স থেকে সদ্য বেরুনো শিক্ষার্থী তাহের মুহাম্মাদ মাহদী। এ ছাড়া আগাগোড়া ফোনে ও সশরীরের যখনতখন সাহায্য পেয়েছি রুয়েটের কম্পিউটার-শিক্ষার্থী ও লিনাক্সপ্রেমী সাঈদ আহমেদের। মুশকিলে পড়েছিলাম 'অভ্র' বা 'বিজয়' ছাড়াই ইউনিজয় লেআউটে বাংলায় লেখা নিয়েও। ফেসবুকের 'লিনাক্স বাংলাদেশ [আমরা লিনাক্সপ্রেমী]' নামের ওপেন গ্রুপে বসে সাপোর্ট দিয়েছেন রুয়েটের তরুণ শিক্ষার্থী সারিম খান। আনাড়ি বিধায় আখেরি উদ্ধার পেয়েছিলাম রিংদারই বদান্যতায়। আর, পরিবেশ-প্রকৌশলী, ঢাকার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ফাউন্ডেশন ফর ওপেন সোর্স সলিউশন্সের অন্যতম সংগঠক মিয়া মোহাম্মদ হুসাইনুজ্জামান ওরফে আমাদের শামিম ভাই উঠতে-বসতে, ফোন-ইন-সাপোর্ট দিয়েছেন 'লিব্রা রাইটার' সফটওয়ারের খুঁটিনাটি নিয়ে।

ঋষি-কবি-শিক্ষক অসীম কুমার দাসের মতো মানুষ হাত লাগিয়েছেন বইয়ের শিরোনামটাকে ইংরেজিতে রূপান্তরে সাহায্য করার জন্য। রাবি-তে একেডি-র আদর ও আধ্যাত্মিকতার ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে সুস্থ থেকেছি আমার দুর্দিনে– দীর্ঘকাল। তাঁর এবং সুস্মিতার কল্যাণে আখড়া-মাজার-লোকধর্ম-সুফিবাদ-শ্রীঅরবিন্দর গোটা একটা নতুন পৃথিবীতে আমি প্রবেশপথ খুঁজে পেয়েছিলাম। রাত ১০টা-১১টার দিকে শহীদুল্লাহ কলাভবনের সামনে যখন তিনি ধ্যানস্থ দাঁড়িয়ে তখন আমি হাজির হই অচেনা দাগের ধারণা নিয়ে। আর তিনি আশ্চর্য ধ্যানগ্রস্ততার মধ্যেই ঘরে গিয়ে বসে

পড়লেন টেবিলে – নওল লার্নারের মতো অভিধান নিয়ে। তৈরি হলো 'দ্য ট্রেইল অফ দ্য আননোন' ইংরেজি নামটা। তাঁর হস্তলিখিত সেই নামলিপির স্ক্যান করা ইমেজই এই বইয়ের শেষ প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজি এই লামলিপিটা যথাযথভাবে স্ক্যান করার কাজ করিয়ে দিয়েছেন আমার তরুণতর বন্ধু রাবি-র আইন বিভাগের শিক্ষার্থী, গানের কারিগর, ইস্ক্রা রহমান তাঁর বন্ধু রাদ ইসহাকের মাধ্যমে। ইস্ক্রার তো প্রেমেই পড়েছি। রাদের সাথে দেখার অপেক্ষা।

বইয়ের ফ্ল্যাপে ব্যবহৃতব্য ব্লার্ব লিখে দিয়েছেন আশির দশকের ছোটকাগজ 'পেঁচা'র প্রাণপুরুষ, অগ্রজ বন্ধু ইচক দুয়েন্দে। দীর্ঘদিন ইউপিএল-এ সম্পাদনার কাজ করা ইচক ওরফে কচি ভাই এই কাজে যে রকম দড় তেমনটা আমি আর কাউকে দেখি নি। তাঁর কাছে চেয়েছিলাম 'অচেনা দাগ'-এর জন্য 'অচেনা' ধাঁচের একটা পুস্তক-পরিচিতি। আমাদের বাসায় বসে আড্ডা মারতে মারতে আধা ঘণ্টার মধ্যে লিখে দেওয়া তাঁর সেই ব্লার্ব অচেনা আশা পূরণ করেছে বটে। আর আমারই প্ররোচনায় এ বইয়ের শেষ প্রচ্ছদে সেটা ব্যবহার করেছেন এ বইয়ের প্রচ্ছদশিল্পী, অস্ট্রেলীয় গ্রাফিক ডিজাইনার অ্যাক্টিভিস্ট বন্ধু অ্যান্ড্রু বাথ ওরফে সমারসেট বিন। গ্রাফিক্সের কাজ ওঁর জীবিকা-কাণ্ড। সেই কাণ্ড বাদ দিয়ে যেভাবে ও আমাদেরকে সময় দিয়েছে দিনের পর দিন ধরে তা শুধু বন্ধুর পক্ষেই সম্ভব।

কচি ভাই কোনোদিন 'শিল্পী আমান' ছাড়া যাঁর নাম উল্লেখ করেন না সেই আমান ভাই – ঢাকার শান্ত মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজির ফাইন আর্টসের শিক্ষক জনাব আমানউল্লাহ – আমার উপর্যপুরি অনুরোধে এই বইয়ের 'নির্মিতির আভাষ' লিখে দিয়েছেন অচিন্তনীয় ব্যস্ততার মধ্যে। আমান ভাইয়ের মতো সদাশিল্পী মানুষটি আমাদেরকে যে স্নেহ-আদর-ভালোবাসা-মর্যাদায় জায়গা দিয়েছেন তাঁর হৃদয়ে তা দিয়ে শুধু তাঁকেই চেনা যায়। যে অনন্য স্বতন্ত্র ভাষায় তিনি তা লিখেছেন 'নির্মিতির আভাষ', তা-ই তাঁর স্বাভাবিক ভাষা। এই ভাষায় লেখা একটা রচনাই এ বইয়ের ভূমিকাভাষ হিসেবে মানায় বলে আমার বিশ্বাস ছিল। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, বিশ্বাসেই আভাষ।

এ বইয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক-দার্শনিক 'সূত্রপাত' শনাক্ত করেছেন আমার প্রথম তারুণ্যের বন্ধু জলি ওরফে উন্নয়ন-বিশ্লেষক মনোয়ার মোস্তফা। অল্প সময়ে সাড়ে চারশো পাতার এই ভোটকা বই স্রেফ হজম করে যে ভূমিকা জলি লিখেছে তা আমাকে তাক লাগিয়েছে। আমাদের বলশেভিক পরিবারের পুরনো বন্ধুদের মধ্যে ওঁ ছাড়া আর কেউ আমার গত ২০/২৫ বছরের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিক্রমার হদিস রাখতে পারেন নি। ওঁ খবর রাখে এবং ওঁ খবর টের পায় ওর ইনবিল্ট অ্যান্টেনা দিয়ে। যেভাবে জলি তার 'সূত্রপাত'-রচনায় বিশেষত গান্ধী প্রসঙ্গে আমার উপলব্ধির

সাথে এম. এন. রায়ের প্রত্যক্ষ সহযোগী অম্লান দত্তের নৈরাজ্য-উপলব্ধিকে টানটান করে মিলিয়ে দিয়েছেন তা এই বইয়ে ওঁর বিশেষ একটা বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান হয়ে থাকল। চিন্তার একটা দুয়ার খুলে গেল তাতে করে। জলির সাথে এক বিছানায় ঘুমিয়েছি ঢাবি-র গোটা ক্যাম্পাসজীবনটাই বলতে গেলে। পরস্পরের প্রেমে আমরা বিচিত্রগামী অনুভূতি যাপন করেছি দীর্ঘকাল।

খোলা দরজার বানান ভুল হলেও নিখিল দরজা বন্ধ হয়ে যায় না সম্ভবত। তবু হোঁচট তৈরি হয় কি? চোখের হোঁচট যেন চিন্তায় গিয়ে না লাগে একান্ত নিষ্ঠা নিয়ে মুদ্রণপ্রমাদের পর্ব্বতকে পর্ব্বে পর্ব্বে সুবিন্যস্ত করেছেন তিন জন। একজন আমান ভাইয়ের একান্ত তত্ত্বাবধানে স্বশিক্ষিত আর্টিস্ট, গল্পকার, মনুষ্যস্পৃহার প্রতিমূর্তি, আমার নতুনতর অগ্রজ বন্ধু অরুণদা (মখলেসুর রহমান)। একজন রাকিব সোহান – রাবি-র ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী; রাবি-তে বর্ধিত ফি ও সান্ধ্যবাণিজ্যিক কোর্সবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সম্মানিত আসামী। (রাবি-তে নবতর প্রাণপ্রবাহ বেগবান হয়ে উঠেছে রাকিব-সোহান-শশী-রকি-উৎসব-ইমনদের মতো নবপত্রপল্লব -দলের বাসন্তী বিকাশে।) অপরজন তানিয়া পারভীন। আমাদেরই বিভাগের ১৪-তম ব্যাচের উজ্জ্বলতম শিক্ষার্থীদের একজন। এই তিনজন ভাষা-বাক্য-অর্থগত জরুরি সব সম্পাদনার প্রয়োজনীয় পরামর্শ লিখেছেন মার্জিনে– প্রুফরিডিং-এর প্রথাকে সানন্দে অতিক্রম করে। সেটাই ছিল আমার একান্ত চাওয়া– ভরসা।

রীতিমতো পুস্তক আকারে এ বইয়ের ডামি যেদিন মুদ্রণ করছিলাম সুস্মিতা আর আমি, সেদিন এসেছিলেন রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা-শিক্ষক নিয়ামুন নাহার নিমা আর তার সহপাঠী-থেকে-বর হাফিজ আল আসাদ জাফর। হাত লাগিয়েছিলেন তাঁরা আমাদের সাথে পাতা নম্বর দিয়ে ফর্মা মিলিয়ে বই সাজানোর কাজে। 'সম্পর্ক স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথ' নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে নিমার সাথে, সুস্মিতার সাথে। 'কর্তৃত্বতন্ত্র শিল্পবোধ স্বাধীনতা' নিয়ে সুস্মিতা, তানিয়া, নিমা, অরুণদার কাছ থেকে জরুরি সমালোচনা, ভ্রান্তি অপনোদন ও প্রশংসা পেয়েছি। বাল্যবন্ধুরা আমাকে একুশের নাটোর-বইমেলায় যেতে বাধ্য না করলে একুশ নিয়ে কথাগুলো কবে বলা হতো কে জানে। 'মতাদর্শ নয়, পথ' নিয়ে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন রাজশাহী শহরের প্রাজ্ঞ অধ্যাপক-সংগঠক রুহুল আমিন প্রামাণিক। পুরো রচনাটাই নিজের স্ট্যাটাসে সুপারিশ-সহযোগে পোস্ট করেছিলেন পনের হাজার 'ফলোয়ার'র ফেসবুকার-ব্লগার আসিফ মহিউদ্দিন। রাবি নৃবিদ্যার শিক্ষক, বন্ধু বখতিয়ার আহমেদের সাথে অনেক কথা বলেছি শাহবাগের লেখাগুলো নিয়ে।

এ বইয়ের রচনাগুলো এসেছে ছোটকাগজ আর আড্ডা-আলোচনা-সেমিনার-বক্তৃতা থেকে। এ বইয়ের বিভিন্ন লেখা ছেপেছেন আমার পরম বান্ধব সম্পাদকবৃন্দ –

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (রাবিসাস), রাবি-র *চিহ্ন* পত্রিকার সম্পাদক প্রফেসর শহীদ ইকবাল, *স্বাধীতিকী* পত্রিকার সম্পাদক মোজাফফর হোসেন, *রাজনৈতিক ডট কম*-এর খোমেনি এহসান, *বামপন্থা ডট কম*-এর কবি সালাহউদ্দীন শুভ্র, *বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর ডট কম*-এর কবি রাজু আলাউদ্দীন, আর ঢাকার 'মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি'র বাৎসরিক পত্রিকা *অঞ্জলি*-র সম্পাদক বিধান দাসগুপ্ত। এক-এগারোর জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর চেয়ে নিয়েও আমার লেখা যখন ছাপতে পারলেন না *প্রথম আলো*, তখন আমার আটটা রচনা ছেপেছিলেন প্রবাসী অনলাইন *ইউকেবেঙ্গলী* – ঢাবি-র বন্ধু-অধ্যাপক শান্তনু মজুমদারের চর্যায়।

এছাড়া, রাজশাহী সংস্কৃতি উৎসব ২০১১-তে সেমিনার-প্রবন্ধ 'রাজনীতি সংস্কৃতি কারাগার' পেশ করার সুযোগ করে দিয়েছেন রাজশাহীর তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার কবি আসাদ মান্নান। গণযোগাযোগ বিভাগের শিক্ষার্থী বাধন অধিকারী, আরিফ রেজা মাহমুদ টিটো, পার্থপ্রতীম দাস, মনিরা শরমিন, মামুনুর রশীদ মামুন, বাবু, সুমন প্রমুখ আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন 'মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচনা'টা এবং তার অনুলিপিও বানিয়ে দিয়েছেন তাঁরাই। প্রবাসী চাঁটগা-বন্ধু কান্তা তাজরীন বলতে গেলে নীরবে কিন্তু অব্যর্থভাবে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন 'কর্নেল-তাহের-রূপকথা'। এ রচনার পেছনকার বক্তৃতাটি করার অবকাশ করে দিয়েছিলেন রাজশাহী জেলা জাসদ এবং রাবি-ছাত্রলীগের পদাধিকারীবৃন্দ – বিশেষ করে তৈমুর ফারুক তুষার। সিনেমা-শিল্প-স্বাধীনতা নিয়ে দরকারি কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন রাবি-সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক কাজী মামুন হায়দার সম্পাদিত *ম্যাজিক লণ্ঠন* পত্রিকা-পরিবারের শিক্ষার্থীরা। কিছু লেখা বেরিয়েছিল ফেসবুকেও।

আমার প্রকাশক 'আগামী প্রকাশনী'র অটল কর্মপুরুষ (কামরুল হাসান) মেনন ভাইয়ের সুরুচি আর সংহতির বোধ আমি কিছুতেই বুঝিয়ে বলতে পারব না – জাস্ট লা-জওয়াব। এরকম মানুষ প্রকাশনার দায়িত্ব নিলে লেখা হয়ে ওঠে আনন্দের; লেখা হয়ে ওঠে সুস্থ থাকার অবলম্বন – মামুন (হুসাইন) ভাই যেমনটা বারবার বলেন: 'রাইটিং ইজ হিলিং'। লেখকরা প্রকাশকের কাছে কৃতজ্ঞতা জানায়, ধন্যবাদ দেয়, আর আমি অধম কামরুল হাসান মেনন এবং ওসমান গনি ভাইয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি বইটা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমার আন্তরিক বিলম্বের জন্য।

আর সুস্মিতা চক্রবর্তী ('ওগো চক্রযান, তোমার চাকায় মম প্রাণ') আমার মতো স্বাধীনতাবিলাসী মানুষকে যে বিচল-অবিচল সম্পর্কে ধরে রাখতে পারলেন, এবং তাকে শেষ পর্যন্ত লেখার মধ্যেই রাখতে দিতে পারলেন সে তাঁর নিজেরই শ্রেয়ত্বে। এ জীবনে প্রেমের-বন্ধুত্বের-সম্পর্কের বিস্ময়ের ঘোর আমার কোনোদিন যাবে না। বন্ধুত্ব-আচ্ছন্ন এ পৃথিবী সহজ সুন্দর – নিখিল আনন্দের। অগ্রজ-অনুজ-

সহজ এইসব বান্ধবকে নতুন করে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে সাধ্য কার?

মুশকিল থেকে যায় তবু। যতটা আমি পারি তার চেয়ে একশটা বেশি কাজ আমি নেই হাতে, আর মাথায় নিই তার চেয়ে হাজারটা বেশি। ফলাফল বিশ্বখিচুড়ির ঝোলের মধ্যে নাকানিচুবানি খাওয়া। *মূলত* এই স্বভাবদোষে টুকটাক কারিগরি মুশকিল থেকেই গেল কিছু। মূল থাকলে *কাণ্ডত* কোনো মুশকিলের আর বিশেষ দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠার কোনো কারণ লাগে না। এরকম নাতিক্ষুদ্র আয়তনের একটা জিনিসের সার্বিক আধেয়-সম্পাদনার ব্যাপার তো আছেই, তার বাইরে শুধু অক্ষর-বিন্যাস-পৃষ্ঠাবিন্যাস-পুস্তকসজ্জা থেকে আরম্ভ করে (অন্যদের সাথে মিলে) প্রুফ সংশোধন এবং সংশোধিত প্রুফ-কপি দেখে টাইপোগুলোকে মেশিনে মেরামত করা ইত্যাকার কারিগরি কাজগুলোর কথাও যদি শুধু ভাবা যায় – দীর্ঘ সময় আর ক্লান্তিসাপেক্ষ কাজ। এবং তা শুধু এই একটা বইয়ের নয় – বিডিআর-বিদ্রোহ আর শাহবাগ নিয়ে আরো দুটো বইয়ের কাজও করতে হয়েছে, হচ্ছে। এ দুটো বইও ভোটকা টাইপের – অর্ধসহস্র পৃষ্ঠার একেকটা বই। চাপটা কম নয়। উপরন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৪-র জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে শিক্ষার্থীদের বর্ধিত ফি ও বাণিজ্যিক সান্ধ্যকোর্স বিরোধী বিপুল আন্দোলন, তাতে পুলিশ-ছাত্রলীগের হামলা, শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে রাবি-কর্তৃপক্ষের মামলা, তদন্তকমিটি গঠন, সেই তদন্তকমিটি কর্তৃক আমাকেসহ আমার বন্ধু-সহকর্মী শিক্ষকদেরকে উস্কানিমূলকভাবে 'উস্কানিদাতা' উপাধি দেওয়া – এসবের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমনা শিক্ষকদের সংহতি ও অনুপ্রেরণায় ফেসবুক-যোগাযোগ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নিজস্ব জাতীয় পর্যায়ের একটা ফোরাম গঠনের উদ্যোগ এবং অন্যবিধ নানান ধরনের যোগাযোগ-মতবিনিময় ইত্যাকার কাজে খানিকটা সময় – এবং তার চে অনেক বেশি করে মন – দেওয়ার মতো অনুষঙ্গগুলো সন্নিবেশিত হলো। রীতিমতো গুবলেট পাকিয়ে ফেলার মতো অবস্থা। পাকিয়ে গেলও। পড়ল দুর্বল শরীর আর দুর্বল মনের ওপর প্রবল চাপ। বইয়ের রচনাগুলোর পূর্বপ্রকাশনার খোঁজ আমার খুঁতখুঁতানির মর্যাদা রক্ষা করে দেওয়া প্রকাশ করা গেল না কিছুতেই। নির্ঘণ্ট বানানো শেষ করতে পারলাম না। বাদ গেল। বাদ পড়ল 'ছবির বিস্তারিত হদিস' নামে আলাদা অংশটাও। ছবিগুলোর অনেকগুলোই বন্দি কয়েদিদের আঁকা। সব ক্ষেত্রেই প্রায় – শিল্পীর নাম, ছবির নাম – যে নামে তা নেটে ছিল – ইত্যাদি ক্ষুদ্রাক্ষরে ছবির নিচে দিয়ে রেখেছি। কয়টা ছবি ইরাকের আবু গারিব কারাগারের অত্যাচার নিয়ে আঁকা – ইতালীয় শিল্পী ফার্নান্দো বোতেরোর। কারোর ক্ষেত্রেই বিস্তারিত নেট-হদিস দিয়ে উচ্চকণ্ঠে ঋণ স্বীকার করতে পারলাম না – আফসোস!

আগে হলে নির্ঘাত হাল ছাড়তাম না। দরকার হলে আরো বছর পার হতো (হি

হি হি) কিন্তু গত বছরের ২০১৩ সালের, মেলায় এরকম সময় বিডিআর-বিদ্রোহের আস্ত বইটা যাবতীয় কারিগরি কাজ শেষ করেও, মলাট-অঙ্গসজ্জা-ভূমিকা হয়ে যাওয়ার পরেও, সামান্য খুঁৎখুঁতানির দায়ে ফেলে রাখতে গিয়ে আজো তা আলোর মুখ দেখল না বলে এবার আমি আর খুঁৎখুঁতানির পাল্লায় পড়া থেকে শেষপর্যন্ত বিরত থেকেছি বাধ্য হয়ে।

এমনিতেও হয়ত যেত না – কে জানে, নিজেকে আর ভরসা লাগে না ইদানীং – পরিবর্ণিত পরিস্থিতিতে আরোই এড়ানো গেল না মুশকিলগুলোকে। সকলের ক্ষমার আশা ছাড়া এ ক্ষেত্রে বাকি থাকে শুধু হতাশাই। আশাহত হতে পারি না অজ্ঞাত কারণে। আশা থাকে: ক্ষমাকাজল চোখে দেখবেন সবাই – পাঠক বিশেষত। সবার জন্য কামনা করি প্রেম-বিদ্রোহ-বসন্তের চেনা-অচেনা সুন্দর।

পশ্চিম পাড়া, রাবি: ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০১৪

কৈফিয়ৎ ও কৃতজ্ঞতা: ২০১৫ অব্দ

গত বছর মেলার শেষ দিনে, ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে, এই বই প্রকাশকের বরাবরে মেইল করে দিয়েছিলাম পূর্ণাঙ্গ অবস্থায়। মলাট-টলাট তো আগেই পাঠিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু মেলাটা যেহেতু শেষই হয়ে গেল, আমি চাইলাম গোটা বইটা একবার শান্তভাবে পড়ে দেখতে। সুতরাং তখনই না-ছাপতে অনুরোধ করলাম। আমার সেই শান্ত পাঠ আর হয় নি। অশান্তি গেল সারা বছরটাই। বইটা শেষ পর্যন্ত পড়েই থাকল আস্ত একটা বছর। এ বই তার মানে গত বছরের সেই বই-ই বটে। শুধু একটা লেখা বাদ আর দুটো লেখা যোগ হয়েছে – এই যা। তাতে অবশ্য বইটার উপকারই হয়েছে। কিছু কারিগরি ত্রুটি মেরামতি করা গেল। সমারসেট বিনের বানানো শেষ মলাট অবলম্বন করে সামনের-পেছনের ফ্ল্যাপ বানিয়ে দিতে পারলাম।

মোক্ষম সময়ে রবীন্দ্রভবনে আমার চেম্বারে নেট নাই বিশেষ কারণে। আজ শেষ মুহূর্তে এসে সারাটা দিন ধরে সূচিপত্র মেলানো ও লেখাগুলোর আদি প্রকাশের হদিস কাগজপত্র ঘেঁটে বের করে বসানোর কুটিল কেরানিকর্ম মহানন্দে করা গেল 'মুক্তধারা নেটওয়ার্ক' এবং 'গ্রন্থ ডট কম'-এর তিন শিক্ষার্থী-বন্ধু আরিফুল ইসলাম শশি, ইস্রা রহমান ও রোকন রকির সাথে হাহাহিহি করতে করতে। এঁদের সদানন্দ এফিশিয়েন্সি অতুলনীয় স্রেফ। রচনাগুলোর বিস্তারিত দোহাই (রেফারেন্স) নিয়ে কনফিউশন দূর করার ক্ষেত্রে রংপুরে বসে নেট ঘাঁটাঘাঁটি করার সাপোর্ট ফোনে দিলেন নিয়ামুন নাহার নিমা। তার আগে, গত রাতে, গোটা বইটা একবার মিলিয়ে দেখতে পেরেছি সুস্মিতা চক্রবর্তীর সাথে বাসায় বসে।

আজও ফাল্গুনই বটে। 'স্বৈরাচার প্রতিরোধ দিবস'ও আজ। রাজার দম্ভের বাড়বাড়ন্তের সামনেও বিচারবুদ্ধি বহাল রাখার নামই মনুষ্যত্ব। বন্ধুত্ব-বসন্ত-বিপ্লবের মনুষ্য-দুয়ারে হাজির তাই রাজা-পীড়িত সাধুপ্রেমিক ভ্যালেন্টাইনও এবং তা কর্পোরেট বাজার-সূত্রে নয়, বরং রাজা রাষ্ট্র ও রাজনীতির বাইরে নবসামাজিক সম্পর্ক-সাধনার নেটওয়ার্ক-সূত্রেই বটে। তের-চোদ্দ-পনেরো সাল জুড়ে জেঁকে বসতে থাকা রাক্ষস-রাজনীতির অচলায়তনকে প্রশ্ন করার সক্ষমতা এই বই হারায় নি দেখছি!

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রথম ভাগ

বলাৎকার কারাগার দণ্ডনীতি

এক

ধর্ষণ বলপ্রয়োগ বলাৎকার

Fernando Botero. Abu Gharib

১.১ গণধর্ষণের গণতন্ত্র

সত্যিকারের ধর্ষণ এক ঘটনা, আর তার মিডিয়া-কাভারেজ এবং এ সম্পর্কিত লেখালিখি, গবেষণা, আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তা আলাদা ঘটনা। নয়াদিল্লীর সড়কে চলমান বাসের মধ্যে কয়েকজন মাতাল পুরুষ কর্তৃক দলবদ্ধভাবে একজন নারীকে ধর্ষণ করে বাস থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করার ঘটনাটিকে আমাদের 'গণতান্ত্রিক' মিডিয়া দিব্যি 'গণধর্ষণ' কথাটা দিয়ে চালাচ্ছে। 'গণধর্ষণ' কথাটা মোটেও গণতান্ত্রিক নয়। 'গ্যাং রেপ' এবং 'গণধর্ষণ' কথা দুটির মধ্যে পার্থক্য আকাশপাতাল। নিওলিবারাল বাণিজ্যপুঁজির বৈশ্বিক প্রভুদের তরফে তাঁদের স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে 'প্রথম আলো' নামের যে কর্পোরেট-বিজ্ঞাপনপত্রটি বাংলাদেশকে

পথ দেখানোর ও পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বলে মনে হয়, তারা পর্যন্ত 'গণধর্ষণ' অব্যাহত রেখেছে। প্রথম আলো তাই বলে কোনো অগণতান্ত্রিক কাজ করছে তা নয়। বিদ্যমান মিডিয়া-গণতন্ত্রে প্রথম আলো সংখ্যালঘু নয়, সংখ্যাগুরুরই দলে। মিডিয়ায় ধর্ষণ প্রসঙ্গে কথা বলার সময় ধর্ষিতা নারীকে যেভাবে 'ভিক্টিম' হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে তা-ও খেয়াল করার মতো। এই আখ্যা ঘোষণা করে: পুরুষ হলো শিকারী, নারী তার শিকার। যেন ধর্ষণ একটি প্রত্যাশিত ঘটনা।

১.২ প্রলোভন: বিদ্যমান গণতন্ত্রের পলিটিক্যাল ইকনোমি

আজকের সারা দুনিয়ায় প্রলোভন বৈধ ব্যাপার। মৌলিকভাবে দরকারি ব্যাপার। প্রলোভন ছাড়া বিজ্ঞাপন অচল। বিজ্ঞাপন ছাড়া পণ্য অচল।[১] পণ্য ছাড়া নিত্যনতুন বাজারি উৎপাদন অচল। প্রবৃদ্ধি ধপাস। এই হলো নয়া উদারনীতিবাদী আর্থরাজনৈতিক ব্যবস্থা। এই হলো বিদ্যমান গণতন্ত্রের পলিটিক্যাল ইকনোমি। টিভিতে পত্রিকায় সিনেমায় নাটকে বিজ্ঞাপনে গল্পে সাহিত্যে প্রবন্ধে এবং গবেষণায় 'প্রলোভন' আজকে প্রধানতম থিম সং। মান্না দে'র সেই গানের কথা কে না জানে: 'ও কেন এত সুন্দরী হলো, অমনি করে ফিরে তাকালো, দেখে তো আমি মুগ্ধ হবই, আমি তো মানুষ'। মনুষ্যত্বের মাপকাঠি হলো: সে স্ট্যান্ডার্ড-সৌন্দর্যের প্রলোভন বোঝে কিনা। এমনই এই লোভের অর্থনীতি যে বন্ধুত্বেও প্রলোভন থাকে। ধর্ষণেও প্রলোভন থাকে। অন্য সব প্রলোভনকে বহাল রেখে ধর্ষণের প্রলোভন উচ্ছেদ করা কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয়ও, খোদ প্রলোভন নামক জিনিসটা কিন্তু থেকেই যায়। প্রলোভন থাকলে তার নানারকম রোগলক্ষণের অভিপ্রকাশও ঘটে। এই যদি হয় খোদ সমাজ-বন্দোবস্ত তাহলে থানা পুলিশ-আদালত-কারাগার, এমনকি ফাঁসি, দিয়েও শান্তি পাব না আমরা।

১.৩ ধর্ষণ – আইনের শাসনের বিজ্ঞাপন

বলপ্রয়োগ আজকের দুনিয়ায় সবচাইতে বৈধ কাজ। ডারউইনের 'সারভাইভাল ফর দ্য ফিটেস্ট' এর নাম দিয়ে, মার্কসের শ্রেণীবিদ্বেষের নাম দিয়ে, মর্গানের বর্বরতার নাম দিয়ে বৈধ করা হয়েছে জোর যার মুল্লুক তার নীতি। 'মাইট ইজ রাইট' আজ

---

১ কেন বিজ্ঞাপন ছাড়া পণ্য-বিপণন অচল, এমনকি খোদ পুঁজিবাদী অর্থনীতি অচল, সে বিষয়ক আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে বিনয় ঘোষ, ১৯৯১-এর অন্তর্ভুক্ত 'বিজ্ঞাপন ও মন' নামের দুর্দান্ত, ধ্রুপদী প্রবন্ধটি।

গ্রাহ্য প্রবাদবাক্য। 'মাইরের উপ্রে ওষুধ নাই' তত্ত্ব হাজির কার্টুন পত্রিকার মলাটে। মা-বাবার তরফে বাচ্চাকে মারা, শিক্ষকের দিক থেকে শিক্ষার্থীদেরকে মারা, গৃহস্তের পক্ষ থেকে চোর পিটানো, জনতার উৎসাহে গণপিটুনি, স্বামীজীর স্বহস্তে বউকে পিটানো, পুলিশের লাঠি দিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রীকে পিটানো– এগুলো মামুলি ঘটনা মাত্র।

এই সমাজে সহিংসতা বৈধ। বলপ্রয়োগই রাষ্ট্রের অস্তিত্বের যুক্তি। পরিবার থেকে প্রশাসন পর্যন্ত যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি বলপ্রয়োগ। বলপ্রয়োগ ও প্রতিশোধ -গ্রহণ খোদ আইন-আদালত-বিচারব্যবস্থার সর্বসম্মত ভিত্তি। 'আইনের শাসন' বলে যে জিনিসটা চালু আছে তা আসলে মহাভারত-কথিত আদিতম শাস্ত্র 'দণ্ডনীতি'। দণ্ড ধারণাটিই পুরুষতান্ত্রিক। পুরুষের বিশেষ দণ্ড, বংশদণ্ড, লৌহদণ্ড ইত্যাদি। কারাগারে, রিম্যাণ্ডে, আটকাবস্থায় পুরুষের গুহ্যদ্বারে দণ্ডপ্রয়োগের ঘটনা এই এক-এগারোর শাসনামলেও ঘটেছে। আর রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের খাপরা ওয়ার্ডে ইলা মিত্রের যোনীতে গরম ডিম ঢুকানোর ঘটনা তো সেদিনকার ঘটনা মাত্র। ধর্ষণ জিনিসটা তাই আইনের শাসনের নিছক একটি বিজ্ঞাপন বা প্রকাশ। আইনের শাসনের মূলনীতি বলপ্রয়োগ; আর ধর্ষণের মূলনীতি বলাৎকার। এইটুকুই যা পার্থক্য। আসলে ঐটুকুই তো মিল। অভিধান ও অর্থতত্ত্ব বলছে, বলপ্রয়োগ আর বলাৎকার আদতে একই বস্তু।

১.৪ বলাৎকারের শব্দার্থতত্ত্ব

এ সমাজ আসলে বলপ্রয়োগের, বলাৎকারের। সহিংসতা মাত্রেই বলাৎকার। বলাৎকার কথাটার একটি অর্থ যেমন 'ধর্ষণ', তেমনই বলাৎকার কথাটার অপর অর্থ বলপ্রয়োগ, তথা 'শক্তিপ্রয়োগ', 'অত্যাচার', 'জুলুম', 'জবরদস্তিমূলক আচরণ' (বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান)। 'বলাৎকার' হচ্ছে এক দিকে 'বল দ্বারা করণ, বলপ্রয়োগ', 'অন্যায়', 'অত্যাচার'; এবং অন্য দিকে 'বলপূর্ব্বক সতীত্বনাশ (রেপ)'; শুধু তাই নয়, 'ঋণীকে স্বগৃহে আনিয়া তাড়নাদি দ্বারা ঋণ দেওয়ানো'ও 'বলাৎকার' বটে (হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-ক; ১৯৯৬-খ)। সুতরাং বলাৎকার স্রেফ নারীর ওপরই ঘটে না, পুরুষের ওপরও ঘটে। অভিধান অনুসারে, 'বলাৎকৃতা' যেমন হয়, তেমনই 'বলাৎকৃত' বা 'পরবশীভূত'ও (হরিচরণের বঙ্গীয় শব্দকোষ) হয়। মোদ্দা কথায় এ হচ্ছে, পরের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা আক্রান্ত হওয়া।

যেহেতু ঘটনাটা বলপ্রয়োগের, আধিপত্যের– টার্গেট সবসময়ই তাই দুর্বল সত্তা। টার্গেট তাই নারী, বৃদ্ধ, বালক, শিশু, গরিব, প্রান্তিক জনজাতি ইত্যাদি। পুরুষ-শিশুও ধর্ষণ এবং সহিংস যৌন নিপীড়ন থেকে রেহাই পায় না। বাসায় না, স্কুলে না,

স্কাউট ক্যাম্পে না, ছাত্রাবাসে না, মক্তবে না, মাদ্রাসায় না, এমনকি মসজিদেও না। পুরুষ-বাচ্চার বলাৎকার অবশ্য আমাদের সমাজে অনালোচ্য। স্ট্যান্ডার্ড পুরুষতান্ত্রিক কোড মোতাবেক পুরুষ ধর্ষণযোগ্য নয়। ধর্ষিত পুরুষ আরেকটা 'মাগি' মাত্র, 'মরদ' নয়।

১.৫ আত্মমর্যাদার বিকার, সম্পর্কের বিকার

সমাজে আত্মমর্যাদাবোধ, স্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বাধীনতা ও আত্মকর্তৃত্বের বোধ যে পরিমাণে বিকারগ্রস্ত হচ্ছে, সম্ভবত সেই পরিমাণে বাড়ছে ধর্ষণ। যার আত্মমর্যাদাবোধ নাই সে-ই অন্যের আত্মমর্যাদার মূল্য বোঝে না, তাকে ভূলুণ্ঠিত করতে পারে। যার নিজেরই স্ব-অধীনতার বোধ নাই, দাসত্বের অপমানবোধ নাই, সে অন্যের স্বাধীনতার মূল্য বোঝে না। অন্যের উপর বলপ্রয়োগের মূঢ়তায় সে আনন্দ অনুভব করে। আত্মমর্যাদার বোধ ও স্বাধীনতার বোধের অভাব পূরণ হয় অপরের উপর কর্তৃত্ব ফলানোর বোধ দিয়ে। এই কর্তৃত্বনীতিতেই সমাজ চলে।

ধর্ষণ হলো সম্পর্কের বিকার। ধর্ষণের দ্বারা সাধিত কৌমার্যের ক্ষতি বা শরীরের ড্যামেজ আসল ব্যাপার না। 'কৌমার্যের ক্ষতি' বানানো একটা পুরুষতান্ত্রিক ধারণা মাত্র। যৌন অর্থে বলাৎকারই শুধু নয়, শরীরের ওপর যেকোনো প্রকার বলপ্রয়োগ বা সহিংসতাই শরীরের ক্ষতি করতে পারে। ধর্ষণে সবচেয়ে বেশি বিনষ্ট হয় আসলে আত্মমর্যাদা। আত্মমর্যাদার যেকোনো বিনাশই ধর্ষণ। এ হলো আত্মার ক্ষতি। যে-কোনো প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগেই এটা ঘটে। চূড়ান্ততম মাত্রায় ঘটে ধর্ষণে। আত্মমর্যাদা কীভাবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে তার ওপর তাই নির্ভর করে ধর্ষণের সংজ্ঞা।

১.৬ বিবাহ, ব্যক্তিগত মালিকানা, ধর্ষণ

ব্যক্তিগত মালিকানার উত্তরাধিকার-প্রথাকে নিশ্চয়তার সাথে টিকিয়ে রাখার জন্য দরকার নারীর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। এই নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়লে, কে কোন পুরুষের সন্তান তা নিশ্চিত হওয়া না গেলে, পৃথিবীতে সাদা-কালো ধনী-দরিদ্র দাস-মালিক কর্তা-গোলাম ব্রাহ্মণ-শূদ্র বাঙালি-পাহাড়ি কোনো প্রকারের বৈষম্য টিকিয়ে রাখা যায় না। বৈষম্য না টিকলে কর্তৃত্বতন্ত্রও টেকে না। সব কিছু ভেঙে পড়ে। তাই মালিকের সন্তান যে মালিকেরই, প্রমাণ সহকারে তা চিনতে পারার জন্য বিবাহ বা 'বিশেষভাবে বহনীয়' চুক্তির মাধ্যমে নারীকে বন্দি বা নজরবন্দি করে রাখতে হয়। এ ছাড়া উত্তরাধিকারের উপায় নেই। এ ছাড়া বিবাহেরও অর্থ নেই। বিবাহ আসলে একটি রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও আইনগত সম্পর্কচুক্তি যা দিয়ে সম্পদের ব্যক্তি-

মালিকানা, যাবতীয় বৈষম্য এবং কর্তৃত্বতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা যায়।

এরই জন্য পাঁচ হাজার বছরের কর্তৃত্বপরায়ণ অসভ্যতা নারীপুরুষকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। পরস্পরকে বানিয়ে রেখেছে পরস্পরের অচেনা। এ হচ্ছে 'ভাগ করো এবং শাসন করো'র বিশ্বজনীন-সর্বজনীন ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত। নারী-পুরুষের এই বিভাজন বহুবিধ রূপ ধারণ করে বিরাজ করছে আজকের পৃথিবীতে। নারীপুরুষের প্রাতিষ্ঠানিক, আইনী, শাস্ত্রীয় ও রাষ্ট্রীয় এই বিভাজনের একেবারে কেন্দ্রে আছে বিবাহের ধারণা। বঙ্গভারতীয় পুরাণের নবতর পাঠের মাধ্যমে কলিম খান দেখিয়েছেন, বিবাহ মানে বিশেষভাবে বহনযোগ্য চুক্তি। বিবাহ মানেই বন্ধন। বিবাহবন্ধন।

বিবাহ-বিভাজন আছে বলেই ধর্ষণ এবং দাম্পত্য-সহিংসতা আদৌ সম্ভব হয়ে ওঠে। নারীকে বন্দি বা নজরবন্দি রাখার একটি উপায় যদি হয় বিবাহ, তো অপর উপায়টি হচ্ছে ধর্ষণ। ধর্ষণ বিবাহেও সিদ্ধ, বিয়ের বাইরেও সিদ্ধ। একে অন্যের পরিপূরক মাত্র। বিবাহ হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট দুই প্রতিপক্ষকে শাস্ত্র ও যৌনতার আঠা দিয়ে পরস্পরের সাথে সেঁটে রাখা। এ থেকে যা উৎপন্ন হয় তা ভালোবাসা নয় – হিংসা ও ঘৃণা। পিতা কর্তৃক কন্যা ধর্ষণ, কন্যাসম মেয়েদের ধর্ষণ বা নিপীড়ন অপ্রচলিত কিছু নয়। (উল্লেখযোগ্য মাত্রায় নানা অর্থে ব্যতিক্রম যে আছে সে কথা সকলেই জানা।) তাই ধর্ষণের বিরুদ্ধে বলা অথচ বিদ্যমান বিবাহের বিরুদ্ধে না বলা রীতিমতো আত্মঘাতী আস্ফালন মাত্র।

১.৭ কাম প্রেম ধর্ষণ

নারী এবং পুরুষের মাঝখানে উপস্থিত যৌন ক্ষুধা এবং যৌন অবদমন। দু-জনের বেলায় এর প্রকাশ দু-রকম। পুরুষের বেলায় আগ্রাসন-আক্রমণ, অর্থাৎ নারীধর্ষণ। নারীর বেলায় যৌনসত্তার 'সেক্সি' বিনির্মাণ ও বিনিময় দিয়ে পুরুষকে ম্যানিপুলেট করা, করায়ত্ত করা। নির্দিষ্ট মাপমতো যৌনতা এখন ক্ষমতা বৈকি। এ দিয়ে পুরুষকে কব্জা করা যায়। দুটোই পুরুষতান্ত্রিক। দুটোই প্রেমহীন। কামপরায়ণ। প্রেম মানে সঙ্গীকে পরিতৃপ্ত করে নিজে সুখী হওয়া। কাম মানে সঙ্গীকে ব্যবহার করে আত্মরতি চরিতার্থ করা। এ আসলে কর্তৃত্বপরায়ণ বাসনা। অথরিটারিয়ান ডিজায়ার অফ ডমিনেশন। এই সুখ আধিপত্যের বিকৃত সুখ – এমনকি খুনের ক্ষেত্রেও, এমনকি ধর্ষণের ক্ষেত্রেও। দুটোই যুগের অসুখ। দুটোই নিওলিবারাল কালপর্বের রোগলক্ষণ। এই রোগ রাজনৈতিক, মানে ক্ষমতাকেন্দ্রিক– সামাজিক নয়। তাই বলে কোনোটাই অপরটার কারণ নয়। একটা আরেকটার ফলাফলও নয়। উভয়েরই কারণ কর্তৃত্বতন্ত্র। উভয়েরই ফলাফল কর্তৃত্বতন্ত্র। এ দুটোর একটা দিয়ে আরেকটাকে

জায়েজ করা যায় না কিছুতেই। দুটোই অগ্রহণযোগ্য। দুটোই বাজারের বিকার। বাজারের যুগে মনুষ্যত্বের বিকার। সমাজের সর্বত্র এই বিকার দৃশ্যমান। শিক্ষার্থী-শিক্ষক অফিসার-কর্মচারী বিক্রেতা-খরিদ্দার উকিল-মক্কেল বিচারক-অপরাধী ডাক্তার-রুগি নারী-পুরুষ চোর-পুলিশ ইত্যাদি সম্পর্ক সমুচয়ে এই বিকারের আছর পড়েছে।

ধর্ষণে যৌনসুখ নাই। এটুকু বোঝার মতো সাবালক হতে যে আত্মঅনুসন্ধান ও নিবিষ্টতা লাগে তা এই বাজারের যুগে নাই। দম ফেলার সময় নাই কারো। আমি কে? আমি কী ভাবে (যৌনকর্মের পরিণামে) এখানে এলাম? এই কর্মের সারসত্য কী? এর সারসত্তাই বা কী? সুখ কী বস্তু? কাম আর প্রেমের পার্থক্য কী? প্রেম আর যৌন আনন্দের মধ্যে সম্পর্ক কী? এ সব নিয়ে নিবিষ্ট আত্মঅনুসন্ধানে নিরত থেকে যৌনতা, লিঙ্গসত্তা এবং প্রেম বা আনন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করার সময় পুরুষ-সমাজের নাই। নারীকূলেরও নাই। এর জন্য দায়ী অবশ্য নারী-পুরুষ নয়। দায়ী আর্থরাজনৈতিক ব্যবস্থা। রাজনীতি মানেই চিন্তা না করা। রাজনীতি মানে অনুগত থাকা। আনুগত্য মানেই আনুগত্যের প্রতিযোগিতা। সর্বগ্রাসী প্রতিযোগিতা মানেই গণ্ডগোলের আশঙ্কা এবং আশঙ্কার কিছু না কিছু বাস্তবায়ন।

১.৮ ধর্ষণ কোনো ফৌজদারি মামলা নয়

ধর্ষণ তাই ব্যক্তিগত মামলা নয়। ধর্ষণ কোনো ফৌজদারি মামলাও নয়। কোনো ক্রাইমই আসলে ক্রিমিনাল কেস নয়, পলিটিক্যাল কেস। ধর্ষক হয়ে ওঠার আগেই সম্ভাব্য ধর্ষকের সামনে সদাহাজির থাকে খোদ 'ধর্ষণ' এর ধারণা। ধর্ষক, খুনী, চোর, রাজনীতিবিদ বা মুনাফাখোর কেউই 'বিশেষ' কোনো পৃথক এক প্রকার জীব নয়। এরা কারো স্বামী, কারো স্ত্রী, কারো সন্তান, কারো সাথী। সবাই বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার শিকার। প্রত্যেকটা ধর্ষণই তাই রাজনৈতিক ধর্ষণ, রাষ্ট্রীয় ধর্ষণ; প্রত্যেকটা অপরাধই যেমন রাজনৈতিক অপরাধ এবং প্রত্যেক বন্দিই যেমন একেক জন রাজবন্দি। এগুলো রাষ্ট্রপ্রণালীর অন্তর্গত উপাদান মাত্র। প্রশ্নটা পুরো সমাজের সংবেদনশীলতা এবং দায়দায়িত্বের। প্রশ্নটা যুগের চলন পাল্টে দেবার।

কে ধর্ষণ করল, কাকে ধর্ষণ করল – তার চেয়ে বড় কথা হলো ধর্ষণ ঘটনাটা সমাজে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কেউ নিরাপদ না। যেকেউ যখন-তখন ধর্ষিত হবে। ধর্ষণের বিশেষ একটি ঘটনার চেয়ে খোদ ধর্ষণের ধারণা বেশি মারাত্মক। খোদ জেলখানার চেয়ে জেলখানার ধারণা যেমন বেশি বিপজ্জনক। পাথরের কারাগারের চেয়ে কাগজের কারাগার, ভাবনার কারাগার, ধারণার কারাগার অধিক ভয়ংকর। দিল্লীর চলন্ত বাসের ধর্ষণের চেয়ে বোম্বের ডিজিটাল ধর্ষকাম ঢের বেশি আত্মঘাতী।

চোখে চোখে ধর্ষণ, চোখে চোখে ক্ষুধা, অবদমন– নিত্যদিন। শহীদমিনারে অনশনরত গরিব শিক্ষকদের ওপর পুলিশের রঙিন বলাৎকার, শিক্ষার্থীর ওপর শিক্ষকের বলাৎকার, ছাত্রসমাজের ওপর ছাত্রলীগের বলাৎকার, শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর গার্মেন্টস-মালিকের বলাৎকার, আসামিদের ওপর কারাগার এবং আদালতের বলাৎকার, অনুগামীর ওপর হুজুরের বলাৎকার, পাঠক আর দর্শকের ওপর মিডিয়ার বলাৎকার নিত্যদিন।

ষাটের দশকে 'মেকানিক্যাল ব্রাইড' বা 'যন্ত্রবধূ' গ্রন্থে মার্শাল ম্যাকলুহান লিখেছিলেন বিজ্ঞাপনবধুর হালচালের কথা। বিজ্ঞাপনের মডেল তখন 'আমাকে দেখো' যুগ পার হয়ে 'আমাকে ছুঁয়ে দেখো'র যুগে প্রবেশ করেছেন। আর আজকের দিনে এসে সেই মডেল বলছেন 'আমাকে আস্বাদন করে দেখো'। এ হলো পুঁজিবাদের আজকের কণ্ঠস্বর। মেকানিক্যাল ব্রাইড এখন রাস্তায়। হাঁটছেন মিডিয়া-ম্যানুয়াল অনুসারে। হাজার বছরের অবদমন ভেঙে ক্ষুধা জেগে উঠছে কামের। হয় তাকে স্বীকার করতে হবে নইলে খুলে দিতে হবে ধর্ষনের সদর দরজা। এই পরিস্থিতি ঢের বেশি আত্মঘাতী টাঙ্গাইলের দলবদ্ধ ধর্ষণের চেয়ে। আত্মঘাতী– কেননা নিজেকে হত্যা না করে কেউ অন্যকে হত্যা করতে পারে না। এভরি মার্ডার ইজ এ সুইসাইড অ্যান্ড এভরি সুইসাইড ইজ এ মার্ডার। নিজেকে ধর্ষণ না করে, খোদ মনুষ্যসত্তাকে বিনষ্ট না করে, সত্তার সতীত্ব নস্যাৎ না করে, কেউ অপরকে ধর্ষণ করতে পারে না। প্রতিটা ধর্ষণ তাই আত্মবিনাশী, আত্মাবিনাশী, মনুষ্যত্ববিনাশী। যাঁরা খুন এবং ধর্ষণের মধ্যে তুলনা করে এক দিকে ধর্ষণকে মহিমান্বিত করেন এবং অন্য দিকে খুনকে নৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত করেন, তাঁরা উভয়কেই শাশ্বত করে তোলার চিন্তা-এজেন্ট মাত্র। যে নারী নিজেকে বা নিজেদেরকে এতটাই পৃথক একটা পদার্থ বলে ভাবেন যে একেবারে ভিন্ন একটি ক্যাটেগরিতে নিজেদের দুঃখদুর্দশাকে ফেলতে চান, তাঁরা খোদ নারীকে বিপদাপন্ন করেন, স্বয়ং অত্যাচারকে আড়াল করে ফেলেন।

১.৯ মুক্ত প্রেমময় সমাজের দিকে

আসলে, মনুষ্য-সমাজে কোথাও কোনো ভালোবাসা আর টিকতে পারছে না বলেই ধর্ষণ বাড়ছে। ধর্ষণ আসলে প্রেমহীন সমাজের প্রেম। বলপ্রয়োগ ও বৈষম্যের সুদৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর দাঁড়ানো সমাজে প্রেম বাঁচে না। প্রেমে উঁচুনিচু নেই। প্রেম মানে সমতা। প্রেমে জোরাজুরি নেই। প্রেম মানে বলপ্রয়োগের অবৈধতা। প্রেম প্রকৃতিরই নিয়ম। প্রেম মানে পরিচয়, বোঝাপড়া। প্রেম মানে সংহতি, পরস্পর-সহযোগিতা। প্রেম মানে স্বাধীনতা– জিম মরিসনের সেই গানের মতো: 'বন্ধু তো সে, যে তোমাকে পেতে দেয় পূর্ণ স্বাধীনতা, যেন তুমি হয়ে ওঠো তুমিই নিজে'। ভালোবাসা, সমতা,

সংহতি, বোঝাপড়া, পরস্পর-সহযোগিতা আর স্বাধীনতার গুণাবলী প্রকৃতিসূত্রে পাওয়া মনুষ্য-স্বভাবেরই লক্ষণ। মিডিয়াশাস্ত্রের প্রচারণা যা-ই বলুক, এইসব সহজাত মানবীয় প্রবৃত্তি অ্যানার্কিরও লক্ষণ বটে।

বিদ্যমান রাষ্ট্র-রাজনীতি-সমাজ থেকে বৈষম্য ও বলপ্রয়োগকে উচ্ছেদ করার আলাপ বাদ দিয়ে খোদ বলপ্রয়োগেরই মাধ্যমে ধর্ষণকে উচ্ছেদ করার কথাবার্তা বলে মুখে ফেনা তোলাটা মোটেও অর্থহীন নয়– অত্যন্ত অর্থপূর্ণই বটে। ধর্ষকের গলা কাটা বা নুনু কাটার প্রতিশোধপরায়ণ সমাধান ধর্ষণের যুক্তিবোধকেই বৈধতা দেয়। এতে করে খোদ ধর্ষণের যুক্তিটা উৎপাটিত হয় না। ধর্ষণ থেকে যায়। মাঝখান থেকে রাষ্ট্রের আইনপ্রয়োগকারীদের হাতে আরো ধারালো অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। মোট অত্যাচার বাড়ে।

শাস্তি দেওয়া আর শিক্ষা দেওয়া বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা ও আইনের শাসনের কাছে একই ব্যাপার। এ হচ্ছে কর্তৃত্বপরায়ণ আইনপ্রথার প্রাথমিক শিক্ষা বা প্রাথমিক পাঠ। প্রতিশোধই আইনশাস্ত্রের প্রাথমিক ন্যায়শিক্ষা। আইনের শাসনের চোখে ন্যায়নীতি হচ্ছে প্রতিশোধনীতি। এই 'ন্যায়' স্রেফ মাৎস্যন্যায় মাত্র।

মাৎস্যন্যায়ই হচ্ছে রাজনীতি। ধর্ষণের রাজনীতি মোতাবেক নির্দিষ্ট ধর্ষককে আইনত 'ধর্ষণ' করে খোদ ধর্ষণ ব্যাপারটাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়– বাঁচানো যায় বৈষম্য ও বলপ্রয়োগভিত্তিক তথাকথিত আইনের শাসনের অনন্ত প্রেমহীনতাকে। এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ গেছে বৈষম্যহীন-বলপ্রয়োগহীন-বলাৎকারহীন মুক্ত প্রেমময় সমাজ পরিগঠনের দিকে। অ্যানার্কির দিকে।

রচনা: রাবি, ১৬ই জানুয়ারি ২০১৩। দৈনিক *সোনার দেশ* পত্রিকায় ১৮ই জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে, এবং দৈনিক *ইত্তেফাক পত্রিকায়* ২৯শে জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে প্রকাশিত।

দুই

বিড়ালের জেলখানা

Cat Caught Smuggling Goods

২.১ জেলখানার জেনেসিস

মানুষের জন্য প্রথম যখন জেলখানা বানানো হলো, কোনো লোক সেই জেলে যেতে চাইলো না। জেলের কর্তারা তখন পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন, মানুষ আদৌ ঐ জেলের ভেতরে থাকতে পারবে কিনা। কুকুরকে বলা হলো কয়েদখানার ভেতরে যেতে। কুকুর রাজি হয় না। তখন ভেতরে মাংশ, হাড় ইত্যাদি অনেক ভালো ভালো খাবার রেখে আসা হলো। এবার প্রধান ফটক খুলে দেওয়া হলো, আর কুকুরকে আবার অনুরোধ করা হলো। কুকুরেরা ঢুকল। আয়েশ করে খাবার-দাবার খেল, গোটা জেল ঘুরে-ফিরে দেখল, তারপর সোজা গেট দিয়ে বের হয়ে গেল। রাজি হলো না থাকতে তারা জেলের ভেতরে। কিন্তু হাল ছাড়লেন না কারা-কর্তৃপক্ষ। এবার পাঠানো হলো বিড়ালদেরকে, আর ভেতরে রাখা হলো মাছ, দুধ ইত্যাদি প্রভৃতি। বিড়ালেরা ঢুকল, খাওয়াদাওয়া করল, এবং থেকে গেল জেলেরই ভেতরে। উল্লসিত কয়েদ-কর্তারা: বিড়াল যখন থেকে গেল, মানুষও পারবে।

২.২ কয়েদির হাসি ও হেঁয়ালি

আশ্বিনের আকাশ-ভর্তি উজ্জ্বল আলোর মতো হাসিভরা মুখ নিয়ে এই গল্প আমা-

দেরকে বলল আলমগীর। আলমগীর ওরফে জাহাঙ্গীর, পিতা: জাকির হোসেন, কয়েদি নম্বর: ৯৩১৯, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি কয়েদির হাসি। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি কয়েদির টুপিতে জ্বলজ্বলে লাল-নীল সুতা দিয়ে ফুল-তোলার মতো করে আঁকানো চারটা সংখ্যা ৯৩১৯, আলমগীরের নিজের হাতে করা কারুকাজ, যে হাত দিয়ে এলজি বহন করার দায়ে আজ ১২ বছর হলো সে কারাগারের রাক্ষসপুরীতে ঘানি টানছে, টানতে হবে আরও কয়েক বছর। কৌতূহল আর জিজ্ঞাসার সিরিয়াস একটা দ্রবণে আমার চেহারা ভিজিয়ে আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, বিড়াল পারলে মানুষও পারবে, এর মানে কী আলমগীর? আলমগীর হাসে। হেঁয়ালি-ভরা, আকাশ-ভরা হাসি। ওর কাছে, ওর অভিজ্ঞতার কাছে, ওর গল্প-সত্তার কাছে নিজেকে আমার নিছক একটা খেলনা বলে মনে হলো। পরে অনেক জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু সেই নিরুত্তর হাসি।

নিজে আমি ভেবে দেখার চেষ্টা করেছি। পোষ-মানা বিড়াল হচ্ছে সেই প্রাণী, যাকে আপনি যতই মারেন যতই ধরেন সে আপনার বাসায় আবার ফিরে আসবে। শারীরিক নিগ্রহ সহ্য করার ক্ষেত্রে বিড়ালের তুলনা মেলা কঠিন। পাঁচ-তলার ছাদ থেকে মাটিতে ফেলে দেন, উঠে একটু গা-ঝাড়া দিয়ে হেঁটে চলে যাবে। অতিশয় শক্ত জান বিড়ালের। আবার, গল্পটা হয়ত এ-কথাও বলতে চাইছে যে জেলখানা নামক ধারণাটার আড়ালে আছে এই মনোভাব যে: মানুষ হচ্ছে কুকুর-বিড়ালের মতোই আরেকটা জন্তু মাত্র। গল্পটার মধ্যে কি এই আভাসও আছে যে জেলের বন্দিত্ব আর নিগ্রহ সহ্য করতে গেলে বিড়ালের মতো 'অমানবিক' জীবনের অধিকারী হতে হবে? নাকি ইশারাটা এই যে, জেলে পুরে রাখতে পারলে মানুষ পরিণত হবে বিড়ালে? আমি থৈ পাই না।

২.৩ বিড়ালের স্বাধীনতা, মানুষের দাসত্ব

কারণ যা-ই হোক, কারাগারে কুকুর দেখি নি। একটাও না। কিন্তু বিড়াল আছে, ছানাপোনা সংসার-সহকারে আছে। বিশাল জানালার লোহার গরাদে গাল রেখে ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি বিড়ালের মা তার সন্তানকে শেখাচ্ছে কেমন করে লাফ দিয়ে আক্রমণ করতে হয়, কেমন করে আত্মরক্ষা করতে হয়, কেমন ক্ষিপ্রতার সাথে থাবা আর দাঁতের ব্যবহার করতে হয়। দেখেছি মধ্যরাতে সন্তানের জন্য খাবার খুঁজতে লক-আপের লোহার ফাঁক গলে আমাদের ওয়ার্ডে ঢুকছে বিড়ালের মা। দেহধারণের জন্য ক্ষুধা-নিবারণ, আর নিজের সিদ্ধান্তে চলার জন্য আত্মরক্ষা-আক্রমণ: বিড়াল তাঁর প্রকৃত প্রজাতি-সত্তা এতটুকু বিসর্জন দেয় নি।

সামান্য বিড়ালকেও তার স্বাধীন স্বভাব থেকে বশীভূত করতে পারে না

জেলখানা। অথচ কয়েদ আছে মানুষকে পরাভূত-বশীভূত করার খায়েশে। আল্লাহ – চাইলে আপনি মা-প্রকৃতিও বলতে পারেন – মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জন্মসূত্রে স্বাধীন সত্তা হিসেবে। আর সেই কবে থেকে সমস্ত মানুষকে অল্প কিছু মানুষের দাস বানানোর জন্য শারীরিক ও মানসিক বলপ্রয়োগের একগাদা সশস্ত্র প্রতিষ্ঠান খুলে বসে আছে কতিপয় লোক। নিজেদেরকে এরা বলে কর্তৃপক্ষ, আমি বলি ইবলিস। কর্তৃত্ব-কর্তৃপক্ষ-ইবলিস চায় মানুষ তার গোলামি করবে। আল্লাহ চান মানুষ স্বাধীনভাবে মোমিন মানুষ হয়ে উঠবে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করা তাই মোমিনের ঈমানের অঙ্গ। অস্ত্র আর শাস্ত্রের জোরে মানুষকে ইবলিসের দাসে পরিণত করার প্রচেষ্টার ইতিহাস হচ্ছে কারাগারের ইতিহাস।

২.৪ প্রত্যেক কারাগারই আদিতম কারাগার

বিড়ালের গল্পটার উৎপত্তি চট্টগ্রাম জেলে। চট্টগ্রামের জেলখানাটা বানানোর সময়ই ঐ কুকুর-বিড়াল পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হয়েছিল বলে গল্পে প্রকাশ। গল্পের পেটের মধ্যে এই ইঙ্গিতও আছে বলে আমার বিশ্বাস। সেটা হলো, তুমি যে জেলখানায় বন্দি ঐটাই পৃথিবীর আদিতম এবং একমাত্র জেল। এর আগে অতীতে কোনো জেলখানা ছিল কিনা, কিংবা বর্তমানে আর-কোথাও কোনো জেলখানা আছে কিনা তাতে তোমার কী আসে-যায়? বন্দির বিবেচ্য হচ্ছে বন্দিত্ব। বন্দির বিবেচ্য হচ্ছে স্বাধীনতা। তো, আলমগীর পৃথিবীর ঐ প্রথম জেলখানার লোক – চট্টগ্রামেরই ছেলে। পাহাড়ে সুড়সুড়ি খেয়ে নামতে নামতে, আর সমুদ্রে সুতা-বাঁধা বয়া ধরে দূর নীলে ভাসতে ভাসতে শৈশব পার করেছে সে। তারপর কৈশোর ঠিক মতো পেরিয়েছে কি পেরোয় নি, অভাবের ধাওয়া খেয়ে জেলে ঢুকেছিল নব-তরুণ। সাত সমুদ্র তের জেল ঘুরেফিরে চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই এখন সে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে। জেল বিষয়ে তাঁর মতো বিশেষজ্ঞ কমই আছে।

২.৫ নির্যাতনের জাদুঘর

আলমগীরই প্রথম জানালো, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার আদতে বৃটিশের তৈরি করা 'সাঁওতাল পানিশমেন্ট জেল'। আস্তে-ধীরে বিভিন্ন কয়েদি এবং 'বাবু'র কাছ থেকে জানা গেল আরও নানা তথ্য। (সবচেয়ে কম বেতনভোগী গরিব কারাকর্মচারী ও কারারক্ষীদেরকে কয়েদিরা বলেন 'বাবু'।) সাঁওতালদের বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষত তাঁদেরই শায়েস্তা করার জন্য ১৮৪০ সালে এই কারাগারের পত্তন ঘটায় বৃটিশ ঔপনিবেশিক প্রভুরা।

এই সুসভ্য প্রভুরা বন্দিদেরকে নির্যাতনের জন্য বানায় ভয়ঙ্কর সব সেল আর অন্য-সব ব্যবস্থা। যেমন অন্ধকার নির্জন কবর-সেল: তাতে কোনো মতে শ্বাস নেওয়ার জন্যে সামান্য একটি বাঁকানো পাইপের আউটলেট, যেন বন্দিকে বোঝানো যায় কবরের আজাব বলে কাকে। এখনও আছে এই সেল, প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকতেই হাতের ডানে। অব্যবহৃত। ঢোকার দরজা মাটি দিয়ে ভরাট করে বন্ধ করে-দেওয়া। ছিল জোঁক-সেল, তাতে কখনো জোঁক কখনো শিং মাছ রাখা হতো কয়েদিদেরকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার জন্য। ছিল ঘনকের আকৃতিসম্পন্ন কিউবিক্যাল সেল: এত ছোট, ঘাড় তুলে যেন কেউ দাঁড়াতে না পারে। এখনও আছে কণ্টক-সেল: মাথার ওপরে আর ডানে-বাঁয়ের দেয়ালে শত শত লোহার কাঁটা, পেরেক বা গজালের মতো, তারই মধ্যে এক চিলতে জায়গা, কোনো মতে শোয়া যায়, সামান্য নড়া-চড়া করতে গেলেও গা রক্তাক্ত হবে। এই কাঁটা-সেলগুলো এমডি'র ভেতরে (ম্যানুফ্যাকচারিং ডিপার্টমেন্ট), অব্যবহৃত, দরজাগুলো সিল করে দেওয়া। ছিল যিশু খ্রিষ্টের ক্রসের মতো করে হাত দুই দিকে ছড়িয়ে বেঁধে মনের সুখ মিটিয়ে চাবুক মারার জন্য হুইপ স্ট্যান্ড। সেই স্ট্যান্ড এখনও আছে, এখন আর চাবুক মারা হয় না। দেড়শো বছর আগের সবচাইতে 'সভ্য'দের এই ছিল বন্দির প্রতি আচরণ। রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার এ-রকম 'ঐতিহ্য'বাহী কারাগার: নির্যাতনের জীবন্ত জাদুঘর।

নির্যাতন এখনও আছে। মাত্রা সংকুচিত হয়েছে, ধারা বদলেছে। কিন্তু নির্যাতন আছে। আছে শীতের কামড়। বাঘ-পালানো মাঘের শীতেও, জেলের দরজা আর দরজার সমান জানালাগুলো থাকে খোলা। সারা সারা রাত ধরে। বিশাল একেকটা ওয়ার্ড। চার দেয়ালের কোনোটাতেই দরজা-জানালার অভাব নাই। হু হু করে হিম ঢুকছে। এদিক দিয়ে ঢুকছে, ওদিক দিয়ে বেরুচ্ছে। জমে যাচ্ছে মানুষের বাচ্চারা। গায়ে শুধু একটা কম্বল: পাতলা, ছেঁড়াখোঁড়া, পুরানা, ধ্যাড়ধ্যাড়া। এসব বন্দির অনেকে শিশু, অনেকে বৃদ্ধ। গরমের দিনে এই অবস্থাটাই বিপরীত আকার ধারণ করে: পদ্মার চর পেরুনো গরম লু হাওয়ার হাহাকার ঢোকে বিরাট উদোম জানলা-দরজা দিয়ে। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘুমাতে বাধ্য হওয়া কয়েদিদেরকে নিয়ে একেকটা ওয়ার্ড পরিণত হয় গরম গ্যাসচেম্বারে।

আছে পিঁপড়ার কামড়। প্রায় তিন-তলা দালানের সমান উঁচু এত্তো বড় বকুলগাছের গোড়ার দিককার মূল কাণ্ডে লোহার কড়া পোঁতা আছে। তাতে হাত বেঁধে বিষ পিঁপড়ার কামড় খাওয়ানো হয় এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা। গাছের গোড়ায় মাটিতে অনেক পিঁপড়ার বাসা। কয়েদির গায়ে মেখে দেওয়া হয়েছে গুড়। খুঁচিয়ে দেওয়া হয়েছে বাসা। লাইন ধরে পিঁপড়া বেরুচ্ছে। শত শত পিঁপড়া। উঠে যাচ্ছে কয়েদির গায়ে, কামড়াচ্ছে। প্রসিদ্ধ ঐ বকুলতলার বকুল ছাড়াও গাছ আরও

আছে। আছে মাথার ওপর গাছের ডালের সাথে উঁচু করে হাত বেঁধে একদিন দুই দিন তিন দিন দাঁড় করিয়ে রেখে দেওয়া, ঐ অবস্থায় পেটানো। এগুলো খুব বিরল না। (কোর্টে এক নাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা করে দাঁড়িয়ে থেকে সামান্য আন্দাজ পেয়েছিলাম দাঁড়িয়ে থাকার সুখ।) আছে দিনের পর দিন লোহার ডাণ্ডাবেড়ি: নানান ভঙ্গিতে, যেন ঠিকমতো হাঁটতে না পারে, যেন দরকারেও নিচু হতে না পারে, সারাক্ষণ পিঠ বাঁকা করে থাকতে হয়, সোজা হতে না পারে, ইয়ত্তা নাই।

আর 'কেস টেবিলে' লাঠিপেটা তো আছেই। একজন কয়েদিকে কয়েকজন 'দাঙ্গা' মিলে রীতিমতো লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে, তবু সে কয়েদি জেল-কর্তাদেরকে চোখে চোখ রেখে ব্যঙ্গ করে হিন্দি গান গেয়ে নেচে চলেছেন অদ্ভুত ভঙ্গিতে। 'বি-ক্লাস' কয়েদি এঁরা, দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদি। প্রকৃতপক্ষে, এঁরাই মানবপ্রজাতির স্বাধীন আত্মা-পরম্পরার সবচাইতে উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি। নিরীহ ও ভদ্রভাবে বন্দিত্বকে মেনে নেন না এঁরা। কিছুতেই বশ মানানো যায় না এঁদের। স্বাধীন মানুষকে সকলেই সমীহ করতে বাধ্য হয়। জেল-কর্তৃপক্ষও সমীহ করেন এঁদেরকে, সহজে ঘাঁটান না। আমাদের আলমগীর এঁদেরই এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি।

২.৬ স্বাধীনতার দিন গণনা, নিরন্তর পাপচক্র

নির্যাতনের এসব ঘটনা প্রত্যেক দিন ঘটে না। ঢালাওভাবে ঘটে না। সেই বৃটিশ আমল আর নাই। তবু এখনও ঘটে নির্যাতন। কম ঘটে, কিন্তু প্রায়শই ঘটে। কোনো কয়েদি বা বাবু-জমাদার অন্য কোনো কয়েদির নামে 'রিপোর্ট' দিলে, মানে অভিযোগ দাখিল করলে, কেস টেবিলে তাৎক্ষণিক-বিচারসভা বসে। জেল-কর্তারা সেখানে সাক্ষী-সাবুদ দেখে রায় দেন। অভিযুক্তরা সুবিচারও পান বটে, তবে প্রায়-সমস্ত ক্ষেত্রেই পান শাস্তি। শাস্তি মানে এই সব শারীরিক নির্যাতনমূলক ব্যবস্থাগুলোর কোনো একটা। আবার, শাস্তি বলতে হতে পারে 'রেমিশন' বা 'রেয়াত' কাটা যাওয়া। প্রায় সকলেরই তো সশ্রম কারাদণ্ড। কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকের শ্রম বা কাজ ঠিক করে দেন, 'কাজ-পাশ' করে দেন। সেই কাজের প্রকৃতি অনুসারে কয়েদিরা প্রতি তিন মাস কারাদণ্ড থেকে নির্দিষ্ট হারে – ২০ দিন ২১ দিন ২২ দিন ইত্যাদি – রেয়াত পান, ফলে তার মোট সাজা কমে আসে।

অত্যন্ত বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া এর চেয়ে বড় শাস্তি কয়েদির কাছে আর কিছু নাই। ধরেন, এক বছর জেল খেটে আপনি তিন মাস 'রেয়াত' অর্জন করেছেন, এখন শাস্তি হলো তার থেকে এক মাস 'রেয়াত' ছেঁটে দেওয়া, এ খুব হৃদয়বিদারক শাস্তি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শারীরিক শাস্তির চেয়ে অনেক বেশি কষ্টকর। তিল তিল করে দেওয়া তাঁর অমানুষিক শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত রেয়াত বাদ গেল। এখন তাঁকে

আরও বেশি জেল খাটতে হবে, আরও বেশি শ্রম দিতে হবে।

একটা দিন বেশি জেল খাটা আর একটা দিন কম জেল খাটার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ আছে যে: স্বাধীন মানুষের সাথে বন্দির যে তফাৎ। 'রেয়াত' কাটা যাওয়াটাকেই তাই কয়েদিদের ভয় বেশি। সেটা কর্তৃপক্ষও জানেন, ফলে তাঁরা শারীরিক শাস্তির চেয়ে রেয়াত কাটার সিদ্ধান্ত নিতেই পছন্দ করেন বেশি। যে কর্তা ব্যক্তিগতভাবে বদ তিনি শারীরিক নিগ্রহে আনন্দ পান। আর যিনি বিচক্ষণ-দয়ালু তিনি রেয়াত কাটেন। আবার মতান্তরে, যে কর্তা রেয়াত কাটেন তিনিই নিষ্ঠুর বেশি। শাস্তির বৈচিত্র্য আর মাত্রার হেরফেরের আর মানুষের দয়ার আর নিষ্ঠুরতার প্রকারভেদের এ-এক নিরন্তর পাপচক্র।

২.৭ বন্দিত্ব প্রাকৃতিক নয়, দাসপ্রথা ঐশ্বরিক নয়

স্বেচ্ছায় ঢুকেছিল বিড়াল কারাগারের পাপচক্রে, শুধু একটু খাওয়ার তাগিদে, বাঁচার আশায়। অথচ প্রকৃতিতে জেলখানা নাই। বিড়াল অথবা বাঘের জন্য কোনো বন্দিশালা নাই বনানীতে। ক্যাঙ্গারুর জন্য কোনো কারাগার কুঞ্জবনে নাই। পাখিদের জন্য প্রিজন নাই। গরুদের জন্য নাই গরাদের বন্দোবস্ত। কুকুরের জন্য কোনো কয়েদের কারবার নাই। ক্ষুধা লাগলে একটা প্রাণী অন্য প্রাণীকে শিকার করে খায় ঠিকই, কিন্তু বন্দি করে রাখে না। খাঁচায়, খোঁয়াড়ে কিংবা চিড়িয়াখানায় অন্য প্রাণীকে বন্দি করে রাখার ব্যবস্থা প্রাকৃতিক নয়। আদিতে মানুষের জন্যেও কোনো জেলখানা ছিল না। মানুষের জন্য খোদা বানিয়েছেন পাহাড়, নদী আর আকাশ। মানুষের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, সৃজনশীলতা এবং স্বাধীনতা। সৃজন করেছেন মানুষকে তিনি জন্মসূত্রে স্বাধীন হিসেবে। মানুষের জন্য তিনি সৃষ্টি করেন নি কারাগার। মানুষের জন্য তিনি সৃষ্টি করেন নি দাসপ্রথা।

রাবি: জানুয়ারি ২০০৮। প্রকাশ: প্রবাসী বাঙালিদের অনলাইন পত্রিকা *ইউকেবেঙ্গলি*, লন্ডন, ৪ঠা মে ২০০৮।

তিন

আদর্শ দাসত্ব-মহাগ্রাম

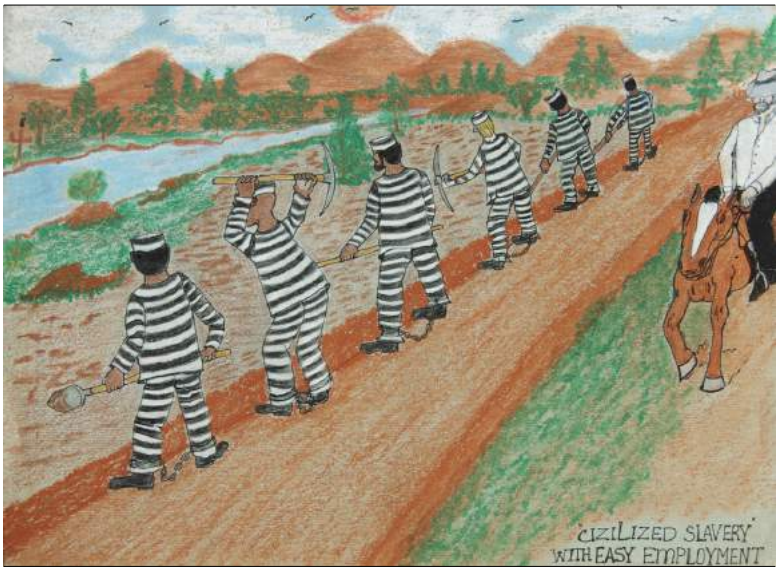

Timothy Clark-Bey. Civilized Slavery

৩.১ বাধ্যতামূলক শ্রমশিবির

আপনি যদি একুশ শতকের আধুনিক প্রত্যক্ষ দাসপ্রথা না দেখে থাকেন, তাহলে কারাগারে যেতে পারেন। দাসদের গ্রাম এটা, বন্দিদের গ্রাম। আদর্শ দাসত্ব মহাগ্রাম। আস্ত একটা নির্যাতনমূলক শ্রমশিবির বটে জেলখানা, বাধ্যতামূলক শ্রমশিবির। এখানে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষকে দিয়ে সর্বপ্রকার কাজ করানো হয় জুলুম করে এবং জুলুমের ভয় দেখিয়ে। কাজ নিজেও একটা জুলুম এখানে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক কর্মশ্রম জুলুম ছাড়া আর কী?

দাসত্ব মহাগ্রামের যাবতীয় কাজ কয়েদিরা করে। পুরোনো কালের বৃহৎ একটা গ্রামের মতো এখানে আছে আলাদা আলাদা পেশা-জীবিকার আলাদা আলাদা পাড়া। তবে, গ্রাম বা পাড়া বললে যে রকম মানবিক একটা ব্যাপার মনে হয়, এটা সে-রকম নয়। এটা খুবই অমানবিক। তবু পাড়া-পাড়া বা গ্রাম-গ্রাম মনে হয় এখানে

থাকা মানুষদের পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য: মোটের ওপর সবাই সবাইকে চেনে, এক সাথে কাজ করে, যাবতীয় দুঃখকষ্টের মধ্যেও সহজভাবে মেলামেশা করে, আড্ডা মারে, কালেভদ্রে ঝগড়াঝাঁটিও করে, আবার মিলেমিশে যায়। হঠাৎ ভুল ভাঙবে, যখন দেখবেন সকলের একই পোশাক, হাসিটা মলিন, উঁকি দিচ্ছে আড়ালের দুঃখ, আর কোথাও কোনো নারী নাই। নারীরা আছেন, আলাদা ঘেরাটোপে, দেখতে পাই নি। শ্রমের দিক দিয়ে দেখলে এটা একটা সুবিশাল কারখানার মতো, বন্দি শ্রমিকরা যেখানে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন, শুষ্ক অনিচ্ছুক প্রাণান্তকর পরিশ্রম। ছোটবেলায় সৈয়দপুরের রেলওয়ে কারাখানায় দেখেছিলাম ওয়াগনশপ, লোকোশেড, আরও সব আলাদা আলাদা শেড। আর এখানে জেলখানায় সব আলাদা আলাদা চালি।

৩.২ জোঁয়াল-বন্দি কয়েদি, মলবাহী মানুষ

শীত নাই গ্রীষ্ম নাই কোন সকাল থেকে বিশাল বিশাল কম্বল আছড়ে ধুচ্ছেন ধোপা-চালির কয়েদিরা। প্রতিদিন দশ হাজার রুটি বানাচ্ছেন রুটি-চালির লোকেরা। নাপিত-চালির নাপিত-কয়েদিদের কাঁচি কচকচ-কচকচ চলছেই সকাল থেকে সন্ধ্যা। কৃষিকাজ যাঁদের ঘাড়ে পড়েছে তাঁরা নিজের কাঁধে করে জোঁয়াল টানছেন গরুর বদলে: কয়েদি থাকতে আবার গরু কেন। আগে-পিছে দুই কয়েদি বাঁশে ঝুলিয়ে ছোটবড় ড্রামের মতো বালতি টানছেন। কোনো কোনো বালতিতে জল। সারা জেলে যেখানে যেখানে জল লাগে পৌঁছে দিতে হবে। গণ-গোসলের বিরাটকায় চৌবাচ্চা ভরার জল। গণ-কাপড় কাচার জল। গণ-টয়লেটের জল। প্রথম শ্রেণীর বন্দিদের গোসলের জল। কয়েদি থাকতে কর্পোরেশনের পানির লাইনের কী দরকার। কয়েদিদের সশ্রম কারাদণ্ড উশুল করতে হবে না। আবার কোনো কোনো বালতিতে মল-মূত্র-গুয়ের পানি: মলবাহী নালা থেকে ভরে আনা, ফুলবাগানের বা মূলাক্ষেতের আদম-সার। গোটা জেল গুয়ের গন্ধে ম ম করছে। একেবারে বৃদ্ধ লোকেরা ঝাঁটি দিচ্ছেন সার বেঁধে। বিস্তৃত আমতলার উঠান লেপছেন। মাথায় করে জং-ধরা পুরাতন টিনের তোরঙ্গে করে ভাত নিয়ে যাচ্ছেন আরেক দল লোক: কয়েদিদের খাদ্য। গিয়ে ঢালছেন ওয়ার্ডের বারান্দায় সিমেন্টের মেঝেতে। অবিকল ফকির লালনের মতো বা কনফুসিয়াসের মতো দেখতে অলৌকিক বৃদ্ধেরা বসে বসে মাছি মারছেন সারা সারা দিন। মেরে মেরে জমা করছেন ছোট ছোট কৌটায় ডিভিশনের স্যারদের ঘরে যেন ভনভন না করে কোনো মাছি। মুচি-চালির লোকেরা জুতা সেলাই করেই চলেছেন। ওদিকে উৎপাদন-বিভাগের (এম.ডি.) দেয়ালের ভেতরে তাঁত-চালির লোকরা মাকু টেনেই চলেছেন। মোড়া-চালির কয়েদিরা বাঁশের-দড়ির মোড়া বানিয়েই যাচ্ছেন। আরও আছে লোহার কাজ, ছাপাখানার

কাজ, (ভেতরে গিয়ে রতন মিয়াকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, রতন, আরও যেন কী কী কাজ?) 'রাইটার' বন্দিরা অফিসের কত রকম কাজ করছেন। মুক্তার মতো তাঁদের হস্তাক্ষর। পাঠাগারের বন্দিরা সাড়ে চার হাজার বই লেনদেনের বন্দোবস্ত সামলাচ্ছেন প্রতিদিন। কারা-হাসপাতালে কয়েদিরাই ড্রেসিং করছেন কয়েদিদের, প্রেশার মাপছেন, ইঞ্জেকশন দিয়ে দিচ্ছেন, স্যালাইনের সিরিঞ্জ-ব্যাগ-স্ট্যান্ড সামাল দিচ্ছেন কলেরার-ডায়রিয়ার রোগীদের। গণটয়লেটের নালাড্রেনের মল-মূত্র পরিষ্কার করছেন 'বাবু'-চালির কয়েদিরা।

৩.৩ বিনামূল্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল উৎপাদন

এই রীতিমতো নিবর্তনমূলক এই শ্রমশিবিরের বন্দিদের বাধ্যতামূলক শ্রমের বিনিময়ে রীতিমতো কারখানাভিত্তিক উৎপাদন-যজ্ঞ পরিচালিত হয় ম্যানুফ্যাকচারিং ডিপার্টমেন্ট এম.ডি.-তে। এটা কারাগারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা, কারাগারের কারখানা। জেলের ভেতরে একটা বড় অংশ চারপাশে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। জেলের ভেতরে জেল। অন্য অংশের কোনো কয়েদি সেখানে ঢুকতে পারেন না। এম.ডি.-তে সবচেয়ে কঠোর পরিশ্রম। এম.ডি.-তে কাজ পাশ হওয়াটা কয়েদিদের কাছে ভয়ের। এখানে শত শত গজ উৎপন্ন হয় চাদর, কয়েদিদের পোশাক, লুঙ্গি, শাড়ি, গামছা ইত্যাদি হিসেবে। প্রচুর মোড়া, বাঁশের চেয়ার তৈরি হয়। মাত্রই বলেছি। জেলের বাইরের বিক্রয়কেন্দ্রে এসব জিনিস দেদারসে বিক্রি হয়, কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করে কুল পান না। এখানে মুদ্রণ হয় জেলের জন্য দরকারি যত রকমের খাতা, কাগজপত্র, ফরম, পার্সোনাল টিকেট, মেডিক্যাল কার্ড ইত্যাদি যাবতীয় কিছু। রাজশাহী জেলের চাহিদা মিটিয়ে সেসব যায় আরো সব অন্য অন্য জেলে।

কয়েদিদের বদ্ধমূল বিশ্বাস, এম.ডি. কারাগারের অত্যন্ত লাভজনক প্রকল্প, কিন্তু কর্তৃপক্ষ এটাতে লোকসান দেখায়, আর টাকা মেরে খায়। এটা এমন একটা উৎপাদন-কারবার যেখানে শ্রম পাওয়া যায় বিনামূল্যে। শ্রমের জন্য কয়েদিদেরকে কোনো টাকা-পয়সা দেওয়া হয় না। দশ-বিশ-তিরিশ-চল্লিশ বছর জেল খেটে মানুষ যখন কারাগার থেকে মুক্তি পায় তখন তাঁর হাতে ফুটা পয়সাও থাকে না।

৩.৪ আকাশে যত তারা, জেলকোডে তত ধারা

কাজ, কাজ আর কাজ: বিনা পারিশ্রমিকে তো বটেই, প্রায় না খেয়ে এবং নিপীড়ণ আর লাগাতার দুর্ব্যবহারের বিনিময়ে। ওদিকে, বাবু-জমাদাররা সারাক্ষণই ছোঁক ছোঁক করছেন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে। জেলের আইনে বিধিবিধানের তো আর শেষ নেই, আলমগীরের বয়ানে: 'আকাশে যত তারা, জেলকোডে তত ধারা'।

রিপোর্ট খাওয়ানোর ভয় দেখিয়ে কীভাবে পাঁচ টাকা দশ টাকা পকেটে ভরা যাবে, কীভাবে কয়েদির সিগারেটটা নিজে খাওয়া যাবে, কয়েদির নামে বাইরে থেকে পাঠানো শুকনা খাবারের ভাগ মারা যাবে, পাঠানো সিগারেটের প্যাকেট সরানো যাবে, ছুঁতানাতার শেষ নাই, অত্যাচারের শেষ নাই। এমনকি ঈদের দিনেও ডিভিশনের 'কাজের লোক' বা 'ফালতু'র কাছ থেকে ২০ টাকা 'পরবী' নিয়েছেন এক জমাদার।

এতসব কাজ আর অত্যাচারের সংসারে তিন বেলা ভাত খেতে পর্যন্ত পান না এই বন্দিরা। সকালে একটা রুটি, সাথে গুড়। দুপুরে দুইটা রুটি, সাথে গুড়। রাতের জন্য শুধু ভাত-তরকারী। কিন্তু সে-ভাত তো এসে যায় বিকালের আগেই প্রায়, সন্ধ্যার আগেই দাসদেরকে খাঁচায় ঢুকতে হবে যে। সত্যিকারের রাতে খেতে বসলে দেখা যাবে নষ্ট হয়ে গেছে সে-ভাত, এমনই ভালো তার চাল। ভাত তাই সন্ধ্যার আগে-আগেই খেয়ে ফেলতে হয়। তারপর সারারাত উপাস। নইলে রেখে দিতে হবে পানি দিয়ে, এবং খেয়ে ফেলতে হবে সন্ধ্যা-রাতেই, না হলে নির্ঘাৎ পচতে শুরু করবে। খাবারের মান নিয়ে কিছু না বলাটাই সবচেয়ে ভালো। ডিভিশন পাওয়ার আগে তিন দিন সেলে ছিলাম, নিজমুখে খেয়ে দেখেছি। মানুষকে কষ্ট দেওয়ার কি সহজ উপায়। তবু এখন যা দেয় সেটাই নাকি ক-বছর আগের তুলনায় অনেক ভালো, কয়েদিরা বারবার মনে করিয়ে দেয় সে-কথা।

৩.৫ আত্মার গভীরে বন্দিত্বের অনুবাদ

সকাল থেকে সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম, অত্যাচার, আর প্রায়-অনাহারের পরও রাতের চেয়ে দিবসই সুন্দর। দিনে আকাশ দেখা যায়, মাটিতে হাঁটা যায়, গণ্ডির ভেতরে হলেও একটু চলাফেরা হয়। রাতে আরও বেশি বন্দি। আসলে রাত তো অনেক দূর, সন্ধ্যা হওয়ার আগেই লক-আপ। নিজ নিজ ওয়ার্ডের খাঁচার মধ্যে লোহার গরাদের গেটে তালাচাবি। তখনও সন্ধ্যা হয় নি। তখনও হাঁস-মুরগি খুপরিতে ঢোকে নি। তখনও মাঠে চরছে গরু-ছাগল। কয়েদিদের মুখে তখন গোধূলি-ঘনানো বিষন্নতা। প্রতিটা সন্ধ্যায় তাঁরা হাঁস-মুরগি-গবাদিপশুর প্রতি ঈর্ষা অনুভব করতে করতে খাঁচায় ঢোকেন। আত্মার একেবারে গভীরে আলাদা করে আরেকবার অনুবাদ করেন বন্দিত্বের অর্থ। বিছানা হয় দেড় হাত চওড়া। বিছানা বলতে ভাঁজ-করা একটা কম্বল, মাথায় ভাঁজ-করা কম্বলেরই একটা বালিশ। দুই বিছানার মাঝখানে এক আঙ্গুলও ফাঁক নাই। শীত হলে গায়ে আর-একটা কম্বল, জানলা-দরজা খোলা, আগেই বলেছি। গরম হলে ভাপ ওঠে, ও-রকম ঘেঁষাঘেঁষি করে বিশাল একটা মেঝেতে কোথাও একশো কোথাও-বা দুইশো তিনশো চারশো

মানুষ, রাজশাহীর কুখ্যাত দম-ফাটানো ৪০-৪২ ডিগ্রির গরমে। কি গরমে, কি শীতে সেলগুলোর অবস্থা আরও সঙ্গীন। ঐভাবে শীতে-গ্রীষ্মে শুয়ে শুয়ে সারা রাত অপেক্ষা, কখন সকাল হবে, কখন খুলবে গরাদ। লক-আপ যখন খুলবে লোহার ঘটাং ঘটরং শব্দ শুনতে কত ভালোই না লাগবে: এই কথা ভাবতে ভাবতেই হয়ত ঘুম আসবে অথবা ঘুম আসবে না – দাঁড়িয়ে থাকবে জানালার বাইরে। এইভাবে আয়ু ক্ষয় করতে করতে যাবে একটা দিন। বন্দি জানবেন, তাঁর মুক্তির ক্ষণ আরও একদিন এগিয়ে এসেছে। এ-ও একটা বিরাট অর্জন: আরও একটা দিন তিনি পার করে দিয়েছেন জেলে, এবং তারপরও বেঁচে আছেন।

৩.৬ টাকাতন্ত্র আমলাতন্ত্র কারাতন্ত্র

এত যে দাসের মতো কাজ, সেই কাজেরও নিশ্চয়তা নাই। আজকে আপনার ফুলবাগানে কাজ, কাল যে আবার উৎপাদন-বিভাগের উঁচু দেওয়াল ঘেরা পৃথক জেলের ভেতর বসে বসে আপনাকে মোড়া বানাতে হবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নাই। কর্তৃপক্ষের খেয়াল হলেই হলো আপনার কাজ অন্যত্র পাশ করে দিতে পারেন তাঁরা। আইন হচ্ছে, প্রতি মাসে কাজ-পাশ করাতে হয়। একই কাজই যদি বহালও থাকে, তবুও সেটা নতুন করে পাশ করাতে হবে। আর প্রতিবার পাশ করানোর জন্য নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দিতে হবে জেল-কর্তাদেরকে। (আকাশে যত তারা, জেলকোডে তত ধারা; জেলকোডে যত ধারা, তত বেশি 'মাসোহারা'।) টাকা দিতে না পারলে আপনার কাজ অন্যত্র পাশ হয়ে যাবে। তাতে হয়ত বেশি পরিশ্রম, তাতে হয়ত আপনার বর্তমান কর্ম-এলাকার বন্ধু-হয়ে-যাওয়া কয়েদিদেরকে হারাতে হবে, দেখা হবে না আর প্রতিদিন, কিংবা নতুন কাজটা হয়ত আপনার ভালো লাগে না স্রেফ। সুতরাং প্রতি মাসে টাকা তৈরী রাখতে হবে। টাকা পাবেন কোথায়? বাসার লোকেরা খেয়ে না খেয়ে দিয়ে যাবে। আপনার সে-রকম টাকা পাঠানোর লোক না থাকলে আপনি হয়ত আপনার বরাদ্দ মাছের টুকরাটা বেচে দেবেন দুই টাকা দিয়ে, টাকা জমাবেন।

ঐ যে সামান্য খাদ্য, একটু রটি আর একটু ভাত, সেটুকু নিয়েও অনেক ব্যবসা হয়। ঠিকাদার কাঁচামাল সাপ্লাই দেবেন। ঠিকাদার নির্বাচনে টাকা লেনদেন হবে। গেট দিয়ে জিনিস ঢুকবে। গেটে নয়-ছয় হবে। রান্না-চালি গোপন 'নিলামে' বিক্রি হবে, যিনি 'কিনে' নেবেন (তিনি একজন কয়েদি) তিনি সেখান থেকে স্পেশাল হিসেবে চোরা খাবার বেচবেন। এমনকি আপনি যে দেড় হাত জায়গায় শুয়ে থাকেন ঐ জায়গাটা ঐখানেই বহাল রাখার জন্যেও আপনাকে মাসোহারা দিতে হবে। একটু আরামে থাকার জন্য, আলাদা একটু লোহার বেডের বালিশ-তোষক-মশারির

বিছানায় ঘুমানোর জন্য, আর একটু ভালো খাওয়ার জন্য আপনাকে থাকতে হবে মেডিক্যালে, যার একটা ওয়ার্ড থেকে প্রায় ৭০ জন বন্দিকে সরিয়ে আমাদের তিন জনের থাকার ডিভিশন ওয়ার্ড বানানো হয়েছিল। আর সেই মেডিক্যালে থাকতে হলে ডাক্তারকে আপনি প্রতি মাসে এক দেড় দুই বা তিন হাজার টাকা দেবেন। টাকা না থাকলে সত্যিসত্যি অসুখ হলেও মেডিক্যালে আপনার এক-আধ দিনের বেশি সিট জুটবে না। আর টাকা থাকলে দিব্যি সুস্থ মানুষ আপনি মাসের পর মাস মেডিক্যালে থাকবেন।

৩.৭ গরিবের জেলখানা, বড়লোকের আইন-আদালত

এমন একটা কাজ জেলখানায় নাই, যার জন্য টাকা দিতে হয় না। অথচ ঐ দাসদের গ্রামে প্রায় প্রত্যেকেই গরিব মানুষ। গরিবের জেল, আর বড়লোকের আইন-আদালত। অনেকদিন জেল খাটা হয়েছে। যে মামলায় আপনি আছেন তাতে হাইকোর্টে মোটের ওপর একটা উকিল ঠিকমতো দাঁড়ালে আপনার জামিন নিশ্চিত, সেই উকিলটুকু ধরার মতো টাকা বেশিরভাগ কয়েদির নাই বলে তাঁকে পচে মরতে হবে জেলে আরও কত কাল। জামিনটুকু পাওয়ার জন্য আপনার পরিবার হয়ত সহায়-সম্বল সব বেচে ৫০ হাজার টাকা দিয়েছে দালালকে, টাকাটা দালাল নিজেই খেয়ে বসে আছে, আর আপনি সেই জেলেই পচে মরছেন। কারারক্ষীরাও নিতান্ত গরিব। অতি সামান্য বেতন পান। সংসার চলে না, মাস চলে না। কিছুতেই না। ডিউটি প্রতিদিন ১৪ ঘণ্টা। বসার হুকুম নাই। জমাদার দেখলে রিপোর্ট করে দেবেন। আর সেই ভয় দেখিয়ে জমাদারও তার কাছ থেকে টাকা খাবেন। জমাদারের কাছ থেকে আবার টাকা খাবেন হয়ত সুবাদার, তারপর জেলার, তারপর সুপার। এরই মধ্যে কত রকম হাজারো মানবিক বৈশিষ্ট্য আর পরিস্থিতির জন্য জেলকর্তাদের কেউ কেউ দয়ালু, কেউ কেউ বদমাইশ। কয়েদিরা সারাক্ষণই বলছেন: এই জেলার ভালো, ঐ সুপার খারাপ, তার আগের জেলার ছিলেন চামার, আর ওমুক সুপার হারামির বাচ্চা, আর তমুক সুবাদার অত্যন্ত সদাশয় লোক। এসব পার্থক্য জেলের ভেতরে বাঁচা-মরার সাথে জরুরিভাবে সংশ্লিষ্ট বটে।

৩.৮ স্বাভাবিকতার স্বর্ণচিন্তা: স্বাভাবিকতার স্বর্ণশৃঙ্খল

আর আমরা? ডিভিশনের কয়েদিরা? আমরা রাষ্ট্র-কর্তাদের কমবেশি নিজেদের শ্রেণীর লোক বলে রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত হয়েও প্রথম শ্রেণীর বন্দির মর্যাদা পাব, 'রাজার হালে' জেলে থাকব। আর সব গরিব মানুষেরা জেলের বাইরে যেমন মর্যাদাহীন, জেলের ভেতরে তেমনি অধিকতর মর্যাদাহীন বন্দি, পশুর মতো,

দাসের মতো। সারাদেশ আমাদের মুক্তির জন্যে চিন্তিত থাকবে, মুক্তি দাবি করে এটা-সেটা করবে, আর এদের মুক্তির কথা কেউ কোনোদিন বলবে না।

জেলখানা থাকলে তাতে গরিব মানুষেরা আর ভিন্নমতের ভিন্নশক্তির লোকেরা তো বন্দি থাকবেই। ৬৪টা জেলা শহর থাকবে, আর ৬৪টা জেলখানা থাকবে না! সাতটা বিভাগ থাকবে, সাতটা কেন্দ্রীয় কারাগার থাকবে না? এই হচ্ছে আমাদের মাথার মধ্যকার 'স্বাভাবিক' 'প্রাকৃতিক' ধারণাগুচ্ছ। পরিবার রাষ্ট্র ইস্কুল-কলেজ সাহিত্য-শাস্ত্র, ধর্ম-শাস্ত্র, আর সাংবাদিকতা-শাস্ত্রের মাধ্যমে কতদিনের প্রশিক্ষণের ফল এইসব 'স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক' ধারণা তা আমাদের ভেবে দেখার সময় কোথায়!

ফলে ডিভিশনের প্রথম শ্রেণীর বন্দিদের কাছে একদিন দুপুরে মর্যাদাহীন এক বন্দি এসে লুকিয়ে লুকিয়ে একটু ভাত খেতে চাইবে বাবু-জমাদার কিম্বা ম্যাট-পাহারারা যেন দেখে না ফেলে, এটাই তো স্বাভাবিক। তারপর একদিন আমরা মুক্তি পেয়ে চলে যাব আর জেলখানা যেমন ছিল তেমনই থেকে যাবে, এটাই তো স্বাভাবিক। স্বাভাবিকতার এই স্বর্ণচিন্তার শৃঙ্খলই কারাগার নামক আদর্শ দাসত্ব-মহাগ্রামের আসল নিরাপত্তা।

রচনা: রাবি, জানুয়ারি ২০০৮। প্রকাশ: *শাশ্বতিকী*, প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৯; প্রবাসী বাঙালিদের অনলাইন পত্রিকা *ইউকেবেঙ্গলি*, লন্ডন, ১৯শে এপ্রিল ২০০৮।

চার

পিওতর ক্রপোৎকিনের ‘কারাগার কি দরকারি’ রচনার বঙ্গানুবাদ

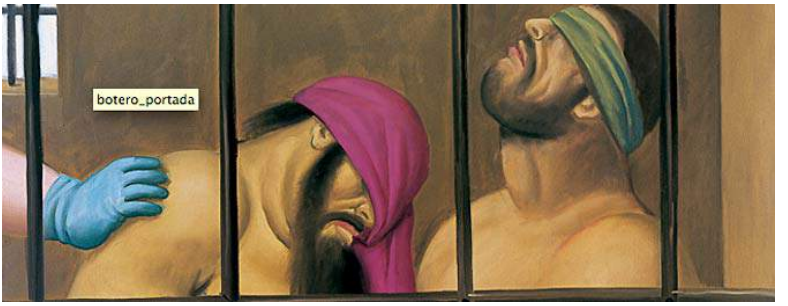

Feenando Botero. Abu Gharib

অনুবাদকের ভূমিকা: এই রচনাটি উনিশ শতকের আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব পিওতর ক্রপোৎকিনের *রুশী ও ফরাসি কারাগারে (ইন রাশান অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ প্রিজনস)* গ্রন্থের শেষ অধ্যায়। ১৮৮৭ সালে লন্ডন থেকে ‘ওয়ার্ড অ্যন্ড ডাউনি’ নামের প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত এই গ্রন্থটি কারাগার সম্পর্কে ক্রপোৎকিনের নিজের অধ্যয়ন। নিজের জীবন তাঁর এই অধ্যয়নের অংশ বটে, কিন্তু কোনোক্রমেই এটি তাঁর কারাস্মৃতি নয়। (আলাদা জীবনস্মৃতি তাঁর আছে: *মেমোয়ার্স অফ এ রেভোল্যুশনিস্ট*।)

আলোচ্য গ্রন্থটি বরং খোদ কারাগার-অধ্যয়নের মর্মস্পর্শী এক দলিল। ইদানিংকার ইউরোপ-আমেরিকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকা কারাগার-বিলুপ্তি-আন্দোলনের যুক্তিমালার ভিত গড়ে দিয়েছিল দুর্দান্ত এই গ্রন্থ। নিষিদ্ধ ঘোষিত ‘প্রথম আন্তর্জাতিকের’ সদস্য হওয়ার অপরাধে জেল খেটেছেন ভয়ংকর সব গা-শিউরানো হিম-শীতল অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। বিষাক্ত গ্যাসের মধ্যে। সম্পূর্ণ নির্জনতার ভেতরে। রাশিয়ায় এবং ফ্রান্সে।

অথচ তরুণ বয়সে এই ক্রপোৎকিনই ছিলেন রাশিয়ার বিশাল একটা এলাকার কারা-সংস্কার-কমিশনের সদস্য। জারের রাজকীয় সামরিক বাহিনীর চৌকষ লেফটেন্যান্ট তখন তিনি। সেই কাজ করতে তখনও ঘুরেছিলেন বিস্তীর্ণ অঞ্চল। কারা-অধ্যয়নের জন্য তিনি মস্কো থেকে পাঁচ হাজার মাইল দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে গোটা সাইবেরিয়া ঘুরেছেন। ঘুরেছেন আরো সব এলাকা। কারাগারের ভেতরে-বাইরে কারাগার নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ, ব্যাপক, বৈচিত্র্যময়।

ক্রপোৎকিনের জন্ম ১৮৪২-এ মস্কোতে। নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবী, চিন্তাবিদ ও লেখক।

তাঁর চিন্তা, রচনা ও কর্ম 'নৈরাজ্যবাদী সমাজতন্ত্র' নামে নৈরাজ্যবাদের বিশেষ একটি ঘরানাই তৈরি করে ফেলেছিল। পুরোদস্তুর প্রকৃতিবিজ্ঞানীও ছিলেন। তাঁর *মিউচুয়াল এইড: এ ফ্যাক্টর ইন ইভোল্যুশন* বইটা প্রকৃতিজগতের বিবর্তন নিয়ে ডারউইনের 'সারভাইভাল ফর দ্য ফিটেস্ট' নীতির একপেশে ধারণাকে মৌলিকভাবে পাল্টে দিয়েছিল। পরিপূরণও করেছিল। বিপুল তথ্যরাজির সাহায্যে তিনি দেখিয়েছিলেন ঐটা বিবর্তনের একটা মূলনীতি বটে, কিন্তু আরো একটা অধিকতর শক্তিশালী মূলনীতি আছে প্রাকৃতিক বিবর্তনের। সেটা হলো 'পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও সংহতি'।

কারাগার বিলোপের পক্ষে সর্বপ্রকার নৈরাজ্যবাদীদের যেরকম দরদী এবং লাগাতার রচনা প্রচারণা-কাজ দেখেছি আর কারো মধ্যে তা দেখি নি। বিপ্লবী-জাতীয়তাবাদী-সন্ত্রাসবাদী নেতাকর্মীরা জেলে যান, ফিরে আসেন, স্মৃতিকথা লেখেন কিন্তু কেউ জেল-বিলোপের কথা বলেন না। তাঁদের রচনা পড়লে মনে হয়: জেলখানা জিনিসটা ঠিকই আছে। কয়েদখানা তো থাকতেই হবে। শুধু 'আমরা' সেখানে থাকব না। থাকবে 'দুষ্টু' লোকেরা – যাঁরা বিরোধী পক্ষ। শ্রেণীগত দিক থেকে বা দল-পার্টিগত দিক থেকে। এই হলো সবার অবস্থান। অথচ জেলখানা আসলে এমন এক প্রতিষ্ঠান যার সত্যিকার সংস্কার সম্ভব নয়। হয় আপনি বন্দি, না হয় আপনি মুক্ত। এর মাঝামাঝি কী হতে পারে? সংস্কারটা তাহলে কী নিয়ে? হ্যাঁ, আপনি বন্দিদের থাকা-খাওয়া-শোওয়া-চিকিৎসা ইত্যাদির কিছু উন্নতি ঘটাতে পারেন অবশ্যই। সেটা জরুরিও বটে। কিন্তু কারাগারের পিঞ্জর যদি সোনার তৈরিও হয়, তবু তা কারাগারই থেকে যায়। বন্দিত্বের গ্লানি মোচন করা যায় শুধু স্বাধীনতা আর মর্যাদাবোধ দিয়ে। অন্য কোনো কিছু দিয়ে নয়। সুতরাং যত সংস্কারই করা হোক না কেন, প্রতিষ্ঠানটা যদি কারাগারই থেকে যায়, তাহলে সেখানে আপনি বন্দি। কারাগারের বিকল্প তাহলে কী হতে পারে? কারাগারের বিকল্প স্বাধীনতা। কারাগারের বিকল্প আত্মকর্তৃত্ব। কারাগারের বিকল্প আত্মমর্যাদা, আর অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা। সত্যিকারের সংস্কার যদি নাই-ই করা যায়, তাহলে এই সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই পথ: যথাশিঘ্রী জেল-বিলোপ করা। নিঃশর্ত বিলোপ। খোদ কারাগারেরই সংস্কার অসম্ভব। তাহলে কারা-রাক্ষসের পেটের ভেতরে বন্দি মানুষের অপরাধ-সংস্কার করা যাবে কীভাবে? কারাগার নিজেই তো বিরাট এক অপরাধ। মেরে-ধরে মানুষকে ভালো করা যায় না। মানুষ উন্নত হয় ভালোবাসায়। উন্নত সামাজিক পরিবেশে। যে সমাজ নিজেই চলে বঞ্চনা বৈষম্য-বলপ্রয়োগের কর্তৃত্বপরায়ণ নীতিতে, সেই সমাজের কারাগার কি আর ভিন্ন কোনো নীতিতে পরিচালিত হওয়া আদৌ সম্ভব। কর্তৃত্বনীতি বরং কারাগারের অন্তরালে অনেক উৎকট রূপ ধারণ করে। সেটাই হওয়ার কথা। কারাগার কখনোই তাই 'সংশোধনাগার' হতে পারে না। সারা পৃথিবীর কারা-পরিসংখ্যান বলছে: যে দেশে মৃত্যুদণ্ড বেশি, সে দেশে খুনখারাবি বেশি। যে দেশে কারাগার বেশি, সে দেশে অপরাধ বেশি। অপরাধী বেশি। অশান্তি বেশি। কারাগার কমায় না অপরাধ। বাড়ায় বরং খানিকটা। এ আসলে অপরাধশিক্ষার এক প্রকার বিশ্ববিদ্যা-লয়। এ বস্তু কখনোই মনুষ্যবান্ধব হতে পারে না। তা সে যত রকমের সংস্কারই করা হোক না কেন। আমাদের দরকার তাহলে কারা-সংস্কার নয়, সমাজ-সংস্কার। কেননা অপরাধের উৎস

খোদ সমাজ। বঞ্চনা-বৈষম্য-বলপ্রয়োগ।আমাদের দরকার আমূল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন।

বলশেভিক রাশিয়ায় ১৯২১ সালে ক্রপোৎকিন মারা যাওয়ার পর মস্কোতে হাজার বিশেক মানুষের বিশাল শোকযাত্রা হয়। সেটাই ছিল রাশিয়ায় নৈরাজ্য-পথিকদের শেষ প্রকাশ্য উপস্থিতি। বলশেভিকদের রাষ্ট্র-পুঁজিবাদী নিপীড়ন-যন্ত্রের অকল্পনীয় অত্যাচারে এর পর তো যাবতীয় বিরোধী স্বরই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নোবেলবিজয়ী সাহিত্যিক আলেকজান্ডার সল্‌ঝনিৎসিনের কয়েক খণ্ডের গ্রন্থমালা *গুলাগ আর্কিপিলাগো* এই নিপীড়ন-যন্ত্রের কার্যক্রম ও কার্যপ্রণালীর রক্ত হিম করা দলিল। ক্রপোৎকিনের জার আমলের কারাগার-অধ্যয়নেরই পরিপূরক গ্রন্থ বলা চলে।

এই দুই বই অনুসরণ করলে স্বতঃস্পষ্টভাবেই বোঝা যায়: সমাজতন্ত্রের নামে ৭০ বছরের বলশেভিক শাসন এক অর্থে জার শাসনেরই স্বাভাবিক-সিস্টেমেটিক সম্প্রসারণ। 'বিপ্লবী' বলশেভিকরা জার-আমলে ব্যবহৃত ভয়ংকর কারাগারগুলোর সুসংগঠিত পরিচর্যা করেছিলেন। পিটার্সবার্গের 'পিটার ও পলের দুর্গ' নামক কুখ্যাত মৃত্যুকূপ-স্বরূপ যে কারাগার -গুলোতে জারবিরোধী বলশেভিক ও অন্যান্য বিপ্লবীরা ধুঁকে ধুঁকে মরেছেন, সেই কারাগারগুলোই পরে বলশেভিক-জমানায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তথাকথিত 'সমাজতন্ত্র-বিরোধী' হাজার হাজার স্বাধীন-প্রাণ তরুণ-বৃদ্ধ মানুষে। এটা ছিল প্রকৃতপক্ষে জেল-সমাজতন্ত্র। ১৯২১ সালে ক্রপোৎকিনের ঐ অন্তিম যাত্রার বিরাট ব্যানারে লেখা ছিল তাঁর পূর্বসূরী রুশ বিপ্লবী কমরেড মিখাইল বাকুনিনের সেই বিখ্যাত উক্তি: 'সমতা ছাড়া স্বাধীনতা মানে বিশেষ এক প্রকার সুবিধা, আর স্বাধীনতা ছাড়া সমাজতন্ত্র মানে দাসত্ব'। কারাগার দাসত্বেরই স্মারক।

বর্তমান অনুবাদটা প্রথম ছাপা হয়েছিল ঢাকার 'মহানগর সার্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটি'র বার্ষিক পূজা-প্রকাশনা *অঞ্জলি*-তে। ২০০৯ সালে। তার আগে পিওতর ক্রপোৎকিনের এই বইটি আদিতে নামিয়েছিলাম নৈরাজ্য সংক্রান্ত ইন্টারনেট-মহাফেজখানা 'অ্যানার্কি আর্কাইভস' থেকে। ওখান থেকে টেক্সট কপি করে এমএস ওয়ার্ডে সাজাতে হয়েছিল। তারপর তাকে কোয়ার্ক এক্সপ্রেস দিয়ে ফর্মা আকারে সাজিয়ে প্রিন্ট নিয়ে বই আকারে বাঁধাইয়ের কাজ করতে হয়েছিল। সেটা ছিল ২০০৮ সালের আগস্ট। কয়েকবার পড়ে শেষ অধ্যায়টির অনুবাদ করে ফেলি। ঐ বছরেরই নভেম্বর মাসে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মার্কিন অধ্যাপক ড. ডানা ওয়ার্ডের পরিচালনায় অ্যানার্কি আর্কাইভস গড়ে উঠেছে 'ইন্টারনেট ও অ্যানার্কি' নামে তাঁর একটি অভিনব কোর্সের অংশ হিসেবে। এই কোর্সের শিক্ষার্থীরা ওসিআর-স্ক্যান করে নৈরাজ্যের নানা উপাদান ইন্টারনেটে ঐ মহাফেজ-খানায় ওঠান। তারপর তা নিয়ে শিক্ষায়তনিক সন্দর্ভ রচনা করেন। এরকমভাবে টেক্সট-স্ক্যান করা এই বইটার এখানে সেখানে বেশ কিছু জায়গায় দু-একটা করে অক্ষর ছুটে গেছে। প্রুফ সংশোধন করার কাজটা ওঁরা হয়ত ঠিক মতো সম্পাদন করতে পারেন নি। ফলে অনেক জায়গাতেই প্রকৃত শব্দটাকে সাধারণ জ্ঞান দিয়ে বুঝে নিতে হয়েছিল। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারি নি এমন জায়গা অন্তত দুই-একটা তো থেকেই গিয়েছিল হয়ত। এ অনুবাদের

অঞ্জলি-পাঠের ভূমিকায় আরো কিছু অসুবিধার কথাও উল্লেখ করতে হয়েছিল। সেগুলো এখানেও বলে রাখার সামান্য অবকাশ আছে:

> অনুবাদটাকে সম্পাদনা করার ক্ষেত্রে যত্নের অনেক অভাব থেকে গেল আমার। নামের উচ্চারণে অনেক ভুল থেকে গেল। সংশ্লিষ্ট বিদেশী ভাষা বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে উচ্চারণগুলো ঠিকঠাক মতো লিখতে পারলে ভালো হতো। তথ্যসূত্র হিসেবে ক্রপোৎকিনের উল্লেখ করা বই-প্রবন্ধ-জার্নাল প্রভৃতির নামের ঝামেলাও থেকে গেল। এগুলোর কোনটা বই আর কোন প্রবন্ধ তা-ও অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে পারলাম না। প্রকাশকের নাম ইত্যাদিও ক্রপোৎকিন উল্লেখ করেন নি। অনুবাদক হিসেবে আমার জোগাড় করতে পারা উচিত ছিল।
>
> ইতালীয় ভাষায় বেশ কিছু বইয়ের নাম রোমান হরফে যেমন পেয়েছি তেমনই রেখে দিতে হলো। আমার মতোন মূর্খের আর উপায় কী। পরে কাউকে পেলে সাহায্য নিতে হবে। অনুবাদের এই কাজটা যখন মুদ্রণযোগ্য করে তুলছি, সেই শেষ দুইটা দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট-সংযোগ হাওয়া হয়ে গেল। সেখান থেকে বেশ কিছু সাহায্য পেতে পারতাম হয়ত। আপাতত কপাল খারাপই।
>
> আরো অনেক খামতিও থাকল। বিদেশী নামের বানান-তালিকা এবং আমার প্রতিবর্ণীকৃত বাংলা বানানের তালিকাটা অসম্পূর্ণই থেকে গেল। সে-আমলের বই এবং লেখকের পরিচিতি ইত্যাদি দিতে হতো। টুকটাক কোনোমতে দিলাম ঠিকই কিন্তু অনেক বাদও থেকে গেল। এসব লেখকের এবং তাঁদের রচনাকর্মের বিস্তারিত খোঁজখবর করা দরকার এবং তা ভালোভাবে অধ্যয়ন ও প্রচার করাও দরকার।

পরে অবশ্য বইটার ইমেজ-স্ক্যান করা প্রতিলিপি সংস্করণই পাওয়া গেল ইন্টারনেটে ১৯৯৭ সালে।

তথ্যসূত্র, পাদটীকা সবই প্রায় ক্রপোৎকিনেরই। তবে আমার সংযোজিত কয়েকটা পাদটীকাও আছে। এগুলোর কোনো কোনোটা নিতান্তই তথ্যমূলক। বাকিগুলোকে আমার দিক থেকে ক্রপোৎকিনের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতার কতিপয় সমালোচনা বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। এগুলো 'অনুবাদকের টীকা' হিসেবে যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রচনাটি ১২৫ বছর আগের একটা রচনা। তার ওপর রুশী ক্রপোৎকিনের ইংরেজি রচনায় বেশ কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে বলে আমার মনে হয়েছে, যা আমি সবসময় ধরতে পেরেছি কিনা আল্লাহপাক জানেন। অনুবাদের সর্বত্র তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরের কথাগুলো অনুবাদকের সংযোজনী।

একথা আজ সুপ্রমাণিত যে কারাগার অপরাধ কমায় না। বাড়ায় মাত্র। যত দিন জেল-রাক্ষস আছে তত দিন তার রাক্ষুসে পেটে তাজা মানুষের মর্মান্তিক 'মৃত্যু' ঘটতেই থাকবে। অধিকন্তু কারাগার আমাদের ওপরে যা করে, তা আর কোনো দিন মুছে ফেলা যায় না। চোখ বন্ধ করলেই সেই সেল, সেই জেল, আর সেখানে রেখে আসা দরিদ্র-দুঃখী আশাহীন-ভালোবাসাহীন সারি সারি মানুষ। এ যে কী রকম যন্ত্রণা, বোঝানো যাবে না। এই যে ক-দিন ধরে এই কারা-অধ্যয়ন নিয়ে আছি, আমি আসলে কারাগারের ভেতরেই আছি। এ কথনও

অতীত হবে না। মনে পড়ছে বন্দিদের কান্নাভেজা ঈদ। সারা বছর না খাইয়ে রেখে তারপর গ্লানিমাখা-করুণামাখা দুই টুকরা মাংসের ঈদ। কয়েদির আত্মপরিচয়হীন ধিক্কৃত ডোরাকাটা-চেককাটা পোশাক-পরা ঈদ। আর প্রতিমাহীন-ঢাকঢোলহীন নামকা-ওয়াস্তে পূজা। দুর্গা পূজা, কালীপূজা। কালীপূজার রাতে জেলের দীর্ঘ সীমানা দেয়াল জুড়ে দীপালি জ্বালাতে আমার জেগেছিল ব্যাকুল বাসনা। অনেক কষ্টে, একে বলে তাকে বলে, আমার গরাদে জ্বালতে পেরেছিলাম একটা মাত্র মোমবাতি। কিন্তু সবাই ঘুমিয়ে পড়লে গভীর রাতে নিজের চোখেই কি আমি দেখি নি রাজশাহী কারাগারের জেল-মাতা ইলা মিত্র একটা একটা করে প্রদীপ জ্বালছেন নিকষ কালো রাতে? দেখি নি কি যেখানে যেখানে তাঁর সন্তানরা খুন হয়েছিলেন সেখানে সেখানে গিয়ে বসছেন তিনি? ৫০ সালের খাপড়া ওয়ার্ডে? ৮০ সালের বকুল তলায়? তাঁর কপালে রক্তসূর্যের টিপ, পরনে লালশাড়ি-সাদাপাড়, এলোকেশী, আঁধার-মলিন-করা দপদপে-ঝকঝকে চোখ। মনে আছে, লোহার গরাদে আমি বাঁধা। বেরোতে পারছি না।

বাকি জীবনে ঈদ-পূজা করা একটু মুশকিলই হবে আমার জন্য। জেলে তো তবু আমাদের স্ত্রী-কন্যারা এসেছিলেন! ছোট্ট শিশুদেরকে যতক্ষণ ওঁরা (কারা-কর্তাবৃন্দ) দয়া করে থাকতে দিয়েছেন ততক্ষণই (জেল-গোয়েন্দার কড়া প্রহরায়) ওরা ওদের বাবাদের বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছে। ঠিকই। কিন্তু শেষ অব্দি তো জামাই-আদরেই রাষ্ট্র আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে, তাই না? আমাদের জন্য তো আন্দোলন হয়েছে! আমরা রাজবন্দি! প্রথম শ্রেণীর বন্দি! আমরা যে বিদ্যমান শাসক-শ্রেণীরই অংশ – প্রিভিলেজড ক্লাস! কিন্তু বাকিদের জন্য তো কেউ টুঁ শব্দটাও করবে না। কারণ তাঁরা নিঃস্ব। সুতরাং আমরা মুক্তি পেলাম। গরিব লোকগুলো থেকেই গেলেন কারাগারে। আদালতে যাওয়ার টাকা তাঁদের নাই। টাকার অভাবে জামিন হয় না তাঁদের। তাঁদের সাথে দেখা করতে আসার মতো টাকা পর্যন্ত নাই বেশিরভাগের পরিবারের। তাঁরা তাঁদের স্বামী-সন্তান-স্ত্রী-মা-বাবাকে দেখতে পান না মাসের পর মাস। এমনকি বছরের পর বছর। এমনকি ঈদ-পূজার দিনেও না। অথচ প্রত্যেক বন্দিই রাজবন্দি। কারণ প্রত্যেক বন্দিই গণবিরোধী রাষ্ট্রীয় নীতির শিকার। শাসক-শ্রেণীর বানানো বৈষম্য, বঞ্চণা আর বলপ্রয়োগের খেলার গুটি হয়ে জেলে আসেন তাঁরা। কারাগারের অভিশাপ থেকে সমাজ মুক্ত না হলে মানুষের মুক্তি নাই। আমার মুক্তি নাই। অনেক মানুষ বন্দি আছেন বলেই আপনি-আমি মুক্ত আছি। অসহায় গরিবের বন্দিত্বের বিনিময়ে মুক্ত আছেন সমাজের উপরতলার মানুষেরা। মনুষ্য-আত্মার টুকরা পুঁতে রেখে গেছেন অগণন জীবিত ও পরলোকগত কয়েদি ঐ কারাপ্রাচীরের নীচে। আমি জানি সেখান থেকে অঙ্কুরিত হবে স্বাধীনতা। তারই জন্য এই কারা-সাধা।

অন্তত একটা 'কারাগার-বিলুপ্তি-সচেতনতা আন্দোলন' গড়ে উঠুক বাংলাদেশে। কারাগার নিয়ে আমরা যেন একটুখানিক ভাবি। আমরা যে একটুখানিক সংবেদনশীল হই আত্মার ঐ বন্দিশালার ব্যাপারে। আমরা যেন খেয়াল করি কারাগার আল্লাহর ধর্ম নয়। মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন স্বাধীন, সৃজনশীল ও চিন্তাশীল প্রাণী হিসেবে। চিন্তার অবাধ স্বাধীনতা আছে সকল ধর্মেই। ধর্ম নিজে কিন্তু শাস্ত্র না। শাস্ত্র রাজার। শাস্ত্র চার্চের। শাস্ত্র

শাসকের। ধর্ম গরিবের। ধর্ম মানুষের। ধর্ম আল্লার। শাস্ত্র অন্ধ। ধর্ম দৃষ্টিমান। শাস্ত্র বন্দিত্বের। ধর্ম স্বাধীনতার। শাস্ত্র ইবলিসের। ধর্ম আল্লার। মানুষকে বন্দি রাখা ইবলিশের ইচ্ছা। অসুরের অনাচার। কংস-অসুরের অত্যাচারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত জন্ম নিতে হয়েছে জেলে। জেলখানা থাকলে আপনাকে-আমাকে, কাউকে না কাউকে বন্দি থাকতে হবে। বাইবেলে বলা আছে: যিশু এসেছিলেন যেন তিনি কারাগার থেকে মুক্ত করতে পারেন বন্দিদের। জবরদস্তি করে, বন্দি করে সমাজের মঙ্গল হয় না। অমঙ্গল বাড়ে। মানুষকে বন্দি রাখার চেয়ে বড় পাপ নাই। দুর্গা পূজার *অঞ্জলি*-তে এ অনুবাদের প্রথম পাঠ নিবেদন করেছিলাম অসুরনাশিনী আদ্যাশক্তি কারা-অসুর বিনাশে আমাদেরকে শক্তি জোগাবেন, সেই প্রার্থনায়। আজ *অচেনা দাগ* প্রকাশের সময় এ অনুবাদের বিস্তারিত পরিমার্জিত পাঠ পেশ করছি আপামর মানুষের প্রাথমিক কারা-পরিচয়ের আশায়।

ডিসেম্বর ২০১৪

পিওতর ক্রপোৎকিন

কারাগার কি দরকারি?

টানা হাতে আঁকা ওপরের ছবিতে[১] সংক্ষেপে যেসব প্রভাবের ইঙ্গিত দেওয়া হলো সেগুলোর প্রত্যেকটা কাজ করে আলাদা-আলাদাভাবে; আবার কাজ করে একত্রে মিলেমিশেও। এসব প্রভাবকে বিবেচনায় নিলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হবো যে এসবের কারণে সমাজ-জীবনের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলতে থাকেন বহু বছর ধরে কারাগারে আটক-থাকা মানুষেরা। মনুষ্য-প্রাণী হিসেবে যেমনটা তাঁরা ছিলেন, তার তুলনায় আরো উন্নত একটা প্রাণীতে পরিণত হওয়ার মতো উচ্চতর জীবনবোধ অর্জনের দিকে নিজেকে নিয়ে যেতে পারেন না তাঁদের কেউই আর। নিজেকে নিয়ে যেতে পারেন না তাঁরা জীবন-কর্তব্য পালনের দিকে। যেতে আর পারেন না তাঁরা নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক গুণাবলী বিকশিত করার অভিমুখে। একজনও না।

কারাগার তার কয়েদিদেরকে নৈতিকতা-গুণে গুণান্বিত করে না। কারাগার তাঁদেরকে অপরাধ করা থেকে নিরস্ত করে না। তখন এই প্রশ্ন ওঠে: যাঁরা শুধু লিখিত আইনই লঙ্ঘন করেন না (লিখিত আইন তো দুঃখজনক অতীতের দুঃখজনক পরিণতি মাত্র), বরং লঙ্ঘন করেন নৈতিকতার সেইসব মূলনীতিও, যেসব মূলনীতি

১ অনুবাদকের টীকা: এখানে গ্রন্থটির নবম অধ্যায়ের কথা বলা হচ্ছে। শিরোনাম: 'বন্দিদের ওপর কারাগারের নৈতিক প্রভাব'। এটা বর্তমান এই অধ্যায়টির ঠিক আগের অধ্যায়। যেখানে যেখানে 'অনুবাদকের টীকা' কথাটা শুরুতে মোটা হরফে উল্লেখ করা আছে সেগুলো ছাড়া এই রচনায় ব্যবহৃত বাকি সব টীকাই ক্রপোৎকিনের নিজের।

প্রত্যেক মানুষই নিজের অন্তরের মধ্যে টের পান – তাঁদেরকে নিয়ে আমরা কী করব? এটাই হলো সেই প্রশ্ন যা অধিকার করে আছে আমাদের শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সব মানুষের চিন্তাকে। একটা সময় ছিল, যখন চিকিৎসা-শাস্ত্র গড়ে উঠেছিল প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে আবিষ্কৃত ওষুধপত্রের প্রয়োগকে কেন্দ্র করে। ডাক্তারের হাতে গিয়ে পড়তেন যেসব রোগী, তাঁরা তাঁর ওষুধ খেয়ে মারাও যেতে পারতেন, আবার ওসব ওষুধের প্রয়োগ সত্ত্বেও, বেঁচেও উঠতে পারতেন। ডাক্তারের যুক্তি ছিল এই যে, অন্যসব ডাক্তাররা যা করেন, তিনিও তা-ই করছেন। সমসাময়িক লোকজনকে অতিক্রম করে তিনি আলাদা হতে পারতেন না। কিন্তু সাহসের সাথে বহু বহু প্রশ্নের মোকাবেলাকারী আমাদের এই শতাব্দী (অথচ এর পূর্বসূরীরা এর সম্পর্কে কি মলিন পূর্বাভাসই না করেছিলেন) এই প্রশ্নটিকেও বিবেচনায় নিয়েছে এবং এর দিকে অগ্রসর হয়েছে বিপরীত প্রান্ত থেকে। রোগের স্রেফ নিরাময়ের বদলে চিকিৎসা-শাস্ত্র এখন রোগ-প্রতিরোধের চেষ্টা করছে। আর এর ফলে যে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, আমরা সবাই তা জানি। রোগ সংক্রান্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ধন্যবাদ। সকল ওষুধপত্রের মধ্যে শরীর সংক্রান্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই আসলে সেরা।

এখনও পর্যন্ত যাকে 'অপরাধ' নামে ডাকা হয়ে আসছে (আমাদের সন্তানেরা যাকে 'সামাজিক রোগ' বলে ডাকবে), সেই বিশাল সামাজিক প্রপঞ্চটির ক্ষেত্রেও ঐ একই কাজ করা প্রয়োজন। প্রতিষেধক-ব্যবস্থাই রোগের নিরাময়সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ: এইটাই হলো তরুণতর লেখকদের গোটা একটা ধারার মূলনীতিগত সারকথা। ধারাটি গড়ে উঠেছে সাম্প্রতিক কালে, বিশেষত ইতালিতে। এ ধারার প্রতিনিধিরা হচ্ছেন: পোলেত্তি[২], [এনরিকো] ফেরি[৩], কোলোজানি[৪] এবং অল্প খানিকটা পর্যন্ত লম্ব্রোসো। মনোবিজ্ঞানীদের বিশাল এই ধারার প্রতিনিধিদের মধ্যে আরো আছেন ইউরোপ মহাদেশের মূল ভূখন্ডের [ভিলহেল্ম] গ্রাইসিঙ্গার[৫], ক্র্যাফ্ট্-এবিং[৬],

---

২ Il Dlinquente; Udine, 1875

৩ Nuovi orizzonti del Diritt o e della Procedure penale; Socialismo e Criminalita, এবং আরো অন্যান্য। [এনরিকো ফেরি ছিলেন সিজার লম্ব্রোসোর ছাত্র। জনসংখ্যা-প্রবণতা, ধর্ম, পরিবারের প্রকৃতি প্রভৃতি সামাজিক কারককে তিনি অপরাধ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিবেচনায় নিয়েছিলেন। – অনুবাদক]

৪ L'Alcoolismo, sue consequenza morali e sue cause; Catania, 1887। এটা এমন একটা গবেষণা যে, যেসব লেখক প্রায়শই পরিণামকে কারণ ভেবে ভুল করে বসেন, এই গবেষণাটা পড়ার জন্য তাঁদেরকে আমি উষ্ণভাবে সুপারিশ না করে পারছি না।

৫ Gesammelte Abhandlungen, Berlin, 1882; Pathologie der Psychischen Kran-kheiten। [ভিলহেল্ম্ গ্রাইসিঙ্গার ছিলেন জার্মান মনোচিকিৎসক। – অনুবাদক]

৬ Zweifelhaffe Geistzustande, Erlangen, 1873; Grundzuge der

ডেসপাইন[৭], এবং এ-দেশের মডস্লে[৮]। সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে আছেন কিউটেলেট[৯] এবং তাঁর অল্প কিছু দুর্দশাগ্রস্ত অনুসারী। এর সর্বসাম্প্রতিক প্রতিনিধিরা আছেন ব্যক্তির দিক থেকে দেখলে মনোবিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তাধারাসমূহের মধ্যে, আর সমাজের দিক থেকে দেখলে সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে। যাঁদের আমরা ফাঁসিতে ঝুলিয়েছি, বা শিরোচ্ছেদ করেছি, বা এখন পর্যন্ত জেলখানায় পাঠিয়ে রেখেছি, সেইসব দুর্ভাগা মানুষদের ক্ষেত্রে নতুন একটা অবস্থান নেওয়ার মতো উপাদানসমূহ এঁদের রচনাবলীতে ইতোমধ্যেই আছে।

অপরাধ হিসেবে যাকে আখ্যায়িত করা হয়, তা উৎপন্ন হওয়ার পেছনে কাজ করে বিরাট তিনটি কারণ: সামাজিক কারণ, নৃবিজ্ঞানগত কারণ, এবং ফেরির ভাষায় বললে, মহাজাগতিক কারণ।

এসবের শেষোক্তটির প্রভাব সম্পর্কে নিতান্তই অপর্যাপ্ত পরিমাণে জানা গেছে, কিন্তু তবু তা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। ডাকবাক্সে ফেলা যেসব ঠিকানাহীন চিঠিপত্রের ভেতরে টাকা থাকে তার সংখ্যা যে বছর-বছর একই রকম থাকে, তা আমরা পোস্টমাস্টার জেনারেলের রিপোর্টসমূহ থেকে জানি। আমাদের জীবনের এতটা অনুমান-অযোগ্য একটা উপাদান যদি এমনসব আইনের অধীনস্ত হয় যা গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণকারী আইনসমূহের মতোই কঠোর, তাহলে তো আইন-লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তা আরো বেশি সত্য হওয়ার কথা। ইউরোপের প্রত্যেকটা দেশে আগামী বছর কতগুলো করে খুন হবে, তা আমরা রীতিমতো যথার্থতার সাথেই অনুমান করতে পারি। আর ঝামেলা-উদ্রেককারী যেসব প্রভাব বাড়বে বা কমবে সেগুলোকেও যদি আমরা বিবেচনায় নিতে পারি, তাহলে তো আরো সঠিকভাবে আমরা আগামী বছরের খুনের সংখ্যা অনুমান করতে পারব।[১০]

Criminal-Psychologie, 1872; Lehrbuch der gerichtlichen Psychopatie, Stuttgart, 1875।

৭ Psycizologie Naturelle, Paris, 1868; Congres Penitentiaire de Stockholm en 1878, ২য় খণ্ড।

৮ 'Insanity with Relation to Crime,' London, 1880। [অনুবাদকের টীকা: হেনরি মডস্লে (১৮৩৫-১৯১৮) ছিলেন বৃটেনের মনোচিকিৎসক।]

৯ অনুবাদকের টীকা: ল্যামবার্ট অ্যাডল্ফ জ্যাকুয়েস কিউটেলেট (১৭৯৬-১৮৭৪) ছিলেন বেলজিয়ামের পরিসংখ্যানবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। নরগোষ্ঠীগত শ্রেণীবিচারকে তিনি গাণিতিক বিজ্ঞানে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থ অন ম্যান এ অপরাধ সম্পর্কে বিশেষ বিখ্যাত একটি উদ্ধৃতি হচ্ছে, 'সমাজ ... অপরাধ তৈরি করে; অপরাধীরা তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার মাত্র'।

১০ অনুবাদকের টীকা: সঠিকভাবে ও সযত্নে, তথা সিস্টেমেটিকভাবে, অনেক দিনের

কিছু দিন আগে *নেচার* পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। এর বিষয় ছিল ভারতে সহিংস আক্রমণ আর আত্মহত্যার সংখ্যার সাথে বাতাসের তাপমাত্রা আর আর্দ্রতার সম্পর্ক-বিচার।

সবাই এটা জানেন, যখন তাপমাত্রা থাকে সহনীয় আর আমাদের ক্ষেত-খামারের ওপর দিয়ে শুষ্ক বাতাস বয়ে যায়, সে সময়ের তুলনায় অতিরিক্ত গরম আর আর্দ্র তাপমাত্রা মানুষকে বেশি বেশি করে স্নায়বিকভাবে দুর্বল করে ফেলে। ভারতে তাপমাত্রা কখনও কখনও মাত্রাতিরিক্ত গরম হয়ে ওঠে আর একই সাথে

তথ্য সংগ্রহ করা গেলে এবং নানারকম সামাজিক ফ্যাক্টর বা কারকসমূহকে ঠিকঠাকমতো বিবেচনায় নিয়ে গাণিতিক বিশ্লেষণ পারলে পরিসংখ্যান শাস্ত্রের গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে সামাজিক ঘটনাবলীর নানান প্রবণতা/সম্ভাব্যতা প্রায় সঠিকভাবে আন্দাজ করা খুবই সম্ভব। কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ডাকবাক্সে ফেলা ঠিকানাহীন চিঠিপত্রের ভেতরকার টাকার বাৎসরিক পরিমাণ অনুমান করা কিংবা ইউরোপের প্রত্যেকটা দেশে আগামী বছর কতগুলো করে খুন হবে তা আন্দাজ করার সাথে 'গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক আইনসমূহের' কঠোরতার তুলনা করা মোটেও যথার্থ হয় না।

ক্রপোৎকিনের মতো সামাজিক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানীর পক্ষে এরকম অযথার্থ অনুমানের কারণ কী হতে পারে? তৎকালে কেবল চোখ ফুটতে শুরু করা 'সামাজিক বিজ্ঞান'কে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো অকাট্য 'বিজ্ঞান' হিসেবে বিবেচনা করার 'বৈজ্ঞানিক' ঝোঁকটা আসলে বিজ্ঞানের প্রতি মুগ্ধতার সেই যুগে চিন্তার সাধারণ একটা বৈশিষ্ট্যই ছিল। কিন্তু এই ঝোঁক মার্কসবাদীদের মধ্যে যে সুতীব্র মতান্ধতা/ডগমাটিজমের জন্ম দিয়েছিল, নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে তা কখনই দেখা যায় নি। নিজেদের আর্থ-সামাজিক-ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতোই সর্বকালে-সর্বদেশে প্রযোজ্য 'বৈজ্ঞানিক সূত্র' বলে কখনোই তাঁরা মনে করেন নি, বরং সমাজের-ইতিহাসের-অর্থনীতির অমোঘ কোনো বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক গ্র্যান্ড থিওরির আগাগোড়া বিরোধিতা করেছেন। খেয়াল করলে দেখা যাবে: ক্রপোৎকিনের আসল ঝোঁকটা এখানে মোটেই কিন্তু সমাজবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো 'বিজ্ঞান' প্রতিপন্ন করা নয়, বরং 'আমাদের জীবনের ... অনুমান-অযোগ্য ... উপাদান'সমূহকে যে 'আরো বেশি সত্য' উপায়ে, 'আরো সঠিকভাবে' এবং 'রীতিমতো যথার্থতার সাথেই অনুমান' করা বা বোঝা সম্ভব সেই দিকটার ওপরই এখানে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এ কথা তবু মানতেই হবে যে বিজ্ঞানকে একটা এককাট্টা জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করার, এবং বিজ্ঞানকে সবকিছুর ঊর্ধে প্রশ্নাতীত স্থান দেওয়ার ঝোঁক সে যুগে এতই প্রবল ছিল যে নৈরাজ্যবাদীরাও তার প্রভাব এড়াতে পারেন নি। যে নৈরাজ্যবাদীরা ঈশ্বর, চার্চ, রাজা, রাষ্ট্র ইত্যাদি সকল কিছুর হাত থেকে স্বাধীনতার চেয়েছেন, বাস্তবে তার চর্চাও করেছেন, সেই নৈরাজ্যবাদীরা পর্যন্ত বিজ্ঞানের তথাকথিত শ্রেয়ত্বকে বিনাপ্রশ্নে মেনে নিয়েছেন। ক্রপোৎকিনের 'মডার্ন সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানার্কিজম' রচনাটির দোহাই দিয়ে এ ব্যাপারে দুর্দান্তভাবে আমাদের মনোযোগ চেয়েছিলেন বিজ্ঞানের

বাতাস হয়ে ওঠে মাত্রাতিরিক্ত আর্দ্র। সে দেশে তাই আবহাওয়ার এই প্রাণশক্তি-নিঃশেষকারী প্রভাব স্পষ্টতই আমাদের অঞ্চলসমূহের তুলনায় ঢের বেশি শক্তভাবে টের পাওয়া যায়। সেখানে জনাব এস. এ. হিল বেশ কয় বছরের তথ্য হিসেবনিকেশ করে একটা ফর্মুলা বের করেছেন, যা দিয়ে আপনি কোনো একটা মাসে সরকারীভাবে তালিকাভূক্ত-করা আত্মহত্যা ও সহিংসতাজনিত জখমের সংখ্যা তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো যথার্থতার সাথে বলে দিতে পারবেন, যদি আপনার প্রত্যেক মাসের গড় তাপমাত্রা আর আর্দ্রতা জানা থাকে।[১১] শারীরিক কারণসমূহের ওপর

নৈরাজ্যপ্রবণ দার্শনিক পল ফায়ারাব্যান্ড। বিস্ময়ের সাথে খেয়াল করেছিলেন: 'পেশাদার নৈরাজ্যবাদীরা সব ধরনের বিধিনেষেধর বিরোধিতা করে থাকেন, এবং তাঁরা দাবি করেন যে ব্যক্তিকে বিকশিত হতে দিতে হবে স্বাধীনভাবে; কোনো আইন, দায়িত্বকর্তব্য বা বাধ্যবাধকতা দিয়ে বিঘ্ন ঘটানো যাবে না সে বিকাশে। তারপরও বিনাপ্রতিবাদে তাঁরা গিলতে থাকেন কঠোর কঠোর সব মানদণ্ড – বিজ্ঞানী ও যুক্তিবিদরা যা আরোপ করেন গবেষণার ওপর এবং সর্বপ্রকার জ্ঞান-সৃজনী জ্ঞান-পরিবর্তনী কর্মকাণ্ডের ওপর। এমনকি কখনো কখনো খোদ নৈরাজ্যবাদের ভেতরেই আত্মস্থ করা হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আইনসমূহকে ...।' ফ্যায়ারাব্যান্ডের উল্লেখ করা ঐ রচনায় ক্রপোৎকিন যেমন বলছেন, 'নৈরাজ্যবাদের অনুন্ধান-পদ্ধতি হচ্ছে একেবারে খাঁটি প্রকৃতিবিজ্ঞানের পদ্ধতি .. আরোহন আর অবরোহনের পদ্ধতি'। (পল ফ্যায়ারাব্যান্ড, *এগেইন্স্ট মেথড*, ভূমিকা, আট নম্বর পাদটীকা, পৃষ্ঠা ১২-১৩।) প্রসঙ্গত, বলা মোটেও বাহুল্য নয়: ফ্যায়ারাব্যান্ড তাঁর এ বইটাতে অকাট্যভাবে দেখিয়েছেন যে বিজ্ঞানের আগে-থাকতে-নির্ধারিত কোনো একক বা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতত্ত্ব নেই। জ্ঞানের আর-সব শাখার মতোই বিজ্ঞান আরেকটা শাখা মাত্র। সুতরাং অন্য সব কিছুর মাতব্বরির মতো বিজ্ঞানের মাতব্বরির হাত থেকে সমাজকে বাঁচানোর কর্তব্য জরুরি। কেননা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নামে বিজ্ঞান নিজেও হয়ে উঠেছে শাস্ত্র, মতাদর্শ।

১১ S. A. Hill, 'The Effects of the Weather upon the Death Rate and Crime in India,' *Nature*, ২৯তম খণ্ড, ১৮৮৪, পৃ. ৩৩৮। এই সূত্র মোতাবেক, কোনো মাসের গড় মাসিক তাপমাত্রা ৪৮ ডিগ্রি ফারেনহাইটের ওপরে যতটা বাড়ে, সেই বাড়তি সংখ্যাটিকে ... [অস্পষ্ট] দিয়ে গুণ করে গুণফলটির সাথে যোগ করতে হবে সেই মাসের গড় আর্দ্রতাকে ২ দিয়ে গুণ করলে যা হয় সেই গুণফলটিকে। এই উভয় গুণফলের যোগফলটি হবে প্রতি মাসে সংঘটিত আত্মহত্যা এবং সহিংস কাজের সংখ্যার সমান। লেখক আরো বলছেন: 'সুতরাং এ-কথা বলা যেতে পারে যে, ভারতে গা-চিটপিটানো গরমের প্রবণতার সাথে সহিংসতাজনিত অপরাধের সংঘটন-সংখ্যা আনুপাতিক। চিটপিটানো গরম বলতে ত্বকে সেই তীব্র যন্ত্রণার অবস্থার কথা বলা হচ্ছে, উচ্চ তাপমাত্রার সাথে আর্দ্রতা মিলেমিশে যা তৈরী হয়। এই যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং নিজের মন-মেজাজের ওপর এর প্রভাব টের পেয়েছেন, এমন লোকই শুধু প্রকৃতপক্ষে বুঝতে পারবেন, কীভাবে এরকম একটা অবস্থা নরহত্যা বা অন্যান্য অপরাধের দিকে

নির্ভরশীল প্রপঞ্চ হিসেবে মনঃস্তত্ত্বকে যাঁরা বিচার করতে অভ্যস্ত নন, তাঁদের কাছে এ-ধরনের হিসেব-গণনা করাটা খুব আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তব তথ্য এই নির্ভরতাটিকে এত পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয় যে, সন্দেহের কোনো জায়গা থাকে না। নিজেদের স্নায়ুতন্ত্রে যাঁরা ঊষ্ণমণ্ডলীয় তাপের সাথে উষ্ণমণ্ডলীয় আর্দ্রতার অভিঘাত অনুভব করেছেন, তাঁরা অবাক হবেন না যে, ঠিক এরকম দিনেই ঝগড়া মেটানোর জন্য ছুরি তুলে নেওয়ার প্রবণতা হিন্দুদেরকে[১২] পেয়ে বসে, অথবা জীবন নিয়ে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়া মানুষজন আত্মহত্যার মাধ্যমে জীবনের ইতি টানার ঝোঁকসম্পন্ন হয়ে ওঠেন।[১৩]

আমাদের কাজকর্মের ওপর মহাজাগতিক কারণসমূহের প্রভাব এখনও পুরোপুরি বিশ্লেষণ করে দেখা হয়নি, কিন্তু বেশ কিছু ঘটনা রীতিমতো সুপ্রতিষ্ঠিত। যেমন ধরুন এ-কথা সবার জানাই যে, জীবনের ওপর হামলা (সহিংসতা, খুনখারাবি ইত্যাদি) গরমকালে অনেক বেড়ে যায়, আর সম্পত্তির ওপর হামলা সবচাইতে বেশি ঘটে শীতকালে। অধ্যাপক ই. ফেরির[১৪] গ্রন্থে আঁকা পরিসংখ্যান-রেখাচিত্র ধরে ধরে আমরা এখানে এগুতে পারছি না। ঐ গ্রন্থের একই পাতায় আঁকা তাপমাত্রার রেখাচিত্রও এখানে আমরা দেখাতে পারছি না। জীবনের ওপর হামলার সংখ্যা দেখানোর রেখাগুলোও দেখাতে পারছি না। এগুলোর মিল দেখে গভীরভাবে মুগ্ধ না হয়েও আপনি সহজেই এমন ভুল করে বসতে পারেন যে, একটা রেখাকে আরেকটা

ঠেলে দিতে পারে।' শীতের আবহাওয়ায় দেখা যায় বিপরীত প্রভাব।

১২ অনুবাদকের টীকা: এখানে বোঝা যাচ্ছে, ভারত ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে ক্রপোৎকিনের জানাবোঝা-পড়াশোনার ঘাটতি ছিল। তা না হলে ভারতীয় মাত্রকেই তিনি 'হিন্দু' মনে করতেন না। আবার, ভারতের তাপমাত্রা যে সর্বত্র একইরকম না, সেটাও মনে হয় তাঁর অজানা ছিল। কাশ্মীর বা দার্জিলিঙের ঠাণ্ডা আর গুজরাটের গরম আকাশ-পাতাল আলাদা। ক্রপোৎকিনের হিল সাহেব কোন এলাকা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন কে জানে। যাই হোক, নিজেকে ভারত-বিশেষজ্ঞ বলে জাহির করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা ক্রপোৎকিন এখানে বা অন্য কোথাও করেন নি। আর তাঁর এসব অতিসরলীকৃত ধারণার পেছনে হিল সাহেবের আলোচ্য প্রবন্ধই বা আদৌ কতটুকু দায়ী, তা-ও তো আমরা জানতে পারছি না।

১৩ এই রচনাটিও দেখুন: Mayr, Gesetzmassigkeit in Gesellschaftsleben। আর E. Ferri-র আলোচনা দেখুন এ-সবের মধ্যে: Archivio di Psychiatria, fasc. 2nd; La Teoria dell' imputabilata e la Negazione del libero arbitrio, Bologna, 1881। আরো অন্যান্য রচনাও দেখা যেতে পারে।

১৪ Das Ferbrechen in seiner Abhangigkeit von Temperatur, Berlin, 1882। এবং Bibl. d'Antilropologie Crimiselle, Lyons, 1886-এর মধ্যে এই রচনাটি দেখুন: Colajanni's Oscillations thermometriques, et de'lits contre les personnes।

রেখা বলে ভ্রম হতে পারে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, যে একান্ত আগ্রহ সহকারে সম্পাদিত হওয়া দরকার, সেরকম আগ্রহ সহকারে এই ধরনের গবেষণাসমূহ এখনও তেমন সম্পাদন করা হয় নি। ফলে মানুষের কাজকর্মের ওপর প্রভাবের ক্ষেত্রে মহাজাগতিক কারণসমূহের অল্প কয়েকটিকেই বিশ্লেষণ করা গেছে।

এ-কথাও স্বীকার করতেই হবে যে, এ-ধরনের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা আছে। কারণ, বেশিরভাগ মহাজাগতিক কারণ শুধুমাত্র পরোক্ষ উপায়েই তাদের প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এভাবে, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ধান-গম-রাই প্রভৃতি মদ্য-উৎপাদনক্ষম শস্যদানার উৎপাদনের সাথে তাল মিলিয়ে আইন-লঙ্ঘনের ঘটনাসমূহের সংখ্যার ওঠানামা করাটা যখন আমরা খেয়াল করি, তখন মনে হয় মহাজাগতিক কারক বা এজেন্টসমূহ সামাজিক চরিত্রসম্পন্ন ধারাক্রমিক প্রভাবসমূহের একটা মাধ্যম হিসেবেই শুধুমাত্র হাজির থাকে। তথাপি, কেউই অস্বীকার করবেন না যে, ঝড়ো বা বিষণ্ন আবহাওয়ার কালে নষ্ট হয়ে যাওয়া ফসল যখন অধিক মাত্রায় সাধারণ অসন্তোষ ছড়ায়, সেই রকম সময়ের তুলনায় আবহাওয়া যখন চমৎকার থাকে, ফসল যখন ভালো ফলে এবং গ্রামবাসীরা যখন আনন্দে থাকেন, তখন নিজেদের সামান্য ঝগড়াঝাঁটি মীমাংসা করার জন্য মারামারির দিকে খুব কমই তাঁরা ঝোঁকেন। আমার মনে হয় নিজেদের ঘরের শান্তির ওপর আবহাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে নারীরা আমাদেরকে ভালো বলতে পারবেন। নিজেদের স্বামীদের খোশমেজাজ ও বদমেজাজ কাছে থেকে দেখার লাগাতার সুযোগ তাঁদের ঘটে।[১৫]

তথাকথিত যে 'নৃবিজ্ঞানগত কারণসমূহ'র প্রতি সাম্প্রতিক কালে অনেক মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো আগের কারণটির চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক সময়ে প্রচুর সংখ্যক অত্যন্ত আগ্রহোদ্দীপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে মানুষের অপরাধ-প্রবণতার ওপরে বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত গুণাবলী এবং শারীরিক গঠনের প্রভাবের বিষয়টি উদাহরণসহযোগে দেখানো হয়েছে। এসবের সাহায্যে এ-ধারার ঐ সমস্ত কারণ সম্পর্কে আমরা প্রায়-সম্পূর্ণ একটা ধারণা গঠন করে ফেলতে পারি, যে

---

১৫ অনুবাদকের টীকা: বিপরীত থেকে দেখলে, একই সুযোগ পুরুষেরও ঘটে। নারীদের মেজাজের ওপর আবহাওয়ার প্রভাব পড়ে না? নারীরা মারামারি করেন না? তাঁদের অপরাধ-প্রবণতা নাই? সেই অপরাধ-প্রবণতার ওপর মহাজাগতিক কারণসমূহের প্রভাব পড়ে না? মহাজাগতিক প্রভাবের বিষয়টি যদি মানুষের ক্ষেত্রে সত্য হয়, তবে তা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সত্য হওয়ার কথা। ফসল যদি নষ্ট হয় এবং তার ফলে ঘরে যদি অভাব লেগে থাকে তাহলে তো নারীদেরও মাথা-গরম, খিটিমিটি হতে পারে। নারীরা কোমল ও শান্ত, আর পুরুষরা কঠোর ও রাগী – ক্রপোৎকিনের চিন্তায় এরকম একটা পুরুষতান্ত্রিক সরলীকরণের ঝোঁক এখানে স্পষ্ট। তবে, বিজ্ঞান-মুগ্ধতার মতো, এটাও সম্ভবত যুগ-বৈশিষ্ট্যই, তথাপি তা অগ্রহণযোগ্য ও সমালোচনাযোগ্য।

সমস্ত কারণ নারী-পুরুষদেরকে আমাদের বিচার-প্রশাসনের আওতায় এনে ফেলে। কিন্তু এই চিন্তাধারার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদের একজন ড. লম্ব্রোসোর[১৬] সিদ্ধান্তসমূহকে[১৭] অবশ্যই আমরা পূর্ণ অনুমোদন দিতে পারি না, বি করে তাঁর রচনাসমূহের অন্তত একটিতে তিনি যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন[১৮]। যখন তিনি দেখান, আমাদের কারাগারের মধ্যকার বিপুল সংখ্যক কয়েদির মস্তিষ্কের গঠনে কিছু ত্রুটি আছে, তখন তাঁর এই কথাটাকে স্রেফ একটা তথ্য হিসেবে আমাদের মেনে নিতেই হবে। আমরা তাঁর এমনকি এ-কথাটাও কবুল করে নিতে পারি যে বেশিরভাগ দণ্ডিত আসামী এবং কারাবন্দিদের বাহু স্বাধীন লোকজনের চেয়ে লম্বা। আবার, যখন তিনি আমাদের জানান, সবচেয়ে নৃশংস খুনগুলো যাঁরা করেছেন তাঁদের দৈহিক কাঠামোয় মারাত্মক ত্রুটি ছিল, তখন এই কথার সামনে আমাদের স্রেফ নুয়েই পড়তে হয় এবং এর যথার্থতাও স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এগুলো সব বিবরণ মাত্র, তার বেশি কিছু নয়।

অথচ এসব থেকে এবং এ ধরনের অন্যান্য তথ্য থেকে জনাব লম্ব্রোসো যখন একটু অতিরিক্ত অনুসিদ্ধান্তই টেনে ফেলেন, তখন আমরা তাঁর সাথে একমত হতে পারি না। লম্ব্রোসো মনে করেন, যাঁদের দৈহিক গঠনে ত্রুটি আছে সে-সব মানুষজনের বিরুদ্ধে যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সমাজের আছে। যেসব লোকজনের মগজের কাঠামো ত্রুটিপূর্ণ, তাঁদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার অধিকার সমাজের আছে বলে আমরা ভাবতে পারি না। আর যাঁদের বাহু একটু লম্বা তাঁদেরকে কারাবন্দি করার অধিকার তো সমাজের আরো-ই নাই। আমরা স্বীকার করছি, যেসব নিষ্ঠুর কাজ বিভিন্ন সময়ে জনগণের ঘৃণায় নাড়া দিয়েছে, সেসব কর্মসম্পাদনকারীরা দুর্ভাগ্যজনক আহাম্মকের চেয়ে খুব একটা আলাদা কিছু না। যেমন ধরুন, ফ্রে-এর মাথাটা (যাঁর একটা ছাপচিত্র সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় বেশ দেখা গেল) এরকম আহাম্মকের মাথার একটা দৃষ্টান্ত বটে। কিন্তু সব আহাম্মকই আততায়ী হয় না মানসিকভাবে অবিকশিত নারী-পুরুষদের সবাই তো হয়-ই না। সুতরাং অবস্থা এমন

১৬ অনুবাদকের টীকা: সিজার লম্ব্রোসো (১৮৩৫-১৯০৯) ছিলেন মনোচিকিৎসার প্রফেসর এবং ইতালীয় অপরাধবিদ্যা-বিশারদ। অপরাধবিদ্যার ইতালীয় ধারার তিনি ছিলেন আদি গুরু। তাঁর ধারণা ছিল কতিপয় শারিরীক বৈশিষ্ট্য দিয়ে (যেমন নিচের চোয়াল লম্বা হওয়া, দীর্ঘতর বাহু ইত্যাদি) অপরাধপ্রবণ মানুষকে শনাক্ত করা সম্ভব। অপরাধবিদ্যায় তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি পরে প্রত্যাখ্যাত হয়। তবে, তাঁর গবেষণা-কাজ আসামীদের সাথে অধিকতর মানবিকতাপূর্ণ আচরণে উৎসাহ জুগিয়েছিল। তাঁর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বই The Criminal Man (১৮৭৬)।

১৭ L' Uomo delinquente, তৃতীয় সংস্করণ, Torino, 1884।

১৮ Sull' Incremento del Delitto, Roma, 1879।

যে, সবচে কর্মঠ অপরাধ-বিশেষজ্ঞটি সকল আহাম্মককে গণহারে মেরে ফেলার আগে আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়তেন, যদি তিনি একবার মাত্র চিন্তা করে দেখতেন, ঐ আহাম্মকদেরই মধ্যে কত মানুষ আছেন যাঁরা দিব্যি স্বাধীন জীবনযাপন করছেন; কেউ কেউ আছেন বটে যাঁদেরকে দেখেশুনে রাখতে হয়, আবার তাঁদেরই মধ্যে কত কত মানুষ আছেন যাঁরা নিজেরাই অন্যদের দেখেশুনে রাখেন। যাঁদেরকে ফাঁসির জল্লাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাঁদের সাথে এই শেষোক্তদের পার্থক্য বলতে মাত্র এইটুকুই যে, তাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বেড়ে উঠেছেন আলাদা আলাদা পরিবেশে। যে বৈশিষ্ট্যগুলোকে ড. লম্ব্রোসো 'অপরাধজনক পাগলামি'র বৈশিষ্ট্য মনে করেন, সেগুলো আমরা কোথায় না দেখতে পাব? সম্ভ্রান্ত বাসাবাড়িতে, রাজপ্রাসাদে তো বটেই, আর পাগল-আশ্রমের কথা বলাই বাহুল্য। অপরাধ-প্রবণতা বিকাশের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের রোগব্যাধি সহায়ক হতে পারে, কিন্তু যদি উপযুক্ত রকম যত্ন-আত্তি করা যায়, তাহলে সেরকমটা না ও ঘটতে পারে। চার্লস্ ডিকেন্সের সুবিবেচনা, এবং তার চেয়ে বড় কথা হলো তাঁর সহৃদয়তা, এই সরল সত্যটিকে একেবারে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছে।

অবশ্যই আমরা ড. লম্ব্রোসোকে তাঁর সব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই সমর্থন করতে পারি না, আর তাঁর অনুসারীদের বেলায় তো আরোই পারি না। কিন্তু আলোচ্য প্রশ্নটির চিকিৎসাশাস্ত্রীয় দিকগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য এবং তাঁর গবেষণাগুলোকে এই দিক দিয়ে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এই ইতালীয় লেখকের কাছে আমাদেরকে কৃতজ্ঞ থাকতেই হবে। কেননা তাঁর বিবিধ প্রকার এবং সবচাইতে আগ্রহোদ্দীপক গবেষণাসমূহ থেকে যে একটি মাত্র সিদ্ধান্ত সংস্কারমুক্ত কোনো মনের পক্ষে টানা সম্ভব তা হলো, আমরা যাঁদেরকে অপরাধী বলি তাঁরা আদতে দৈহিক দিক থেকে রোগগ্রস্ত মানুষ এবং কারাবন্দি করার মাধ্যমে তাঁদের অসুস্থতাকে আরো খারাপের দিকে ঠেলে দেওয়ার বদলে তাঁদের দরকার আসলে চিকিৎসা।

অপ্রকৃতিস্থতার সাথে অপরাধের সম্পর্ক নিয়ে জনাব মডস্লের গবেষণাসমূহ এ-দেশে [বৃটেনে] সুপরিচিত[১৯]। কিন্তু তাঁর রচনাবলী যাঁরা ভালোভাবে পড়েছেন তাঁরা এ-অবস্থা জেনে চমকে না উঠে পাঠ শেষ করতে পারবেন না যে, আমাদের জেলখানাগুলোর যেসব কয়েদি অন্যের জীবনের ওপর হামলার দায়ে কারাবন্দি আছেন, তাঁদের বেশিরভাগই আসলে কোনো না কোনো মনের অসুখে আক্রান্ত; এবং 'আমাদের আইন নিজে যেসব আদর্শ পাগলকে সৃজন করে' আর একমাত্র এরকম আদর্শ পাগলকেই তাঁর কৃতকর্মের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিতে রাজি থাকে, সেরকম

১৯ Responsihility in Mental Disease, London, 1872; 'Body and Will,' London, 1883।

‘আদর্শ পাগল’ পাওয়াটা ‘আদর্শ অপরাধী’ পাওয়ার মতোই বিরল, যে ‘আদর্শ অপরাধী’কে শাস্তি দেওয়ার জন্য রীতিমতো জিদ করতে থাকে ঐ একই আইন। ‘অপরাধ এবং অপ্রকৃতিস্থতার মধ্যে’, জনাব মডস্লে যেমনটা বলছেন, ‘তেমন একটি সুবিস্তৃত সীমান্ত-স্থল’ নিঃসন্দেহেই আছে, ‘যার একটি প্রান্তের কাছাকাছি জায়গায় আমাদের সঙ্গে এমন একটা কিছুর সাক্ষাৎ হয়, যেটা যতখানি না পাগলামি তার চেয়ে বেশি আসলে পাপ’ (বা, বরং বলা ভালো, অন্যের ক্ষতি করার সচেতন বাসনা); ‘আর অপর প্রান্তটির কাছাকাছি কোথাও আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এমন একটা কিছুর, যেটা যতখানি না পাপ তার চেয়ে বেশি আসলে পাগলামি’। কিন্তু ‘এই সীমান্ত-স্থলে যে সব পোড়াকপালে-লোক বসবাস করেন, তাঁদের নৈতিক দায়-দায়িত্বের ন্যায়সম্মত কোনো পরিমাপ প্রণয়ন করা’ কোনোদিনই সম্ভব হবে না, যতদিন আমরা ‘পাপ’ অথবা ‘কু-আকাঙ্ক্ষা’ সংক্রান্ত গাদা-গাদা ধারণা থেকে মুক্ত হতে না পারব[২০]।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের বিচার-প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও পর্যন্ত প্রতিশোধ-গ্রহণ, ‘কু-আকাঙ্ক্ষা’ ও ‘পাপ’-এর শাস্তিপ্রদান প্রভৃতি সেকেলে ধ্যানধারণা এবং ‘ভয়ভীতি দেখিয়ে মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত রাখা’র আধুনিক ধ্যানধারণার মধ্যেকার একটা আপোস ছাড়া আর কিছুই না। পরার্থপরতা/জনকল্যাণ জাতীয় আবছা বুঝ দিয়ে এই দুই প্রকার ধ্যানধারণাকে অতি সামান্য পরিমাণে নরম করে

---

২০ Maudsley, Responsibility in Mental Disease। এর ২৭ নম্বর পৃষ্ঠায় জনাব মডস্লে বলছেন: ‘একইভাবে, যদিও একজন অপরাধীর প্রতি দয়া-করুণা-সহানুভূতি দেখানো যেতে পারে, কিন্তু তারপরও, আরো-সব অপকর্ম করার ক্ষমতা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা থেকেই যায়। আর সেরকম প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার অধিকার সমাজের স্পষ্টতই আছে। অর্থাৎ, যদিও তাঁকে সদয়ভাবে যত্ন নেওয়া যেতেই পারে, তথাপি তাঁর এবং অন্যদের প্রতি সবচেয়ে খাঁটি দয়া দেখানোর পথ হচ্ছে তাঁদের ওপর সবলে এমন ধরনের শৃঙ্খলা আরোপ করা যা তাঁদেরকে (যদি সম্ভব হয়) মানসিকভাবে স্বাস্থ্যকর একটা অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য সবচেয়ে মানানসই, এমনকি যদি তা কঠোর পরিশ্রমও হয় (যে শ্রম তাঁদের শক্তির আওতাকে ছাড়িয়ে যায় না)।

‘সশ্রম শৃঙ্খলা আরোপ করার ক্ষেত্রে সমাজের এরকম অধিকার নিয়ে সন্দেহ তো করাই চলে, কেননা জনাব মডস্লে নিজেই স্বীকার করেছেন যে, সমাজই তার নিজের ‘অপরাধী উৎপাদন করে’। কিন্তু কঠোর শ্রম আরোপ করার ক্ষেত্রে সমাজের অধিকার সম্পর্কে শেখার পাশাপাশি আমরা বিস্মিতও হলাম: এত খোলা মনের একজন মানুষও কবুল করে ফেলছেন (যদিও তা মুহূর্তের জন্যই মাত্র) যে, কোনো একটা মানুষকে মানসিকভাবে স্বাস্থ্যকর অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য সশ্রম কারাদণ্ড সর্বোত্তম উপায় হতে পারে।’

তোলা হয় মাত্র। কিন্তু আমাদের আশা, সেই সময় খুব দূরে নয় যখন গ্রাইসিঙ্গার, ক্র্যাফ্ট্-এবিং, দেস্পাইন এবং কোলাজানি ও ফেরির মতো আধুনিক অপরাধ-বিশারদগণকে অনুপ্রেরণাদানকারী ধ্যানধারণা সাধারণ মানুষের সম্পদে পরিণত হবে। আমরা যাঁদেরকে অপরাধী বলি, তাঁদেরকে জল্লাদ আর জেলারের কাছে পাঠানোর নিয়মটা এত দীর্ঘকাল যাবত চালু রাখার জন্য তখন সেসব ধারণা আমাদেরকে লজ্জাই দেবে। এখনই যাঁদের নাম নেওয়া হলো, সেই লেখকদের কঠোর ও ব্যাপক পরিশ্রমের কথা যদি আরো সুবিস্তৃতভাবে সবার জানা থাকত, তাহলে আমাদের সকলেরই বেশ সহজে বোঝা সম্ভব হতো, যাঁদেরকে আমরা এখন জেলে রেখেছি বা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি, তাঁরা স্রেফ এমন ধরনের মানুষ, যাঁদের দরকার সবচাইতে সযত্ন ভাতৃপ্রতিম চিকিৎসা। নিঃসন্দেহে আমি এ-কথা বলতে চাইছি না যে, আমাদের কারাগারগুলো তুলে দিয়ে পাগলা-গারদ বসানো দরকার। এরকম ঘৃণ্য ধ্যানধারণাকে স্বাগত জানানো থেকে আমি বহুৎ তফাতে। পাগলা-গারদসমূহ কারাগার ছাড়া আর কিছুই না। আর আমরা যাঁদেরকে কারাগারে রেখেছি, তাঁরা পাগল নন। তাঁরা এমন মানুষও নন, যাঁরা সেই দুঃখজনক সীমান্ত-স্থলের সীমানার দিকে এগুচ্ছেন, যেখানে পৌঁছালে মানুষেরা তাঁর নিজের কাজকর্মের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। শিক্ষক ও ডাক্তারদের অধীনে কারাগারগুলো দিয়ে দেওয়া হোক, যেন তাঁরাই সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন – কখনোসখনো-হাজির-করা এমনসব ধ্যানধারণা থেকেও আমি অনেক দূরে অবস্থান করি। এখন যাঁদেরকে জেলখানায় পাঠানো হয়ে থাকে, যে জিনিসটা তাঁদের দরকার, সেটা হচ্ছে স্রেফ ভাতৃপ্রতিম সহায়তা। সহায়তাটা দরকার তাঁদের কাছ থেকেই, যাঁরা তাঁর চারপাশ ঘিরে থাকেন। মানব-প্রকৃতির উন্নততর সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিকশিত করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁদেরকে সাহায্য করার জন্যেই ঐ সহায়তাটা তাঁদের দরকার। মানব-প্রকৃতির ঐসব বৈশিষ্ট্য তাদের বিকাশের পথে আটকে আছে হয় কোনো শারীরিক অসুখ – যেমন মস্তিষ্কের লোহিত কণিকার ঘাটতি বা হৃদপিণ্ড-যকৃত-পাকস্থলীর রোগ – ইত্যাদির কারণে, না হয় তো যাকে আমরা সভ্যতার কেন্দ্র বলি, সেইসব অঞ্চলে যে অরুচিকর পরিবেশ-পরিস্থিতিতে হাজার হাজার শিশু বেড়ে ওঠে এবং লাখ লাখ পূর্ণবয়স্ক মানুষ বসবাস করেন, সেই পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে। কিন্তু মানুষকে যখন তাঁর স্বাধীনতা থেকে, তাঁর নিজের কাজকর্মের স্বাধীন পরিচালন থেকে, এবং মানব-বিশ্বের বহু-বিচিত্র প্রভাবসমূহ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তখন এই উচ্চতর গুণাবলীর চর্চা করা যায় না। চলুন, আমরা অলিখিত নৈতিক আইনের প্রত্যেকটা লঙ্ঘনকে সযত্নে বিশ্লেষণ করে দেখি, তাহলে সবসময় আমরা সেরকমই দেখতে পাব, যেমনটা সেই চমৎকার বৃদ্ধ গ্রাইসিঙ্গার বলেছিলেন: মানুষেরা

যা অর্জন করেন, হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোনোকিছুর ফলে তা অর্জিত হয় না, বরং তা অর্জিত হয় বহু বছর ধরে তাঁর ভেতরে গভীর আলোড়ন-তোলা কত শত অভিঘাতের পরিণামে[২১]। উদাহরণ হিসেবে একটি লোকের কথা ধরুন, যিনি সহিংস কোনো কাজ ঘটিয়েছেন। আমাদের সময়ের অন্ধ বিচারকটি এগিয়ে আসেন এবং তাঁকে পাঠিয়ে দেন কারাগারে। কিন্তু যে মানুষটি রোমান আইনশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে বহুকাল ধরে অর্জিত এক প্রকার বাতিকের কাছে পরাস্ত হন নি, যিনি স্রেফ শাস্তি দেওয়ার বদলে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখার ক্ষমতা রাখেন, গ্রাইসিঙ্গারের মতো তিনিও বলবেন: যদিও এ-ক্ষেত্রে লোকটি তাঁর আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন নি এবং সেগুলোকে বরং এমন সুযোগ দিয়েছেন যেন তারা সহিংস-কর্ম ঘটানোর মাধ্যমে নিজেরাই নিজেদের সাথে বেঈমানি করতে পারে, তথাপি এই সহিংস-কর্মটি আসলে প্রস্তুত হয়ে উঠেছে অনেক দিন আগে থেকেই। এইবারের ঘটনাটির আগে, সম্ভবত তাঁর সারাজীবন ধরে, এই লোকটিকে নিয়মিতই প্রায় তাঁর আবেগ-অনুভূতির বাকবিতন্ডাপূর্ণ অভিব্যক্তির মাধ্যমে নিজের মনের ঝামেলা-গুলোর প্রকাশ ঘটাতে দেখা গেছে: সামান্য অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে চিৎকার করে কাঁদার মাধ্যমে, আশেপাশের মানুষজনের ওপর সহজেই বদমেজাজ দেখানোর মাধ্যমে, এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে, শিশুকাল থেকেই তিনি এমন কাউকে পান নি, যিনি তাঁকে তাঁর স্নায়বিক উত্তেজনাময় প্রকাশ-রীতির ক্ষেত্রে আরেকটু ভালো পথ দেখাতে পারতেন। তাঁকে কয়েদির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে সহিংসতার যে কারণগুলো, বহু বছর আগের ঘটনাবলীর ভেতরেই সেগুলোকে খুঁজতে হবে। আর আমরা যদি আমাদের বিশ্লেষণটিকে আরেকটু গভীরে নিয়ে যাই, তাহলে আমরা আবিষ্কার করতে পারব যে, মনের এই অবস্থাটা খোদ নিজেই উৎপন্ন হয়েছে কোনো শারীরিক রোগের পরিণামে (হতে পারে হৃদপিন্ডের হৃদপিন্ডের বা মস্তিষ্কের বা পরিপাকতন্ত্রের কোনো রোগ), যে রোগ এসেছে হয় উত্তরাধিকার-সূত্রে, না হয় তো অস্বাভাবিক জীবনযাপনের সূত্রে। অনেক বছর ধরে এই কারণগুলো ক্রিয়াশীল থেকেছে, তারপর এমন কোনো কাজ ঘটিয়ে ফেলেছে, যা আইনের আওতায় পড়ে যায়।

শুধু এটুকুই নয়। আমরা নিজেরা যদি বিশ্লেষণ করে দেখি, প্রত্যেকেই যদি তাঁদের মাথার মধ্যে দিয়ে নানা সময় বয়ে যাওয়া চিন্তাভাবনাগুলো অকাতরে স্বীকার করেন, তাহলে আমরা দেখতে পাব, আমাদের সকলেরই এমন সব অনুভূতি ও চিন্তাভাবনা ছিল, যার মধ্যে অপরাধী বলে বিবেচিত হওয়ার মতো সমস্ত কাজেরই প্রবৃত্তি থেকে গিয়েছিল। হতে পারে সেসব অনুভূতি ও চিন্তাভাবনা ছিল মস্তিষ্কের

২১ Vierteljahrsschrift fur gerichtlzche und offentliche Medicin, 1867।

ভেতর দিয়ে আলোর ঝলকের মতো বয়ে যাওয়া অনুধাবন-অযোগ্য একটা তরঙ্গ মাত্র – তবু তা ছিল কিন্তু। আমরা তক্ষুণি সেগুলোকে হটিয়ে দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু সেগুলো বারবার ফিরে আসার সুযোগ যদি পেত, যদি সেগুলো পরিবেশ-পরিস্থিতির দ্বারা পরিপুষ্ট হতো, কিংবা যদি সেগুলো পরিপুষ্ট হতো আমাদের চারপাশের মানুষজনের সাথে বসবাসের ফলে গড়ে ওঠা ভালোবাসা, করুণা এবং এরকম আর-সব কিছুর চর্চার অভাবে, তাহলে এই সব ক্ষণস্থায়ী (এত সংক্ষিপ্ত যে, আমরা হয়ত খেয়ালই করি না) প্রভাবসমূহই অধঃপতিত হয়ে আমাদের চরিত্রের কোনো রুগ্ন-বিষণ্ন উপাদানে পরিণত হতো।

এই হলো সেই জিনিস, যা শিশুকাল থেকেই আমাদের বাচ্চাদেরকে আমাদের শেখানো উচিত। অথচ, এখন আমরা তাদেরকে তাদের কোমলতম বয়েস থেকেই ঠেলে দিই বিচারক আর আদালতের ন্যায়পরায়ণতার এমন সব ধারণার দিকে, যা প্রতিশোধপরায়ণতারই নামান্তর। আর সেটাই যদি আমরা করে থাকি, তাহলে এতদিনকার হায়া-শরম ঝেড়ে ফেলে প্রকাশ্যে এ-কথা ঘোষণা করতে আমাদের আর লজ্জা লাগা উচিত নয় যে, আমরা আমাদের শাস্তি-দন্ডের বাস্তবায়ন ঘটানোর জন্য আততায়ীদেরকে ভাড়া করি, আর আমরা কারা-কর্তাদেরকে এমন সব কর্ম-সম্পাদনের জন্য বেতন দিই, যে কাজ করার জন্য কোনো শিক্ষিত মানুষই তাঁর নিজের সন্তানকে গড়ে তুলতে চাইবেন না। যে কাজটাকে আমরা এতটাই অসম্মান-জনক বলে বিবেচনা করি, সেই কাজ কখনও নৈতিকতা সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার কোনো উপাদান হতে পারে না।

আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠা সমাজবিরোধী অনুভূতিসমূহের বিকাশ ঠেকানোর জন্য কারারুদ্ধ করা নয় বরং ভাতৃপ্রতিম চিকিৎসাই হচ্ছে একমাত্র উপায়, যা আমরা প্রয়োগ করার অধিকার রাখি, এবং প্রয়োগ করতে পারি। শারীরিক রোগের বা সামাজিক প্রভাবের ফলে যাঁদের মধ্যে এ-রকম সমাজবিরোধী অনুভূতি গড়ে ওঠে, তাঁদের ক্ষেত্রে শুধু এই উপায়েই কিছু সুফল মিলতে পারে। আর এটা কিন্তু কোনো ইউটোপিয়া (স্বর্গ-কল্প) নয়। শাস্তিপ্রদান করার মাধ্যমে সমাজবিরোধী অনুভূতির বৃদ্ধি ঠেকানো সম্ভব বলে সুখ-কল্পনা করাটাই বরং একটা ইউটোপিয়া, বাজে একটা ইউটোপিয়া: 'সারা দুনিয়া যেমন খুশি চলছে চলুক, আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও' মার্কা একটা ইউটোপিয়া।

ড. জে. ব্রুস. থম্পসন[২২] এবং আরো অনেকের কাছ থেকে আমরা জানি, সমাজবিরোধী অনুভূতিসমূহের অনেকগুলিই উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া। তথ্য-উপাত্ত এই সিদ্ধান্তটিকে যথেষ্ট মাত্রায় সমর্থন করে। কিন্তু উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া

২২ Journal of Mental Science, জানুয়ারি ১৮৭০, পৃষ্ঠা ৪৮৮।

মানে কী? এটা কি অপরাধ-প্রবণতার আচমকা কোনো ঝোঁক, নাকি অন্য কিছু? উত্তরাধিকার সূত্রে যা আসে, তা হলো অপর্যাপ্ত আত্মনিয়ন্ত্রণ বা দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অভাব, অথবা ঝুঁকি আর উত্তেজনার আকাঙ্ক্ষা[২৩], কিংবা বেমানান বড়াই। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ঝুঁকি আর উত্তেজনার আকাঙ্ক্ষার সাথে অহমিকা এসে যুক্ত হওয়াটা আমাদের কারাগারের মানুষজনের সবচাইতে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অহমিকা অনুশীলন করার মতো আরো অনেক এলাকাই তো আছে। অহমিকা প্রথম নেপোলিয়ন বা ফ্রে-র মতো বাতিকগ্রস্ত লোকের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে, বিশেষত সুস্থ-সজীব মেধা দ্বারা উদ্দীপিত ও পরিচালিত হতে পারলে, ঐ একই অহংকার আবার এমন মানুষেরও জন্ম দিতে পারে, যাঁরা সুরঙ্গ পেরোতে পারেন অথবা দুই বৃহৎ ভূখন্ডের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ যোজক-ভূখণ্ডকে ভেদ করে যেতে পারেন, কিংবা এমন কোনো মহৎ কাজের পেছনে তাঁদের সমস্ত প্রাণশক্তি ঢেলে দিতে পারেন, যা তাঁদের বিবেচনায় মানবতার জন্য উপকারী। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মেধা-বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে কোনো কিছুর চরম মাত্রায় পৌঁছানোর ঝোঁককে সামলনো যেতে পারে, অথবা এমনকি কমিয়ে এটাকে একেবারে প্রায় শূন্যের কোঠায় এনে ফেলা যেতে পারে। উত্তরাধিকার-সূত্রে যা পাওয়া গেছে, তা যদি হয় ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তার অভাব, তাহলে তো আমরা এ-ও জানি যে, চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি জীবনের পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী অত্যন্ত বিচিত্র সব পরিণামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের 'ভালো মানুষ'দের কত জনের ক্ষেত্রে ভোগান্তির কারণ হয়ে ওঠে ঠিক এই ত্রুটিখানিই? এটাই কি তাঁদেরকে কারাগারে পাঠানোর যথেষ্ট কারণ হতে পারে?

মানবতা তার কারাবন্দিদের সাথে মানুষের মতো আচরণ করেছে কচিৎ-কদাচিৎ। কিন্তু যখনই তা করা হয়েছে, তখনই তার সাহসিকতার জন্য উপযুক্ত পুরস্কার মিলেছে। ক্লেয়ারভক্স-কারাগারে হাসপাতালের বেশকিছু চিকিৎসা-সহকারী [যাঁরা নিজেরাও কারাবন্দি] অসুস্থ লোকজনের প্রতি যে রকম দয়া দেখান তা দেখে

---

২৩ এডমন্ড দ্যু কেইন কর্তৃক চমৎকারভাবে প্রদর্শিত এই উপাদানটির গুরুত্ব প্রমাণিত হয় তাঁরা যাঁকে বলেন 'অপরাধের বয়স' (পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ বছর), সেই বয়স সংক্রান্ত পরিস্থিতি থেকে। এই বয়েসের পরে নিরিবিলি জীবনের একটা আকাঙ্ক্ষা হঠাৎ করেই আইন-লঙ্ঘনের ঘটনা কমিয়ে দেয়। কোনো এক কালে যাঁরা কারাগারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন, এডমন্ড দ্যু কেইনের প্রস্তাবটি সেই ধরনের লোকদের ভেতরে বিকশিত হওয়া অদ্ভুত যুক্তিমালার চরিত্রসম্পন্ন। (প্রস্তাবটি হলো: 'যেসব ব্যক্তির ইতিহাস তাঁদের মধ্যে সুচিহ্নিত অপরাধ-প্রবণতার সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করে, তাঁদেরকে ধরুন চল্লিশ বছর বয়স পার না হওয়া পর্যন্ত বন্দি করে রাখা বা বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখা'।)

আমি কখনো কখনো চমকে গেছি। এক প্রকার কোমল অনুভূতির বেশ কিছু প্রকাশ আমাকে একদম ছুঁয়ে গেছে। ডাক্তার ক্যাম্পবেল বলেছেন আরও বেশি কিছু। তিনি কিন্তু কারাগারের ডাক্তার হিসেবে তাঁর তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে মানব-প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছেন ঢের বেশি। তিনি বলছেন, খুবই আলতোভাবে 'এতটা যত্নের সাথে' তাঁদের চিকিৎসা দেওয়া হতো (আমি একদম তাঁর নিজের কথারই উদ্ধৃতি দিচ্ছি) 'যেন তাঁরা নাজুক মহিলা', আর এতে করে 'হাসপাতালে প্রায় সবসময়ই সর্বোচ্চ মাত্রার সুবন্দোবস্ত বজায় থাকত'। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি 'এমনকি সবচেয়ে রুক্ষ অপরাধীদের মধ্যেও কারাবন্দিদের চরিত্রের এই শ্রদ্ধাজনক বৈশিষ্ট্যটি দেখতে পেয়ে - অসুস্থদের প্রতি যে বিপুল মনোযোগ তাঁরা দিতেন, আমি তার কথা বোঝাতে চাইছি।' সাথে তিনি আরও বলছেন, 'সবচেয়ে কঠোর হয়ে যাওয়া অপরাধীরাও এই অনুভূতি থেকে মুক্ত ছিলেন'। আরেক জায়গায় তিনি বলছেন, 'অতীতের বেপরোয়া জীবন ও লুঠতরাজের অভ্যেসের কারণে এঁদের অনেককেই যদিও কঠোর ও অনুভূতিহীন বলে মনে হতে পারে, তথাপি কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল সে-ব্যাপারে এঁদের রয়েছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধারণা।' কারাবন্দিদের নিয়ে কাজ করেছেন এমন কোনো মানুষই ডাক্তার ক্যাম্পবেলের অভিজ্ঞতাকে সঠিক না বলে পারবেন না।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদেরকে বন্য পশুর চেয়ে তেমন আলাদা কিছু বলে ভাবতে যাঁরা অভ্যস্ত নন, এমনকি তাঁদেরকেও মুগ্ধ না করে পারে না যে বৈশিষ্ট্য, তার রহস্য কী? মঙ্গলময় আবেগ-অনুভূতি চর্চা করার মতো সুযোগ হাসপাতালের এই চিকিৎসা-সহকারীরাই পান। তাঁদের আছে অন্যের জন্য দরদ অনুভব করা এবং সেই মোতাবেক কাজ করার সুযোগ। তার চেয়ে বড়ো কথা হলো, হাসপাতালের ভেতরে তাঁরা অন্যান্য দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনতা পেয়ে থাকেন; আর ডাক্তার ক্যাম্পবেল যাঁদের কথা বলছেন, তাঁরা ছিলেন তাঁর মতো একজন ডাক্তারের প্রত্যক্ষ নৈতিক প্রভাবের অধীনে, সৈনিকের অধীনে নয়।

সংক্ষেপে, নৃতাত্ত্বিক কারণসমূহ (অর্থাৎ শরীরের গঠনগত ত্রুটি) মানুষকে জেলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে থাকে। যথার্থভাবে বলতে গেলে, এই কারণগুলো কিন্তু 'অপরাধ-প্রবণতা'র কারণ নয়। আমাদের আধুনিক মনোবিকারগ্রস্ত প্রজন্মের অজস্র মানুষের মধ্যে এই একই কারণ-সমূহ ক্রিয়াশীল আছে, কিন্তু কতকগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির অধীনেই কেবল সেগুলো সমাজবিরোধী কাজকর্মের দিকে মোড় নেয়। কারাগার এসব রোগ-লক্ষণ সংক্রান্ত শারীরবৃত্তীয় ত্রুটির নিরাময় করে না, এগুলোকে আরো জোরদার করে মাত্র। অনেক বছর ধরে কারাগারের হীন প্রভাবের অধীনে থাকার পর একজন

মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তি যখন বাইরে আসেন, তখন তিনি সমাজস্থ জীবনের জন্য আগের তুলনায় অনেক কম উপযুক্ত হয়ে পড়েন। এর সাথে কোনোকিছুর তুলনা চলে না। যদি তাঁকে নতুন করে সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হয়, তাহলে কারাগার তাঁর ওপর যা যা করেছে সেগুলোর বিমোচনের মাধ্যমেই শুধুমাত্র সেটা অর্জিত হতে পারে। এর জন্য দরকার তাঁর মন থেকে কারাগারের সেই বৈশিষ্ট্যগুলো মুছে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা, যেসব বৈশিষ্ট্য কঠিন কারা-অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাওয়া মানুষের ওপর প্রগাঢ় ছাপ ফেলে দেয়। মুছে ফেলার এই কাজটা মানবতার কতিপয় বন্ধুদের দ্বারাই সম্পাদিত হয় বটে, কিন্তু এটা এমন একটা কাজ, অনেক অনেক ক্ষেত্রেই যা থেকে কোনো সুফল পাওয়া যায় না।

অপরাধ-বিশেষজ্ঞরা যাঁদেরকে সুযোগ্য আততায়ী হিসেবে অভিহিত করে থাকেন, তাঁদের সম্পর্কেও কিছু কথা বলার আছে। 'দাঁতের বদলে দাঁত'-এর সেই পুরাতন বাইবেলীয় নীতির গুণে গুণান্বিত হয়ে এঁদেরকে ফাঁসি-কাষ্ঠে পাঠানো হয়ে থাকে অনেক দেশেই। অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু ঘটনা হলো এই যে, সারা সাইবেরিয়া জুড়ে যেখানে নির্বাসিত লোকদেরকে আলাদা আলাদা মূল্যায়ন করার প্রচুর সুযোগ আছে, সেখানে দণ্ডপ্রাপ্ত মানুষজনের মধ্যে 'খুনী'রাই শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মানুষ হিসেবে মূল্যায়িত হয়ে থাকেন। অত্যন্ত প্রখরভাবে অপরাধ এবং তার কারণ-সমূহ বিশ্লেষণকারী জনাব দাভিৎও যে এই একই রকম পর্যবেক্ষণ[২৪] দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন তা দেখে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম।[২৫] একশত বছরেরও বেশি সময়

২৪ তিনি বলছেন: 'ছিনতাই-রাহাজানিকে কেন্দ্র করে নানা সময় হত্যাকাণ্ড ঘটে বটে। এটা সত্যি। কিন্তু সেগুলো পূর্বপরিকল্পিত হয় না বললেই চলে। বরং ছিনতাই-রাহাজানির অপরাধটি ঘটাতে যেয়ে দুর্ঘটনাক্রমে হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়। এটা একেবারে নিয়মের মতো। সমস্ত অপরাধের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য হলো বুঝেশুনে, আগে থেকে পরিকল্পনা করে, খুন করা। হত্যাকাণ্ড ঘটে প্রতিশোধ আর হিংসা সংক্রান্ত তীব্র আবেগ-অনুভূতির পরিণামে অথবা সামাজিক বা রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তির কারণে। বেশিরভাগ সময়ে এরকম হত্যাকাণ্ড হচ্ছে মানুষের স্বভাবের মহত্তর সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর এক প্রকার বিকৃতির পরিণাম। মানুষের হীনতর প্রবৃত্তি অথবা তাড়ণার মধ্যে খুনের উৎস খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।' (Leaves from a Prison Diary, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭)।

২৫ অনুবাদকের টীকা: মাইকেল দাভিৎ (১৮৪৬-১৯০৬) ছিলেন আইরিশ জাতীয়তাবাদী নেতা। ১৮৭০ সালে বৃটিশরা তাঁকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়। কিন্তু অর্ধেক কারাভোগের পর ১৮৭৭ সালে তিনি মুক্তি পান। ১৮৯৫ সালে তিনি বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯০০ সালে পদত্যাগ করেন দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ওলন্দাজ বংশোদ্ভূতদের (এঁদেরকেই 'বোয়ার' বলা হতো) বিরুদ্ধে বৃটিশদের 'বোয়ার যুদ্ধের' প্রতিবাদে। তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে Leaves from a Prison Diary (১৮৮৪) এবং The Boer Fight for Freedom (১৯০২)।

যাবত রুশ আইন যে মৃত্যুদণ্ডকে স্বীকৃতি দেয় না, এই কথাটা সবার যতখানি জানা থাকা উচিত ছিল সবাই ততখানি জানেন না। দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের [রাজত্বকাল ১৮৫৫-১৮৮১] এবং তৃতীয় আলেকজান্ডারের শাসনাধীনে [রাজত্বকাল ১৮৮১-১৮৯৪] রাজনৈতিক আইনলঙ্ঘন-কারীদেরকে যেমন খুশি ইচ্ছা মতো যতই ফাঁসি-কাষ্ঠে পাঠানো হয়ে থাকুক না কেন (দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের শাসনামলে ৩১ জন মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল[২৬] এবং ১৮৮১ থেকে এখন পর্যন্ত[২৭] মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে ২৫ জনকে), রাশিয়াতে 'কমন-ল'-এর অধীনস্থ আইনলঙ্ঘনের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান নাই। ১৭৫৩ সালে সেটা বিলুপ্ত করা হয়েছিল এবং সেই সময় থেকে খুনীদেরকে স্রেফ আট থেকে বারো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড (আর মা-বাবা প্রভৃতি নিকটাত্মীয়দের হত্যাকারীদের ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড) দেওয়া হয়। এই মেয়াদটা শেষ হয়ে গেলে সাইবেরিয়ায় তাঁদেরকে বাকি জীবনের জন্য স্বাধীন থাকতে দেওয়া হয়। পূর্ব-সাইবেরিয়া তাই মুক্তিপ্রাপ্ত আততায়ী দিয়ে ভরা, এবং তা সত্ত্বেও এরকম দেশ খুব কমই আছে, যেখানে আপনি এর চেয়ে বেশি নিরাপত্তার সাথে থাকতে পারবেন, ঘুরে বেড়াতে পারবেন। সাইবেরিয়ায় আমার অত্যন্ত সুবিস্তৃত সফরের সময় আমি আমার সঙ্গে কোনো ধরনের আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র রাখতাম না। আমার বন্ধুদের ঘটনাও তাই, যাঁরা প্রত্যেকেই প্রতি বছর এই বিপুল ভূখন্ডে দশ হাজার মাইলের মতো ভ্রমণ করতেন। আগের অধ্যায়ে যেমনটা বলা হয়েছিল, পূর্ব-সাইবেরিয়ায় মুক্তিপ্রাপ্ত আততায়ীদের হাতে বা পালিয়ে-যাওয়া অগণন লোকের হাতে খুন হওয়া মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। আর যে বিরামহীন দস্যুতা এবং খুনখারাবির ঘটনা নিয়ে সাইবেরিয়া ইদানিং নালিশ করে থাকে, সেগুলো সংঘটিত হয় তমস্ক[২৮] এবং সারা পশ্চিম-সাইবেরিয়া জুড়ে; সেখানে কিন্তু আততায়ীদেরকে নয় বরং লঘু দায়ে অভিযুক্তদেরকে নির্বাসন দেওয়া হয়। এই [উনবিংশ] শতাব্দীর প্রথম দিকেও এমনটা অস্বাভাবিক ছিল না যে, অফিসারের বাসায় দেখা যাচ্ছে কোচোয়ান লোকটি একজন মুক্তিপ্রাপ্ত খুনী। কিংবা এমনটাও অস্বাভাবিক ছিল না যে, যে নার্সটি বাচ্চাদেরকে মায়ের মতো আদর-যত্ন করছেন,

---

২৬ কেউই জানেন না, ঠিক কত সংখ্যক বা কত শত পোলিশকে ১৮৬৩-৬৫ সালে খুন করা হয়েছিল।

২৭ অনুবাদকের টীকা: ক্রপোৎকিনের এই বই প্রকাশের সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত, সম্ভবত।

২৮ অনুবাদকের টীকা: তম্স্ক দক্ষিণ সাইবেরিয়ার সবচেয়ে পুরাতন শহরগুলোর একটি। ১৬০৪ সালে একটি দুর্গ হিসেবে এর প্রতিষ্ঠা। গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও যোগাযোগ-কেন্দ্র। সাইবেরিয়ার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় এখানেই ১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তাঁকেও তাঁর দেহে বহন করতে হচ্ছে গণগনে লোহা দিয়ে ছ্যাঁকা-দেওয়া একটা দাগ, যে দাগ কিছুটা মুছে গেছে আর কিছুটা থেকেই গেছে। যাঁরা বলতে চান পশ্চিম ইউরোপের লোকজনের তুলনায় রুশরা একটু কোমল জাতের মানুষ, তাঁদের শুধু কৃষক-বিক্ষোভের সময়কার দৃশ্যগুলোকে একটু স্মরণ করলেই চলবে; এবং তাঁদেরকে এ-কথাও জিজ্ঞেস করা যেতে পারে যে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে মেরে ফেলার পদ্ধতিটির বিলোপ-সাধন করাটা মানবজীবনের প্রতি শীতল একটা ঘৃণা পরিপোষণ করে চলার ক্ষেত্রে কতখানি অবদান রেখেছে, আর মৃত্যুদণ্ড দিয়ে মেরে ফেলার বর্ণনায় পরিপূর্ণ চরম অরুচিকর যেসব কথাবার্তায় ইংরেজ কারাবন্দিরা সবচাইতে বেশি উল্লসিত হন, সেসব কথাবার্তার অনুপস্থিতি মানবজীবনের প্রতি ঐ শীতল ঘৃণা বিকশিত করে চলার ক্ষেত্রে কতটকু অবদান রেখেছে।

আইনসম্মত হত্যাকান্ডের লজ্জাকর অনুশীলন পশ্চিম ইউরোপে এখনও পালিত হয়ে চলেছে। যে শাস্তি নিজের হাতে বাস্তবায়ন করার মতো সাহস বিচারক নিজেও পেতেন না, সেই শাস্তি বাস্তবায়নের জন্য মাত্র এক গিনি'র[২৯] বিনিময়ে একজন ঘাতককে ভাড়া করার লজ্জাজনক এই অনুশীলন[৩০] এবং কলঙ্কময় এই অনুশীলনের পরিণামে কল্পনাতীত মাত্রার যে দুর্নীতি সমাজে ঢোকে, সেই অনুশীলন এমনকি সম্ভাব্য খুনখারাবি-হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ করতে পারার অজুহাতটুকু পর্যন্ত দেখাতে পারে না। মৃত্যুদন্ডের বিলুপ্তির ফলে কিন্তু খুনের সংখ্যা কোথাও বেড়ে যায় নি। মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার এই চর্চা এখনও যে থেকে গেছে, তা থেকে গেছে স্রেফ সাহসের অভাবজনিত ভয়ভীতির ফলে এবং নিম্নতর একটা সভ্যতার স্মৃতিচারিতার ফলে যে সভ্যতায় ধর্ম কর্তৃক প্রচারিত হয়েছিল 'দাঁতের বদলা দাঁত'-এর মতো নীতি।

কিন্তু প্রত্যক্ষভাবেই হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক, মহাজাগতিক কারণগুলো যদি সমাজবিরোধী কাজের বাৎসরিক পরিমাণের ওপর এতটা শক্তিশালী প্রভাব ফেলতে পারে, এবং শরীর-কাঠামোর একেবারে ভেতরে গভীরভাবে প্রোথিত মনস্তাত্ত্বিক কারণসমূহও যদি মানুষকে আইন লঙ্ঘনের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে

---

২৯ অনুবাদকের টীকা: গিনি হচ্ছে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে প্রবর্তিত বৃটিশ স্বর্ণমুদ্রা। আফ্রিকার দেশ গিনির সাথে বাণিজ্য করতে গিয়েই বৃটিশরা গিনির স্বর্ণে তৈরি এই মুদ্রার প্রথম প্রচলন ঘটায় বলে এর নাম হয়ে যায় 'গিনি'। ১৬৬৩ থেকে ১৮৮৩ সালের মধ্যকার সময়কালে এক গিনির মূল্যমান এক পাউন্ডের সামান্য বেশি: ২১ শিলিং বা ১.০৫ পাউণ্ড। (এনকার্টা ডিকশনারি, সিডি-সংস্করণ, মাইক্রোসফট এনকার্টা রেফারেন্স লাইব্রেরি ২০০৪; মাইক্রোসফট কর্পোরেশন)

৩০ দ্যু কেইনের 'Punishment and Prevention of Crime,' পৃষ্ঠা ৩৩।

একটি শক্তিশালী প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে, এবং এর পর যদি যাকে আমরা অপরাধ বলি তার সামাজিক কারণগুলোকেও বিবেচনায় নিতে পারি, তাহলে ফৌজদারি আইনকানুন সংক্রান্ত লেখকগণের তত্ত্বসমূহের মধ্যে বাকি আর থাকে কী?

পুরাতন কালে একটা রীতি চালু ছিল। সদস্যদের যেকোনো রকম সমাজবিরোধী কাজের জন্য প্রত্যেকটা কমিউন (গোত্র, মার্ক, জেমিন্দে)[৩১] ইত্যাদিকে সামগ্রিক-ভাবে দায়ী মনে করা হতো। প্রাচীন কালের সম্প্রদায়গত সংগঠনসমূহের ভালো ভালো অনেক অবশিষ্টাংশের মতো এই প্রাচীন রীতিটিও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আবার আমরা ওটাতেই ফিরে আসছি। চরম স্বাধীন ব্যক্তিতন্ত্রের একটা পর্যায় পার হওয়ার পরে আবার আমাদের মধ্যে সেই একই অনুভূতি জন্মাচ্ছে: সমাজ-বিরোধী কাজকর্মের জন্য সমাজই দায়ী। আমাদের শতাব্দীর প্রতিভাবানদের অর্জনসমূহে যদি আমাদের ভাগ থেকে থাকে, তাহলে আমাদের আততায়ীদের কৃতকর্মের লজ্জাতেও আমাদের ভাগ আছে।

বছরের পর বছর ধরে আমাদের বাচ্চারা বেড়ে ওঠে আমাদের বিশাল শহর-গুলোর জঘন্য আবর্জনায় – বস্তুগত এবং নৈতিক আবর্জনায়। কোনোরকমে দু-মুঠো অন্ন জোটাতে হিমশিম-খাওয়া জীবনের চাপে, আর ভবিষ্যত নিয়ে সংশয়ের চাপে আশাহীন-আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পুরোপুরি পরিত্যক্ত অবস্থায় বেড়ে ওঠে এরা। এমন একটা দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা, যার সম্পর্কে অতীতের কোনো যুগ এমনকি কোনো ধারণাও রাখে নি। নিজেদের মধ্যে আর রাস্তার বাজে সব প্রভাবের মধ্যে আটকে-পড়া, আর অস্তিত্বের ভয়ঙ্কর সংগ্রামে ধুলায় মিশে-যাওয়া মা-বাবাদের কাছ থেকে আদরযত্ন না পাওয়া এইসব বাচ্চারা বলতে গেলে জানেই না, সুখী একটা পরিবার বলে কাকে। অথচ একেবারে প্রথম শৈশব থেকেই তারা শিখে ফেলে, আমাদের প্রকাণ্ড এই শহরের পাপ কোনগুলো। জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে এমন কোনো হাতের কাজটুকু পর্যন্ত না শিখেই

---

৩১ অনুবাদকের টীকা: জার্মান-ইংরেজি অনুবাদ থেকে জানা যাচ্ছে 'Gemeinde' শব্দটার অর্থ পৌরসভা বা স্থানীয় সরকার। (এনকার্টা ডিকশনারি, সিডি-সংস্করণ, মাইক্রোসফট এনকার্টা রেফারেন্স লাইব্রেরি ২০০৪; মাইক্রোসফট কর্পোরেশন) আবার, সুইজারল্যান্ডেও জার্মান ভাষা থেকে আসা 'জেমিন্দে' শব্দটা আছে। সেখানে ২৬টা ক্যান্টন (রাজ্য) আছে। ২০টা পূর্ণ ক্যান্টন, ৬টা অর্ধ। এগুলো আবার ছোট ছোট প্রায় ৩০০০ কমিউনে বিভক্ত। এই কমিউনগুলোই জেমিন্দে। এগুলো, ইঙ্গ-মার্কিন মুলুকের স্থানীয় সরকারের প্রশাসনিক একক 'কাউন্টি'র সাথে তুলনীয়। (এনকার্টা এনসাইক্লোপেডিয়া, সিডি-সংস্করণ, মাইক্রোসফট এনকার্টা রেফারেন্স লাইব্রেরি ২০০৪; মাইক্রোসফট কর্পোরেশন)

তারা জীবন শুরু করে। একজন বর্বরের[৩২] ছেলে তো তবু তার বাবার কাছ থেকে শিকার করাটুকু শেখে; তার বোন শেখে কেমন করে বাড়ির সাধারণ কাজকর্ম সামলাতে হয়। কিন্তু যেসব বাচ্চাকাচ্চার মা-বাবা কিছু-একটা কাজের খোঁজে (যা তাঁদেরকে পরের সপ্তাহটা পাড়ি দিতে হয়ত একটু সাহায্য করবে) সাত-সকালে বেরিয়ে পড়েন অপরাধের আস্তানা থেকে (যেসব আস্তানায় তাঁদের বাস), সেইসব বাচ্চারা জীবনে প্রবেশ করে এমনকি ঐসব বর্বরের সন্তানদের সামান্য জ্ঞানটুকুও না নিয়েই। কোনো হাতের কাজ তারা জানে না। কর্দমাক্ত রাস্তা হচ্ছে তাদের বাসাবাড়ি। আর যে শিক্ষাদীক্ষা তারা রাস্তা থেকে পায়, তা এমন ধরনের শিক্ষা, যা গরিবের সস্তা মদের প্রাসাদ আর বড়লোকের প্রমোদ-কানন পরিদর্শনকারী মানুষজনের কাছে দিব্যি পরিচিত।

এই শ্রেণীর লোকজনের মদ খাওয়ার অভ্যাসকে কঠোরভাবে ভৎর্সনা করাটা খুবই চমৎকার একটা ব্যাপার। কিন্তু যাঁরা তাঁদেরকে ভৎর্সনা করেন, তাঁরাও যদি ঐসব শ্রমজীবীর সন্তানসন্ততির মতো একই পরিবেশে বড় হয়ে উঠতেন, যেসব শ্রমজীবীকে প্রত্যেক দিন সকাল বেলায় কব্জির জোরে আদায় করে নিতে হয় লন্ডন-ডকইয়ার্ডের গেটের ভেতরে ঢোকার অধিকার, তাহলে তাঁদের কতজন ঐসব সস্তা মদের প্রাসাদের নিয়মিত মেহমান না হয়ে থাকতে পারতেন? সত্যিকারের উৎপাদকদের সমস্ত সম্পদ ধনীরা নিজেদের করে নিয়েছে শুধু এইসব প্রাসাদের বলেই।

যখন আমরা আমাদের সমস্ত কারখানা কেন্দ্রগুলোতে এই জনগোষ্ঠীকে বেড়ে উঠতে দেখি, তখন একথা ভেবে আমাদের অবাক হওয়া সাজে না যে, কারাগারে কয়েদি সরবরাহ করে প্রধানত আমাদের এই বড় শহরগুলোই। উল্টা বরং আমি অবাক না হয়ে পারি না, কীভাবে এই শিশুদের তুলনামূলকভাবে এত ছোট্ট একটা অংশ চোর অথবা বড় রাস্তার ছিনতাইকারী হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর

---

৩২ অনুবাদকের টীকা: নিজেদেরকে 'সভ্য' মনে করা আর শিকারীসমাজের সদস্যদেরকে 'বর্বর' বলে আখ্যায়িত করার এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত লুই হেনরি মর্গানের (১৮১৮-১৮৮১) ১৮৭০ সালে প্রকাশিত সিস্টেম অফ কনস্যাঙ্গুইনিটি অ্যান্ড অ্যাফিনিটি অফ দ্য হিউম্যান ফ্যামিলি এবং ১৮৭৭ সালের অ্যানশাইন্ট সোসাইটি প্রভৃতি বইয়ের প্রভাবে সেযুগে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তী কালে এ-ধারণা সর্বত্রই ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। সারা বিশ্ব জুড়ে সভ্যতার একরৈখিক অগ্রগতির তত্ত্বের বদলে বহুত্ব ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিয়ে স্বীকার করা এবং শিকারজীবী, কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, আদিবাসী, অরণ্যবাসীদেরকে অসভ্য, উপজাতি, বর্বর বলে হীনভাবে আখ্যায়িত না করাটাই এখন আমাদের যুগের বৈশিষ্ট্য। ক্রপোৎকিনের আরো একটা যুগ-সীমাবদ্ধতা-চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে এখানে এই 'বর্বর' শব্দটার মধ্যে। তাই এসব কথা।

মানব-সম্প্রদায়ের মধ্যেও সামাজিক অনুভূতির গভীর শেকড়-বিস্তার দেখেই বরঞ্চ আমি অবাক না হয়ে পারি না। নোংরা রাস্তাঘাটে হৃদয়ের শুভবৃত্তি এখনও যেটুকু আছে, তাতেই বরং আমি অবাক না হয়ে পারি না। এগুলো আছে বলেই চরম অবহেলায় বড় হয়ে-ওঠা লোকজনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে এত সামান্য সংখ্যক মানুষ আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এইসব শুভবোধ, সহিংসতার প্রতি ঘৃণার এই বোধ, আর এই মেনে-নেওয়া (যা আছে বলে বুকের মধ্যে ঘৃণার উন্মেষ না ঘটিয়েই নিজেদের নিয়তিকে তাঁরা গ্রহণ করে নিতে পারেন) – কারাগারের ভীতিকর প্রভাব নয় - এইগুলোই বরং সেই আসল প্রতিবন্ধক, যা খোলাখুলিভাবে সমস্ত সামাজিক বন্ধন ভেঙ্গে ফেলা থেকে তাঁদেরকে এখনও বিরত রাখে। পাথরে-গাঁথা আমাদের আধুনিক অট্টালিকাগুলোয় এক পাথরের ওপর আরেক পাথর যে এখনও ঠিকঠাক বিন্যস্ত আছে – তা এইসব অনুভূতি আছে বলেই আছে।

আর সামাজিক দাঁড়িপাল্লার অপর প্রান্তে টাকা (অর্থাৎ মানুষের কাজের প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্ন) ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে অশ্রুতপূর্ব বিলাসব্যসনের মধ্যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্রেফ নির্বোধ অহংকারকে তৃপ্ত করার জন্য, অন্য কিছুর জন্য নয়। বৃদ্ধদের আর তরুণদের যখন রুটি নাই, এবং সত্যি-সত্যিই যখন তাঁরা আমাদের বিলাস-বিপনীগুলোর একেবারে দরজায় অনাহারে দাঁড়িয়ে আছেন, সে সময় এসব দোকানের লেনদেনে বিপুল ব্যয়ের কোনো সীমা থাকে না।

যখন আমাদের চারপাশের সবকিছু – রাস্তায় আমরা যেসব দোকান আর মানুষজন দেখি, যে সাহিত্য আমরা পড়ি, প্রত্যেকদিন যে অর্থপূজার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয় - এই সবকিছু মিলে সীমাহীন সম্পদের জন্য অসম্ভব একটা আসক্তির উন্মেষ ঘটায়, উন্মেষ ঘটায় ঝলমলে বিলাসের জন্য ভালোবাসার এবং প্রত্যেকটা প্রকৃত বা অপ্রকৃত উদ্দেশ্যেই আহাম্মকের মতো টাকা খরচের প্রবণতার; যখন আমাদের শহরগুলোতে মহল্লার পর মহল্লা জুড়ে এমনসব বসতবাড়ি গড়ে উঠে উঠছে, যার প্রত্যেকটা বাসা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, যত রকম আকার-আয়োজনেই মানুষ তার পশুত্বকে লুকিয়ে রাখুক না কেন, বেশিরভাগ সময় জুড়েই সে আসলে পশু ছিল; যখন আমাদের সভ্য জগতের জপ-মন্ত্র হলো: 'নিজেকে ধনী বানাও, পথে যা-কিছুই পড়ুক, যেকোনো উপায়ে হোক গুঁড়িয়ে দাও সব, স্রেফ কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না হলেই হলো, ব্যস!'; যখন সামান্য কতিপয় ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে জমিদার-ভূস্বামী থেকে শুরু করে কারু-শ্রমিক পর্যন্ত প্রত্যেককে প্রতিদিন অজস্র উপায়ে শেখানো হচ্ছে যে, জীবনের সবচেয়ে সুন্দর আদর্শ হলো এমনভাবে সবকিছু সামলানো, যেন অন্যেরা তোমার কাজ করে দেয়;

যখন শারীরিক পরিশ্রম এতটাই অবজ্ঞার জিনিস যে, দৈহিক চলাফেরা-কাজকর্মের অভাবে যাঁরা মারা যাচ্ছেন, করাত দিয়ে কাঠ কাটা অথবা নিড়ানি দিয়ে জমির আগাছা পরিষ্কার করার বদলে তাঁরা আশ্রয় নিচ্ছেন জিমন্যাস্টিক্সের, অনুকরণ করছেন করাত বা কোদাল চালানোর ভঙ্গি; যখন শক্ত আর কালো হয়ে-যাওয়া হাত হীনতার চিহ্ন বলে বিবেচিত হচ্ছে এবং উচ্চমন্যতার বিশেষ পরিচায়ক বলে ভাবা হচ্ছে চাকরবাকরদেরকে কঠোর শৃঙ্খলায় অধীনস্থ করে রাখার বুদ্ধিকে, আর রেশমি পোশাক-পরিচ্ছদকে; যখন সাহিত্য তার কলাবিদ্যা খরচ করছে ধনসম্পদের আরাধনাকে বজায় রাখার জন্য এবং 'অবাস্তব আদর্শবাদী'র সাথে করছে ঘৃণাপূর্ণ আচরণ – তখন আর উত্তরাধিকার-সূত্রে অর্জিত অপরাধ-প্রবণতার কথা তোলার প্রয়োজন কী, বিশেষত যখন নাকি আমাদের জীবনের গাদা গাদা উপাদান একটি মাত্র অভিমুখে ক্রিয়াশীল, আর তা হচ্ছে সৎভাবে বেঁচে থাকার সাথে মানানসই নয় এমন ধরনের মনুষ্য-সত্তা নির্মাণ করা, সমাজবিরোধী অনুভূতিসমূহ যার জন্য অনুমোদিত!

চলুন, আমরা আমাদের সমাজকে এমনভাবে গড়ে তুলি, যাতে সর্বজনীন মঙ্গলের লক্ষ্যে প্রত্যেকেরই নিয়মিত কাজ করতে পারার সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করা যায় (নিঃসন্দেহে এর মানে হলো, কাজ এবং পুঁজির ভেতরকার বর্তমান সম্পর্কসমূহের আগাগোড়া রূপান্তর ঘটানো); চলুন, প্রত্যেকটা বাচ্চার জন্য সুন্দর শিক্ষা আর নির্দেশনা নিশ্চিত করি (শারীরিক শ্রমের ক্ষেত্রেও বটে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বটে), যেন সে তার জীবনের প্রথম কুড়ি বছরে আন্তরিক ও সন্নিষ্ঠ কাজের জ্ঞান ও অভ্যাস অর্জন করার সুযোগ পায়; তাহলেই ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কারাকক্ষ ও জেলখানার এবং হাকিম ও জল্লাদের আর কোনো দরকার পড়বে না আমাদের।

যে পরিস্থিতিতে মানুষ বড় হয়ে ওঠে, সে তার পরিণাম মাত্র। দরকারি কাজ করার অভ্যাস সহকারে তাকে বেড়ে উঠতে দেওয়া দরকার। তাকে এমনভাবে বেড়ে উঠতে দেওয়া প্রয়োজন যেন প্রথম জীবনেই সে পুরো মানবজাতিকে একটা মহা-পরিবার হিসেবে দেখতে শেখে, বিরাট একদল সাথীকে (এবং চূড়ান্ত বিচারে পুরো সমাজকে) আহত হওয়ার অনুভূতি না দিয়ে যে পরিবারের কোনো সদস্যকেই আহত করা যায় না। বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সর্বোচ্চ আনন্দের স্বাদ তাকে নিতে দেওয়া দরকার, যা নিম্নতর আবেগ-অনুভূতি থেকে পাওয়া তৃপ্তির চেয়ে অনেক বেশি উচ্চ-অনুপ্রেরণাজাত এবং দীর্ঘস্থায়ী। তাহলে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে, আমরা নৈতিকতাজনিত আইনের লঙ্ঘন খুব বেশি একটা পাব না। নৈতিকতাজনিত আইন সমাজস্থ জীবনের সর্বোত্তম পরিস্থিতির এক ধরনের অচেতন বিবৃতি বিশেষ।

আইনলঙ্ঘনের মোট ঘটনাসমূহের দুই-তৃতীয়াংশই হচ্ছে, যাকে বলে 'সম্পত্তির

বিরুদ্ধে অপরাধ'। সম্পত্তি এখন গুটিকয়ের বিশেষ এক প্রকার সুবিধা/অধিকার, কিন্তু সম্পত্তি যখন তার আসল উৎস সমাজ-সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাবে, তখন এই অপরাধের ঘটনাগুলো আর থাকবে না, অথবা নিতান্তই তুচ্ছ একটা সংখ্যার ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকবে। 'ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ'সমূহের ক্ষেত্রে বলা যায়, এগুলোর সংখ্যা ইতোমধ্যেই দ্রুততার সাথে কমছে। এর কারণ হলো নানারকম নৈতিক আর সামাজিক অভ্যাসের বিকাশ, যা নিঃসন্দেহে প্রত্যেক সমাজেই বিকশিত হয়, আর এর বিকাশ ঘটতে পারে শুধু তখনই, সাধারণ স্বার্থ যখন বেশি বেশি করে শক্ত করে তোলে [সামাজিক] বন্ধনকে, যা সমষ্টিগত একটা জীবনে উদ্বুদ্ধ করে তোলে মানুষকে।

সমাজ-সংগঠনের অর্থনৈতিক ভিত্তি যা-ই হোক না কেন, এর ভেতরে সবসময়ই এমন কিছু মানুষ থাকেন, যাঁরা দৃঢ়ভাবে বিকশিত তীব্র আবেগ-অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ, যাঁদেরকে বাকিদের মতো সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, এবং সবসময়ই এমন কিছু মানুষ দেখতে পাওয়া যায়, যাঁদের তীব্র আবেগ-অনুভূতি তাঁদেরকে সমাজ-বিরোধী কাজ করার দিকে ঠেলে দেয়। এইসব তীব্র আবেগ-অনুভূতি কিন্তু অন্য একটা পথও নিতে পারে, এবং যাঁরা আমাদেরকে ঘিরে থাকেন, সেসব মানুষের সমন্বিত প্রচেষ্টা ঐসব আবেগ-অনুভূতিকে প্রায়-পুরোপুরি বা যথেষ্ট নির্দোষ করে তুলতে পারে। এখন আমরা বেঁচে আছি অতিরিক্ত বিচ্ছিন্নতার ভেতরে। সবাই শুধু তার নিজের বা নিকটতম আত্মীয়স্বজনের কথাই ভাবেন। বস্তুগত জীবনের আত্ম-মুগ্ধ তথা নির্বোধ ব্যক্তিতন্ত্র মানুষজনের অজস্র পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও অনিবার্যভাবে বয়ে এনেছে এমন একটা ব্যক্তিতন্ত্র, যা স্বার্থপর এবং ক্ষতিকর। ইতিহাসে আমরা দেখেছি, এবং এখনও আমরা এমন সব সমাজ-সম্প্রদায় দেখতে পাই, যেখানে মানুষেরা আমাদের ইউরোপীয় শহরগুলোর তুলনায় অধিক ঘনিষ্টভাবে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত। চীন এক্ষেত্রে একটা দৃষ্টান্ত। বিরাট সব 'যৌথ পরিবার' এখনও সেখানে সমাজ-সংগঠনের ভিত্তি। যৌথ পরিবারের সদস্যরা সেখানে একে অপরকে একেবারে নিখুঁতভাবে চেনেন। শুধু বস্তুগত জীবনেই নয়, নীতি-নৈতিকতা সংক্রান্ত সমস্যাবলীতেও তাঁরা একে অপরের ভার বহন করেন, একে অপরকে সাহায্য-সহায়তা করেন। এবং সেখানে সম্পত্তির বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তির বিরুদ্ধে উভয়বিধ অপরাধের সংখ্যা তাক লাগানোর মতো নিচু পর্যায়ে থাকে (কেন্দ্রীয় প্রদেশগুলোতে অবশ্যই, সমুদ্র-উপকূলে নয়)। স্লাভ[৩৩] এবং সুইজারল্যান্ডের কৃষি-কমিউনগুলো হচ্ছে আরেকটা দৃষ্টান্ত। এইসব ছোট ছোট লোকসমষ্টিতে মানুষেরা

৩৩ অনুবাদকের টীকা: পূর্ব ইউরোপ এবং উত্তরপশ্চিম এশিয়ার স্লাভীয় ভাষাসমূহে কথা বলা মানুষ এবং তাঁদের বসবাসের এলাকাকে বলে স্লাভ।

পরস্পরকে চেনেন। একে অপরকে তাঁরা পারস্পরিকভাবে সাহায্য-সমর্থন করেন। অথচ, আমাদের শহরগুলোতে অধিবাসীদের মধ্যকার সকল বন্ধন গায়েব হয়ে গেছে। একই পূর্বপুরুষ/পূর্বনারী থেকে গড়ে ওঠা পুরোনো পরিবার ভেঙে পড়ছে। কিন্তু মানুষ এরকম বিচ্ছিন্নতায় বসবাস করতে পারে না। নতুন নতুন সামাজিক গোষ্ঠীর উপাদানসমূহ, একই জায়গায় বসবাসকারী অনেক রকম সাধারণ স্বার্থসম্পন্ন বাসিন্দাদের মধ্যে জেগে ওঠা বন্ধনসমূহ এবং সাধারণ একটি লক্ষ্য অভিমুখে ঐক্যবদ্ধ মানুষজনের ভেতরকার টানও বিকশিত হচ্ছে। পারস্পরিক নির্ভরতা বাড়ানোর মতো নানারকম পরিবর্তন এবং আমাদের সমাজ-সম্প্রদায়ের সদস্যদের উচ্চতর গুণাবলী অর্জনই শুধু এই বিকাশকে তরান্বিত করতে পারে।

এবং তথাপি, এই সকল কিছু সত্ত্বেও, নিশ্চিতভাবেই সীমিত সংখ্যক কিছু লোক থেকেই যাবেন, যাঁদের মধ্যে দৈহিক রোগের পরিণামে সৃষ্ট সমাজবিরোধী তীব্র আবেগ-অনুভূতি সমাজ-সম্প্রদায়ের জন্য বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। মানবতা কি তাঁদেরকে ফাঁসিকাষ্ঠে পাঠাবে, বা কারাগারে বন্দি করে রাখবে?

একটা সময় ছিল যখন মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষের সাথে সবচাইতে জঘন্য উপায়ে আচরণ করা হতো। তাঁদেরকে শয়তান ধরেছে বলে সবাই বিশ্বাস করত। খাঁচার মধ্যে পশুর মতো শেকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় তাঁদেরকে দেখে এমনকি তাঁদের দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকেরা পর্যন্ত ভয় পেত। আর মুক্ত করে দেওয়ার জন্য তাঁদের শেকল খুলে দেওয়াকে আহাম্মকি জ্ঞান করা হতো। কিন্তু একটা মানুষ এলেন - তাঁদের শেকল খুলে নেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তাঁদের সাথে ভাইয়ের মতো, বোনের মতো আচরণ করার উদ্দেশ্যে - পাইন গাছের গুঁড়ির মতো দৃঢ় একটা মানুষ। কাছে কোনো মানুষ যাওয়ার দুঃসাহস দেখালেই তাঁকে চিবিয়ে খাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকার দায়ে যাঁদেরকে ঘৃণা করা হতো, তাঁরা তাঁদের মুক্তিদাতাকে ঘিরে জড়ো হলেন, এবং প্রমাণ করলেন মানুষের স্বভাবের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যে, এমনকি রোগের কারণে যাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে তাঁদেরও স্বভাবের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাস স্থাপন করাটা সঠিক ছিল। সেই সময় থেকে মানবতার বিশ্বাস জয়ী হয়েছিল। মানসিকভাবে অসুস্থদের সাথে আর বন্য পশুর মতো আচরণ করা হয়নি।

শেকল বিলুপ্ত হলো, কিন্তু থেকে গেল পাগল-আশ্রম, যা কারাগারেরই আরেকটা নাম মাত্র; এবং সেগুলোর দেওয়ালের ভেতরে শেকলের মতোই জঘন্য একটা বন্দোবস্ত গড়ে উঠল ধীরে ধীরে। কিন্তু তারপর একটা বেলজীয় গ্রামের কৃষকরা তাঁদের সরল শুভবুদ্ধি আর হৃদয়ের করুণাবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে পথের নতুন বাঁক দেখিয়ে দিলেন, মানসিক রোগের বিজ্ঞ শিক্ষার্থীরাও যা ধারণা করতে পারেন নি। মানসিকভাবে অসুস্থদেরকে তাঁরা স্রেফ মুক্ত করে দিলেন। তাঁদেরকে

তাঁরা নিয়ে গেলেন নিজ নিজ পরিবারে। নিজেদের গরিব বাসাবাড়িতে তাঁদেরকে দিলেন একটা বিছানা। নিজেদের সামান্য টেবিলে দিলেন আরেকটা করে চেয়ার। জমিতে চাষাবাদ করার সময় তাঁদেরকে করে নিলেন নিজেদের একজন। আর নিজেদের নাচের অনুষ্ঠানে তাঁদেরকে দিলেন একটা করে জায়গা। এবং সাধু-দরবেশদের ছোঁয়ায় 'অলৌকিক আরোগ্যের' খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল, আর এই সাধুদের নামে ঘীল নামের ঐ গ্রামের গির্জাকে পবিত্র ঘোষণা করা হলো। কৃষকদের প্রয়োগ করা এই চিকিৎসা (অর্থাৎ স্বাধীনতা) ছিল এতই সরল আর এতই পুরাতন যে, ঘটনাকে ঘটনা হিসেবে মেনে না নিয়ে বিজ্ঞজনেরা এই ঘটনার চিহ্ন অনুসন্ধান করতে মনস্থ করলেন স্বর্গীয় প্রভাবের মধ্যে। কিন্তু সৎ এবং সহৃদয় মানুষের কোনো অভাব ছিল না, যাঁরা ঘীলের কৃষকদের আবিষ্কৃত চিকিৎসার শক্তি উপলব্ধি করেছিলেন, এর পক্ষে ওকালতি করেছিলেন, এবং মনের জড়তা, ভীরুতা আর পরিপার্শ্বের প্রতি নিঃস্পৃহতাকে অতিক্রম করার জন্য তাঁদের সমস্ত প্রাণশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন[৩৪]।

আমাদের দিককার প্রান্তটি থেকে, ওপরে [হেনরি মডস্লে কর্তৃক] বর্ণিত 'পাগলামি এবং অপরাধের ভেতরকার' সুবিস্তৃত সীমানাস্থলের সর্বোত্তম আরোগ্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে স্বাধীনতা আর বন্ধুত্বপরায়ণ যত্ন। একই সীমানাস্থলের অপর দিককার প্রান্তটি থেকেও সর্বোত্তম আরোগ্য বলে প্রমাণিত হবে এগুলোই। প্রগতির পথ সেদিকেই এগুচ্ছে। যা-কিছু সেদিকে এগুচ্ছে, সেগুলো আমাদেরকে নিয়ে যাবে সেই বিরাট প্রশ্নটির সমাধানের নিকটে, সবচেয়ে সুদূর অতীত কাল থেকে যে প্রশ্ন মানবসমাজের চিন্তাকে অধিকার করে রাখা থেকে কখনও বিরত থাকে নি, এবং যে প্রশ্নের সমাধান কারাগার দিয়ে হবে না।

অনুবাদ: নভেম্বর ২০০৮। পরিমার্জনা: সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৩। আদিপ্রকাশ: *অঞ্জলি*, ঢাকা মহানগর সার্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটির বার্ষিক পূজা-প্রকাশনা ২০০৯

৩৪ এঁদের একজন, ড. আর্থার মিশেল, স্কটল্যান্ডে সুপরিচিত। তাঁর Insane in Private Dwellings (Edinburgh, 1864) গ্রন্থটি দেখুন; এবং দেখুন এই প্রবন্ধটিও: 'Care end Treatment of Insane Poor,' Edinburgh Medical Journal, 1868।

পাঁচ

রাজনীতি সংস্কৃতি কারাগার

Fernando Botero. Abu Gharib

৫.১ শাহবাগ-জাগরণ: রাজনীতি না সংস্কৃতি?

শাহবাগ-গণজাগরণ কি রাজনীতি, নাকি সংস্কৃতি? এ গণজাগরণের সূচনা কি রাজনৈতিক দলের ডাকে? নাকি ব্লগার ছোটকাগজ-কর্মী অনলাইন-অ্যাক্টিভিস্ট কবি শিল্পী সাহিত্যিক চলচ্চিত্র-নির্মাতা নাট্য-শিল্পী সংবাদকর্মী আর ক্ষুদ্র মানুষদের ডাকে ও অংশগ্রহণে? ইউরোপীয় রেনেসাঁ গড়ে উঠেছিল কি রাজনীতি দিয়ে, নাকি অজস্র-মুখী বিজ্ঞান দর্শন শিল্প সাহিত্য চিন্তা ভাস্কর্যের মুক্তধারা দিয়ে? কিংবা রুশো ভলতেয়ার মন্টেস্কু টমাস পেইন মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট অগাস্টিন কোচিন প্রমুখ লেখকদের চিন্তা-জাগরণী প্রশ্ন, কৌতূহল এবং অচলায়তন-ভাঙা রচনাবলী ছাড়া

কি ফরাসী বিপ্লবের কথা কল্পনা করা যায়? আমাদের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনায় ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকজোড়া শতধারায় বিকশিত বহুবর্ণিল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডই কি মানুষের চিন্তাপ্রণালী বদলানোর ক্ষেত্রে এবং গণজাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুখ্য ছিল না?

বলতে চাচ্ছি, মৌলিক রূপান্তরধর্মী আর্থ-রাজনৈতিক পরিবর্তন-আন্দোলন সফল হতে পারে তখনই, যখন তার বিশাল-বিস্তৃত পটভূমি-পাটাতন রচনা করতে পারে বিপুল সংস্কৃতিযজ্ঞ। সংস্কৃতিই নবজাগরণ তৈরি করে যার ওপর দাঁড়াতে পারে নতুন রাজনীতির দিশা। কিন্তু জয়যুক্ত হয় যখন রাজনীতি, তখন পরাজয় ঘটতে থাকে সংস্কৃতির; চিন্তারহিত জলাবদ্ধতায় মুখ থুবড়ে পড়তে থাকে গোটা দেশ এবং মানুষ।

৫.২ রাজনীতি ও বলপ্রয়োগ

রাজনীতি এবং সংস্কৃতি পরস্পর-মুখোমুখি দুইটা ব্যাপার। আপনি পৃথিবীর ইতিহাস দেখবেন, বাংলাদেশের ইতিহাস দেখবেন, যখন কোনো রাজনৈতিক শক্তি বা রাজনৈতিক ধারা ক্ষমতা দখল করে, তখন সেই ধারার সাংস্কৃতিক পঙ্গুত্বের সূচনা ঘটে। একটা দেশে যখন রাজনীতি আর পথ খুঁজে পাচ্ছে না, রাজনীতি যখন একেবারে দিশাহারা, খুব দুর্বল, তখন আপনি দেখবেন, সেই দেশে সংস্কৃতির বিকাশ অনেক বেশি ঘটে।

রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির মূলগত বিরোধ আছে। রাজনীতি হলো কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার হিসাবনিকাশ। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা কীভাবে কারা প্রয়োগ করবেন, কারা ক্ষমতাবান হবেন, কারা ক্ষমতাহীন হবেন, কারা জেলখানাগুলো চালাবেন, কারা প্রশাসনিক কাঠামোগুলোকে পরিচালনা করবেন, সেই সমস্ত রীতি-বন্দোবস্ত-নিয়ম-কানুনের যে সামগ্রিক আয়োজন, সেটাই হচ্ছে রাজনীতি।

রাজনৈতিক ক্ষমতাচর্চা কথাটার মানে কী? মানে হলো ক্ষমতা-কাঠামোর আওতায় যে জনগোষ্ঠী আছে (সংস্কৃতিও তার থেকে বাদ না), সেই জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করা, পরিচালনা করা, শাসন করা। শাসন করাই রাজনীতির একমাত্র কাজ। মুখে আমরা যা-ই বলি, যে রাজনীতি যে ধরনের বুলিই আওড়াক না কেন, যে ধরনের মতাদর্শের কথাই বলুক না কেন (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনীতিই হোক, মৌলবাদী-লাদেনবাদী রাজনীতিই হোক, কিংবা পুঁজিবাদী-বাজারবাদী রাজনীতিই হোক), রাজনীতি মানেই হচ্ছে: সে শাসন করতে চায়। সে সবাইকে অধীনস্ত করতে চায়। সে চায় না তার 'অভ্রান্ত' রাজনৈতিক দর্শনের ওপর দিয়ে কেউ কথা বলুক। সে চায় না তার অবস্থানকে, পাটাতনকে, রাজনৈতিক কাঠামোকে, ক্ষমতা-বিন্যাসকে

কেউ চ্যালেঞ্জ করুক। এই হচ্ছে রাজনীতি।

রাষ্ট্র-রাজনীতি-ক্ষমতা কখনোই সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হতে পারে না। 'ক্ষমতা শুধু ধ্বংসাত্মকভাবে কর্ম-পরিচালনা করে। জীবনের প্রত্যেকটা উদ্ভাসকে সর্বদা জোর খাটিয়ে নিজস্ব আইনকানুনের রক্ষণশীলতার মাপে বশ মানায়। ক্ষমতার অভিব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক রূপ হলো মৃত মতান্ধতা। এর দৈহিক রূপ হলো বর্বর গায়ের জোর। আর, তার লক্ষ্য-আদর্শের এই নির্বুদ্ধিতা নিজের সিলমোহর সেঁটে দেয় তার সমর্থকদের ওপরেও। ... কেউ যখন সারাক্ষণই জোর করে সমস্ত কিছুকে একটা যান্ত্রিক বিন্যাসের মধ্যে নিয়ে আসার কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সে নিজেই অবশেষে একটা যন্ত্রে পরিণত হয় এবং যাবতীয় মানবীয় অনুভূতি হারিয়ে ফেলে।' (হুডল্ফ হকার, ১৯৩৮; হুডল্ফ হকার, ২০১১)

রাজনীতি-যন্ত্র মানে কিন্তু শুধু রাজনৈতিক দল না। রাজনৈতিক বন্দোবস্ত মানে তাহলে কী? রাজনীতি মানে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা। গোটা রাজশাহী বিভাগ একজন বিভাগীয় কমিশনারের দায়িত্বে। বিভীষিকাপূর্ণ দায়িত্ব। এই কমিশনারটি যদি অলৌকিক ক্ষমতাধর ব্যক্তিও হয়ে থাকেন তাঁর পক্ষে গোটা রাজশাহী বিভাগের সরকারী-সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা একটা অলীক কথা। কিংবা একজন ভাইস-চ্যান্সেলর। তিনি গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান। পাতাও নড়বে না ওনার স্বাক্ষর ছাড়া। বাতাস প্রবাহিত হবে না। হয় না। এইটা হচ্ছে রাজনীতি। আমাদের পরিবার-কাঠামোর মধ্যেও এই বস্তু আছে। পরিবারেও একজন 'বিভাগীয় কমিশনার' আছেন, একজন 'ভাইস-চ্যান্সেলর' আছেন, একজন 'রাষ্ট্রপতি' আছেন।

এই রাজনৈতিক বন্দোবস্ত আমাদের ধর্মকেও খেয়ে ফেলছে। আমাদের ধর্মে দেখবেন, ওমুক ফকির – তিনি বস্। ওমুক পীর, ওমুক ইমাম, উনি হলেন গুরু। যাবতীয় গুরু, পুরোহিত, পাদ্রী, হুজুর, কর্তা, বস্ – এরা হচ্ছেন রাজনীতির প্রতীক। এই সিস্টেমটাই রাজনীতি। রাজনীতির প্রভাবে এটা আমাদের ধর্মের মধ্যেও জেঁকে বসেছে। রাজনীতি আমাদের শিক্ষাঙ্গনে আছে, আমাদের সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে-প্রশিক্ষণে-দীক্ষায়নে আছে, যাবতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে আছে।

মুশকিলটা হচ্ছে: ধরেই নেওয়া হয় যে আপনি-আমি কিছু পারি না। কে পারেন? 'এক্সপার্ট'রা পারেন। যাবতীয় গুরুরা পারেন। যাবতীয় হুজুররা পারেন। ধর্ম – আপনি-আমি বুঝি না। কে বোঝেন? ওমুক হুজুর। তমুক পীরসাহেব। আপনাকে যে হাশরের মাঠে একা একা দাঁড়িয়ে জবাব দিতে হবে, এই হুঁশটা সারাক্ষণ থাকছে না। আপনার পক্ষ থেকে কোনো পীরসাহেব গিয়ে দাঁড়াবে না ওখানে আপনার সাফাই গাওয়ার জন্য। আপনি-আমি 'বুদ্ধিজীবী' না, 'এক্সপার্ট' না, 'নেতা' না, আপনি-

আমি সাধারণ মানুষ। অথচ এই আপনি-আমিই কিন্তু সমাজ। আপনি-আমিই সংস্কৃতি। আমাদের স্বশাসনের কোনো ক্ষমতা নাই, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নাই।

শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, যিশুখ্রিষ্ট কিংবা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মতো নবী-রসুল-অবতার-ধর্মপ্রচারকগণ কেউই 'রাজা' বা 'রাষ্ট্রপতি' বা 'পার্টি সেক্রেটারি' ছিলেন না। কোরান-শরিফে আজকের অর্থে রাষ্ট্র পরিগঠনের কোনো ধারণা নাই। ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা তো নাইই। কোরানে পার্টির ধারণাও নাই। কোরান অনুসারে মুসলমানদের অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে ইসলামের নামে পার্টি গঠন করার কথা না। তার ওপরে ইসলাম তো মুসলমানদের ধর্ম শুধু নয়! এটা সারা পৃথিবীর মানুষের ধর্ম। আদি ইসলাম সাম্য-ভাতৃত্ব-স্বাধীনতার ধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্ম হচ্ছে আল্লার রাজত্ব। আল্লার রাজত্ব মানে হচ্ছে, আল্লা ছাড়া আর কাউকে কুর্নিশ না করা। আর রাজাদের যে রাজত্ব, সেটা হচ্ছে ইবলিসের রাজত্ব। ওখানে এক নম্বর কথা হচ্ছে, আল্লাকে বাদ দিয়ে রাজা-রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীকে কুর্নিশ করা। আল্লার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে রাজা-রাষ্ট্র-কর্তৃত্বতন্ত্র। তাঁরা বলেন: তুমি যখন জন্ম গ্রহণ করবে, আমার খাতায় নাম লেখাবে। তুমি যখন মারা যাবে, গোরস্তানে মাটি দেওয়া হবে, শ্মশানে পোড়ানো হবে, তখনও আমার কাছে সার্টিফিকেট লিখিয়ে নেবে। এক-এগারোর সামরিক শাসনে আমরা যখন কোর্টে দাঁড়ালাম, সেখানে দেখলাম কী, আমার নাম যে নিউটন, আমাকে যে অমুক লোক 'এক্স' এবং তমুক নারী 'ওয়াই' জন্ম দিয়েছে, সেটা আমি প্রমাণই করতে পারব না ভালো উকিল ছাড়া। এরই নাম রাজনৈতিক বন্দোবস্ত। এ বস্তু ধর্মের বিপরীত। সংস্কৃতির বিপরীত।[১]

আর সংস্কৃতির কাজ কী? সংস্কৃতি ঠিক এর পাল্টা জিনিস। সংস্কৃতির সূত্রপাতই ঘটে যখন মানুষ প্রশ্ন করে, অনুসন্ধানে রত হয়, চ্যালেঞ্জ করে। সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে যখন মানুষ মুখস্ত বুলি না আউড়িয়ে একান্তই নিজের মতো করে চিন্তা করতে শুরু করে, শিখতে শুরু করে, এবং নিজের পায়ে ও নিজের মাথায় দাঁড়াতে শুরু করে। এইটা হলো সংস্কৃতির সূচনাবিন্দু।

আমাদের দেশের দিকে তাকালে আপনি দেখবেন, আমি যেটা বললাম, সে কথাগুলোকে আপাত অর্থে ঠিক মনে হবে না। কেন ঠিক মনে হবে না? কারণ, আমাদের এখানে ষাটের দশকে যখন বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ধারা শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে, তখন একই সঙ্গে, সেই রাজনীতিকে সমর্থন করে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেরও সূচনা ঘটে। আজকের অনেক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নেতা সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগপৎ কর্মী। এই

১ ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আরো খানিক খোলাসা করার জন্য দেখা যেতে পারে: সেলিম রেজা নিউটন, ২০১০।

যুগপৎ কর্মী হওয়াটাই মজার। যাঁরা ছাত্র ইউনিয়ন করেছেন সেই সময়, ষাটের দশকে, তাঁরাই 'সংস্কৃতি সংসদ' করেছেন। রাজনীতি এবং সংস্কৃতি একই পরিবারের দুই ভাইবোনের মতো পরস্পরের সঙ্গে লেনদেন করে অগ্রসর হয়েছে। এই ধারা একাত্তরের পরেও, এখন পর্যন্ত, বহাল আছে। এ জন্যই আমাদের মনে হয় রাজনীতি আর সংস্কৃতি বুঝি পরস্পরের খুব নিকট-সত্তা।

এ ধারণার অভ্রান্ততা সম্পর্কে আমার সংশয় আছে। আমাদের এখানে ষাটের দশক থেকে এ পর্যন্ত দেখবেন, সংস্কৃতি রাজনীতির গোলামি করেছে। সংস্কৃতি নিজের পায়ে দাঁড়ায় নি। সংস্কৃতি নিজের মাথার ওপরে দাঁড়ায় নি। সংস্কৃতি রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। যেমন আমাদের এক সময়ের স্বর্গীয় নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন লিখেছেন পত্রিকা কী হবে: পত্রিকা হবে পার্টির নাটবল্টু, পার্টির ইস্ক্রু এবং দাঁত। যান্ত্রিক চাকার ইস্ক্রু এবং দাঁত যে রকম থাকে, সে রকম।[২] আর সংস্কৃতি কী

---

২ ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন: ১৯০৫ সালে 'বিপ্লবী সংবাদপত্রের মৌলনীতিসমূহ' নামক এক রচনায় লেনিন সুস্পষ্ট ভাষায় বলছেন: '**সাহিত্যকে হতে হবে পার্টি সাহিত্য।** বুর্জোয়া রীতি, মুনাফা অর্জনকারী, ব্যবসাদারী বুর্জোয়া সংবাদপত্র, বুর্জোয়া সাহিত্য সম্পর্কিত ব্যক্তিগত উন্নতি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নবাবী নৈরাজ্য ও মুনাফা শিকারের বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক সর্বহারাকে পেশ করতে হবে **পার্টি সাহিত্যের নীতি**, তাকে বিকশিত করতে হবে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে যথাসম্ভব পূর্ণতর ও সমগ্রতর রূপে।

'পার্টি সাহিত্যের এই নীতিটা কী? এটা শুধু এই নয় যে সমাজতান্ত্রিক সর্বহারার কাছে সাহিত্যের ব্যাপারটা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ধনী করার হাতিয়ার হতে পারবে না: সাধারণ সর্বহারা কর্মকাণ্ড থেকে স্বাধীন একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে থাকাটাও তার আদৌ চলবে না। দূর হোক অ-পার্টি সাহিত্যিক! দূর হোক সাহিত্য বিষয়ক অতিমানব! সাহিত্যের ব্যাপারটাকে হতে হবে সাধারণ সর্বহারা কর্মযোগের একটা অংশ, হতে হবে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর সমস্ত রাজনৈতিক সচেতন অগ্রবাহিনীর দ্বারা চালানো একক ও অখণ্ড সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক মেকানিজমের 'চাকা ও ইস্ক্রু'। **সাহিত্যের ব্যাপারটাকে হতে হবে সংগঠিত, পরিকল্পিত, সম্মিলিত সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি কাজের অঙ্গাঙ্গী অংশ**।' (কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৮: ১৩৯; ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, ১৯০৫)

প্রলেতারীয় সংস্কৃতি, তথা প্রলেতারিয়ান কালচার, বিকাশের জন্য গঠিত বলশেভিক প্রতিষ্ঠান 'প্রলেতকুল্ত'-এর কংগ্রেসের জন্য লেনিন যেসব সিদ্ধান্তের খসড়া রচনা করেন ১৯২০ সালের ৮ই অক্টোবর, তার পাঁচটি দফার মধ্যে প্রথমটিতেই দেখা যাচ্ছে বলশেভিক রাষ্ট্রের যাবতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের তথাকথিত 'প্রলেতরীয় একনায়কত্ব'। সংক্ষেপে পড়া যাক:

'সোভিয়েত শ্রমিক-কৃষক প্রজাতন্ত্রে যেমন সাধারণভাবে রাজনৈতিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তেমনি বিশেষ ক'রে শিল্পকলার ক্ষেত্রে **শিক্ষার সমস্ত ব্যাপারটা প্রলেতারীয়**

করবে? সংস্কৃতি রাজনীতিকে সার্ভ করবে। সার্ভ করা মানে সেবা করা। সার্ভ করা মানে দাসত্ব করা। এই হলো সংস্কৃতির কাছে রাজনীতির প্রত্যাশা। অন্যের কাছ থেকে আনুগত্য ছাড়া আর দাসত্ব ছাড়া কিচ্ছু প্রত্যাশা করে না রাজনীতি। কিচ্ছু না। কখনো না। কোনোদিন না।

ষাটের দশকের ঐ রাজনীতি-সংস্কৃতি আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। ঐ রাজনীতি-সংস্কৃতির ধারাই আমাদেরকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বন্দর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু যে পথে পৌঁছে দিয়েছে সেই পথটাই আমাদের জন্য খাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে খাল বেয়ে পেছন পেছন এসেছে কুমির। একাত্তর সালের পরেই কেবল কুমিরটাকে চেনা গেছে।

যখন আমরা বিরোধী দল থাকি, তথাকথিত বিপ্লবী থাকি, হীন রাজনৈতিক ক্ষমতা-কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করি, চ্যালেঞ্জ করে লড়াই করি, এবং লড়াই করে জিতে আসি, সেই জেতার আগ পর্যন্ত আমাদের সৃজনশীল শক্তিমত্তা, আমাদের চিন্তার স্বাধীনতা ইত্যাদি ইতিবাচক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর স্ফূরণ ঘটতে থাকে। আবার, যখনই আমরা ক্ষমতায় বসি, তখন আমাদের মধ্যে ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করার তথা নিজের-নিজেদের মতো করে ভাবার আর সুযোগ থাকে না।

ভারতবর্ষের লোকেরা কয়েক হাজার বছর ধরে জানেন, যে লঙ্কায় যায়, সেই হয় রাবণ। আর রুশ দেশের এক লোক, যাঁকে আমরা ছোটবেলার বলশেভিক দীক্ষায়নের কারণে বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী 'নৈরাজ্যবাদী' বলে গালি দিতাম, সেই মিখাইল বাকুনিন (লেনিনের প্রায় ষাট বছর আগে যাঁর জন্ম) খুব মূল্যবান একটা কথা বলেছিলেন: 'আমাদের মধ্যে সবচাইতে বড় বিপ্লবীকে আপনি রাশিয়ায় জারের ক্ষমতায় বসিয়ে

একনায়কত্বের লক্ষ্য সফলভাবে কার্যকরী করার ... প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হওয়া চাই। ('প্রলেতারীয় সংস্কৃতি প্রসঙ্গে', ৮ই অক্টোবর ১৯২০, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, ১৯৭১)

এই খসড়া সিদ্ধান্ত প্রণয়নের পরদিনই, ৯ই অক্টোবর ১৯২০, 'প্রলেতারীয় সংস্কৃতি নিয়ে সিদ্ধান্তের মুসাবিদা'য় অকল্পনীয় পরিষ্কার ভাষায় বলে দেওয়া হয়, পার্টি এবং রাষ্ট্রের শিক্ষাবিভাগের যোগফলই প্রলেতারীয় সংস্কৃতির সমষ্টি-সমগ্র:

'শিক্ষা জনকমিশারিয়েত থেকে আলাদা নয়, তার অংশ হিসাবে, কেননা রুশ কমিউনিস্ট **পার্টি+শিক্ষা জনকমিশারিয়েত = প্রলেতারীয় সংস্কৃতির Σ**' ('প্রলেতারীয় সংস্কৃতি নিয়ে সিদ্ধান্তের মুসাবিদা', ৯ই অক্টোবর ১৯২০, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, ১৯৭১)।

এই যদি হয় খোদ লেনিনের চিন্তন, তাহলে তার বাস্তবায়নের পথে রাষ্ট্র-পার্টির আমলাদের ভূমিকা কী হতে পারে তা হজেই বোধগম্য – সংস্কৃতির কাজ থাকে তখন স্রেফ রাষ্ট্র-রাজনীতিকে এবং আমলাতন্ত্রকে সার্ভ করা। (এই পাদটীকার মোটা হরফ সব বর্তমান গ্রন্থকারের।)

দেন, সেই বিপ্লবী লোকটা এক বছর যাওয়ার আগেই জারের চাইতে বড় জারে পরিণত হবেন।'

৫.৩ বলশেভিক কারাগার, লিবারাল কারাগার

রাশিয়াতে লেনিনরা যখন জারকে শীতপ্রাসাদ থেকে উচ্ছেদ করে সেখানে গিয়ে বসেন, তখন জার-আমলের যে দুর্গগুলো ভয়ঙ্কর কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো তাতে বন্দি করা হয়েছিল লেনিনবিরোধী বিপ্লবী বামপন্থীদের। বরফের দেশের শীতের মধ্যে ঐসব দুর্গের নির্জন আন্ডারগ্রাউন্ড কারা-কুঠুরিগুলোতেই এক সময় জেল খেটেছিলেন জারবিরোধী বিপ্লবীরা। লেনিন-ট্রটস্কি-স্ট্যালিনদের বলশেভিক সমাজতন্ত্র 'মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজে' জেলখানার বিলোপ ঘটাতে পারেনি। লেনিনীয় সমাজতন্ত্র এমন একটা সমাজতন্ত্র, যে সমাজতন্ত্র টিকে ছিল জেলখানার ওপরে। সে সময়ের পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি কারাগার ছিল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রুশ-সাম্রাজ্যে।

নোবেলবিজয়ী আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসিনের কথা বলি: নিজ দেশে (রাশিয়ায়) কয়েক বছর কনসেন্ট্রেশন-ক্যাম্পে তথা দাস-শিবিরে ছিলেন তিনি। জানবাজি রেখে লেখা তাঁর বিখ্যাত বই: গুলাগ আর্কিপিলাগো। সাত খণ্ডের মহাগ্রন্থ। বিষয় রুশ প্রিজন-সিস্টেমের পর্যালোচনা। আর কিছু না। আরেক রুশী ছিলেন প্রিন্স পিওতর ক্রুপোৎকিন। ছিলেন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাহিত্য-সমালোচক। একটি রাজ-পরিবারের সন্তান ছিলেন। অ্যানার্কিস্ট ছিলেন। তিনি যখন ২০/২২ বছর বয়সী, রাজকীয় সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট, তখন তাঁকে জারের কারা-সংস্কার কমিটির সদস্য হিসেবে রুশ কারাব্যবস্থার পর্যালোচনা করতে হয়েছিল। আর মাঝ বয়েসে এসে তাঁকেই ঐ বিভীষিকাপূর্ণ কারাগারে থাকতে হয়েছিল। দীর্ঘদিন।

জেলখানার উপযোগিতা কোথায়? জেলখানা আমাদের সমাজে কেন আছে? যখন এখানে রাজনীতি-সংস্কৃতি নিয়ে সুন্দর সুন্দর কথা বলছি, তখন এই রাজশাহী শহরে একটি অসাধারণ স্থাপনা শোভা পাচ্ছে আমাদের সর্বজনপ্রিয় পদ্মা নদীর ধারে। ইন্টারনেটে 'গুগল আর্থ' থেকে যখন আপনি তাকাবেন তখন দেখবেন জেলখানা-টাকে খুবই সুন্দর একটা স্থাপনা মনে হবে। আমি যখন জেলখানায় প্রথম ঢুকি, তখন প্রথম নজরে আমার কাছে 'আশ্রম' 'আশ্রম' মনে হচ্ছিল। তো, এত সুন্দর একটা রাষ্ট্র-আশ্রমে আমাদের এই সমাজের লোকেরা কেন আছেন?

যেহেতু আপনি এবং আমি স্বাধীন আছি, আমাদের এই স্বাধীনতার মূল্য দেওয়ার জন্যই অসংখ্য মানুষকে জেল খাটতে হয়। আর কোনো কারণ নাই।

আমাদের এ স্বাধীনতা অন্যদের বন্দিত্বের দামে কেনা। আর এই কারাবন্দিত্বের হিসেবে আজকের এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জেল-সিস্টেম হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্য। প্রতি দেড় শ জন লোকের একজন সেখানে জেলখানায় থাকেন (২০০৪ সালের *মাইক্রোসফ্টের এনকার্টা এনসাইক্লোপিডিয়া* সিডি-সংস্করণে দেওয়া ১৯৯৯ সালের হিসাব)। ১৯৯০ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় অব্দি পৃথিবীজোড়া তথাকথিত বিশ্বায়নের সময়কাল। আবার এটাই বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে নিওলিবারাল / মুক্তবাজার / পুঁজিবাদী অর্থনীতির আপাত রমরমার সময়কাল। এই পর্বেই আমাদের 'সভ্য' দুনিয়া ভয়াবহ রকমের কারাগারের বিস্তার দেখছে। ''গত শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকে আমেরিকার কারাগার ব্যবস্থার বৃদ্ধি এমনই সাংঘাতিক রূপ নিয়েছে যে, সেটাকে 'কারাগারতন্ত্র' নামেই ডাকা যেতে পারে'' (নৈবেদ্য চট্টোপাধ্যায়, ২০০৭: ৩৮)। অর্থাৎ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার এই যুগ, তথা সুশীল-সামরিক জেল-জমানা, শুধু বাংলাদেশের ঘটনা নয়। আন্তর্জাতিক পরিসরেও একটা কারাগারের যুগ ক্রমাগতভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। আমাদের মার্কিনী ধাঁচের গণতন্ত্র হয়ে উঠছে কারাগার-গণতন্ত্র, কারাগার-ধনতন্ত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে' ব্যবহৃত আবু গারিব কারাগার এবং গুয়ানতানামো বে কারাগার বিশ্ব-পরিসরে কারাযুগের নবপ্রবর্তনারই ইঙ্গিতবাহী। প্রাণহীন পুঁজিবাদ বানানোর জন্য লাগে অগণন কারাগার, অতিকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা আর সেনাবাহিনী, আর তথাকথিত আইনের শাসন (সেলিম রেজা নিউটন, ২০০৮-খ)।

কারাগার এখন অনেক উন্নত দেশে প্রায়-মজুরিহীন, মাঙনা, শ্রমের লাভজনক কর্পোরেট ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। জেলখানার নাম হয়েছে 'কারাশিল্প-কমপ্লেক্স'। সুতরাং এটা কোনো ব্যতিক্রম নয় যে বাংলাদেশে চলমান প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সুশীল-সামরিক জরুরি জমানার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হচ্ছে, টান দিয়ে উপড়ে তুলে পুঁজিবাদের বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রাণহীন, জৈব সম্পর্কহীন, রীতিনীতি-সংস্কৃতির এবং উন্নতির অনন্ত গহ্বরের মধ্যে আমাদের দেশটাকে নিক্ষেপ করা, যেন আমরা 'সুন্দর সুসভ্য' হই। প্রাণহীন পুঁজিবাদ বানানোর জন্য লাগে অগণন কারাগার, অতিকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা আর সেনাবাহিনী, আর তথাকথিত আইনের শাসন। বিশ্ব পুঁজিবাদের প্রাণকেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের দিকে তাকালেও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার এই একই গতিধর্ম লক্ষ করা যায়।

সম্প্রতি প্রয়াত বৃটিশ অ্যানার্কিস্ট-প্রফেসর কলিন ওয়ার্ডের আলোচনা থেকে জানা যায়, ১৯৯৮ সালের একটি রিপোর্ট বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের ১৫ লক্ষ কয়েদিকে রাখার ব্যবস্থা করতে ১৬৮টা নতুন প্রাদেশিক পর্যায়ের রাষ্ট্রীয় কারাগার এবং ৪৫টা

কেন্দ্রীয় পর্যায়ের রাষ্ট্রীয় কারাগার বানাতে হয়েছে শুধু ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে। কিন্তু নতুন সব কয়েদির জন্য এতেও জায়গা হচ্ছে না। ২০০০ সাল নাগাদ এসে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েদি-সংখ্যা ২০ লক্ষ পার হয়েছে। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সম্মেলনে সমাজবিজ্ঞানী ডেভিড ডাউনস জানিয়েছেন, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও কোথাও এত মানুষকে এক সাথে বন্দি করে রাখা হয় নি। বৃটেন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, বৃটেনও এগুচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের এই নিওলিবারাল পথেই। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে বৃটেনই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি নাগরিককে বন্দি করে রাখছে। নিওলিবারাল পথই যে এই কারা-প্রসারের জন্য দায়ী সেটা বোঝা যায়, যদি আমরা মনে রাখি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতেই কারাবন্দি মানুষের সংখ্যা হারে কমছিল (উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিল সোভিয়েত রাশিয়া এবং তার উপগ্রহ-দেশগুলো)। যুদ্ধের পরপরই নেদারল্যান্ডে বন্দি ছিল প্রতি এক লাখ মানুষের মধ্যে ৯০ জন। ১৯৭৫ সালে নেদারল্যান্ডে এ সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছিল লাখ-প্রতি ১৭ জনে। সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকে এই প্রবণতা উল্টা-গতি অর্জন করে। এবং প্রধানত মধ্য-আশির দশকে সূচিত নিওলিবারাল-পন্থার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ছিল সত্তরের এই দশকটা। (কলিন ওয়ার্ড, ২০০৪: ৪৩-৪৪)

৫.৪ জাতীয় শত্রুর রাজনৈতিক বিনির্মাণ

আমি যখন লেনিনের নাম বলছি, কাউকে অশ্রদ্ধা করার জন্য তা বলছি না। ইতিহাসে প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে। সে সমস্ত ভূমিকার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক থাকে। আমি শুধু নিজের মাথা খাটিয়ে, নিজের মতো করে তাকানোর চেষ্টা করছি। এবং দেখতে পাচ্ছি, রাজনীতি ও সংস্কৃতি পরস্পরের শত্রু।

লেনিনের মতোই, আমরা (আওয়ামী লীগ এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংগঠন) যখন স্বাধীন বাংলাদেশের সিংহাসনে (কেউ কেউ তক্তপোষে) আরোহন করলাম, তখন আমরাও 'লঙ্কার রাবণ' হওয়ার জন্য যা যা যোগ্যতা লাগে, সেসমস্ত যোগ্যতার অসামান্য পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছি। ফলে গোটা পঞ্চাশ-ষাটের দশক ধরে সাংস্কৃতিক যে গণজাগরণ ঘটল, সেই জাগরণের চিহ্ন মাত্র আর বাহাত্তরে, তিয়াত্তরে, চুয়াত্তরে, পঁচাত্তরে দেখা গেল না। দেখা যে গেল না, সেটা খেয়াল পর্যন্ত করলেন না কেউ। তার মানে, নিজেদের সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার দিকে না তাকিয়ে আপনি আসলে শত্রু খুঁজছেন। রাজনীতির এক নম্বর কর্তব্য হচ্ছে একটা গণশত্রু দাঁড় করানো এবং সেই শত্রুর ঘাড়ে যাবতীয় দোষ চাপিয়ে নিজের সমস্ত ব্যর্থতাকে আড়াল করা। গণশত্রু না থাকা পর্যন্ত কোনো

রাজনীতিই জায়েজ হয় না।

তো, আমরা সেই কাজই করলাম। একদিন ঘুম থেকে উঠে আমরা একটা 'বিষধর সর্প' আবিষ্কার করলাম। দেখলাম স্বাধীনতাবিরোধী সাপের ছোবলে জাতি জর্জরিত। আমাদের নিজেদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বে-ক্ষমতায়-পরিচালনায়-দাপটে গড়ে উঠতে থাকা স্বাধীন বাংলাদেশে এত বড় আজদাহা কীভাবে-কোত্থেকে অবতরণ করতে পারল সেই প্রশ্নটা তোলার কোনো প্রয়োজনই বোধ করলাম না আমরা।

আসলে কিন্তু সেই সাপটা আমাদের ভেতরেই ছিল। ছিল আমাদের উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যকার অন্তর্জাত অসঙ্গতিরই ভেতরে। ছিল আমাদের রাজনীতি-সংস্কৃতির বহু-প্রশংসিত 'মেলবন্ধন'-এর মধ্যে। অদ্ভুত শোনালেও, একাত্তরে বিজয়ের পর থেকেই প্রকৃতপক্ষে আমাদের দুর্গতির শুরু হয়েছে। আমরা লঙ্কায় গিয়েছি। রাবণ হয়েছি। একচ্ছত্র ক্ষমতা-রাজনীতির মহাদামামা বাজাতে বাজাতে ড্রাম ফাটিয়ে ফেলেছি এবং নিজেদের অজান্তেই খুন করে ফেলেছি সংস্কৃতিকে।

ফলে বঙ্গবন্ধুকে যখন অকল্পনীয় নৃশংসভাবে, সপরিবারে, খুন করে ফেলা হচ্ছে, এখানে কোনো সংস্কৃতির 'স' শোনা যাচ্ছে না। সেই অবস্থা কিন্তু এখন পর্যন্ত চলছে। আপনি দেখবেন, যখন ঐসব বিষধর সাপেরা বাংলাদেশের মন্ত্রীসভার সদস্য হয়েছেন, বাংলাদেশের সংসদের সদস্য হয়েছেন, বড় বড় আস্ফালন করেছেন, তখন আমরা মঞ্চ-গরম মুখস্ত বুলি অনেক আউড়েছি বটে, কিন্তু সংস্কৃতি, যার মূল শনাক্তকরণ-চিহ্ন হচ্ছে প্রতিরোধ, সেই প্রতিরোধের 'প'-ও দেখাতে পারিনি; এখনও পর্যন্ত না।

৫.৫ রাজনীতি বনাম সমাজ-সংস্কৃতি

সমস্যার গোড়া মনুষ্য-স্বাধীনতাবিরোধী বৃটিশ-পাকিস্তানী ধারার কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-কাঠামোয়। সংস্কৃতিকে তাই মানুষের স্বাধীনতার সঙ্গে করমর্দন করে পথ খুঁজতে হবে। তবে, উচ্চনিচ-কর্তৃত্ব-ক্রমতন্ত্র শুধু রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য না, শুধু রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্যও না। রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত এমন জায়গায় গেছে যে, আমাদের গোটা সমাজটাই আজ একটা রাজনৈতিক সমাজে পরিণত হয়েছে।

মনে রাখা দরকার, সমাজ হলো মানব-পরিসরের সে জায়গাটুকু, যে জায়গাটুকুতে ক্ষমতা-রাজনীতি-কর্তৃত্বতন্ত্রের মাতব্বরি নাই। আর রাজনীতি হলো সেই জায়গাটুকু, যে জায়গাটুকুতে সমাজ নাক গলাতে পারে না। আমাদের এখনকার যে সমাজ, ঐ সমাজে সমাজটুকু আজ নিখোঁজ প্রায়। গোটা সমাজটাই একটা রাজনৈতিক সিস্টেমে পরিণত হয়েছে। সমাজের প্রত্যেকটা কড়িবর্গা, প্রত্যেকটা খুঁটি, প্রত্যেকটা ব্যক্তি হয় এই রাজনৈতিক দলের প্রতি না হয় ঐ

রাজনৈতিক দলের প্রতি প্রকাশ্যে আনুগত্য ঘোষণা না করলে শান্তি নাই, স্বস্তি নাই, নিরাপত্তা নাই।

আজ থেকে বহু দশক আগে নৈরাজ্যচিন্তক হুডল্ফ হকার সেই সময়কার ইউরোপের ফ্যাসিবাদী-বলশেভিক রাষ্ট্রগুলো সম্পর্কে যা বলেছিলেন, আমাদের আজকের বাংলাদেশের দিকে তাকালে মনে হবে আমরা সেরকম একটা রাষ্ট্রের খপ্পর থেকে আজও বের হতে পারি নি। কেননা রাষ্ট্রের মাত্রেরই ঝোঁক আসলে ফ্যাসিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ার। কোনো প্রকার স্বাধীন চিন্তার অবকাশ দেয় না এই রাষ্ট্র। এই

> রাষ্ট্র এখন সমস্ত জনসাধারণের ওপর পর্ব্বতপ্রমাণ বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটা অভিব্যক্তিকে রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি দ্বারা নির্ধারিত একটা প্রাণহীন রীতি-আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করছে এই রাষ্ট্র। নিষ্ঠুর ও বর্বর বলপ্রয়োগ করে দমিয়ে দিচ্ছে বিদ্যমান অবস্থাকে বদলানোর প্রত্যেকটা প্রচেষ্টাকে। সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্র হচ্ছে আমাদের সময়ের একটা ভয়াবহ অশুভ সংকেত। ... এটা হলো মনের ওপর রাজনীতি-যন্ত্রের বিজয়। এটা হলো পদস্থ কর্তাব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুন অনুযায়ী মানুষের চিন্তা, অনুভূতি আর আচার-আচরণের যুক্তিসিদ্ধ সঙ্গতিবিধান। পরিণামে, এটা হলো যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির পরিসমাপ্তি। (হুডল্ফ হকার, ১৯৩৮; হুডল্ফ হকার, ২০১১)

এ কথা সত্য যে সংস্কৃতি দুর্বল থাকলে রাজনীতি, মানে ক্ষমতাচর্চা সংস্কৃতিকে বেশি করে প্রভাবিত করে। সামরিক আইনের সময়, জরুরি অবস্থার সময়, যুদ্ধের সময়, রাজনৈতিক হানাহানির সময় সংস্কৃতি কুঁকড়ে যায়, দুর্বল হয়ে যায়। কারণ তখন রাজনীতির বা ক্ষমতাচর্চার বাড়বাড়ন্ত। সংস্কৃতির কাছ থেকেও সে আনুগত্য-দাসত্ব আদায় করে নেয় অনেকখানি। আমাদের দেশেও রাজনৈতিক হানাহানির এই পর্বে (গত দুই দশক ধরে) সংস্কৃতির বিকাশ স্থবির হয়ে আছে। সব সংস্কৃতিওয়ালারা দলবাজ-সংস্কৃতির চর্চা করছেন, তথা সংস্কৃতির নামে রাজনীতির চর্চা করছেন। মাথা বেচে দিয়ে দালালি করছেন। তার আগে এরশাদের সামরিক আইনের সময়ও সংস্কৃতির বিকাশ প্রচণ্ড বাধাগ্রস্ত ছিল। বাক-ব্যক্তি-চিন্তা-প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। সংস্কৃতি বলতে তখন যা খানিকটা তৈরী হয়েছিল তা ছিল স্লোগানধর্মী, স্থূল, রাজনৈতিক প্রত্যাশা পূরণের হাতিয়ার মাত্র, এবং সেই অর্থে দলীয় সংস্কৃতি, বা সংস্কৃতির নামে ঐ রাজনীতিই। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, আবৃত্তি ফেডারেশন, জাতীয় কবিতা পরিষদ, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন ইত্যাদিকে তখন ১৫-দলের, ৮-দলের, ২২-সংগঠনের রাজনৈতিক প্রত্যাশাই পূরণ করতে দেখা গেছে প্রধানত।

আবার গোটা মধ্যযুগের ইউরোপে রাষ্ট্র এবং চার্চের সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্রী কর্তৃত্ব-

ক্ষমতা-রাজনীতির চূড়ান্ত বাড় বেড়েছিল। পরিণামে সেটা ছিল সংস্কৃতির প্রায়-মৃত অধ্যায়। পরে যখন একের পর এক বিদ্রোহ, হানাহানি-যুদ্ধ-মারি-মড়ক, এবং আর্থ-সামাজিক (ব্যবসা-বাণিজ্যিক) রূপান্তরের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র-চার্চের কর্তৃত্ব-ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকল তখনই দেখা দিল রেনেসাঁ। সংস্কৃতির নতুন আবাহন। স্বাধীনতার সীমা বাড়ল। কর্তৃত্ব কোনঠাসা হতে থাকল। পরিণামে নতুন রাজনীতিতে রাজতন্ত্র, চার্চতন্ত্র, এবং সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্র আর থাকল না। যেমনই হোক ক্ষমতা বেশ খানিকটা বিকেন্দ্রীকৃত হলো। খানিকটা গণতন্ত্র অন্তত মুখে স্বীকার করা হলো। বাস্তবেও তার অনেকটাই প্রতিফলন ঘটল। আগের যুগের তুলনায়। তার পরিণামে আবার ব্যক্তি ও সমাজের স্বাধীনতার সীমা ও সংস্কৃতি-বিজ্ঞান-দর্শনের চর্চা আরো বাড়ল।

আর সংস্কৃতি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে অধিকতর স্বাধীনতাপরায়ণ সামাজিক অবস্থায়। এরকম অবস্থা তৈরি হয়, যখন রাজনৈতিক কর্তৃত্বতন্ত্র-হুকুমতন্ত্র দুর্বল ও শিথিল হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার সীমা তখন বাড়তে থাকে। সংস্কৃতির উপযুক্ত বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আর সংস্কৃতি প্রাণবন্ত থাকলে তো সংস্কৃতিই রাজনীতিকে বেশি করে প্রভাবিত করে। রাজনীতিকে-ক্ষমতাচর্চাকে আরো দুর্বল করে ফেলে তা। হুকুমতন্ত্র আরো গুটিয়ে যায়। কোনঠাসা হয়ে পড়ে। মানুষের স্বাধীনতাস্পৃহাকে সে ভয় পায়। পরিণামে, ঘুরেফিরে সংস্কৃতি শক্তিশালী হয়।

আজকের ইন্টারনেট-ফেসবুক-ব্লগ-ইউটিউব ইত্যাদির দিকে তাকালে দেখা যাবে এই সাইবার-পরিসরে রাষ্ট্রীয় ও ফৌজদারি ক্ষমতা-খবরদারি তথা রাজনৈতিক ক্ষমতা-খবরদারি এখনও খুব কম। পরিণামে এখানে হু হু করে সংস্কৃতি বিকশিত হচ্ছে। অজস্র ধারার কবিতা-গান-গল্প-প্রবন্ধ-নিবন্ধ এমনকি বিশ্লেষণ ও দর্শনচর্চার অজস্র প্রকাশ ঘটছে স্বাধীনভাবে। সংস্কৃতি এই পরিসরে শক্তিশালী হচ্ছে। এখন রাষ্ট্র-ফৌজদারি-রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্রগুলো চাইছে এর ওপরে খবরদারি। তা যদি সফল হয় তাহলে দেখবেন ইন্টারনেটে সংস্কৃতির বিকাশ মুখ থুবড়ে পড়বে। রাজনীতি আর সংস্কৃতি কি তাহলে পরস্পরবিরোধী সত্তা না? একটা বাড়লে আরেকটা কমে। রাজনীতি আর সংস্কৃতি উভয়ে উভয়ের পরিপূরক নয়। পরস্পরবিরোধীই বটে। স্বাধীনতা আর সংস্কৃতিই বরং পরস্পর-পরিপূরক। ভুলে গেলে চলবে না যে

> স্বাধীনতা বিমূর্ত কোনো দার্শনিক ধারণা নয়। এটা বরং যেসব সমতা, সামর্থ্য আর মেধা প্রকৃতি তাকে দিয়েছে, প্রত্যেক মানুষের সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটাতে পারার এবং সেগুলোকে সামাজিক হিসাবনিকাশে রূপান্তরিত করার সপ্রাণ বাস্তব সম্ভাবনা। ধর্মযাজকীয় বা রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব দিয়ে মানুষের এই স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক বিকাশ যত কম প্রভাবিত হয়, মানুষের

> ব্যক্তিত্ব তত বেশি কুশলী ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয়ে ওঠে। তত বেশি সেই ব্যক্তিত্ব যে-সমাজে তা গড়ে উঠেছে তার মানদণ্ডে পরিণত হয়। [এবং] এই হলো সেই কারণ যেজন্য ইতিহাসের সমস্ত সংস্কৃতি-কাল রাজনৈতিক দুর্বলতার কাল হয়ে থেকেছে। এবং সেটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। কেননা রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থাসমূহকে সবসময়ই যান্ত্রিকতার উপর খাড়া করা হয় – সামাজিক শক্তিসমূহের জৈবিক বিকাশের উপর নয়। নিজ নিজ সত্তার গভীরে রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতি অমীমাংসেয়-রকমের বিপরীতধর্মী। (হুডল্ফ হকার, ১৯৩৮; হুডল্ফ হকার, ২০১১)

নিজের এ কথার সপক্ষে জার্মান দার্শনিক ফ্রিডরিখ নিটশে'র কথা উদ্ধার করেছিলেন হুডল্ফ হকার:

> এ ব্যাপারে কারও প্রতারিত হওয়া ঠিক হবে না যে সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্র পরস্পরের প্রতি বৈরিতাপূর্ণ ...। একটা আরেকটাকে খেয়ে বাঁচে, একটা আরেকটার বিনিময়ে উন্নতি সাধন করে। সংস্কৃতির সমস্ত মহান যুগপর্ব হচ্ছে রাজনৈতিক অধোগতির যুগপর্ব। সংস্কৃতিবান অর্থে যা কিছু মহান, তা রাজনৈতিক নয়; আসলে তা রাজনীতিবিরোধীই বটে। (নিটশের উদ্ধৃতি: হুডল্ফ হকার, ১৯৩৮; হুডল্ফ হকার, ২০১১)

পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক পক্ষগুলো আজকের বাংলাদেশে তাঁদের নিজ নিজ পছন্দের সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটানোর জন্য নির্ভর করছেন রাষ্ট্রের ওপর। সবাই রাষ্ট্রক্ষমতাটাকে দখল করতে চান। তার রাষ্ট্রশক্তির জোরে সংস্কৃতি ফলাতে চান। এভাবে সংস্কৃতির কোনো ফলন হয় না। কারণ,

> যেকোনো সাংস্কৃতিক বিকাশের পথে শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় কলকব্জা-পদ্ধতি হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধা। রাষ্ট্র যেখানে অভ্যন্তরীণ ক্ষয়ে আক্রান্ত, সমাজের সৃজনশীল শক্তিগুলোর ওপর রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাব-প্রতিপত্তি যেখানে সবচেয়ে নিচুতে নেমে এসেছে – সেখানেই সবচেয়ে ভালোভাবে বিকশিত হয় সংস্কৃতি।
>
> কেননা রাজনৈতিক ক্ষমতা সবসময় কঠোর চেষ্টা চালায় একরূপতা কায়েমের জন্য। এবং তা সমাজ-জীবনের প্রত্যেকটা দিককে তার নিজের অভিভাবকত্বের অধীনে বশীভূত করতে চায়। এতে করে রাষ্ট্রকে দেখা যায় যে সাংস্কৃতিক বিকাশধারার আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে অনতিক্রম্য বিরোধে সে লিপ্ত। আর এই সাংস্কৃতিক বিকাশধারা সবসময়ই খুঁজতে থাকে সামাজিক কর্মকাণ্ডের নতুন নতুন আদল ও এলাকা। এসব সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য চিন্তা, মতামত ও অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা এবং বস্তুনিচয়ের বহুপার্শ্বিক

> ও বহুবর্ণিল রূপান্তর আন্তরিকভাবে প্রয়োজনীয়। এবং ততটাই অসঙ্গতিপূর্ণ হলো অনড় রূপাবয়ব, মৃত আইনকানুন এবং সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটা অভিব্যক্তির জবরদস্তিমূলক অবদমন। (হুডল্ফ হকার, ১৯৩৮; হুডল্ফ হকার, ২০১১)

কাজেই সংস্কৃতিকে যদি বাঁচাতে হয়, সমাজকে যদি বাঁচাতে হয়, তাহলে আমাদেরকে রাজনীতির বাইরে এসে দাঁড়াতে হবে। সমাজকে পরিচালনা করার জন্য, আমাদের যাবতীয় অ্যাফেয়ার পরিচালনা করার জন্য, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটা সত্যিকারের সামাজিক বন্দোবস্ত গড়ে তুলতে না পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি-আমি চাইলেই রাজনৈতিক বন্দোবস্ত হাওয়া হয়ে যাবে না।

সুতরাং এই রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মধ্যে থেকেই আমাদেকে যার যার সাধ্যমতো ভূমিকা নিতে হবে। এই ভূমিকা নেওয়াটা নিতান্তই এই মুহূর্তের কাজ। আর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হচ্ছে ধীরে ধীরে, ক্রমাগতভাবে, তিল তিল করে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে যথাসম্ভব স্বাধীন স্বশাসিত, আত্মনির্ভর, পরস্পর-সহযোগিতাপরায়ণ সমাজশক্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে গোটা রাজনৈতিক বন্দোবস্তটাকেই প্রতিস্থাপন করা।

৫.৬ সমাজ-স্বাধীনতার পথে যাক শাহবাগ

আজকের বাংলাদেশে শাহবাগ-সমাবেশ একটা অভূতপূর্ব গণজাগরণের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। একে যদি তার কাঙ্ক্ষিত বন্দরে নিয়ে যেতে হয় তাহলে আমাদেরকে রাজনীতি আর সংস্কৃতি সম্পর্কিত অভ্যস্ত চিন্তাহীনতাকে প্রশ্ন-পর্যালোচনার সামনে দাঁড় করাতে হবে। আমরা যদি স্রেফ রাজনীতি-রাষ্ট্র-থানা-পুলিশ-কারাগারের পিঠে চড়ে বসে থাকি, তাহলে মঞ্জিলে মকসুদের পথ খুঁজে পাওয়া দুরাশা হয়েই থাকবে। আর আমরা যদি নবরক্তধারা-সঞ্চারিত নবতর বাংলাদেশের দিশা খুঁজতে চাই তাহলে আমাদের হাঁটতে হবে সমাজের পথে, সংস্কৃতির পথে। শাহবাগ-জাগরণের ম্যাজিক লণ্ঠনে ইতোমধ্যেই তার নিশানা উজ্জ্বল উঠছে বৈকি। হাজারো উপায়ে রচিত ছড়া কবিতা গান শিল্প সাহিত্য ছোটকাগজ সিনেমা আলোকচিত্র বইপত্র ইত্যাদি প্রভৃতি আসছে-ফাল্গুনের বাংলা-বসন্তের আগাম ইশতেহারের সৃজনশীল রূপরেখা রচনা শুরু করেছে। কোনো প্রকার চিন্তাবদ্ধতা তাকে আর বেশি দিন আটকে রাখতে পারবে বলে মনে হয় না।

আওয়ামী লীগ অথবা বিএনপিকে ভোট দিয়ে আসবে না সেই পরিবর্তন। তার জন্য চাই রাজনীতি নয়, স্বাধীনতা। চাই রাজনীতি নয়, সংস্কৃতি। মৌলিক রূপান্তরকামী সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটানোর জন্য স্বাধীন পরিবেশের কোনো বিকল্প নাই।

বহুদিন আগে হুডল্ফ হকার যেমনটা বলেছিলেন:

> মানুষজনকে মহৎ কাজে অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপ-রূপান্তর ঘটাতে পারে শুধু স্বাধীনতাই। মানুষজনকে শাসন করার কলাকৌশল তাদেরকে শিক্ষিত করার ও তাদের জীবনকে নতুন রূপ দিতে অনুপ্রাণিত করার কলাকৌশল হয়ে ওঠে নি কখনোই। একঘেঁয়ে ও বিষণ্ন বাধ্যবাধকতার হুকুমদখলে থাকে শুধু প্রাণহীন রুটিন-বাঁধা অনুশীলন। এ বাধ্যবাধকতা যেকোনো আন্তরিক উদ্যোগকে তার আঁতুড় ঘরেই শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলে এবং জন্ম দিতে পারে শুধু পরাধীন প্রজাদেরকে, স্বাধীন মানুষকে নয়। জীবনের আসল নির্যাসই হচ্ছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা হচ্ছে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক বিকাশের চালিকাশক্তি। (হুডল্ফ হকার, ১৯৩৮; হুডল্ফ হকার, ২০১১)

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

একটি সেমিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যা আমি বলেছিলাম তার অডিও-অনুলিপি এই রচনার আদি উৎস। এটা সেই অনুলিপির পরিবর্ধিত ভাষ্য। মূলত কবি আসাদ মান্নানের (বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী। প্রকাশিত কবিতার বই: সৈয়দ বংশের ফুল, যে পারে পাড় নাই সেই পারে ফিরবে নদী। সংস্কৃতি-সংগঠক।) উদ্যোগে বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়, রাজশাহী ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন আয়োজন করেছিল দশদিনব্যাপী রাজশাহী সংস্কৃতি উৎসব। এর চতুর্থ দিনের বিশেষ সেমিনার ছিল 'চার দশকের বাংলাদেশ: রাজনীতি ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন' নিয়ে। সেখানে মূল প্রবন্ধ পড়েছিলেন কবি অসীম সাহা (ষাটের দশকের কবি। প্রকাশিত কবিতার বই: পুনরুদ্ধার, পূর্ব-পৃথিবীর অস্থির জ্যোৎস্নায়, কালো পালকের নিচে, অন্ধকারে মৃত্যুর উৎসব, উদ্বাস্তু।)। নির্ধারিত আলোচক ছিলেন নূহ উল আলম লেনিন (সিপিবি-র একসময়কার কেন্দ্রীয় নেতা। বর্তমানে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতা। কবি, লেখক। প্রকাশিত কবিতার বই: স্বপ্ন করপুটে, আকাশের সিঁড়ি, অনেক দূর যেতে হবে, ভালোবাসা হিসেব জানে না ইত্যাদি। অন্যান্য বই: *স্বাধীনতার সন্ধানে*, *প্রসঙ্গ নারী: নানা প্রেক্ষিত*, *নির্বাচিত কলাম*, *বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায়– বাঙালির কলঙ্কমোচন*। *পথরেখা* পত্রিকার প্রধান সম্পাদক।), মোহন রায়হান (কবি। এরশাদ-স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আশির দশকের ছাত্র-গণআন্দোলনের অন্যতম তুখোড় সংগঠক। জাসদ-ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। জাতীয় কবিতা পরিষদের অন্যতম উদ্যোক্তা-সংগঠক। প্রকাশিত কবিতার বই: *জ্বলে উঠি সাহসী মানুষ*, *ঘাতক না প্রেমিক*, *সবুজ চাদরে ঢাকা রক্তাক্ত ছুরি*, *গোলাপ জানের পকেট পঞ্জিকা* ইত্যাদি।), এবং বর্তমান রচনার প্রণেতা। অধ্যাপক সালিম সাবরিন (অধ্যক্ষ, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড মডেল স্কুল এন্ড কলেজ। কবি। প্রকাশিত কবিতার বই:

দুমুখো ঈগলের কোলাজ, নদীমহলের জার্নাল। প্রবন্ধের বই: *ভাষা, জাতি ও জাতীয়তা*; *কথাসাহিত্যের সমাজতত্ত্ব*; *মানিক বন্দোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে ব্রাত্যজীবন*; *আধুনিক ভাষাতত্ত্বের প্রসঙ্গ ও প্রকৃতি*। *এবংবিধ* নামের ছোটকাগজের সম্পাদক।) কর্তৃক পরিচালিত সেমিনারটিতে সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যাপক শফিকুর রহমান বাদশা (অধ্যক্ষ, রাজশাহী কোর্ট কলেজ। আওয়ামী লীগের রাজশাহী মহানগর-নেতা। সিপিবি, রাজশাহীর জেলা কমিটির প্রাক্তন নেতা।)। স্থান ছিল গ্রীন প্লাজা, নগরভবন, রাজশাহী। তারিখ ২০শে মার্চ ২০১১ বেলা চারটা।

সেমিনারে উপস্থাপিত আমার আলোচনার অডিও থেকে পরে অনুলিপি প্রণয়ন করেছিলাম আমি নিজে। তারপর সেটির সাথে কিছু টীকাটিপ্পনী জুড়ে দিয়ে সেটিকে ছাপার উপযোগী করে তুলেছিলাম। হুবহু সেই অডিও-অনুলিপি ছাপা হয়েছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা *মিথস্ক্রিয়া*-য়। পরে এটির পরিমার্জিত পাঠ ছাপা হয়েছিল রাজশাহীর *সোনার দেশ* পত্রিকায় ২৯শে মার্চ ২০১৩ তারিখে। ফেসবুকে পোস্ট করা হয়েছিল ৬ই এপ্রিল ২০১৩ তারিখে।

ছয

রাজা এবং রাষ্ট্রের ধর্ম: দণ্ডনীতির উৎপত্তির গল্প

My 2 Cacks - Cole Peterson

৬.১ নৈরাজ্যের ব্যুৎপত্তি: রাজা ও রাষ্ট্র

মার্কসীয়-লিবারাল বিশ্ববীক্ষার কারণেই সম্ভবত 'নৈরাজ্য' শব্দটিকে গতানুগতিক-ভাবে 'বিশৃংখলা' এবং 'কট্টরতা' অর্থে বিভ্রান্তিপূর্ণভাবে নিন্দা করেন। এঁরা আমাদের সেইসব বন্ধু যাঁদের সহজে কোনোকিছুতে খটকা লাগে না। পত্র-পত্রিকায় -প্রেসনোটে 'নৈরাজ্য' মানেই অশান্তি। পরিস্থিতি দেখে শব্দটার গভীর দার্শনিক তাৎপর্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান সুমন সম্প্রতি ফেসবুকে তাঁর স্ট্যাটাসে লিখেছেন, 'এই মৌসুমে যে দুইটা শব্দ বিপুলভাবে অপব্যবহৃত হচ্ছে' তার একটা হচ্ছে 'নৈরাজ্য' (অপরটা 'গণহত্যা'; আজ তা আলোচ্য নয়)।

'নৈরাজ্য' শব্দটার ভেতরে আছে 'রাজা' বিষয়ক ধ্যান-ধারণা। আসলে রাজ, বিরাজ, রাজ্য, রাজা, রাজন, সম্রাট, রাষ্ট্র প্রভৃতি শব্দের আদিতে আছে 'রাজ্'

নামের ধাতুটি (হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-খ: ১৯০৭)। এই 'রাজ্'-এর অর্থ হচ্ছে 'শোভা, দীপ্তি' (হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-খ)। এই ধাতু থেকে উৎপত্তি লাভ করা 'রাজ' শব্দটির অর্থ 'শোভা পাওয়া, দীপ্তি পাওয়া'; 'প্রকাশ পাওয়া, বিদ্যমান থাকা'। এইভাবে 'বিরাজ' শব্দের অর্থ 'শোভমান, শোভিত', 'দীপ্যমান, দীপ্ত'; কিংবা 'শোভা পাওয়া, শোভিত হওয়া'; 'শোভা করিয়া অবস্থান করা', 'বিদ্যমান থাকা, উপস্থিত থাকা'। 'সম্রাট' শব্দেরও অন্যতম অর্থ 'রাজা', এর গোড়ায় আছে 'সম্+রাজ+কিপ', অর্থাত্ 'যিনি মণ্ডলেশ্বর ও রাজগণের শাসক, তিনি সম্রাট'। তার মানে: যিনি শোভা পান, যিনি দীপ্তি পান, যিনি প্রকাশ পান, যিনি বিদ্যমান থাকেন, তিনিই হন রাজা।

কিন্তু 'রাজা' ছাড়া বাকি সব মানুষ কি শোভা পান না? দীপ্তি পান না? প্রকাশ পান না? বিদ্যমান থাকেন না? নিশ্চয়ই পান, নিশ্চয়ই থাকেন। কিন্তু 'রাজা' ছাড়া অন্যসব লোকের শোভা, দীপ্তি, প্রকাশ, বিদ্যমানতা প্রভৃতির বিশেষ কোনো মূল্য 'আইনত' নাই (আইন এখানে রাজার আইন, রাষ্ট্রের আইন)। কেননা 'রাজা' ছাড়া অন্যসব ব্যক্তিও যদি শোভা পান, দীপ্তি পান, প্রকাশিত হন, বিদ্যমান থাকেন, তাহলে আর 'রাজা'র সাথে সবার পার্থক্য কী থাকে?

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন 'আমরা সবাই রাজা', তখনই আসে নৈরাজ্যের প্রশ্ন। কেননা যে রাজ্যে বা যে রাষ্ট্রে এক 'রাজা' ছাড়া আর কারুর অস্তিত্বের, বিদ্যমানতার, বিরাজমানতার স্বীকৃতিই নাই, সেই রাজ্য দিয়ে কার লাভ? শুধু রাজাদের লাভ। এ কথা কে না জানে, রাজতন্ত্রের সর্বনিম্নপদস্থ দায়োয়ানটিও স্থান-কাল-পাত্রমতো নিজেই খোদ রাজা; আগা-পাছ-তলা এই রাজাদের সিস্টেম বা বন্দোবস্ত বা তন্ত্রের নামই তো দাঁড়িয়েছে রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রে দাসত্ব ছাড়া আমাদের জন্য কিছু বরাদ্দ নাই। রাজাকে দেশ লিখে দাও, তারপর দেশের মালিক রাজাকে খাজনা দাও, আর রাজপেয়াদার লাঠির বাড়ি খাও – এই আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য। তাহলে তো নৈরাজ্যই ভালো। রাজতন্ত্রের বদলে অরাজতন্ত্রই ভালো।

'রাষ্ট্র' শব্দের উৎপত্তিও ঐ একই জায়গা থেকে – 'রাজ্' (হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-খ)। 'রাষ্ট্র' শব্দটির গোড়ায় আছে: 'রাজ্+ত্র (ষ্ট্রন্)', যার অর্থ 'রাজ্য'। আর এই যে 'ষ্ট্রন্' – এর অর্থ সব সময়ই কোনোকিছুর গঠন-পরিগঠনের সাথে যুক্ত। মানে রাজত্ব বা বিরাজত্ব জিনিসটার যে গাঠনিক কাঠামো, তারই নাম 'রাষ্ট্র'।

আবার 'রাষ্ট্র' কথাটার আরও একটা অর্থ 'প্রচার, প্রকাশ' হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-খ। রাজার বিরাজত্ব যখন প্রচারিত হয়, প্রকাশিত হয় এবং সবাই সে ব্যাপারে সম্মত হন, তখনই 'রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা লাভ করে, গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে

যায়। এই গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে যাওয়ার সাথেই ওপরের ঐ 'ত্র' কথাটার সম্পর্ক। 'ত্র' অর্থ 'তরণ-রহন (এখনি তরিত হয়ে অন্য কোথাও চলে যাব, এই ভাব)' (২০০৯ সালে প্রকাশিত কলিম খান এবং রবি চক্রবর্তীর *বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ: ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের অভিধান,* পৃ. ৪৮৮)। তার মানে হলো, 'রাজা'র একক, অদ্বিতীয় ও প্রশ্নাতীত বিরাজত্ব যখন বাকি সবাইকে 'তরিত' হয়ে কোথাও 'রহন' করে বা রহে বা স্থিতি-কাঠামো লাভ করে, তখনই তার নাম হয় রাষ্ট্র।

'রাষ্ট্র' জিনিসটা তার মানে নিতান্তই 'রাজা'র একক ও অদ্বিতীয় বিদ্যমানতার সংস্থা। এ জিনিস কখনো জনগণের হতে পারে না। অতএব, বিদ্যমান গঠন-কাঠামোয় 'জনগণের রাষ্ট্র' বলে কিছু হয় না। এইজন্যই রাষ্ট্র শব্দের আরো একটা অর্থ 'উপদ্রব, মকরাদি, দুর্ভিক্ষ' হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-খ। তথাপি 'সভ্যতা' নামক গত পাঁচ হাজার বছরের রাজতন্ত্রে-শাসনতন্ত্রে 'রাজা' 'রাষ্ট্র' প্রভৃতিকে এতটাই স্বাভাবিকভাবে দেখানো হয়েছে যে এগুলো সব ডালভাত তো বটেই আলো-পানি-হাওয়ার মতো প্রশ্নাতীত প্রাকৃতিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে যেন।

আজকের 'রাজতন্ত্র'র মালিক-গোলাম-পেয়াদা আর নবরত্নসভার রাজ-বুদ্ধিজীবীরা এতক্ষণে হয়ত বলেই ফেলেছেন: তো, জনাব, দেশটা চলবে কী করে, চালাবেটা কে? প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ-অজ্ঞ রাজাদের, তাঁদের বাচাকাচ্চাদের, বাচ্চা-রাজাদের বা রাজসন্তানদের এইরকম শিশুসুলভ প্রশ্নেরও সযত্ন উত্তর রচনা করতে হবে বৈকি। এবং সে উত্তর হতে হবে চিন্তারহিত সাবালকের উপযোগী। কেননা সে নিজে চিন্তা করবে না, খুঁজবে না, ভাববে না, শুধু মুখস্থ কথা বলবে এবং 'উত্তম পশু'র মতো কুলগুরু পুরুত্ঠাকুরের শেখানো 'গায়ত্রী মন্ত্র' জপে যাবে, আর এক প্রশ্ন হাজারো ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যাবে: রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হবে তো, নইলে দেশটা চলবে কীভাবে?

তাকিয়ে দেখুন: খোদ এই মহাবিশ্বপ্রকৃতিকে পরিচালনা করার জন্য কী কোনো ব্যক্তি-রাজা লাগে? রাজতন্ত্র লাগে? থানা পুলিশ-পাইক-পেয়াদা-উজির নাজির-হাকিম-হুকুম-কারাগার-মন্ত্রী-মিনিস্টার লাগে? লাগে না। এগুলো লাগে পদার্থ-শক্তি-প্রাণের সর্বোচ্চ অভিপ্রকাশ মানুষের বেলায়ই শুধু। বাঘ-ভাল্লুক-শেয়াল-কুকুর-ইঁদুরের যা লাগে না, আশরাফুল মখলুকাত মানুষের তা লাগে। আশ্চর্য ঘটনা বটে। বনের রাজা সিংহ, অথবা মাছের রাজা ইলিশ থেকে শুরু করে বাতির রাজা ফিলিপস পর্যন্ত যত বানোয়াট কেচ্ছা যে নিছকই 'রাজা'র দীপ্তি বাড়ানোর বুদ্ধিবৃত্তিক ছলনা, সে কথা বোঝা কী এতই কষ্ট? প্রয়োজনে স্মরণ করুন লোক-ছড়ার ইঙ্গিত: মাছের রাজা রুই, শাকের রাজা পুঁই, নারীর মধ্যে আমেনার মা, পুরুষের মধ্যে মুই।

হ্যাঁ, 'রাজা' একটি অভ্যাসের নামই বটে। আনুষ্ঠানিক রাজতন্ত্র তো এখন

বিলুপ্ত-প্রায় পদার্থ। তার বদলে গণপতি গণেশের গণতন্ত্রের উত্থানের হাওয়া নতুন করে বইতে লেগেছে শ' দুয়েক বছর ধরে। তথাপি তথাকথিত নিরক্ষর-অশিক্ষিতদের জন্য মাতব্বর-চেয়ারম্যান তো লাগেই, সর্বোচ্চ শিক্ষালয়ের জন্যও একজন বাদশাহী ভাইস-চ্যান্সেলর লাগে।

৬.২ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন: রাজাগিরির যুক্তি

এতসব দীক্ষায়ন-প্রশিক্ষণ সত্ত্বেও কিন্তু 'রাজা' এবং 'রাজতন্ত্র'র বৈধতা ও যুক্তিসিদ্ধতা সম্পর্কে খটকা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় না; মনের মধ্যে কোথায় একটা খচখচানি থেকেই যায়। খটকাটা একেবারে আদি থেকেই ছিল বৈকি। মহাভারত তার প্রমাণ। মহাভারতের যুদ্ধের পরে তাঁর সর্বগ্রহণযোগ্যতার কারণে সকলেই যুধিষ্ঠিরকে 'রাজা' হওয়ার জন্য অন্তহীন কাকুতি-মিনতি করেই চলেছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির ছিলেন অনড়। 'রাজা' হতে চাননি তিনি মোটেও। তিনি বলছিলেন তিনি ধর্ম-জগতের লোক, রাজা তিনি হতে পারবেন না। মহাভারতের 'শান্তিপর্ব্ব'র গোড়ায় অর্জুনকে তিনি বলছিলেন: 'আমি রাজ্যলোলুপ হইয়াই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছি। ... অতএব আমি সমস্ত রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকদুঃখবিবর্জ্জিত হইয়া অরণ্যে গমন করিব। আমার রাজ্য বা উপভোগ্য দ্রব্যে কিছুমাত্র অভিলাশ নাই। অতঃপর তুমিই নির্ব্বিঘ্নে এই পৃথিবী শাসন কর।'

যুধিষ্ঠিরের এই একান্ত উপলব্ধির উত্তরে নিতান্তই রুষ্ট অর্জুনের বক্তব্য ছিল খুবই আক্রমণাত্মক ও সুস্পষ্ট এবং তাতে চিরন্তন ক্ষত্রিয়-ধর্ম তথা কর্তৃত্বধর্মের মহাসারকথাই ফুটে ওঠে: 'যদি রাজধর্ম্মে দ্বেষ প্রকাশ করিয়া আলস্যে কালহরণ করিবেন, তবে কি নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিলেন? ক্ষাত্র-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা মিত্রের প্রতিও ক্ষমা, অনুকম্পা, কারুণ্য বা অনৃশংসতা প্রকাশ করেন না। ... ক্ষত্রিয়গণ হিংসার্থই জন্মগ্রহণ করেন। হিংসাই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং সেই সহজ-হিংসাধর্ম্মের ও তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার নিন্দা করা ক্ষত্রিয়ের নিতান্ত অকর্ত্তব্য।' [মহাভারত, ২০০১ সালে প্রকাশিত কলকাতার 'তুলিকলম প্রকাশনী'র রাজ-সংস্করণ]

ক্ষত্রিয়-শাসক-রাজনীতিবিদ এবং তাদের শাসনযন্ত্র যে আজকের দিনেও এমনকি বন্ধুর প্রতিও 'ক্ষমা, অনুকম্পা, কারুণ্য বা অনৃশংসতা' প্রকাশ করে না, তা তো সমকালীন জাতীয় আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিকে তাকালেই বোঝা জলজ্যান্ত বোঝা যায়। 'রাজনীতিতে চিরস্থায়ী শত্রু-মিত্র বলে কিছু নাই' জাতীয় কথা তো আর এমনিতেই রটে নাই। আদি ক্ষত্রিয় অর্জুন থেকেই এইসব ধারণার উৎপত্তি। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁর কথায় অনড়। রাজা হওয়ার যুক্তিপ্রণালী কিছুতেই তাঁর গ্রাহ্য হয়

না – হওয়ার কথা না বলেই।

শেষ পর্যন্ত রাজ-রাজত্বের যুক্তিসিদ্ধতা কীসের ওপরে দাঁড়াচ্ছে সেইটাই আপাতত আমাদের দেখার বিষয়। তো, অর্জুনের যে নিজের ক্ষত্রিয়ধর্ম নিয়ে গর্ব, সেই গর্ব নিয়ে 'দেবত্ব' অর্জন করা যায় না, 'দেবলোকে' যাওয়া যায় না, সে কথাই তুলে ধরেন যুধিষ্ঠির। অনেক অনেক কথার পর অর্জুনকে এক পর্যায়ে তিনি বলেন: 'যে ভূমিপতি এই অখিল ভূমণ্ডল মধ্যে একাধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহারও এক ভিন্ন দ্বিতীয় উদর নাই। তবে তুমি কি নিমিত্ত বিপুল রাজ্যভোগের প্রশংসা করিতেছ? ... অতএব তুমি অগ্রে উদরকে পরাজিত কর, তাহা হইলেই তোমার সমুদয় পৃথিবী পরাজয় করা হইবে। ... রাজ্যালাভ ও রাজ্যরক্ষা এই উভয়েই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আছে; অতএব উহা পরিত্যাগ করিয়া মহদ্ভার হইতে বিমুক্ত হও। ... যাহাদের বর্ণ ও আশ্রমাদির অভিমান থাকে, তাহারা পিতৃলোক, আর যাহারা অভিমানশূন্য, তাহারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকে।'

কি সাংঘাতিক কথা। দেখা যাচ্ছে, বর্ণপ্রথার শ্রেয়ত্বের ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে যে রাজতন্ত্র, খোদ সেই 'বর্ণ ও আশ্রমের অভিমান' যুধিষ্ঠির আর বহন করতে প্রস্তুত নন। আর এই অভিমান না থাকলে যে 'রাজত্ব'ই অর্জন করা যায় না, সেই গুরুতর সত্যের প্রতিও এভাবে তিনি ভাবিকালের মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে বসে থাকেন। 'রাজত্ব' অর্জনের চেয়ে 'দেবত্ব' অর্জনের দিকেই তাঁর ঝোঁক। ফলত তাঁর শোক, আক্ষেপ, অনুতাপ ও পাপবোধ কিছুতেই প্রশমিত হয় না, বারংবার উথলে উঠতে থাকে। বেদব্যাসের কাছে তিনি অতঃপর এই ভয়াবহ সত্য উচ্চারণ করতে ছাড়েন না যে 'রাজা' এবং 'ধর্ম', 'রাজত্ব' ও 'ধর্মবোধ' আসলে পরস্পরের বিরোধী: 'ধর্ম্মচর্য্যা ও রাজ্যরক্ষা এই উভয় পরস্পর বিরুদ্ধ, অতএব এক ব্যক্তি কিরূপে ধর্ম্মরক্ষা ও রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারে, নিরন্তর এই চিন্তা করিয়া আমি মোহে বারংবার অভিভূত হইতেছি।'

পরিশেষে, নকুল-সহদেব-দ্রৌপদী-ভীমের এবং ঋষি দেবস্থান ও মহর্ষি ব্যাসদেবের এবং সর্বোপরি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বহু বহু প্রকার, উপর্যুপরি, অনুরোধ-উপরোধ-যুক্তি-তর্ক-দৃষ্টান্ত ও উত্তেজনা উক্তি এবং বিশেষত মহর্ষি বৈশম্পায়ন বেদব্যাস কর্তৃক প্রায়শ্চিত্ত পাওয়ার উপায় বর্ণনার পর যুধিষ্ঠির অবশ্য রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন; কিন্তু সংশয় শোক তাঁর পিছু ছাড়ে না কিছুতেই। তখন বহু কিছুর পর মহর্ষি বৈশম্পায়নের পরামর্শে সবাই মিলে তাঁকে নিয়ে যান 'সর্বজ্ঞ ধর্ম্মবেত্তা' 'কুরুকুল -পিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্মের নিকট' যুধিষ্ঠিরের 'ধর্ম্মগত সংশয় নিরাকরণ' করার জন্য, সবিস্তারে রাজধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য। সেখানে ভীষ্ম কর্তৃক নানারকম রাজধর্ম-বন্দনা এবং রাজার কর্তব্য-অকর্তব্য প্রভৃতি শোনার পরও যুধিষ্ঠির সংশয়মুক্ত হন না;

বরং তিনি এবার সেই মোক্ষম, একেবারে গোড়ার প্রশ্নটি উত্থাপন করেন:

> 'পিতামহ! 'রাজা' এই শব্দটি কিরূপে সমুত্পন্ন হইল? রাজার হস্ত, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, মুখ, উদর, শুক্র, অস্থি, মজ্জা, মাংস, শোণিত, নিঃশ্বাস, উচ্ছ্বাস, প্রাণ, শরীর, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, সুখ, দুঃখ, জন্ম ও মরণ যেরূপ, প্রজাগণেরও তদ্রূপ। তবে রাজা কিরূপে একাকী অসংখ্য বিশিষ্টবুদ্ধি মহাবলপরাক্রান্ত পুরুষের উপর আধিপত্য করিয়া সমুদয় পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হয়েন? সকল লোকে কি নিমিত্ত রাজার প্রসাদ-লাভের আকাঙ্ক্ষা করে ... ?'

এ প্রশ্ন তো চিরন্তন স্বাধীনতাপরায়ণেরই বটে: 'রাজা'র এবং 'প্রজা'র মধ্যে কী এমন দৈহিক-প্রাকৃতিক পার্থক্য আছে যে, একজন মাত্র ব্যক্তি কোটি কোটি মানুষের 'রাজা' হয়ে বসে থাকেন? আর লোকে তাঁকে মানেইবা কী কারণে? গুরুতর এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মদেব কিছুই লুকান না, ফাঁস করে দেন রাজতন্ত্রের গোড়ার গুমোর।

৬.৩ আদি রাজা, আদি বুদ্ধিজীবী, আদিতম শাস্ত্র

একটু ভিন্ন আঙ্গিকে হলেও, এমনকি 'রাজা'দের দিক থেকে হলেও মহাজ্ঞানী ভীষ্মদেব সেই স্মৃতিকথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বয়ান করেন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ-পরবর্তী কলিযুগের আদি রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে। এই পৃথিবীর আদিতে যে অরাজ ছিল তার এবং সেই অরাজকে বলপ্রয়োগ ও শাস্ত্রপ্রয়োগের মাধ্যমে উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠিত নয়া রাজতন্ত্রের, আদি বৃত্তান্ত।

ভীষ্মদেবের কথায় যা বোঝা গেল: আদি সেই অরাজকে ভেঙে ফেলে দেবতারা যে আদি দেবতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন তা ছিল মনুষ্যশ্রমনির্ভর। মানুষের প্রদত্ত 'হোমাদি'-স্বরূপ অন্নেই দেবতাদের গ্রাসাচ্ছাদ্দন হতো; এবং সেটাকেই দেবতারা বেদের নাম দিয়ে 'ধর্ম' বলে মেলা দিন চালিয়েছেন। কিন্তু মনুষ্যসমাজ এক পর্যায়ে যখন তা আর মানল না, তখন দেবকুলের মুখে এই মর্মে অন্নাভাবের হাহাকার শোনা গেল: নরলোকে আর বেদ নাই; নরলোকে আর ধর্ম নাই; সব বিনষ্ট হয়ে গেছে; 'মানব-দিগের ক্রিয়াকলাপ উচ্ছিন্ন হওয়াতে আমাদিগের অন্নাভাব হইয়াছে'; শুধু তাই নয়, সেই অন্নাভাবের পরিণামে দেবতারা আর দেবত্বই বজায় রাখতে পারছেন না বলে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে আক্ষেপ করছেন: 'অতঃপর আমরা মনুষ্যের ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত হইলাম'।

মাঝখানে একটু টুকে রাখি: 'দেবত্ব' বা বৈষম্য টিকিয়ে রাখার শর্তই হচ্ছে 'প্রিভিলেজ' বা বিশেষাধিকারতন্ত্র, অর্থাৎ অন্যের (মানুষের) শ্রমে বসে বসে খাওয়া। বসে খাওয়ার 'বিশেষ অধিকার' না থাকলে দেবতাও আর দেবতা থাকেন না, তাঁর অন্নাভাব ঘটে, তিনি মনুষ্যদশাপ্রাপ্ত হন।

তো, ব্রহ্মা যেন নরলোক থেকে বেদ ও 'ধর্ম' ধ্বংস হতে না দেন; একটা কিছু উপায় যেন তিনি 'বুদ্ধি' খাটিয়ে, 'স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে' বের করেন— দেবতাগণের এই সম্মিলিত নালিশ এবং আহাজারির মুখে ব্রহ্মা তাঁদের আশ্বস্ত করেন: নো টেনশন, মনুষ্যজাতিকে আবার বেদ ও 'ধর্ম' মানতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু কীভাবে? রাজা-প্রথার জোরে; রাজতন্ত্রের জোরে। কিন্তু রাজতন্ত্র চলবে কীসের জোরে? রাজতন্ত্র চলে কীসের জোরে? কেন—শাস্ত্রের জোরে! স্বয়ং ব্রহ্মা সে উপায় বের করেন 'বুদ্ধিবলে'। আদিতম 'শাস্ত্র' রচনা করে বসেন 'প্রজাপতি' ব্রহ্মা—সৃষ্টি করেন তিনি 'প্রকৃষ্টরূপে জাত' বিশেষ ধরনের মানুষকে যারা অতঃপর 'প্রজা' হিসেবে পরিচিত হবে।

আদিতম 'শাস্ত্র' আর 'বুদ্ধিজীবী'র সন্ধান তাহলে মহাভারতেই পাওয়া গেল – তিনি খোদ ব্রহ্মা। জানা গেল: তাঁর কাজ হচ্ছে শাসকদের অনুকূলে বৈষম্য ও বিশোধিকারতন্ত্র টিকিয়ে রাখা – প্রজাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে এবং তাতে কাজ না হলে শাস্ত্রের জোর, শাস্তির জোর ও ভয়ের জোর খাটানোর 'প্রেসক্রিপশন' দিয়ে। এভাবে অবশেষে বুদ্ধির জোরে এবং গায়ের জোরে দুর্দান্ত ও দুর্দমনীয় মানুষকে শান্ত ও দমিত করার ব্যবস্থা হলো: তাঁদেরকে এই পৃথিবীতে রাজার রাজত্ব মানানো হলো, রাজবশীভূত করা হলো আদিতম শাস্ত্রের জোরে; এবং 'দণ্ড'ই হচ্ছে এই ভূ-ভারতের আদিতম শাস্ত্র। আর সেই শাস্ত্র চলে রাজা এবং রাজবুদ্ধিজীবীর যুগলবন্দিতে।

৬.৪ আদিতম দণ্ডনীতির উৎপত্তি

এবার সেই চাঞ্চল্যকর ইতিহাসের সারবিবরণী হুবহু শোনা যাক কুরুকুলপিতামহ সর্বজ্ঞ বৃদ্ধ ভীষ্মের মুখে।

> ভীষ্ম কহিলেন, 'ধর্ম্মরাজ! সত্যযুগে প্রথমে যেরূপে রাজত্বের সৃষ্টি হয়, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীতে রাজ্য, রাজা, দণ্ড বা দণ্ডার্হ ব্যক্তি কিছুই ছিল না। মনুষ্যেরা একমাত্র ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক পরস্পরকে রক্ষা করিত। মানবগণ এইরূপে কিছুদিন কালযাপন করিয়া পরিশেষে পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ নিতান্ত কষ্টকর বোধ করিতে লাগিল। ... নরলোক এইরূপে কুমার্গগামী হইলে বেদ বিনষ্ট ও ধর্ম্ম এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল।
>
> তখন দেবগণ নিতান্ত শঙ্কিতচিত্তে লোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'ভগবন্! ... অতঃপর আমরা মনুষ্যের ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত হইলাম। মানবগণ হোমাদি কার্য্যদ্বারা ঊর্দ্ধবর্ষী বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং আমরা বারিবর্ষণাদিদ্বারা অধোবর্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে মানবদিগের ক্রিয়াকলাপ উচ্ছিন্ন হওয়াতে আমাদিগের অন্নাভাব হইয়াছে। অতএব যাহাতে আপনার প্রভাবে সম্ভত এই প্রাকৃতিক

নিয়ম ধ্বংস না হয়, আপনি স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে তাহার সদুপায় উদ্ভাবন করুন।'

তখন ভগবান্ কমলযোনি [ব্রহ্মা] ... প্রজাপতি দেবগণকে এই কথা বলিয়া বুদ্ধিবলে একখানি লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করিলেন। ...

ভগবান্ পদ্মযোনি ঐ নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে হৃষ্টমনে কহিলেন, 'সুরগণ! আমি ত্রিবর্গ সংস্থাপন ও লোকের উপকার-সাধনের নিমিত্ত বাক্যের সারস্বরূপ এই নীতিশাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি। ইহা পাঠ করিলে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ দর্শনপূর্ব্বক লোকরক্ষা করিবার বুদ্ধি জন্মিবে। এই শাস্ত্রদ্বারা জগতের যাবতীয় লোক দণ্ডপ্রভাবে পুরুষার্থ-ফললাভে সমর্থ হইবে; অতএব ইহার নাম দণ্ডনীতি হইল।

এতটা সুস্পষ্ট কথা আর কী হতে পারে। পরিষ্কারভাবেই দেখা যাচ্ছে, ভূ-ভারতের আদিতম নীতিশাস্ত্রটি হলো 'দণ্ডনীতি' এবং যুধিষ্ঠিরকে পিতামহ ভীষ্মদেব আরো বলেছিলেন, 'দণ্ডপ্রভাবেই জনসমাজে নীতি ও ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে'। তার মানে, 'দণ্ডনীতি'ই যে কর্তৃত্বতন্ত্রের আদিতম নীতিশাস্ত্র শুধু তা-ই নয়, এ জিনিস জনসমাজে প্রচলিত নীতিবোধের জনকও বটে। এবং এই নীতিবোধের প্রধান দুই উপায় হচ্ছে 'নিগ্রহ ও অনুগ্রহ'। এ-ই হলো সেই 'নিমিত্ত', যে নিমিত্তে 'সকল লোকে ... রাজার প্রসাদলাভের আকাঙ্ক্ষা করে'। নইলে যে মার খেতে হবে, নিগৃহীত হতে হবে। তারচেয়ে অনুগ্রহ-তাড়নাই বাস্তবোচিত।

দণ্ডনীতি কী বস্তু, সমাজ-সংসারে এর কাজ কী – তাও যুধিষ্ঠিরকে সবিস্তারে বুঝিয়ে বলেছিলেন অর্জুন: 'দণ্ড প্রজাদিগকে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইলেও দণ্ড একাকী জাগরিত থাকে। পণ্ডিতেরা দণ্ডকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।'

এসব কথা আজকের সংসদীয় গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের অত্যাধুনিক প্রবক্তাদের মুখে শোনাও, 'সভ্যতা'র উষালগ্নের দণ্ড বা আইন প্রয়োগকারী সত্তা অর্জুনের মুখে শোনাও তা-ই। কেননা আইনের শাসন তথা দণ্ডনীতি প্রতিষ্ঠার নামই 'সভ্যতা' এবং সত্যিকারের সভ্যতার নামে এই জিনিসই চলছে গত পাঁচ হাজার বছরের 'কর্তৃত্বতান্ত্রিক সভ্যতা' জুড়ে। এই দণ্ডনির্ভর সভ্যতায় দণ্ডই 'প্রধান ধর্ম' বটে, তবে তা 'মনুষ্যধর্ম' নয়, 'শাস্ত্রধর্ম' তথা 'রাজধর্ম' এবং সেই কারণেই বিপরীত দিক থেকে 'প্রজা'র ধর্মও বটে। অন্য কথায় এ বস্তুই আজকের 'সভ্য'যুগের রাষ্ট্রের ধর্ম। আইনের ধর্মই তো দণ্ড। শাসনের ধর্মই তো দণ্ড। এই আইনের শাসনকে কখনও সত্যিকারের মনুষ্যধর্মের নামে চালানো যায় না। একে চালাতে হয় শাস্ত্রধর্মের নামে। এবং পুনরাবৃত্তি করতেই হবে, আদিতম শাস্ত্রধর্মের নামই দণ্ডশাস্ত্র বা দণ্ডধর্ম বা কর্তৃত্বনীতি বা কর্তৃত্বধর্ম। এই জিনিসটিকেই কর্তৃত্বতন্ত্র মানুষের ধর্ম এবং প্রকৃতির ধর্ম

বলে চালাতে চায়।

যুধিষ্ঠিরকে অর্জুন বলছেন, ভয়ের রাজত্বই হচ্ছে দণ্ডনীতির প্রাণ: 'দণ্ডপ্রভাবে ধন ও ধান্য রক্ষিত হয়। ... অনেকানেক পাপপরায়ণ পামরেরা রাজদণ্ডভয়ে, অনেকে যমদণ্ডভয়ে, অনেকে পরলোকভয়ে এবং অনেকে লোকভয়ে পাপানুষ্ঠান করিতে পারে না। অনেকে কেবল দণ্ডভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে না। ফলতঃ সংসারে প্রায় সমুদয় কার্য্যই দণ্ডভয়ে নির্ব্বাহ হইতেছে। ... ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক ইহারা দণ্ডের ভয়ে স্ব স্ব পথে অবস্থান করিতেছেন। ভীত না হইলে কেহই যজ্ঞানুষ্ঠান, দান ও নিয়ম প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করে না।' তৎকালীন প্রধান সেনাপতি অর্জুনের বক্তব্য খুবই পরিষ্কার। দণ্ডনীতি মানেই হচ্ছে দমননীতি এবং শাসন-ত্রাসনের নীতি: 'দমন ও শাসন করে বলিয়াই উহা দণ্ড নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে'। আর কার জন্য কোন দণ্ড সমুচিত তার মোক্ষম বিধানও প্রস্তুত: 'দণ্ড সংসার রক্ষা না করিলে সমুদয়ই গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইত। দণ্ড দুর্দান্তদিগকে দমন ও দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিদিগকে শাসন করিয়া থাকে। দমন ও শাসন করে বলিয়াই উহা দণ্ড নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণের তিরস্কার, ক্ষত্রিয়ের বেতন প্রদান না করা, বৈশ্যের রাজসমীপে দ্রব্যজাত সমর্পণ এবং শূদ্রের সর্ব্বস্বাপহরণই সমুচিত দণ্ড।'

কি সুনির্দিষ্ট, কি তীব্রসূচিমুখ এই দণ্ডনীতি সেই প্রাচীনকাল থেকেই। আর শাসনের প্রশ্নে সে কাউকেই ছাড়ে না। শাসনযন্ত্রের হাতে তথা শাসকের হাতে, রাষ্ট্রযন্ত্রের ম্যানেজারদের হাতে ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত কারো কোনো নিস্তার নাই। পার্থক্য আছে বৈকি। ব্রাহ্মণের জন্য 'তিরস্কার'ই যথেষ্ট; আর শূদ্রকে শায়েস্তা করার জন্য চাই তার 'সর্বস্ব অপহরণ' করা।

৬.৫ উপসংহার

আজকের বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের ইতিহাসগত বিচার স্রেফ দণ্ডনীতির মামলা নয়, বরং খোদ রাষ্ট্রের ধর্ম বদলানোর প্রশ্নও বটে। এই কথাটুকু মনে করিয়ে দেয়ার জন্য এত কথা বলা।

দৈনিক ইত্তেফাক, 'খর বায়ু বয় বেগে' কলাম, 'দৃষ্টিকোণ' পাতা, ১৪ই মার্চ ২০১৩

দ্বিতীয় ভাগ

মুক্তিযুদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লব কর্তৃত্বতন্ত্র

সাত

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট: কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতন্ত্রের প্রচ্ছন্ন রূপকল্প

Shahabuddin Ahmed. Bangladesh Liberation War

৭.১ স্বাধীন রাষ্ট্রের উপযুক্ত রূপকল্প ছিল না

আজকের বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক সংকট দেখতে পাচ্ছি, এর গোড়া আছে আমাদের সুমহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। মুক্তিযুদ্ধের মতো বড় একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে বা ঘটবে, পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা আর থাকব না, বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হয়েই যাবে, এরকম একটা ব্যাপার টের পাওয়াই যাচ্ছিল। 'পদ্মা-মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো' – আটষট্টি/ঊনসত্তর সালেই এ শ্লোগানগুলো চলে এসেছে। এ-সমস্ত শ্লোগান বোঝায়: বড় পরিবর্তন আসন্ন।

কিন্তু সে-পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমরা কোথায় যেতে চাই তা নিয়ে, যাঁরা পরিবর্তনের জন্য লড়াইগুলো করছিলেন তাঁদের দিক থেকে, সুস্পষ্ট কোনো ধারণা প্রণয়ন করার চেষ্টা ছিল না। ধারণা যে একেবারেই ছিল না তা না। ছিল। যেমন: সমাজতন্ত্র চাই। রাষ্ট্রীয়করণ চাই। মানে, আদমজি-বাওয়ানির মতো ২০/২২টা

কোম্পানি যে গোটা পাকিস্তানকে লুটপাট করে খাচ্ছিল, সেরকমটা আর চাই না। রাষ্ট্রীয়করণ চাই। সমাজতন্ত্র চাই। আবার, গোটা পাকিস্তান আমল জুড়ে ধর্ম নিয়ে রাষ্ট্র খেলেছে। মানুষকে ধর্মের নামে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করেছে। সুতরাং ধর্ম দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হোক, এটাও আর চাই না। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চাই।

এভাবে, গোটা ষাটের দশক জুড়েই সামরিক শাসন চাই না, গণতন্ত্র চাই, সংবিধানের ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হোক এটা চাই, এসব চলেছে। পাকিস্তান আমলে তো প্রথম নয় বছর সংবিধানই ছিল না। পরে যেটা পাওয়া গেল, ঐ সংবিধান কেউ চায়নি। পার্লামেন্ট ছিল না। পার্লামেন্টকে নিয়ে একেবারে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। প্রতিদিন পার্লামেন্টারি সরকার বদলে যায় – পরপর তিন চার দিন – এরকম ঘটনাও ঘটেছে। পূর্ব পাকিস্তানে। পার্লামেন্টের মধ্যে হাতাহাতি, মারামারি, ডেপুটি স্পিকারকে মেরে ফেলা, এগুলোও ঘটেছে। সুতরাং নতুন বাংলাদেশে পার্লামেন্ট থাকবে। সংবিধান থাকবে। সেই কন্সটিটিউশনে জনসাধারণের অধিকার সংরক্ষিত হবে। এই ছিল চাওয়া। সামগ্রিক প্রবণতাটা ছিল এরকম: যে সমস্ত বিষয় নিয়ে গোটা পাকিস্তান আমল ধরে আমাদেরকে ভুগতে হলো, ঐসব আর থাকবে না। স্বাধীন বাংলাদেশ হবে ঠিক তার বিপরীত।

কিন্তু জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করবে, এমন কন্সটিটিউশন মানে কী? তার মানে, জনসাধারণ নিজেরাই নিজেদেরকে পরিচালনা করবে, তাই না? স্বাধীন দেশের মানুষ আমরা স্বাধীন থাকব। সামরিক বাহিনী আমাদের ওপর দিয়ে স্টিম রোলার চালাবে না। কিন্তু সেইটা কেমন করে, কী পদ্ধতিতে অর্জন করা যাবে। সামরিক বাহিনীই কি থাকবে, নাকি থাকবে না? সামরিক বাহিনী যদি থাকে, তাহলে সামরিক বাহিনীর আকার, প্রকার, গঠনপ্রকৃতি কী রকম হবে? জনসাধারণের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী হবে? খোদ রাষ্ট্রের গঠনপ্রকৃতি কী হবে? রাষ্ট্রের সম্ভাব্য নিপীড়ণের মুখে সাধারণ ব্যক্তি-মানুষ বা দল-গোষ্ঠীর রক্ষাকবচ কী হবে? এগুলো নিয়ে বলতে গেলে কথাই ওঠেনি।

পরিণামে, একাত্তর সালের ১৭ই ডিসেম্বর থেকেই কিন্তু বাংলাদেশ আবার সেই আগের রাষ্ট্র। ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মানুষের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার সঙ্গে বাস্তবে ব্যাপক ফারাক ঘটতে শুরু করে ১৭ই ডিসেম্বর থেকেই। ১৭ই ডিসেম্বর থেকেই সেই আগের আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জনবিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র। নিপীড়ক রাষ্ট্র-কাঠামো। গঠন-প্রকৃতি, পরিচালন-প্রণালী ও লক্ষ্যের দিক থেকে সেই একই ধারার রাজনৈতিক দল। একই ডিসি। একই এসপি। একই মহকুমা-প্রশাসক। একই আমলা-রাষ্ট্রপতি-মন্ত্রী-সচিব-সচিবালয়। মৌলিক কাঠামোর দিক থেকে সমগ্র রাষ্ট্রটা মূলগতভাবে সেই আগের জায়গায়ই থেকে গেল। বদলালো শুধু পরিচালক-গোষ্ঠী। জনসাধারণের

শাসনের পক্ষে, সংবিধানের পক্ষে, পার্লামেন্টের পক্ষে, বাঙালি সংস্কৃতির পক্ষে, মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা জাতীয় ধ্যানধারণার পক্ষে পুরো ষাটের দশক ধরেই অনেক লেখালেখি হয়েছে। অনেক ধরনের সাংস্কৃতিক চর্চা হয়েছে। নাটক, গান, কবিতা হয়েছে। ঠিকই। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে আমাদের গুণগত অমিলগুলো ঠিক কোথায় কোথায় ঘটবে, তার কোনো ভালো গ্রাউন্ডওয়ার্ক ছিল না। বোঝা গেল: রাজনৈতিক স্বাধীনতার মুখস্ত বুলিতে আটকে না থেকে বাংলাদেশের আপামর মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তির এবং সমাজ-ব্যক্তির স্বাধীনতার উপযুক্ত কোনো র‍্যাডিক্যাল রূপকল্প আমাদের সামনে ছিল না।

৭.১.১ স্বাধীনতার দুই কর্তব্য

সামনেই একটা যুগান্তকারী জনবিপ্লব, অথচ আগে থেকে আমার সামনে আলাদা করে পরিষ্কার কোনো ধারণা বা রূপকল্প নাই। এই না থাকার মানে কী? মানে হলো, আমি আসলে আগের জায়গাতেই থেকে যাচ্ছি। প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা কর্তৃত্বপরায়ণতার বিদ্যমান কাঠামো এবং ধ্যানধারণাই তাহলে আমাকে পরিচালিত করবে। কর্তৃত্বপরায়ণতার সুপ্রাচীন কাঠামোটা অটুট থেকে গেলে ব্যক্তি-মানুষ ও সমাজ কখনোই চিন্তা-সিদ্ধান্ত-সংগঠন-প্রকাশের প্রকৃত স্বাধীনতার দিকে যেতে পারে না। শ্রেণীবৈষম্যভিত্তিক আর্থ- সামাজিক উৎপাদন-বণ্টনের কাঠামোটা বহাল থাকলে ভৌগোলিক-রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে আপামর মানুষের জন্য স্বাধীনতার নামে স্রেফ একটা ধাপ্পায় পরিণত হয়, সেটা তো ১৯৪৭ সালে অর্জিত স্বাধীনতা থেকেই প্রমাণিত ছিল।

তাহলে একাত্তরে জনসাধারণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার – অর্থাৎ শ্রমশোষণের হাত থেকে মুক্তির – প্রশ্নটাও ফয়সালা করার কর্তব্য ছিল। একদিকে যাবতীয় ঊর্ধ্বতন ও কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের হাত থেকে স্বাধীনতা। এবং অন্যদিকে ব্যক্তিমালিকানাকেন্দ্রিক শ্রমশোষণ-ব্যবস্থার হাত থেকে মুক্তি। এই দুইটা ছিল সমগ্র জনগণের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার অন্তর্নিহিত কর্তব্য। কিন্তু এই দুইটা কর্তব্যের প্রচ্ছন্ন একটা বোধ গড়ে উঠলেও সুস্পষ্ট-সুনির্দিষ্ট কোনো উপলব্ধি আমাদের রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের মধ্যে ছিল না। সচেতন-অচেতনভাবে এই দ্বিবিধ কর্তব্য পূরণ করতে গিয়ে কীভাবে এই দল-শক্তিসমূহ কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতন্ত্রের বিশ্ববীক্ষাতেই আটকে গিয়েছিল সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে।

৭.১.২ কর্তৃত্বের হাত থেকে স্বাধীনতার প্রশ্নে কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতান্ত্রিক রূপকল্প

দুই কর্তব্যের মধ্যে প্রথমটা সম্পর্কে বলা যাক। যাবতীয় কর্তৃত্বের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য চাই অন্যদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতির নীতিতে নিজেরা নিজেদেরকে পরিচালনা করতে পারার সক্ষমতা অর্জন। দরকার জনসাধারণের উৎপাদনভিত্তিক ও সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্থাসমূহের নানাবিধ স্বাধীন ফেডারেশন। এইসব নীতি ও সংগঠনের ভিত্তিতে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজেই নিজেকে পরিচালনা করতে পারার নামই যে স্বাধীনতা, সে-ব্যাপারে আদৌ কোনো উপলব্ধি আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনকারী রাজনৈতিক দল ও শক্তিগুলোর মধ্যে ছিল না। আওয়ামী লীগ ও মস্কোপন্থী দল ও শক্তিসমূহ এবং পিকিংপন্থী দল ও শক্তিসমূহের স্বাধীনতাপন্থী অংশ তাঁদের নিজস্ব রাজনৈতিক কাজেকর্মে খোদ নিজেরাই কর্তৃত্বপরায়ণ চিন্তাচেতনা দ্বারা চালিত হতেন। (এখনও হন বৈকি।)

বলশেভিক ধ্যানধারণাকেই তাঁরা সমাজতন্ত্রের আইডিয়া হিসেবে ঐতিহাসিক সূত্রে পেয়েছিলেন। রুশবিপ্লবের সূত্রে। এটা তাঁরা বেছে নেন নি। এখানে তাঁদের ইচ্ছা -অনিচ্ছার সুযোগই ছিল না। আপামর রুশ শ্রমজীবী জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক বিপ্লবের ওপর সামরিক শক্তি ও কৌশলের জোরে ঘটে যায় বলশেভিকদের রাজনৈতিক প্রতিবিপ্লব। কায়েম হয় বলশেভিকদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। মুছে ফেলা হয় বাকি সব মত-পথ-পত্রিকা। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায় ইউরোপের পূর্ব ও পশ্চিম। তৈরি হয় সর্বগ্রাসী স্নায়ুযুদ্ধের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি।

এ সংক্রান্ত হিসাবনিকাশই বাংলাদেশের উদ্ভবের আন্তর্জাতিক পাটাতন হিসেবে নিয়ামক উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে আমরা কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতান্ত্রিক রূপকল্পের আন্তর্জাতিক খপ্পরে পড়ে যাই।

৭.১.৩ শ্রমশোষণের হাত থেকে স্বাধীনতার প্রশ্নে কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতান্ত্রিক রূপকল্প

জনগণের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে অর্জিতব্য স্বাধীনতার অন্তর্নিহিত কর্তব্য দুটির অপরটি ছিল ব্যক্তিমালিকানাকেন্দ্রিক শ্রমশোষণ-ব্যবস্থার হাত থেকে মুক্তির কর্তব্য। এক্ষেত্রেও মুক্তির উপায় হিসেবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই দ্বিধাহীনভাবে ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্র বলতে সবাই বুঝেছিল কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতন্ত্রের ধারা। এই ধারা মোতাবেক, কার্ল মার্কসের সময় থেকেই, কলকারখানা উৎপাদন-ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয়করণকেই ব্যক্তিমালিকানা উচ্ছেদের পথ তথা সমাজতন্ত্র বলে বিবেচনা করা

হয়েছে।

অথচ এতে করে পুঁজিবাদী শ্রমশোষণের আর্থ-সামাজিক কাঠামোটা থেকেই যায়। বড়জোর রকমফের ঘটে মাত্র। এতে মূল শ্রমিক-উৎপাদকের শ্রমের মালিক হয়ে ওঠেন ব্যক্তি-মালিকের বদলে রাষ্ট্রীয় আমলা-রাজনৈতিক পরিচালক-গোষ্ঠী। শ্রমিক যে শ্রমিক সেই শ্রমিকই থেকে যান। খোদ উৎপাদকরা কলকারাখানার মালিক-পরিচালক হতে পারেন না। কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতন্ত্র এগুলো খেয়াল করতে চায় না।

অথচ মুক্তিপরায়ণ সমাজতন্ত্রীরা কার্ল মার্কসের সময় থেকেই মনে করতেন: কলকারখানা ও কৃষিতে দরকার শ্রমিকদের প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সংস্থার স্ব-নিয়ন্ত্রণ ও স্ব-পরিচালনার ব্যবস্থা। এর মাধ্যমেই শুধু শ্রমিকের শ্রমের ওপর তাঁর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এভাবেই 'স্বাধীনতা' ধারণাটির সত্যিকারের বাস্তবায়ন ঘটতে পারে। স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের এই মুক্তিপরায়ণ সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা আমাদের দেশের কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতন্ত্রীদের সামনে আদৌ হাজির ছিল না নানা ঐতিহাসিক কারণে।

এই পরিস্থিতিতে কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতন্ত্রের বলশেভিক ধ্যানধারণা দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামী দল-শক্তি-গুলোর উপায় ছিল না। এটা তাঁদের বেছে-নেওয়া সিদ্ধান্ত ছিল না। এটাও ছিল পরাশক্তিমূহের ঠাণ্ডাযুদ্ধের বৈশ্বিক পাটাতনে গৃহীত অবিকল্প সিদ্ধান্ত। ফলে ব্যক্তিমালিকানা-কেন্দ্রিক শ্রমশোষণ-ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রীয় মালিকানাকেন্দ্রিক শ্রমশোষণ-ব্যবস্থার দিকেই আমরা যাচ্ছিলাম। তারই নাম দিয়েছিলাম সমাজতন্ত্র। কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতন্ত্রের রূপকল্পই ছিল আমাদের একমাত্র রূপকল্প।

৭.১.৪ বড়লোক-বুর্জোয়াদের মধ্যে মৌলিক রূপান্তরের ধারণা না থাকার কারণ

স্বাধীনতা ও সমতার যে অচেতন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আপামর শ্রমজীবী মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল-শক্তি-নেতাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্ম-পার্থক্য ছিল। বাঙালি জাতীয়তাবাদের মহা-জাগরণের ডামাডোলে শ্রমজীবী মানুষের চাওয়া আর সম্ভাব্য শাসক হিসেবে মধ্য-শ্রেণীর চাওয়ার মধ্যকার শ্রেণীগত পার্থক্যটা তেমন করে চোখে পড়ে নি। পার্থক্যটা সূক্ষ্মই থেকে গেছে। পেছন ফিরে তাকিয়ে এখনও আমাদের তা ভালো করে চোখে পড়ছে বলে মনে হয় না। পড়লেও আমরা তার গুরুত্ব বুঝতে পারছি না।

কিন্তু পার্থক্যটা সূক্ষ্ম হলেও, খুবই সিরিয়াস ধরনের পার্থক্য। আপামর মানুষের কাছে মুক্তিযুদ্ধ ছিল আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের যুদ্ধ। রাজনৈতিক

দল-শক্তি-নেতাদের একেবারে নিচের তলার গরিব অংশটারও এ-ই ছিল আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ওপরের তলার মূল নেতাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল পূর্ব পাকিস্তান নামক ভূখণ্ডটাকে কোনোরকমে পাকিস্তান থেকে আলাদা করা। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিজেদের শাসন কায়েম করা। বাংলাদেশটা পাঞ্জাবি শাসকদের পরিবর্তে বাঙালি শাসকদের দ্বারা শাসিত হলেই তাঁদের জন্য যথেষ্ট।

হাজার বছর ধরে জমিতে বলদের মতো খেটে-খাওয়া 'নিচু' জাতের বাঙালিরা সার্বিক স্বাধীনতার জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা বলতে আদৌ কী বোঝায়, ভৌগোলিকভাবে স্বাধীন একটা রাষ্ট্রের ভেতরে জনমানুষের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ও সুরক্ষিত রাখার উপায় কী হতে পারে, তার উপযোগী রাষ্ট্র-কাঠামোর রূপরেখা কী দাঁড়াতে পারে, এসব নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা তাঁদের ছিল না। পাকিস্তানীদেরকে তাড়িয়ে বাঙালিদেরকে শাসক বানানোই ছিল তাঁদেরও একমাত্র দুশ্চিন্তা।

শাসক বাঙালিদের কাছে স্বাধীনতার যে অর্থ, কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি বাঙালিদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ যে তার থেকে আলাদা, সেটা তাঁদের মনে ঘুণাক্ষরেও আসে নি। কারণ, মাত্র ১০০ বছর আগেও এই আপামর হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের মধ্যে পৃথক কোনো বড়লোক শ্রেণীর বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্বই ছিল না। সকলেই 'বাঙাল'। সকলেই কৃষক। সকলেই নমঃশুদ্র। কাজেই, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাট-বেচা টাকা থেকে গজিয়ে-ওঠা উঠতি-বড়লোক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সামান্য সন্দেহ করতেও তাঁরা শেখেন নি। এঁদের স্বার্থ যে আপামর মানুষের স্বার্থ থেকে আলাদা হতে পারে, এই উপলব্ধি তখনও পর্যন্ত তাঁদের গড়ে ওঠে নি।

উঠতি-বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতাদের দিক থেকে মৌলিক রূপান্তর -ধর্মী কোনো রূপকল্প না থাকার কারণ তো খুবই স্পষ্ট। সাতচল্লিশে তাঁরা যে ভারত থেকে আলাদা হলেন, তারও তো ঐ একই কারণ। তাঁরা চেয়েছিলেন, জমিজমা কলকারখানা ব্যাবসা-বাণিজ্য এবং রাজনীতির মালিক হবেন তাঁরা। কলকাতা-গুজরাটের শাসনে তাঁরা থাকবেন না। জমিদারদের অধীনে থাকবেন না। কিন্তু পাকিস্তানে এসে তাঁরা দেখলেন, তাঁরা কলকাতার হুকুমদারি থেকে পাঞ্জাব-ইসলামাবাদ-করাচির কর্তৃত্বের পেটে চলে গিয়েছেন। তাঁরা দেখলেন এখান থেকে বাঁচার রাস্তা নাই। নিজেরা শাসক-পরিচালক-উদ্ধারক হওয়ার পথ নাই। নতুন একটা ঔপনিবেশিক শাসনের খপ্পরে পড়ে গিয়েছেন তাঁরা। সামনে তাঁদের ছিল একটাই পথ: পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করে বাংলাদেশ বানানো। তাহলেই তাঁরা নিজেরা দেশ চালাতে পারবেন। বাঙালিরাই তখন বাংলাদেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা

হবেন। সুতরাং বাঙালি জাতীয়তাবাদী জজবা তুলতে পারলেই তাঁদের চলে।

কিন্তু মানুষ তো একবার 'স্বাধীন' হয়েছিল এর আগে। বৃটিশদের হাত থেকে 'স্বাধীন' হয়ে নিপীড়িত-বঞ্চিত 'মুসলমানদের' জন্য 'স্বাধীন' একটা পাকিস্তান রাষ্ট্র তাঁরা পেয়েছিল। সেটাতে তাঁদের কোনোই উপকার হয় নি। কাজেই, আবার স্রেফ দেশ স্বাধীন করার কথা বলে মেহনতি মানুষের সমর্থন পাওয়ার তেমন রাস্তা ছিল না। এ কারণেই মেহনতি মানুষের সত্যিকারের মুক্তি, অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি, তথা 'সমাজতন্ত্র' অর্জনের কথা বলতে হয়েছিল। পরিস্কার যে: এভাবে সমাজতন্ত্রের কথা বলাটা বড়লোক নেতাদের দিক থেকে ছিল স্রেফ কথার কথা। ফলে তাঁদের দিক থেকে স্বাধীন গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের জন্য র‍্যাডিক্যাল কোনো রূপরেখার আদৌ দরকার ছিল না।

৭.১.৫ বামপন্থীদের মধ্যে মৌলিক রূপান্তরের ধারণা না থাকার কারণ

বুর্জোয়াদের দিক থেকে না হয় এ ধরনের রূপরেখার প্রয়োজন নাই। কিন্তু চীন-রাশিয়াপন্থী বলশেভিক-বামপন্থার দিক থেকে? তাঁদের নিজেদের ধারণা মোতাবেক এই বামপন্থীরা বুর্জোয়া না, 'শ্রেণীচ্যুত', তাই না? মস্কোপন্থীরা মনে করলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁরা সমাজতন্ত্র কায়েম করবেন আওয়ামী লীগকে মিত্র শক্তি হিসেবে সাথে নিয়ে। পিকিংপন্থীরা মনে করলেন, প্রকৃত সমাজতন্ত্র তাঁরাই কায়েম করবেন। কিন্তু তার জন্য দরকার আওয়ামী লীগ ও মস্কোপন্থীদের নেতৃত্বে নয়, মাওবাদীদের নেতৃত্বে 'জনযুদ্ধ' করে দেশ স্বাধীন করা।

উভয় ধারার বামদের স্বতন্ত্র কেবলা ছিল (মস্কো-পিকিং)। তাঁদের নিজের নিজের কেতাব (অর্থাৎ মার্কস-লেনিন-মাও প্রমুখের 'চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য' সম্বলিত ম্যানুয়াল) ছিল। এবং তাঁদের নিজের নিজের 'বৈপ্লবিক মডেল' ছিল (রুশী মডেল, চীনা মডেল)। সুতরাং বাকি ছিল শুধু যেনতেনভাবে ক্ষমতাটা দখল করতে পারা। সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সমাজের মৌলিক রূপান্তর ঘটানোর ক্ষেত্রে রুশচীন-ধারার সমাজতান্ত্রিক চিন্তাপ্রণালী কতটুকু স্বাধীনতাপরায়ণ, কতটুকু জনমুখী, আর কতটুকু কর্তৃত্বপরায়ণ – এগুলো নিয়ে মাথা খাটানোর কোনো প্রয়োজন তাঁদের ছিল না।

ফলে তাঁদের এই চেতনার ঘাটতি ছিল যে নতুন স্বাধীনতাও হবে স্রেফ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা। রাষ্ট্রকর্তাদের স্বাধীনতা। রাষ্ট্র-ম্যানেজাররাই হবেন সমস্ত ক্ষমতা ও উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক। আপামর মানুষের এমনকি সভা-সমিতি-সংগঠন-ধর্মঘটের স্বাধীনতাও এটা হবে না। চিন্তার ও মত প্রচারের স্বাধীনতা তো নয়ই। আর

আর্থ-সামাজিক মুক্তির তো প্রশ্নই ওঠে না। এটা যে আদতে সমাজতন্ত্র না, স্রেফ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, তা আমাদের কোনো বামপন্থী ধারাই ভাবেন নি। আদিতে কর্তৃত্বপরায়ণ ধারার 'সমাজতন্ত্রী' হওয়ার কারণেই তাঁরা খোদ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বপরায়ণ, স্বাধীনতাবিনাশী চরিত্র সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে বুঝের এরকম ঘাটতি তৈরি হয়েছিল। এটা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদীদের বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের মোহ আজও যায় নি।

৭.১.৬ কৃষকদের মধ্যে মৌলিক রূপান্তরের ধারণা না থাকার কারণ

কৃষকের দিক থেকে দেখলে, তাঁরও এই পাকিস্তানী উপনিবেশ থেকে বাঁচা দরকার। তাছাড়া তার পাট বাঁচে না। ধান বাঁচে না। সব চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। এখানকার পাট দিয়ে ঐখানকার পাটকল চলে। আগে চলত কলকাতার পাটকল। তাঁর ভাগ্যের কোনা পরিবর্তন ঘটে না। তাঁর ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করার সুযোগ পায় না। চাকরি পায় না। তাঁরা ভেবেছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জিত হলে আমি না হোক, আমার ছেলেমেয়েরা অন্তত দেশ চালাবে। শিক্ষিত হবে। দুঃখ থাকবে না। গরিবি থাকবে না। তার মানে, শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের দিক থেকে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নটা একাধারে প্রবল এবং প্রচ্ছন্ন ছিল – বরাবরই। এই জ্ঞান সবারই ছিল যে আসন্ন স্বাধীন দেশ মানে স্রেফ রাজনৈতিক স্বাধীনতা। তাও আবার আংশিক। শুধু বড়লোকদের। এর মাধ্যমে রেডিমেড কোনো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা গরিব মানুষ পাবেন না। তাঁরা জানতেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া আসলে প্রকৃত স্বাধীনতা হয় না। কিন্তু বাস্তবে সেই অর্থনৈতিক মুক্তির মানে কী, সেটা নিয়ে অত পরিষ্কার ভাবনাচিন্তা তাঁদের ছিল না।

কারণ: সাধারণ সত্য আকারে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা এক ব্যাপার, আর স্বাধীনতা মানে যে এক দিকে কর্তৃত্বের হাত থেকে স্বাধীনতা, অন্য দিকে শ্রমশোষণের হাত থেকে স্বাধীনতা – এরকম সুস্পষ্ট উপলব্ধি অর্জন করাটা আলাদা ব্যাপার। এই উপলব্ধি কৃষকের ছিল না। থাকলে তাঁরা বুঝতেন যে কর্তৃত্বও থাকবে, শোষণও থাকবে, অথচ আমি স্বাধীন হয়ে যাব, এ কথার কোনো মানে নাই। আমাকে যদি অন্যের সিদ্ধান্ত-মতাদর্শ-পরিকল্পনা অনুসারে জীবন-যাপন করতে হয়, আমার দেশ-সমাজ কীভাবে চলবে, সেই সিদ্ধান্ত যদি সবার সাথে বসে আমি নিজে নিতে না পারি, দেশ যদি শুধু আমলা আর রাজনৈতিক দলই চালায়, তাহলে আমার কীসের স্বাধীনতা? অন্য দিকে একথাও বোঝা যেত: আমাকে যদি পেটের দায়ে অন্যের কাছে নিজের শ্রম বিক্রি করতে হয় তাহলে তা স্বাধীনতা নয়, শ্রমদাসত্ব। এরকম সুস্পষ্ট

উপলব্ধি থাকলে তখন এটাও টের পাওয়া যেত, প্রকৃত স্বাধীন ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য বিদ্যমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান এবং বিধি-ব্যবস্থা -বন্দোবস্তের গোটা সিস্টেমটাকে আগাগোড়া ঢেলে সাজানো দরকার।

আজকের যুগে জনসাধারণ তাঁদের বিগত প্রায় চার দশকের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে ফেলেছেন, পলিটিশিয়ানরা দেশের জন্য, মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কী শিক্ষিত লোক, কী অশিক্ষিত লোক, সবাই এটা জেনে গিয়েছেন। এই যে জ্ঞানটা আজকের মানুষ অর্জন করেছেন, এটা কিন্তু এই ৪০ বছর ধরে রাজনীতির আগুনে পোড় খাওয়া জ্ঞান। এই জ্ঞান তাঁরা পাকিস্তান আমলে অর্জন করতে পারেন নি। পাকিস্তান আমলে তাঁরা মনে করেছিলেন, ১৯৪৭ সালে আমরা সব ঠিকই করেছিলাম। ক্ষমতাটা শুধু কেমন করে যেন পশ্চিমাদের হাতে চলে গিয়েছে। এটুকুই যা ভুল হয়ে গেছে। ওটা যদি তখনই মজিবরের হাতে থাকত বা শেরে বাংলার হাতে, তাহলে কোনো ঝামেলাই হতো না। ফলে তাঁরা জানপ্রাণ দিয়ে মজিবরের হাতে এনে দিয়েছেন 'ক্ষমতা' নামক সর্বরোগহর সেই দাওয়াইটা। এটুকুই তাঁদের কর্তব্য বলে তাঁরা তখন উপলব্ধি করেছিলেন। এর পেছনে রাজনৈতিক দল-শক্তিসমূহের দীর্ঘদিনের শিক্ষাদীক্ষা-প্রচারণার ভূমিকা ছিল, সেটা বলাই বাহুল্য। মৌলিক অর্থে ভিন্ন ধারার কোনো স্বাধীন চিন্তাচেতনা প্রচার উপস্থিত ছিল না। ছিল শুধু অস্পষ্ট স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য দল-নেতা-শিক্ষিত-শ্রেণীর প্রতি অগাধ আস্থা। আর আত্মত্যাগের মনোভাব।

১৯৪৭ সালে স্বাধীন পাকিস্তানের স্বপ্নও কিন্তু সর্বজনীন স্বপ্নই ছিল। পাকিস্তানের সম্ভাব্য নতুন বুর্জোয়াদেরও স্বপ্ন। আবার আপামর জনসাধারণেরও স্বপ্ন। ঐ স্বপ্নটাই ট্রান্সফার হলো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশ্নে। স্বপ্নটা পাকিস্তান দিয়ে পূরণ হয় নি। ঐটা এবার বাংলাদেশ দিয়ে হবে। ফলে শ্রমশোষণের শিকার জনসাধারণ এবং শ্রমের শোষক বুর্জোয়ারা সাধারণ ধ্যানধারণার পাটাতনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। বড়লোক মালিকশ্রেণীর চিন্তা তো পরিষ্কার: তারাই দেশ চালাবেন। আবার কৃষক-শ্রমজীবীদের চিন্তাও পরিস্কার: শেখ মুজিব তো আমাদেরই ছেলে।

চিন্তা করে দেখুন তো ফরিদপুরের কৃষকরা কী ভেবেছিলেন? মজিবর। গোটা পাকিস্তান আমল, গোটা একাত্তর সাল জুড়ে বাংলাদেশের মানুষ বড়লোকের বঙ্গবন্ধুকে 'মজিবর' বলে ডেকেছেন। ছাত্রলীগের ছেলেরা বলেছে 'মুজিব ভাই'। এ পর্যন্তই তো। এর বেশি কিছু তো না। অতি-ভক্তি অতি-শ্রদ্ধা তো ছিল না। এমনকি যখন সে 'বঙ্গবন্ধু' ডেকেছে তখনও আদর করেই 'বঙ্গবন্ধু' বলেছে। 'বঙ্গবন্ধু' শুনে জনসাধারণ খুব মাইন্ড করেন নি। তাঁরা ভাবেন নি যে, আমাদের ঘাড়ের উপর নতুন আরেকটা রাক্ষস-রাজা এসে যাচ্ছে। সকলেরই বরং পূর্ণ আস্থা ছিল, কৃষকের সন্তান

মজিবর তাঁদেরকে স্বাধীনতা এনে দিতে পারবেন। তার জন্য যা লাগে জনগণ দেবে। সুতরাং বড়লোক নেতাদেরই মতো কৃষক-শ্রমিকের দিক থেকেও আসন্ন স্বাধীনতার সুনির্দিষ্ট কোনো রূপকল্প ছিল না। কতকগুলো দাবিদাওয়া ছিল মাত্র। নিঃসন্দেহে সেগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ দাবিদাওয়া। নিঃসন্দেহে কৃষক-শ্রমিকেরা বিশ্বাস করেছিলেন, দাবিদাওয়াগুলো পূরণের জন্য, আপামর মানুষের মুক্তির জন্য প্রয়োজন সমাজতন্ত্রের দিকে যাওয়া। প্রশ্ন হলো: স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিমুখীন সমাজতন্ত্রের এই সর্বজনীন প্রচ্ছন্ন বাসনাকে পায়ে দলে শাসকেরা কেমন করে হুকুমদারির সমাজতন্ত্র তথা বাকশালি একনায়কত্বের দিকে যেতে পারলেন? সেই সর্বনাশের আন্তর্জাতিক পাটাতন নিয়ে কিছু কথা বলা বলা দরকার।

৭.২ একাত্তরের জনযুদ্ধ এবং কর্তৃত্বপরায়ণ বামপন্থা

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা দেখলাম: ষাটের দশকের শেষ ভাগে এসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কারো পক্ষে এ কথা না বোঝার উপায়ই ছিল না যে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আবির্ভাব সময়ের ব্যাপার মাত্র। অথচ বাংলাদেশের আপামর মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তির এবং সমাজ-ব্যক্তির স্বাধীনতার উপযুক্ত কোনো র‍্যাডিক্যাল রূপকল্প আমাদের সামনে ছিল না। সামগ্রিক প্রবণতাটা ছিল এরকম: যে সমস্ত বিষয় নিয়ে গোটা পাকিস্তান আমল ধরে আমাদেরকে ভুগতে হলেছিল, স্বাধীন বাংলাদেশ হবে তার বিপরীত। পরিণামে, রাষ্ট্রকাঠামো সংবিধান সেনাবাহিনী জনপ্রতিনিধিত্ব বিচারব্যবস্থা ইত্যাদির প্রশ্নে ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর থেকেই বাংলাদেশ সেই বৃটিশ-পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক ধারার আমলাতান্ত্রিক, জনবিচ্ছিন্ন ও নিপীড়ক একটি রাষ্ট্রের আদল নিয়ে হাজির হয়।

স্বাধীনতা মানে যে একদিকে যাবতীয় ঊর্ধ্বতন ও কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের হাত থেকে স্বাধীনতা, এবং অন্যদিকে ব্যক্তিমালিকানা-কেন্দ্রিক শ্রমশোষণ-ব্যবস্থার হাত থেকে মুক্তি – এরকম সুস্পষ্ট-সুনির্দিষ্ট কোনো উপলব্ধি আমাদের রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের মধ্যে ছিল না। আওয়ামী লীগ এবং মস্কোপন্থী-পিকিংপন্থী দল ও শক্তিসমূহ তাঁদের নিজস্ব রাজনৈতিক কাজেকর্মে খোদ নিজেরাই কর্তৃত্বপরায়ণ চিন্তাচেতনা দ্বারা চালিত হতেন। বলশেভিক ধ্যান-ধারণাকেই তাঁরা সমাজতন্ত্রের আইডিয়া হিসেবে ঐতিহাসিক সূত্রে পেয়েছিলেন। ফলে আমরা কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতান্ত্রিক রূপকল্পের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খপ্পরে পড়ে যাই। কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতন্ত্রের বলশেভিক ধ্যানধারণা দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামী দল-শক্তিগুলোর ঐতিহাসিক কোনো উপায়-সূত্রও ছিল না। এটা ছিল পরাশক্তিমূহের ঠাণ্ডাযুদ্ধের বৈশ্বিক পাটাতনে গৃহীত অবিকল্প

সিদ্ধান্ত। উপরন্তু জাতীয়তাবাদী একনায়ক-আনুগত্য, পরাশক্তিগত আনুগত্য, এবং শ্রেণীগত নানা কারণে উঠতি- ও পাতি-বুর্জোয়া বড়লোক শ্রেণীর দলের এবং বামপন্থীদের দিক থেকে তো বটেই, এমনকি খোদ শ্রমিক-কৃষকদের দিক থেকেও রাষ্ট্র ও সমাজের মৌলিক রূপান্তরের কোনো ধারণা ছিল না।

নিজেদের মধ্যকার আপাতদৃষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সবগুলো রাজনৈতিক ধারাই যে একই রকম কর্তৃত্ব-পরায়ণ সমাজতন্ত্রের বলশেভিক রূপকল্পে আচ্ছন্ন হয়ে উঠতে পারল, এই ঘটনা সম্ভব হলো কী করে তা বুঝতে গেলে আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন আন্তর্জাতিক একটু পরিস্থিতিটা একটু দেখতে হবে। আজকের এই আলোচনা শুরু হবে আট নম্বর দফা থেকে।

৭.২.১ পরাশক্তি, প্রচারণা ও স্নায়ুযুদ্ধ

স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক একটা রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? নেশন স্টেট বলতে কী বোঝায়? একটা দেশের সর্বস্তরের মানুষ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে আলাদা হয়ে যখন বহুভাষা-বহুধর্ম-বহুজাতিভিত্তিক স্বাধীন একটা রাষ্ট্র বানাবে, সেই রাষ্ট্রের চেহারা কী হবে? গণতন্ত্র মানেই বা কী? এসব প্রশ্নে যে ধারণাগুলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার নেতাকর্মীদের মধ্যে কাজ করছিল, সেগুলো ছিল তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও ধ্যানধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। চিন্তনের ও ধ্যানধারণার রেডিমেড কাঠামোগুলো থেকে খুব আলাদা কিছু চিন্তাভাবনা তারা করেন নি।

আমাদের দেশের তৎকালীন অবস্থার দিক থেকে দেখলে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে প্রথমেই আসে চীন-রাশিয়ার মার্কস-বাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী রাজনীতির কথা। তারপর আসে ইঙ্গ-মার্কিন এবং ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার কথা। আরো আসে স্নায়ুযুদ্ধের কথা। এবং সবশেষে আসে ভারত-পাকিস্তানের অবস্থার কথা।

আমাদের দেশসহ সারা পৃথিবীর প্রতিরোধ-আন্দোলনের বিরাট অংশের ওপর সর্বগ্রাসী প্রভাব ছিল মস্কো-পিকিং বামপন্থার। এঁদের ধ্যানধারণা-তত্ত্ব-আন্দোলনের যে উপাদানগুলো আমাদের দেশ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল রুশ-চীন-সাম্রাজ্যের প্রচারণার সুবাদে, সেগুলোই আমাদের নতুন রাষ্ট্র পরিগঠনের চিন্তাভাবনা রূপকল্পকে প্রভাবিত ও কাঠামোবদ্ধ করে ফেলেছিল। এমনকি আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রেও আমরা ঐ রকমেরই কিছু আন্তর্জাতিক সূত্র পাব।

ততদিনে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক ক্রমবিকশিত উঠেছে। পুঁজিবাদ -ওয়ালারা ও বলশেভিকওয়ালারা তখন নানান ধরনের কেতাবি প্রচারণায় দুনিয়াকে

বুঝিয়ে চলেছেন গণতন্ত্র কী, উন্নয়ন কী, তৃতীয় বিশ্বের মুক্তির পথ কী, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব কী ইত্যাদি নিয়ে। এটা নতুন একটা যুগ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী যুগ। উপনিবেশ-পরবর্তী যুগ। একেবারে হুড়মুড় করে তখন একের পর এক দেশ স্বাধীন হচ্ছে উপনিবেশিক গোলামির শৃঙ্খল থেকে – ইউরোপীয় জাতিরাষ্ট্রসমূহের ছাঁচে। আর ঐ ইঙ্গ-রুশ-চীন-মার্কিন-ফরাসী নয়া উপনিবেশওয়ালারাই আবার স্বাধীন হওয়ার পর নতুন জাতিরাষ্ট্রগুলোর রাজনীতি-অর্থনীতি-গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র নিয়ে মাঙনা প্রেসক্রিপশন বিতরণ করছেন।

৭.২.২ কর্তৃত্বপরায়ণ বামপন্থার করুণ ক্যারিকেচার

বলা বাহুল্য, যাঁরা বাম ঘরানার না, কিংবা কংগ্রেস বা আওয়ামী লীগের মতো অর্ধেক-ডান-অর্ধেক-বাম ঘরানার দল-শক্তি, তাঁদের বেলায় প্রভাব ফেলেছে ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী-জার্মান ধ্যানধারণা। এইসব ধ্যানধারণা কোনো না কোনোভাবে পুঁজিবাদ-আচ্ছন্ন বুর্জোয়া ডেমোক্রেসি বা তথাকথিত লিবারেল ডেমোক্র্যাসির ধ্যানধারণা। কিন্তু লিবারেল ডেমোক্র্যাসি বলতে ততদিনে যেটা দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে কিন্তু সত্যিকারের ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের বা ক্ল্যাসিক্যাল লিবারালিজমের কোনো সম্পর্ক নাই। ইউরোপীয় রেনেসাঁ, ফরাসি বিপ্লব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ধ্যানধারণার সাথে এই লিবারেল ডেমোক্রেসির আদৌ কোনো সম্পর্ক নাই। আর ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের অধিকতর র‍্যাডিক্যাল অভিপ্রকাশসমূহের সাথে (যেমন প্যারি কমিউন ও মে-দিবস), কিংবা সাধারণভাবে বললে শিল্পবিপ্লবের কালে রচিত অজস্র শ্রমিক-আন্দোলনের পরিক্রমায় শত বছর ধরে গড়ে-ওঠা মুক্তিপরায়ণ ধারণা -জগতের সাথে এই পুঁজি-গণতন্ত্রের মিলের কোনো প্রশ্নই নাই।

তো, যা-ই হোক, সেই যুগে এই লিবারাল গণতন্ত্রের পুঁজিবাদী ধ্যানধারণাতেই আওয়ামী লীগ আচ্ছন্ন। পাশাপাশি আবার মস্কোপন্থার সাথেও আওয়ামী লীগ ঘনিষ্ট বটে। ভারতের কংগ্রেস পার্টিকে তাঁরা যে ধরনের গণতন্ত্র অনুশীলন করতে দেখেছেন, খানিকটা সেরকম। কংগ্রেসের গায়ে তখনও পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের গন্ধ আছে। কংগ্রেস একটা বামপন্থী দল – এমনকি এরকম কথাবার্তাও চালু আছে। কারণ, যুগটা স্নায়ুযুদ্ধের। পররাষ্ট্রনীতিতে যাঁরাই তখন মার্কিনবিরোধী, বা যাঁদের মধ্যে মুখে মুখে হলেও একটু-আধটু গরিব-দরদী ভাব আছে, তাঁরাই তখন বামপন্থী – অভ্যন্তরীন অর্থনীতিতে তারা রাশিয়ার মতো পুঁজিতন্ত্রী হলেও। এবং এঁরা নিজেরাও নিজেদেরকে এক প্রকার বামপন্থী বলেই জাহির করেছেন। বিশ্বাসও করেছেন। এমনকি মার্কিন শাসক শ্রেণীও এঁদেরকে বামপন্থী বলেই চিহ্নিত করেছেন।

মার্কিন দেশের রিপাবলিক্যানরা তখন ডেমোক্রেটিক পার্টিকে পর্যন্ত বামপন্থী বলে অভিহিত করছেন। এখনও করেন (ওবামা যেমন 'বামপন্থী')। মার্কিনী ব্যক্তি-পুঁজিতন্ত্র আর রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের মধ্যকার শীতল যুদ্ধের উসিলায় বামপন্থা জিনিসটা এরকমই অদ্ভুত একটা জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে ভারতের বৃহৎ শিল্প-বুর্জোয়াদের কংগ্রেস, পাকিস্তানের জমিদার-বুর্জোয়াদের পিপলস পার্টি, বাংলাদেশের পাতিবুর্জোয়াদের আওয়ামী লীগও তখন ওরকম বামপন্থী দলই বটে।

আমাদের আওয়ামী লীগের গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র অনেকখানি রুশ-ভারতের আবছা আদলকে দূরের ও কাছের মডেল হিসেবে সামনে রেখেছিল। আদলগুলো তাঁদের মাথার মধ্যে কাজ করেছে আবছা আবছাভাবে। আওয়ামী লীগের নেতারা দেখেছেন, বৃটিশদের কাছ থেকে স্বাধীন হলো পাকিস্তান আর ভারত। তার মধ্যে ভারতে গণতন্ত্র হলো। পার্লামেন্ট হলো। পাকিস্তানে হলো না। তাহলে, ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে তুলনা করলে, ভারতের পথটাই উন্নততর পথ– তথাকথিত গণতন্ত্রের পথ। ফলে ঐটার একটা তাৎক্ষণিক ছাপ ছিলই। আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তো আমরা প্রশ্নাতীতভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছিলাম পাকিস্তানী পথ।

পারিপার্শ্বিক-আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের কাছে গণতন্ত্র জিনিসটা তখন তাহলে কী? ভারতে যা আছে, সেটাই গণতন্ত্র। আর আওয়ামী লীগের সমাজতন্ত্র মানে কী? সমাজতন্ত্র মানে হলো, পাকিস্তানীদের ফেলে-যাওয়া বড় বড় কলকারখানা ব্যাংক-বাণিজ্য সব কিছু (রাশিয়ার মতো করে) রাষ্ট্রের আমলাদের মালিকানায় নিয়ে আসা, এবং একদলীয় বলশেভিক শাসনের মতোন একদলীয় বাকশালী শাসন চালু করা। আমাদের স্বাধীনতা-যুদ্ধে ছিল সার্বক্ষণিক মার্কিন শত্রুতার চাপ, আবার ছিল কংগ্রেসী ভারত আর বলশেভিক রাশিয়ার বন্ধুত্বের চাপ। ফলে কোনো সহজ উপায় আমাদের সিপিবি ও আওয়ামী লীগের কাছে ছিল না।

এভাবে একটা করুণ ক্যারিকেচারের দিকে এগিয়ে গিয়েছে আমাদের দেশ। এক দিকে আওয়ামী লীগ অনেকখানি 'বামপন্থা'পূর্ণ হয়ে উঠছে। এমনকি কংগ্রেসকেও হারিয়ে দিচ্ছে। (মস্কো তো মূলত আওয়ামী লীগকে দিয়েই বাংলাদেশে বলশেভিক-সমাজতন্ত্র বানানোর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করে দিয়েছিল।) আর অন্য দিকে আদি অকৃত্রিম বলশেভিক-বামপন্থাওয়ালারা, অন্তত মস্কো ঘরানার লোকেরা তখন অনেকখানি আওয়ামী-লীগপন্থা-পূর্ণ হয়ে উঠছে। (বামদের মধ্যে শক্তির দিক থেকে এরাই তখন প্রধান।) আওয়ামী লীগের বি-টিম হওয়ার বদনামও অর্জিত হচ্ছে বলতে গেলে অনায়াসেই। (নাকের কাছে রাষ্ট্রক্ষমতার সুগন্ধ বলে কথা।) আর যাঁরা মস্কো-ভারতপন্থী না, সেই পিকিংপন্থী সমাজতন্ত্রীদের সাথে মৌলিক প্রশ্নে মস্কো-পন্থীদের কোনো পার্থক্য নেই। নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র পরিগঠন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির

কাঠামো, সর্বময় রাষ্ট্রক্ষমতার কর্তৃত্বপরায়ণতা, রাষ্ট্র-সামাজিক সিদ্ধান্ত-গ্রহণপ্রণালী ইত্যাদি কাঠামোগত প্রশ্নে পিকিংপন্থা-মস্কোপন্থা একেবারে একাকার।

মোট কথা ৬০-এর দশকে আর ৭০-এর দশকে গোটা পৃথিবী জুড়ে 'সমাজতন্ত্র' নামে যেটাকে পাচ্ছি (সেটা রাশান বা চাইনিজ বা আলবেনিয়ান বা কোরিয়ান যা-ই হোক না কেন), সেটা আসলে কর্তৃত্ববাদী সমাজতন্ত্রেরই কোনো না কোনো ধারা, কোনো না কোনো রূপ। এবং মুক্তিযুদ্ধের আগে বা পরের বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র বলতে আমরা যে ধারাগুলোকে পাচ্ছি, তা-ও স্বাভাবিকভাবেই কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতন্ত্রের ধারাই বটে।

৭.২.৩ দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু মানুষ স্বাধীন হয় নি

তার মানে, পাকিস্তানী শাসকদের উচ্ছেদ করে দিয়ে আমরা যাঁরা 'ভালো মানুষ' বলশেভিক, আমরাই স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করব, এ নিয়ে আর কথা কী? আর তারপর থেকে আমরা ভালোভাবেই দেশ চালাবো, তাই না? তত দিনে আমরা তো সবাই পাখি-পড়া করে স্নায়ুযুদ্ধের নামতা শিখে ফেলেছি: সমাজতন্ত্র ভালো, পুঁজিবাদ খারাপ। রাশিয়া ভালো, আমেরিকা খারাপ। এসব নিয়ে তো কারো আর কোনো সন্দেহই নাই। সুতরাং আমরা যে 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্রটা বানাবো, সেটা তো ভালো-কিছু হবে। এরকমই তো হয়। এরকমই তো নিয়ম। প্রকৃতির নিয়ম। বিজ্ঞানের চূড়ান্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নিয়ম। তা-ই যদি হয়, তাহলে ঐ 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্রের মৌলিক চেহারা-আদল-কাঠামো কী হবে না হবে তা নিয়ে আর আলাপ কীসের?

দেখুন: আওয়ামী লীগ এবং সিপিবি এবং অন্যান্য যাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে বা ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, একটু পরে তাঁরাই তো দেশ চালাবেন, তাই না? তাঁরাই তো আমাদের মহান নেতা। রীতিমতো পরীক্ষায় পাশকরা নেতা। সুতরাং দেশ তো তাঁরা ভালোভাবে চালাবেনই। এটা নিয়ে সংশয় আসবে কোত্থেকে? আর মুজিব তো অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক নেতা। তাঁর নেতৃত্বে যদি দেশ চলে, তাহলে তার চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে?

এভাবে রাষ্ট্র-কাঠামো ও রাষ্ট্র-পরিগঠনের প্রশ্ন, কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বতন্ত্রের প্রশ্ন, সমাজের ও ব্যক্তির সত্যিকারের স্বাধীনতার প্রশ্ন, শ্রমশোষণ আর বলপ্রয়োগের হাত থেকে শ্রমজীবী মানুষদের মুক্তির প্রশ্ন সব কিছু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে স্রেফ অনালোচিতই থেকে গেলো। রাষ্ট্রটা যেমন ছিল তেমনই থাকবে। রাষ্ট্রের নেতা-পরিচালকেরা শুধু যদি ভালো মানুষ হন, তাহলেই মিটে গেল: রাষ্ট্রও ভালো মানুষ রাষ্ট্র হয়ে যাবে।

কর্তৃত্বপরায়ণ ভ্যানগার্ড-তত্ত্বটা এতক্ষণে টের পাওয়া যাচ্ছে নিশ্চয়ই? এই তত্ত্ব অনুসারে রাষ্ট্র চালানো নিয়ে জনমানুষের কিছু করার নাই। ভাবার নাই। বলার নাই। যা-কিছু করার নেতারা করবেন। আমরা তাঁদের ওপর 'ঈমান' রাখব। তাঁরা যা বলেন শুনব। লাগলে জীবনটাও দিয়ে দেব। তারপর তিন দশক চার দশক পার করে এসে রাজশাহীর একজন মুক্তিযোদ্ধা মুর্মুর মতো বলব: দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু আমি স্বাধীন হই নি; আমি খেতেও পাই নি। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাসে আমরা পড়তে হবে আমাদের এক সাঁওতাল মুক্তিযোদ্ধার ইন্টারভিউ। আমাদেরকে রীতিমতো চমকে দিয়ে উনি বলবেন: 'একাত্তরে দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু দেশের মানুষ স্বাধীন হয় নি' (প্রথম আলো, ডিসেম্বর ২০০৭)।

তার মানে, দেশ স্বাধীন হওয়া এক জিনিস; আর দেশের মানুষ স্বাধীন হওয়া আরেক জিনিস। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে: প্রত্যক্ষ এক মুক্তিযোদ্ধার মুখ দিয়েই কথাটা শুনতে পাচ্ছি আমরা। মফস্বলের পাতার সামান্য এই রুটিন-সংবাদটির তাৎপর্য নিশ্চয়ই খেয়াল করছি না আমরা। প্রথম আলোর পাঠক হিসেবেও না; বামপন্থী কর্মী হিসেবেও না। খোদ এক মুক্তিযোদ্ধা বলছেন: আমরা দেশ স্বাধীন করলাম কিন্তু দেশের মানুষকে স্বাধীন করতে পারলাম না। এবং এটুকু বলেই তিনি থেমে যাচ্ছেন না। এমন মারাত্মক কথাও বলছেন: এইবার দেশের মানুষকে স্বাধীন করতে হবে।

এই স্বাধীনতা অর্জনের চিরায়ত স্বপ্ন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সেই স্বপ্নের চুরমার হয়ে যাওয়া নিয়েই কথা হচ্ছে বর্তমান এই রচনায়।

৭.৩ জনযুদ্ধ, ইতিহাস ও অ্যানার্কি

একটা মুশকিলের কথা এখানে না উঠেই পারবে না। সেটা এখানে প্রস্তাবিত চিন্তাপ্রণালীর একটা গুরুতর 'অসঙ্গতি' বিষয়ক। আগে বলেছি: পূর্ব বাংলার হাজার বছর ধরে নিপীড়িত-উপেক্ষিত-বঞ্চিত কৃষক-সমাজ সার্বিক আর্থসামাজিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মরিয়া হয়ে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য আপামর শ্রমজীবী জনগণের দিক থেকে আদৌ কোনো রূপকল্প ছিল না। থাকলেও সেটা এই মুহূর্তে লিখিত ইতিহাস-সূত্রে আমাদের সামনে হাজির নাই।

অসঙ্গতিটা হচ্ছে: একটা জনগোষ্ঠী সার্বিক অর্থে স্বাধীনতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলে তার নিজস্ব সক্রিয়তার কিছু না কিছু অভিপ্রকাশ তো থাকবেই, তাই না? সেইসব অভিপ্রকাশ ইতিহাসের ফাঁকেফোঁকরে নিশ্চয়ই ছাইচাপা থেকে যাবে। সে ক্ষেত্রে স্রেফ নেতাদেরকে অনুসরণ করার বাইরে, পার্টি কিংবা মুজিবনগর সরকারের আদেশ-নির্দেশের বাইরে, অর্থাৎ সমস্ত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার বাইরে জনমানুষের নিজে নিজে বিকশিত হয়ে ওঠার, নিজে নিজে স্বাধীনতা-চিন্তা করতে শেখার, নিজেরা

নিজেরা সংগঠিত হতে সক্ষম হয়ে ওঠার, নিজেরা নিজেদের দায়িত্বে মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে পারার, এবং সর্বোপরি, তাঁদের মধ্যে সত্যিকারের স্বাধীনতার কিছু না কিছু স্বতন্ত্র ভাবধারার অন্তত কিছু ছড়ানো-ছিটানো নমুনা তো থাকারই কথা। সেগুলো সব গেল কোথায়?

৭.৩.১ একাত্তরের জনযুদ্ধ এবং জনসাধারণের নিজস্ব সক্রিয়তার আভাস

বিদ্যমান লিখিত ইতিহাসের খাপেখোপে সেগুলো লুকিয়ে আছে। আমরা খেয়াল করি নি। এসবের খোঁজখবর পাওয়া সাপেক্ষে জনগণের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, অর্থাৎ বিশাল এক জনযুদ্ধ আকারে মুক্তিযুদ্ধের আসল ইতিহাসটাকে দাঁড় করানোর অসম্পাদিত কর্তব্য আমাদেরকে সম্পাদন করতে হবে। সুতরাং খোদ মুক্তিযুদ্ধের বৈশিষ্ট্যগত, মানে স্বভাব-চরিত্রগত, কতকগুলো দিক নিয়ে আলাপ তোলার বিকল্প থাকবে না আমাদের। প্রস্তাবিত সামগ্রিক প্রেক্ষাপটটাকে বুঝতে এই আলাপ আমাদেরকে সাহায্য করবে।

একাত্তর সালের আগে-পরে বাংলাদেশের যে ইতিহাস, সেটাকে খুব স্বতন্ত্রভাবে, এবং বিস্তৃতভাবে দেখার একটা বড় জায়গা আছে। কেননা আপামর মানুষের লড়াইয়ের দিক থেকে এটা আমাদের মহিমান্বিত ইতিহাস। খুবই গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস। জনসাধারণ (বলতে গেলে প্রত্যেকটা মানুষ) এই লড়াইয়ে বিপুল মাত্রায় ইনভল্‌ভ্‌ড্‌ ছিলেন। ইতিহাসটা যে গৌরবমণ্ডিত, সেটা এই অর্থে। আসলে জনসাধারণই যে যুদ্ধ করে দেশটা স্বাধীন করেছেন, এই কথাটা সহজে আমাদের মনে থাকে না। গতানুগতিকতার অভ্যাসে কথাটা এখানে-সেখানে বলে ফেললেও, কী বললাম, কী অর্থে বললাম, সেটা আমাদের মাথায় ঠিক খেলে না।

সুনির্দিষ্ট একটা অর্থে কথাটা আমরা এখন তুলছি। নিজের নিজের দল-নেতা-মহামানবের অবদান নিয়ে যে যাই বলুন, যে যাই প্রচার করুন, মুক্তিযুদ্ধটা কিন্তু একটা জনযুদ্ধ। বিশুদ্ধ জনযুদ্ধ। মানে একটা ভূখণ্ডের লোকেরা প্রায় একশতে একশ জনই যুদ্ধে ইন্‌ভল্‌ভ্‌ড্‌ এবং একইভাবে টিউন্ড। ইতিহাসে এই ঘটনা পাওয়া খুব সহজ না। গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে। কাছাকাছি ঘটনা আছে, সত্য, কিন্তু আমার ধারণ – একেবারে প্রায়-শতভাগ টিউনিং বিরল।

(এইগুলো শুদ্ধ ধারণা মাত্র। আরো খোঁজখবর নিয়েই ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে কথা বলতে হবে। কিন্তু খোঁজখবরটা নেব কোন লাইনে, সেই অনুমানগুলোই এখানে বলছি মাত্র। খোঁজখবর নিয়ে যদি অন্য জিনিস পাওয়া, তাহলে ধারণা অবশ্যই বদলাতে হবে। তাতে কোনো অসুবিধা নাই। সত্যের চেয়ে কাঙ্ক্ষিত তো কিছু নাই।)

তো একটা ভূখণ্ডের সাত কোটি, সাড়ে সাত কোটি লোকের এক সুরে বেজে ওঠা, এক কাতারে শামিল হয়ে জানবাজি লড়াইয়ে নেমে পড়া, সমর্থন জোগানোটা খুব আরামের কথা নয় মোটেও। খুব অল্প সংখ্যক লোকের ব্যাপার তো এটা না, তাই না? এঁরা সকলেই মনে করেছেন যে, সবাই মিলে তাঁরা এমন একটা কাজ করছেন, যার চেয়ে দামি কাজ তাঁদের জীবনে আর কিছুই নাই, কখনও ছিলও না, এবং যেকোনো মূল্যেই হোক, কাজটা সম্পন্ন করা দরকার।

সম্মুখযুদ্ধে কয় জন বন্দুক হাতে নিয়েছেন, কত জন নিজে হাতে গ্রেনেড ছুঁড়েছেন, এগুলো স্রেফ গুরুত্বহীন ঘটনা। আসল ঘটনাটা হলো: সকলেই মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। নিজের নিজের মতো করে। অজস্র উপায়ে। অযুত-নিযুত ফ্রন্টে। সকল ফ্রন্টের নাম, সকল সেক্টরের নাম, সকল যোদ্ধার নাম-ঠিকানা মানচিত্র মুজিবনগর-সরকারের খাতায় ছিল না। হ্যাঁ, এরই নাম জনযুদ্ধ। এখানেই আমরা জনসাধারণের নিজস্ব সক্রিয়তার ঐতিহাসিক আভাস পেয়ে যাই।

রাজাকার? আলবদর? আচ্ছা। মুক্তিযুদ্ধের আকাশ-সমান বৃহৎ ক্যানভাসে রেখে দেখলে, গুটিকয় লোক যে রাজাকার হয়েছেন, সেটা নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বামপন্থী-ডানপন্থী বুর্জোয়া পলিটিক্সের প্যাঁচে পড়ে গিয়ে রাজাকাররা অনেক বেশি বড় হয়ে উঠে এসেছেন। এটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মহত্বকে অনায্যভাবে এবং ভ্রান্তিপূর্ণভাবে খাটো করেছে। রাজনৈতিক নেতাদের কথা শুনে মনে হয় যেন মুক্তিযুদ্ধের সময় অ-নে-ক অ-নে-ক মানুষ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন। ঠিক না। একেবারেই ঠিক না। জামায়াতে ইসলামী ছিল। কিন্তু মোট জনসংখ্যার তুলনায় কতটুকু ছিল তারা? তাদের অপকর্ম এবং যুদ্ধাপরাধকে আমি মোটেও খাটো করে দেখছি না। এমনকি রাজাকার-আলবদরদের মধ্যেও, ইন দ্য ট্রুয়েস্ট সেন্স অফ দ্য টার্মস, রাজনৈতিকভাবে মোটিভেটেড 'অ্যান্টি-লিবারেশন ফোর্স' হিসেবে কাজ করেছে এমন লোকের সংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা যাবে।

'রাজাকার' বলে যে একটা ফোর্স ছিল, সেটা ছিল ভাড়াটিয়া ফোর্স মাত্র। 'আলবদর'ও তা-ই। এগুলো ছিল টাকার বিনিময়ে, মাসিক ভাতার বিনিময়ে, দুষ্প্রাপ্য খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে, এবং সর্বোপরি নিরাপত্তার বিনিময়ে ভাড়া-খাটা মজুরদের মতো একটা ভাড়াটিয়া পদাতিক বাহিনী। এইসব বাহিনীর সকল সদস্যও বাস্তবে, একদম সত্যিকার অর্থে, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধ-মনা ছিলেন না। অনেকের জন্যই রাজাকারগিরি-আলবদরগিরি করাটা চাকরি ছিল মাত্র। বাড়তি দুইটা পয়সা পাওয়ার চাকরি। যে যুবকেরা দেশ ছেড়ে যেকোনো কারণেই হোক পালাতে পারেন নি, বা সরাসরি সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং নেওয়ার জন্য ভারতে গিয়ে পৌঁছাতে পারেন নি, তাঁদের অনেককেই জোর করে এইসব

বাহিনীতে ঢোকানো হয়েছে। স্বেচ্ছায় বাধ্য হয়ে ঢুকেছে, এমন মানুষও ছিল, সন্দেহ নাই। আবার এরকমও ছিল, নিজের গ্রামটা বাঁচানোর জন্য মুরুব্বি-মাতব্বর স্থানীয়, ভালো উর্দু-জানা কেউ, শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন।

হ্যাঁ, এরকম অনেক ঘটনাও ছিল। একটা ঘটনা শুধু এখানে বলি। আমাদের এক বন্ধু পাভেলের শ্বশুর সেদিন গল্প করলেন। শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান গোছের একজন লোক। প্রভাবশালী লোক। তার বাড়িতে ঐ এলাকার পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন-লেফটেন্যান্ট সাহেবরা খেতে আসবেন। পাকিস্তানী বাহিনীর অফিসাররা একটা ভোজে আসবেন আর কি। তাদের সম্মানে ভোজ দিতে হবে। তো সেই ভোজের জন্য রান্না হচ্ছে। একই রান্না এরা খাচ্ছে: পাকিস্তানী সৈন্যরা, অফিসাররা। আবার ঐ একই রান্নার হাঁড়ি ঐ বাড়িতেই চাতালে উঠে যাচ্ছে সংগোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। এরকম অজস্র ঘটনা নিশ্চিত পাওয়া যাবে। অজস্র। আর এরকম অজস্র ঘটনার রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে কথা তোলা যাবে এই রচনার শেষ কিস্তিতে। সামনের সপ্তাহে।

ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি: আজকের বাংলাদেশের যে দুর্দশা বাহাত্তর থেকে সূচিত হয়েছে, দুর্ভাগ্যজনক হলেও তার গোড়া রয়েছে আমাদের সুমহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতেই। পঞ্চাশ-ষাটের দশক জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের যে মানস-পাটাতন গড়ে উঠেছিল, তাতে ছিল কর্তৃত্বপরায়ণ ধ্যানধ্যারণার প্রভাব। তারপর যুদ্ধ যখন চলেই এল, আমাদের সামনে তখন ব্যক্তি-রাষ্ট্র-সমাজ-স্বাধীনতা সম্পর্কিত কর্তৃত্বপরায়ণ বলশেভিক সমাজতন্ত্রের রূপকল্প ছাড়া আর কোনো দিশা ছিল না জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসগত নানান কারণে। ফলে আপামর মানুষের অকল্পনীয় আত্মত্যাগ এবং শোষণ-বৈষম্যহীন একটি সমাজের অনন্ত-লালিত একটা গণ-আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বরের পরদিন থেকেই আমরা আবার সেই বৃটিশ-পাকিস্তানী ঔপনিবেশিকতার ধারায় বৈষম্যপূর্ণ, কর্তৃত্বপরায়ণ ও গণবিরোধী একটি রাষ্ট্র-কাঠামোর খপ্পরে পড়ে যাই।

আজ দেখব: আমাদের স্বপ্নের সাথে মানানসই রূপকল্পের অভাবজনিত দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি কীভাবে ২০০৬ সালের অক্টোবর-মহাসংকট তথা এক-এগারোর দুঃশাসন এবং ২০১৩-র রাজনৈতিক অচলায়তনের সাথেও ওতপ্রোত-ভাবে সংশ্লিষ্ট। আমরা আরো দেখব, আমাদের মহাকালের মুক্তিযুদ্ধের বিশালতার গভীরে অচেতনভাবে অনুশীলিত অ্যানার্কির স্পৃহা, অর্থাৎ ব্যক্তি ও জনগণের আত্মকর্তৃত্ব-আত্মমর্যাদা-স্বাধীনতা-সমতাপূর্ণ স্বশাসনের অলক্ষিত উপাদানসমূহের সচেতন-সক্রিয় অনুশীলনই অচলায়তন ভেঙে বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে পারে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মুক্তধারার দিকে। নতুন রাষ্ট্র-সামাজিক বন্দোবস্তের দিকে।

৭.৩.২ সর্বাত্মক জনযুদ্ধ সর্বব্যাপ্ত মুক্তিবাহিনী

ওপরে আমরা দেখেছি, আমাদের মুক্তিযুদ্ধটা ছিল বিশালায়তনের ঘটনা। কথাটা স্রেফ মুখস্ত বুলি হিসেবে বলছি না। বরং সতর্ক পর্যবেক্ষণ আকারে এবং অজস্রমুখী তথ্য-প্রমাণ-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে উপলব্ধিযোগ্য বা খারিজযোগ্য অনুকল্প আকারে এখানে উপস্থাপন করছি।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলতে গত কয়েক দশক ধরে যে প্যানপ্যানানি চলছে তা নির্লজ্জ দলীয় রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর মাত্র। আওয়ামী লীগ কী করল, শেখ মুজিব রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন কিনা, জিয়াউর রহমান রেডিওতে কিছু বললেন কিনা, কে-কোথায়-কীভাবে যুদ্ধ করলেন ইত্যাদি হয়ে দাঁড়িয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস -চর্চার মনোযোগকেন্দ্র। ফলে অল্পকিছু লোকের নাম ঘুরেফিরে উঠে আসছে 'ইতিহাসের পাতায়'। আমি কাউকে খাটো করছি না। সবাই কাজ করেছেন। সম্মিলিত প্রয়াসেই মুক্তিযুদ্ধ সফল হয়েছে। সেটা একটা তুলনাহীন ব্যাপারই বটে।

কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হচ্ছে: পাকিস্তানী আর্মির একটা অংশই তো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষাবলম্বন করল, তাই না? এঁরা পাকিস্তানী আর্মিরই অংশ। জাতিগত দিক থেকে তাঁরা বাঙালি। বাঙালি না হলেও বাংলাদেশের মানুষ। কিন্তু জাতিগতভাবে বাঙালি হলেই, কিংবা বাংলাদেশ-ভূখণ্ডের মানুষ হলেই যে সবাই এ্যান্টি-পাকিস্তান অবস্থান নেবেন, স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে প্রযোজ্য এমন কোনো আইন তো নাই! এটা বোঝা যাবে ভারতে বৃটিশ শাসন দেখলে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বৃটিশ শাসন যে টিকে থাকল, সেটা কিন্তু মূলত ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কারণেই। শুধু ভারতীয় বলেই সবাই এ্যান্টি-ব্রিটিশ হয়ে যাননি। ভারতীয় আমলা-সেনাকর্তারা সাধারণভাবে ব্রিটিশের গোলামিই করেছেন। বাংলাদেশের বেলায় তেমন ঘটেনি। সে সময় পুলিশ-আর্মি-আমলাতন্ত্রের মধ্যে বলতে গেলে এমন একটা লোকও ছিলেন না, যিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা তো পাকিস্তানী আর্মির ট্রেনিং পাওয়া লোকই বটে। ফর্মাল শৃংখলাবাহিনীর লোক। টিপিক্যাল মিলিটারি মেন্টালিটির লোক। তাঁরা তো সামারিক বেসামরিক কর্তৃত্ব-পরায়ণতার মহাট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক। আইন-শংখলা-ডিসিপ্লিন-অথরিটি-পানিশমেন্ট ইত্যাদিকে কর্তৃপক্ষীয় চোখেই তো দেখার কথা তাঁদের। তাহলে, অন্ততপক্ষে, একটা দুইটা সামরিক ইউনিটের তো যাওয়ারই কথা ছিল পাকিস্তানীদের পক্ষে, তাই না? তা তো পাচ্ছি না। একটা লোকও যে পাচ্ছি না! এরই নাম হলো জনযুদ্ধ। এ খুবই অন্য মাপের ঘটনা। সম্ভবত আমরা আজও ঠিক বুঝি নি এর গুণ, মাত্রা, ব্যাপকতাকে।

মুক্তিযুদ্ধ কারা করেছেন? আমাদের ইপিআর সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনীর

লোকেরাই। এঁরা যখন মুক্তিবাহিনী হয়ে গেলেন, তখন তাঁরা চলে গেলেন কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতার কাতারে। আর যুদ্ধ করলেন রীতিমতো অন্যভাবে। বৃটিশ-পাকিস্তানী ট্রাডিশনের ফর্মাল একটা আর্মির বিশাল একটা অংশ স্রেফ সিভিলিয়ান আর্মি হয়ে গেল! জনগণের আর্মি হয়ে গেল!

মুক্তিযুদ্ধের নেচারটাই সর্বমাত্রিক জনযুদ্ধের। এর পরিচালনা কৌশল, প্রশিক্ষণ, তহবিল, সংগঠন-কাঠামো ইত্যাদি নানা কিছুর দিকে তাকালে এই ইঙ্গিতটুকু পষ্ট পাওয়া যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের কথা ধরুন, যাঁরা মুক্তিবাহিনীর মেম্বার, তাঁরা তো নতুন-পুরোনো তরুণ-যুবাদের নিয়ে গড়া একটা সামরিক বাহিনীরই মেম্বার। মুক্তিবাহিনীটা তো একটা সামরিক বাহিনীই বটে। কিন্তু এই সামরিক বাহিনীর স্বভাব-চরিত্র ও গঠন-প্রকৃতি, 'অফিসার-জওয়ান' সম্পর্ক, চেইন অফ কমান্ডের বাস্তব-প্রায়োগিক ধারণা ও আচরণ একদম আলাদা। সেক্টরগুলোতে, ইউনিটগুলোতে, গেরিলাদলগুলোতে সেই অর্থে কি 'অফিসার' পদ ছিল? সনাতন কমান্ড-কাঠামো ছিল? ঊর্ধ্বতন-নিম্নতন-মনোভাব কি ছিল? প্রবল ছিল? স্যালুট দেওয়া, হুকুম-দারিত্ব, মর্যাদাবোধের বিপুল পার্থক্য, সুযোগসুবিধার নিদারুণ বৈষম্য ইত্যাদি প্রভৃতি আদৌ কি ছিল? কতটা ছিল? কীভাবে ছিল? পরিবর্তনের প্রবণতাগুলো কেমন ছিল? এগুলো সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার দরকার আছে। মুক্তিবাহিনীতে সম্ভবত ফর্মাল সেনাবাহিনীর মতো করে ছিল না এগুলো। মুক্তিবাহিনী ছিল অন্য ধরনের একটা টিমওয়ার্ক। মুক্তিযোদ্ধাদের একটা দলকে ঠিক 'সেনাবাহিনী'র মতো লাগে নি। জনগণের অংশ বলেই মনে হয়েছে। সাধারণ মানুষ কক্ষনো তাঁদের ভয় পায় নি।

মিডিয়াসমর্থিত সুশীল সামরিক জরুরি জমানায় দুষ্টু রাজনীতিবিদদের হাত থেকে জাতিকে চিরতরে উদ্ধারের জন্য পথে নেমে আসা সেনাবাহিনীর গাড়ি রাস্তা দিয়ে গেলেই মানুষ আঁতকে উঠেছে। কখন কার হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়! আমেরিকান সেনাবাহিনীকে দেখে সাধারণ ইরাকিরা যতখানি ভরসা করেন, আমাদের সিংহাসনে বসা সেনাবাহিনীকে দেখে কি আমরা তার চেয়েও বেশি ভরসা করি? নাকি ভয় করি? মুক্তিবাহিনীকে দেখে বাংলাদেশের মানুষের সেই ভয় লাগেনি। পোশাকে-আশাকে, চলনে-বলনে, চিন্তায়-প্রেরণায় সকল কিছুতেই এঁরা ছিলেন আলাদা। হয়ত মাত্র তিরিশ টাকা নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকছে একটা গেরিলা টিম। তারপর কয়দিন যায়? যে গুটিকয় বন্দুক-বোমা-গ্রেনেড নিয়ে ঢোকেন তাঁরা, সেগুলোই বা কয় দিন? তারপর তাঁদের নিজেদেরকেই ঠিক করতে হবে নিজেদের খাওয়া-পরা-অস্ত্র-আশ্রয়-তথ্য-সিদ্ধান্ত সবকিছু। উপরন্তু বেতন, ভাতা কিচ্ছু পাবেন না তাঁরা। মরে গেলে খবরটা যে পরিবার পাবে, তারও নিশ্চয়তা নেই সামান্যতমও। কী ধরনের সামরিক বাহিনী এটা তাহলে? মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর অবদান নিয়ে যে বক্তৃতা-

গুলো শোনা যায় তার সত্যিকারের প্রকৃতি ও প্রণালী নিতান্তই পৃথক। বক্তৃতার মতো নয় মোটেও। একেবারেই অন্যরকম।

মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে তাহলে সেই অর্থে আমি তো কোনো সামরিক বাহিনীই পাচ্ছি না। খাঁটি, জনবিচ্ছিন্ন, ফর্মাল, স্ট্রাকচারাল মিলিটারি অর্থে কোনো সামরিক বাহিনী আমাদের কোথায় ছিল একাত্তরে? কি পুলিশ, কি ইপিআর কি সেনাবাহিনীর লোক, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, তাঁদেরকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল গণবাহিনী টাইপের সত্যিকারের একটা জনপ্রতিষ্ঠান। এটা একদম জনসাধারণের বাহিনী। চিন্তা করা যায়: এটা এমন একটা বাহিনী, যে বাহিনীর নামটাই 'মুক্তি'। ভালো নাম 'মুক্তি-বাহিনী', ডাক নাম 'মুক্তি' বা 'বিচ্ছু'। শুধু নামেই নয়, বাস্তবিকই এটা ছিল শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতার মুক্তিপরায়ণ একটা গণবাহিনী।

গভীরভাবে ভেবে দেখার মতো এরকম অজস্র ইঙ্গিত আছে। এই মুক্তিবাহিনী জনসাধারণের মধ্যে খায়, ওঁদেরই সাপোর্টে থাকে, ঘুমায়, ওঁদেরই পাহারায় শেল্টার নেয়, এবং ওঁদেরই ইনফরমেশনে অপারেশন চালায়। এবং বিনিময়ে কী হয়? হয়ত যে গ্রামটা সমর্থন দিয়েছিল ঐ গ্রামটাই হয়ত পুড়িয়ে দিল পাক হানাদার বাহিনী। মানে জনসাধারণের ঐ মাত্রা পর্যন্ত মূল্য দিতে হয় মুক্তিদের একটা অপারেশনের জন্য। তারপরও, সব জেনেশুনেই, সমর্থন দিচ্ছেন জনগণ, বুকে করে আগলে রাখছেন তাঁদের নিজেদের বাহিনীকে, নিজের সন্তানকে পাঠাচ্ছেন সেই বাহিনীতে। একাত্তরের গোটা বাংলাদেশই একটা মুক্তিবাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের এই দুর্দান্ত তাৎপর্যমণ্ডিত গণচরিত্র নিয়ে আমাদের আজকালকার মঞ্চ-মাইক-মুরুব্বি-মুখপাত্র-মহাজনদের উচ্চবাচ্য শোনা যায় না।

৭.৩.৩ ইতিহাসের অসম্পাদিত কর্তব্য

হাওয়ার্ড জিনের 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের ইতিহাস'-এর মতো কয়েক ডজন গ্রন্থ-দলিল-ডকুমেন্টারি রচনার অসম্পাদিত কর্তব্য দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সামনে। উপকরণ ছড়িয়েছিটিয়ে আছে। অঢেল। বই-ই আছে শত শত। আত্মজীবনী। যুদ্ধবিবরণী। দলিলপত্র-সংকলন। গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও চিঠিপত্র। আছে দেশের-বিদেশের আলোকচিত্র। গল্প-কাহিনী-সাহিত্য-সিনেমা-সংবাদপত্র। এগুলোকে সংগ্রহ করা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা, যথার্থভাবে বিচারবিশ্লেষণ করার কাজ আমাদের সামনে।

আরো আছে ওরাল হিস্ট্রি সংগ্রহ ও রচনার সুযোগ। হাজারো রকমের ভয়েস রেকর্ডার বাজারে এখন সুলভ। অজস্র মানুষের হাতে আছেও। প্রায় সকল সেলফোনেই এখন কথা রেকর্ড করার সুযোগ আছে। এখনও একাত্তরের লোকেরা

বেঁচে আছেন। তরুণদের পক্ষে প্রায়-রাতারাতি ভলিউম ভলিউম ওরাল হিস্ট্রি সংগ্রহ করা সম্ভব। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে এটা করতে পারেন। নিজের নিজের মা-বাবা, নানা-নানি, দাদা-দাদি, আত্মীয়-স্বজন, আর নিজের নিজের গ্রামের লোকদের সাথে কথা বললেই অঢেল অডিও ফাইল তৈরি হবে। সেগুলো ফেসবুকে-ইউটিউবে-ওয়েবসাইটে তুলে রাখা যায়।

বয়স্ক লোক পেলেই হলো। একাত্তর সালে তাঁরা কোথায় ছিলেন। কী ভেবেছিলেন। কী আশা ছিল। কী চেয়েছিলেন। কী করেছিলেন। কীভাবে করে-ছিলেন। কী ঘটেছিল। কীভাবে ঘটেছিল। যত রকম প্রশ্ন করা যায়, ততই লাভ। যেকোনো প্রশ্ন। কথা বলাতে পারলেই হলো। আঁতেল-দার্শনিক প্রশ্ন প্রয়োজন নাই। কমনসেন্স প্রশ্নই যথেষ্ট। তাহলেই আমরা পেয়ে যাব অমূল্য উপকরণ। সংবাদপত্র-গুলো সারা বছর ধরে এই কাজ করতে পারেন। অন্য মিডিয়াও পারে। তাঁরা নানা কিছু করছেনও। কিন্তু আমাদের বেশি দরকার হুবহু, প্রত্যক্ষ বিবরণী। স্রেফ অনুলিপি। অজস্র মানুষ ইতোমধ্যে কাজে নেমেছেন। অজস্র তথ্যভাণ্ডার, আর্কাইভ, মোহাফেজখানা গড়ে উঠছে। বিশেষত অনলাইনে। অফলাইনেও।

এমন অনেক কিছু পাব যেটা আমরা কল্পনাও করিনি। কেননা একাত্তরের ইতিহাস বা একাত্তর-পূর্ব আন্দোলনের যে ইতিহাসটা (প্রণীত ইতিহাস, মানে পুস্তকাবদ্ধ ইতিহাস) আমাদের সামনে আছে, সেই ইতিহাসের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: এগুলো যখন যে রাজনৈতিক দলগুলো দেশ চালিয়েছে তাদেরই সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা লিখেছেন। এঁরা আসলে রাজনৈতিক দলগুলোর কলম-কর্মচারী মাত্র।

এর বাইরে বাম ধারার রাজনৈতিক দলগুলোর সংশ্লিষ্ট লোকেরাও কমবেশি ইতিহাস রচনা করেছেন। সেগুলোও লেখা হয়েছে নিজেদের কর্মসূচী-এজেন্ডা-দৃষ্টিভঙ্গির প্রচারণাপত্র আকারে। এই দলগুলোর লোকদের রচিত ইতিহাসে আছে নিজ নিজ পার্টির গৌরবগাথা। তাঁদের কাছেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মানে দলীয় ইতিহাস। জনসাধারণের যুদ্ধটাকে তাঁরাও কখনো সামনে নিয়ে আসেন না। ইতিহাস মানে আমার-পরিবারের-দলের-জোটের ইতিহাস। এ হচ্ছে ইতিহাস রচনার ঔপনিবেশিক ছাঁচ। কর্তৃত্ব-তন্ত্রের ছাঁচ। তারপরও হয়ত অনেক কিছুই এসব রচনায় চলে আসে নানারকম শিথিলতাজনিত কারণে। দল-নেতা-মতাদর্শ-বিশ্বাস-চিন্তাধারার সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ অনেক কিছুই সেসবে থেকে যায়। এসব শিথিলতা বা কন্ট্রাডিকশন মহান। এসবের ফাঁকফোকর দিয়েই উঁকি দেবে মুক্তিপরায়ণ জনযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসের আর্থ-সামাজিক সম্পর্কসূত্রাবলী।

৭.৪ আজকের সংকটের গোড়ার জায়গা এবং তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপযুক্ত দিশা

সব মিলিয়ে কী দাঁড়ালো? মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের দেশের মানুষদের দুই ধরনের আকাঙ্ক্ষা ছিল। একটা হচ্ছে সম্ভাব্য শাসকদের আকাঙ্ক্ষা। অপরটা আপামর শ্রমজীবী জনগণের আকাঙ্ক্ষা। বলা বাহুল্য, এই দুই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের জন্য দুই রকমের রূপকল্প প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাস্তবে ছিল একটাই দিশা। সেটা শাসক-বড়লোকদের। এটি ছিল বলশেভিক রাশিয়ার ছাঁচে গঠিত কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজ-তান্ত্রিক রূপকল্প। এতে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার সুস্পষ্ট-সুনির্দিষ্ট কোনো আদল ছিল না। (আর এই কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতান্ত্রিক রূপকল্পের বিপরীতে আপামর শ্রমজীবী জনগণের দিক থেকে সার্বিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক মুক্তির আদৌ কোনো রূপকল্প সুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকলেও সেটা লিখিত ইতিহাস-সূত্রে আমাদের সামনে হাজির নাই।)

পরিণামে শ্রমজীবী জনসাধারণ ১৯৪৭ সালের মতো আরো একবার প্রতারিত হয়েছেন ১৯৭১ সালে। সার্বিক স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করলেও, কেমন যেন মনে হয়, আদতে তাঁরা আচ্ছন্ন থেকে গিয়েছিলেন কর্তৃত্ব-আনুগত্য-নেতৃত্ব ঘরানার সুপ্রাচীন ভাবাদর্শের খোঁয়ারিতে। তাঁরা তাঁদের নেতাদেরকে বিশ্বাস/অনুসরণ করে গেছেন স্রেফ। ঈমান রেখেছেন নিজেদের ওপরে নয়, জাতীয়তাবাদী নেতাদের ওপরে।

এক দিকে বাংলাদেশের মানুষের শ্রেণীচেতনা ও বাঙালি জাতীয়তাবোধ একাকার হয়ে যাওয়া, এবং অন্য দিকে, রুশবিপ্লব-পরবর্তী কোল্ড ওয়ারের ঐতিহাসিক, আন্তর্জাতিক ও ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল এই দুর্ভাগ্যের জন্য প্রধানত দায়ী। নেতাদের পেছন পেছন ঘোরার মানসিক নিষ্ক্রিয়তা ঝেড়ে ফেলে জনগণ আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠলে, এবং চিন্তা ও কাজের সত্যিকার সক্রিয়তা অর্জন করতে পারলে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্যরকম হতে পারত। এইটাই আমাদের সংকটের গোড়ার জায়গা।

২০০৬ সালের অক্টোবর-মহাসংকটের মাৎস্যন্যায়-পর্বেও এটাই ছিল সংকটের মূলে। সে বছর ২৮শে অক্টোবর তারিখে যখন রাজনীতির রাক্ষসতন্ত্র তার দাঁত-থাবা-নখ-পেশীর মহাপ্রকাশ ঘটাল, লগি-বৈঠা-বন্দুক-লাঠি-পিস্তল এবং 'লাইভ' টিভি-ক্যামেরা নিয়ে শাসক-শ্রেণীর বিভিন্ন পক্ষ যখন মাঠে নেমে পড়লেন ক্ষমতা দখলের হুড়াহুড়িতে, জনগণকে তাঁরা তখন এই মেসেজ-ই দিয়েছিলেন: 'জনগণ দূরে থাকো'।

জনগণ তখন কোথায় ছিলেন? সোজা ঘরের ভেতর। ক্ষমতা-ভাগাভাগির

লড়াই থেকে তাঁরা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। সর্বসম্মত নীরবতার আওয়াজে সকলকে তাঁরা জানিয়ে দিয়েছিলেন: ক্ষমতা নিয়ে এই কামড়াকামড়ি তাঁদের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। তাঁরা এতে জড়িত থাকতে ইচ্ছুক নন। এতে তাঁদের মঙ্গল নিহিত নাই। এটা স্রেফ রাজনৈতিক দলসমূহের ইস্যু। জনসাধারণের ইস্যু নয়। তাঁদের এই নিষ্ক্রিয়তা মঞ্চে ডেকে এনেছিল সেনাবাহিনীর দুঃশাসন।

তথাপি গণমানুষের দিক থেকে এই উপলব্ধি এক ধাপ অগ্রগতিই বটে। তাঁদের এই উপলব্ধিজনিত 'নিষ্ক্রিয়তা'র সিদ্ধান্ত ছিল রীতিমতো সযত্নে রচিত। সচেতন-ভাবে প্রণীত। সক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত। একাত্তরের সাথে, ষাট সত্তর আশি ও নব্বইয়ের দশকের সাথে একুশ শতকের এই হচ্ছে তফাৎ। অতীতে রাজনৈতিক দলগুলোকে নানান প্রশ্নে সমর্থন দিলেও, এই প্রশ্নে আদৌ কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক তাঁরা নন। পরিণামে পষ্ট হয়ে ওঠা 'রাজনৈতিক দল বনাম জনসাধারণ' এর এই বিভাজন-রেখা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ভবিষ্যতে জনগণ যদি নিজেরা নিজেদেরকে পরিচালনা করতে চান, সেক্ষেত্রে এই বিভাজন-রেখাই হবে তাঁদের সক্রিয়তার প্রধানতম ভিত্তি হবে। এবং আজকের শাহবাগ-সক্রিয়তাও আদিতে এই বিভাজন-রেখার ওপরই প্রতিষ্ঠিত বলে আমার মনে হয়। যাবতীয় রাজনৈতিক দলের প্রতি অবিশ্বাস ও অনাস্থাই শাহবাগের আদি ভিত্তি। খোদ পলিটিক্স নামক প্রতিষ্ঠানটি যে আদতে গণবিরোধী, লুটেরা এবং নিপীড়ক– এই উপলব্ধি দিনে দিনে দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। শাহবাগ -জাগরণের বিস্ময়কর ও মহাকাঙ্ক্ষিত উত্থান এবং কিছু পরে তার আপাত শিথিলতা থেকে শুরু করে সাভারের শ্রমিক হত্যাযজ্ঞে পার্টি-পয়সা-প্রতারণার অবিশ্বাস্য 'নাটক' পর্যন্ত তার ইশারা সুস্পষ্ট।

সাধারণ মানুষ এখন জানেন যে কোনো রাজনৈতিক দলই জনগণের নিজেদের সংগঠন নয়। এবং বাংলাদেশে যত প্রকার সংগঠন আছে, তার সবই কোনো না কোনোভাবে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের দুর্বৃত্তদের ঘাঁটি। সবাই শিখতে শুরু করেছেন যে জনগণের নিজেদের কোনো পার্টি নাই, পলিটিক্স নাই। পলিটিক্স শব্দটাই আজ একটা গালি। ঘৃণ্য তৎপরতার প্রতিশব্দ। এই বস্তাপচা পার্লামেন্টারি রাজনীতির বিপরীতে আগামী দিনের অরাজ-নীতির তথা অ্যানার্কির তথা গণমানুষের গণতন্ত্রের তথা গনসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বাধীনতা ও স্বশাসনের ভিত্তিই হবে এই উপলব্ধি যে: বিদ্যমান রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অসার সেনাকর্পোরেট কর্তৃত্বতন্ত্র দিয়ে আমাদের মুক্তি আসবে না। আমাদের দরকার: বেসামরিক, সামাজিক গণতন্ত্র।

ধরা যাক ঐ অক্টোবর-মহাসংকটের আগে-পরের সময়কালেই যদি জনগণ

নিজেরাও একটা 'পক্ষ' হয়ে উঠতেন এবং মাঠে নামতেন, মাথার গহীন থেকে কর্তৃত্ব -পরায়ণ ভ্যানগার্ড-তত্ত্ব তথা রাখাল/ভেড়ার পাল তত্ত্বটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যদি তাঁরা সিদ্ধান্ত নিতেন – দেখি, এবার আমরা নিজেরা নিজেদের জন্য কিছু করতে পারি কিনা, তাহলে কী হতো? তাহলে রাজনীতির রাক্ষসদের বন্দি করে তথাকথিত অবাধ পুঁজিবাদের ড্রাম বাজাতে বাজাতে সিংহাসনে এসে বসা এক-এগারোর নবতর সুশীল-সামরিক রাখালদেরকে, ওরফে রাক্ষসের বড় ভাই সেনাকর্পোরেট খোক্কসদেরকে, নিজেদের ঘাড়ে বসিয়ে পাক্কা দুইটা বছর জেল-জুলুম-ঘানি-ক্ষুধা-অভাব-দুর্ভিক্ষ হজম করে ফের সেই রাজনীতির রাক্ষসতন্ত্রের থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় আমাদেরকে গিলতে হতো না। আমাদের ইতিহাস ইতির পথে পা বাড়াতো, নেতির রাস্তায় নয়। এইটাই আমাদের সংকটের গোড়ার জায়গা। সম্ভবত শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই নয়, আমাদের মতো 'উন্নয়নশীল' আরো অনেক দেশের ক্ষেত্রেও, স্বাধীন ও বৈষম্যমুক্ত একটা উন্নততর সমাজ পরিগঠনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক সংকটটা এখানেই।

এখানে অবশ্যই খেয়াল করতে পারা দরকার: সমস্যাটা শুধু কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতান্ত্রিক রূপকল্প নিয়ে নয়। সমস্যাটা লেনিনবাদ-লিবারালবাদ-লাদেনবাদ নির্বিশেষে খোদ কর্তৃত্বপরায়ণতা তথা আনুগত্যপরায়ণতার সুপ্রাচীন প্যারাডাইম বা আদিকল্প নিয়েই। জনগণের আপাত নিষ্ক্রিয়তার, নিস্পৃহতার, নেতানেত্রীর প্রতি আপাত আনুগত্যের, আপাত আস্থার আদি উৎস আমাদের কর্তৃত্বপরায়ণ ভাব-পরিমণ্ডলের হাজার বছরের ইতিহাসের ভেতরে। আদি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এবং ক্ষত্রিয়-তন্ত্রের হাতে এর শুরু। রাজা-রাজড়া-ভূস্বামী-জমিদার-পুঁজিপতি-কারখানামালিক ও রাষ্ট্রকর্তাদের কঠোর বলপ্রয়োগ ও মধুর শাস্ত্র-সুধায় এর বিকাশ ও পরিপক্কতা।

ব্যক্তি-মানুষ এবং সমাজস্থ মানুষ-সকল যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিজেই নিজেকে পরিচালনা করতে পারেন, এই দৃষ্টিভঙ্গি বা ধ্যানধারণা বা দিশা আমাদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত অনুপস্থিত। একবার এই আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তি ও সমাজবীক্ষা অর্জন করা গেলে জনগণ নিজেরাই নিজেদের আর্থ-সামাজিক পরিচালনা করার মতো স্বাধীনতাশীল সমাজতান্ত্রিক সংগঠন গড়ে তুলতে পারবেন। ক্রমাগত তাকে উন্নত করে তুলতে সমর্থ হবেন।

এইসব জনসংগঠনের প্রধান 'রাজনৈতিক' কাজ হবে খোদ রাজনীতিকে উচ্ছেদ করা। কেননা রাজনীতি মানেই হলো শাসনতন্ত্র। শাসন রাজারাণীর নামে, আল্লা-খোদা-বুদ্ধ-ভগবানের নামে, কিংবা তথাকথিত আইনের শাসনের নামে। জনসাধারণকে আত্মবিশ্বাসহীন করে রেখে এবং রাজনৈতিক দল-নির্ভর বা রাজা-রাণী-মোল্লাপুরুত-নির্ভর নিষ্ক্রিয়তার প্রচারণা জারি রেখে গুটিকয়ের শাসনতন্ত্র

চালিয়ে যাওয়ার নামই রাজনীতি। বিদ্যমান কাঠামোয় রাজনীতি কথাটার মানে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা-কর্তৃত্বের সিংহাসন দখল করা এবং তার 'আইনগত' ভাগ-বাঁটোয়ারার বন্দোবস্ত বহাল রাখা।

মানুষ যখন নিজেরা নিজেদেরকে পরিচালনা করতে শুরু করবেন তখনই গড়ে উঠতে শুরু করবে রাজনীতিমুক্ত, কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্ব-ক্ষমতা-মুক্ত স্বাধীন ও উন্নতি-শীল একটা সমাজ। মানুষকে তখন আর 'শাসন' করার প্রয়োজন থাকবে না। প্রয়োজন থাকবে শুধু আর্থসামাজিক কাজকর্মসমূহের সমন্বয় সাধন করা। সেই কাজ করবে জনগণের নিজস্ব, প্রত্যক্ষ আর্থসামাজিক সংগঠনসমূহের ডেলিগেটদের নিয়ে গঠিত সমন্বয়-পরিষদ গোছের প্রতিষ্ঠানসমূহ। এদের নিজেদের নীতিনির্ধারণী কোনো ক্ষমতা থাকবে না। জনগণের নিজস্ব সংগঠনসমূহের প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক সম্মিলিত-ভাবে নির্ধারিত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের কাজটুকু শুধু দেখাশোনা করবেন এঁরা।

একদিন ঘুম থেকে উঠে মানুষ তাদের মাথা থেকে কর্তৃপক্ষীয় ভাবাদর্শের বোঝা ছুঁড়ে ফেলবে, এমন চিন্তার অসার। কিন্তু উপযুক্ত দিশা বা রূপকল্প অর্জন করা গেলে বিদ্যমান সমাজের মধ্যেও জনগণের আত্মকর্তৃত্বের আর্থসামাজিক প্রণালী রচনার কাজ শুরু করাটা সম্ভব। পুরোনো সমাজের মধ্যেই নতুন সমাজের বীজ বপন সম্ভব। ইতিহাস আমাদের মহাজাগরণের অপেক্ষায় আছে। সেই জাগরণ বাস্তবিকই সম্ভব। হুট করে নয়। নির্দিষ্ট তারিখ ধরে নয়। মঞ্চ-মাইক-মুরুব্বি-মুখপাত্রদের কোনো কমিটির ডিক্রি-ফরমান-ফতোয়া দিয়ে নয়। একটু একটু করে। তিল তিল করে। মুক্তিপরায়ণ ব্যক্তি-সমাজ-তন্ত্রের স্বাধীনতাশীল সংগঠন, সংস্থা ও চিন্তাধারাকে দীর্ঘ দিনের থ্যাংকসলেস কাজের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলার মাধ্যমে আমরা সেদিকে যেতে পারি। একটু একটু করে। তিল তিল করে। শাহবাগ-শিবগঞ্জ-সাভারে আজকের গণসক্রিয়তা বহুল কাঙ্ক্ষিত সেই মহাজাগরণেরই আজকের দিশাহারা মহড়া মাত্র। চাই শুধু উপযুক্ত দিশা। এক কল্পকালের কাজ এক পলকেও সাধন করা যেতে পারে বৈকি! আপামর মানুষ আপামর পরিবর্তনের জন্য তো আসলে প্রস্তুত। উপযুক্ত দিশাটুকু চাই শুধু।

রাবি-র *অভীপ্সা* ছোটকাগজের সাথে আলাপচারিতার আংশিক অনুলিপি: মে ২০০৭। *সমবীক্ষণ*, চট্টগ্রাম: ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯। *দেশলাই*, কিশোরগঞ্জ-ঢাকা: ২য় সংখ্যা, আগস্ট ২০১২।

আট

কর্নেল-তাহের-রূপকথার ৩৭ বছর: কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা

অক্সফোর্ডে ১৯৭০ সালে আবু তাহের বীরোত্তম

সূচনাতথ্য: বর্তমান রচনাটি জাসদ-ছাত্রলীগের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কর্তৃক ২২শে জুলাই ২০১১ তারিখে আয়োজিত তাহের-দিবসের আলোচনার পরিমার্জিত ও পুনর্লিখিত অডিও-অনুলিপি। অডিও ইউটিউবে: https://www.youtube.com/watch?v=90P_Zu_rZg0।

৮.১ আজকেও কি আমরা তাহেরের পথে হাঁটতে চাই?

কর্নেল আবু তাহের (বীরোত্তম) এর আত্মদানের দিবসে আজকে আয়োজিত এই সভায় জাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির, রাজশাহী জেলা কমিটির, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ, আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও শহরের জাসদ এবং ছাত্রলীগের বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ, সংগঠকবৃন্দ সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবং

যেকোনো প্রকারেই হোক, যত রকম সীমাবদ্ধতার মধ্যেই হোক, কর্নেল তাহেরের নামটা – তাঁর নিশানা এবং তাঁর লড়াইয়ের চিহ্ন – বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং প্রতি বছর অন্তত তাহের-দিবসে সেটা মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়ার যে কাজ জাসদ, কর্নেল তাহের পরিষদ, ছাত্রলীগ গত ৩৫ বছর ধরে করছেন, তার জন্য তাঁদেরকে লড়াকু অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বক্তৃতা করতে আমার রীতিমতো ভয় লাগে। আলোচনা করতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ হয়। সেটা এই জন্য যে আমি খুব কুণ্ঠিত থাকি: যাঁদের সামনে কথা বলা হচ্ছে তাঁরা ঠিক এ ধরনের কথাবার্তা শোনার জন্য আদৌ আগ্রহী কিনা। আর সুদীর্ঘ কাল ধরে, বিশেষ করে উপনিবেশিক শাসনামলের জের ধরে আমাদের মধ্যে দাসত্বের একটা ট্র্যাডিশন তৈরি হয়েছে। সেই ট্র্যাডিশনটা যতখানি না সাক্ষাৎ দাসত্বের, তার চেয়ে বেশি চিন্তার দাসত্বের।

আপনি দেখবেন যে ছিয়াত্তরের পর থেকে এই পর্যন্ত কর্নেল তাহেরকে নিয়ে আমরা কথা বলে যাচ্ছি। কর্নেল তাহেরকে নিয়ে সম্প্রতি দুর্দান্ত একটা উপন্যাস সাম্প্রতিক সময়ে লিখিত হয়েছে। ক্রাচের কর্নেল। শাহাদুজ্জামান লিখেছেন। যাঁরা পড়েন নি তাঁদেরকে পারলে এক্ষুণি জোগাড় করে পড়ে ফেলতে হবে। অসাধারণ লেখা। তো, আমি যেটা বলছি তা হলো: ১৯৭৬ থেকে এ পর্যন্ত আমরা তাহেরকে নিয়ে যত কথা বলে যাচ্ছি, তার বেশ একটা তালিকা এই বইটার সঙ্গে আছে। তাহেরকে নিয়ে কী লেখা হয়েছে না হয়েছে, তাঁর নিজের রচনা কী আছে না আছে তার তালিকা। তা ছাড়া বুদ্ধিজীবীদের, এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের তাহের বিষয়ক লেখালেখির তালিকাও ওখানে বড় করে দেওয়া আছে। এগুলো আপনারা প্রতি বছরই দেখে থাকেন।

আমরা গতানুগতিক কিছু কথা বলি। অথচ তাহেরের মতো একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ – ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ – রূপকথার মতো অলৌকিক সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। রোমাঞ্চকর, রোমান্টিক, সাহসিকতায় পরিপূর্ণ, স্বপ্নে আচ্ছন্ন ঘটনা। এবং সত্যিই একেবারে অলৌকিক, রূপকথার মতো, ঘটনাপ্রবাহ বয়ে গেছে। তাহেরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। সেই তাহেরের রাজনৈতিক দল জাসদ। তাহের এই রাজনৈতিক দলের সাথে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত নিজেকে যুক্ত করে রেখেছিলেন। নিজে তিনি এই দল গড়ে তোলেন নি বটে, কিন্তু তাঁর কাছে মনে হয়েছিল, জাসদই তাঁর স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে মানানসই রাজনৈতিক দল। সেই রাজনৈতিক দল এবং তাহেরের অনুসারীরা আজকে যাঁরা বাংলাদেশ চালাচ্ছেন সেই মহাজোট-সরকারের অংশ। তার মানে আমরা তাহেরের সাক্ষাৎ কমরেডদেরকে নিয়ে গঠিত একটা সরকারের অধীনে বাংলাদেশে আছি।

আমি জানি না। আমার খুব কৌতূহল হয়। আমার এমনিতে পড়াশোনা খুব কম। কৌতূহল হয়: জাসদের দিক থেকে তাদের পঁচাত্তরের বিপ্লবী কর্মসূচি এবং বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের কোনো পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন কিনা। জাসদের দিক থেকে সামগ্রিক কোনো পার্টিগত মূল্যায়ন আছে কিনা।

আজকের বাংলাদেশে আমরা কি কর্নেল তাহেরের পথ অনুসরণ করে একটা সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হতে চাই? আজকে? চাই না। আজকের বাংলাদেশ আর সাড়ে তিন দশক, চার দশক আগের বাংলাদেশের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তাহেরের মতো করে সেনাবাহিনীর ভেতরে নিজেদের রাজনৈতিক -সামরিক সংগঠন গড়ে তোলা, কিংবা বেসামরিক মানুষদের মধ্যে বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার পথ অনুসরণ করার দিকে তাহেরের অনুসারীরাও আর নাই। তার মানে কোথাও না কোথাও কিছু একটা আমরা বিবেচনা করে দেখেছি। মূল্যায়ন একটা ঘটেছে। মুখে সেটা বলি না বলি। বুঝেশুনে সেটা লেখা হোক না হোক। মূল্যায়নটা হলো: কর্নেল তাহেরের পথ আমরা বাংলাদেশে আর অনুসরণ করব না।

৮.২ রূপকথার মতো সময়

তাই বলে কর্নেল তাহেরকে নিয়ে কথা বলার গুরুত্ব আর থাকে না, তা মোটেই না। ব্যক্তি হিসেবে একটা মানুষ কোন শিখরে পৌঁছাতে পারে – মনুষ্যত্বের – তার একটা নমুনা হচ্ছে তাহের। ব্যক্তি হিসেবে একজন মানুষ কীভাবে তার সময়কে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, সময়ের লাগাম নিজের হাতের মুঠোয় পুরে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে পারে এবং সে আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে পারে – তার অসাধারণ নমুনা কর্নেল তাহের। একই সঙ্গে, ব্যক্তি-মানুষ উপযুক্ত সামাজিক ভিশনের অভাবে, উপযুক্ত রূপকল্প, উপযুক্ত প্রোগ্রাম, উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে কী করতে পারে না, তার নিজের জীবনকে হাসিমুখে একাধিকবার, সারা জীবন জুড়ে অনেকবার, বাজি ধরার পরেও কী করতে পারে না তারও অসাধারণ একটা নমুনা তাহের, এবং তাহেরের মতো এক ঝাঁক মানুষ। তাহের কিন্তু একা না। খেয়াল করে দেখবেন। তাহেরের ডাইনে দেখবেন। তাহেরের বাঁয়ে দেখবেন। তাহেরের সামনে-পেছনে দেখবেন। তাহেরের পরিবারকে দেখবেন। তাহেরের ভাইদেরকে দেখবেন। অজস্র মানুষ। গোটা মুক্তিযুদ্ধ জুড়ে আপনি দেখবেন, তাহেরের মতো, তাহেরের মাপের অনেক মানুষ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। যুদ্ধ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের পরে কর্নেল তাহের এবং তাঁর সাথীরা নিজেদের মতো করে কাজ করে গেছেন। আরো অনেক মানুষ। তাঁরা ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের ঝুঁকিপূর্ণ, টালমাটাল, পরিবেশের মধ্যে নিজেদের গোটা জীবন-সংসার-পরিবার

সমস্ত কিছুকে বাজি ধরে কাজ করে গেছেন।

আমার কাছে মনে হয়, কর্নেল তাহেরকে নিয়ে কাজ করার, কথা বলার চাইতে বড় গুরুত্ব আজকে এখানে যে: এ পর্যালোচনা থেকে তাহেরের বিপ্লব ব্যর্থ হলো কেন সে সম্পর্কে একটা পরিষ্কার উপলব্ধি অর্জন করা যায়। এ আলোচনা এ জন্যে নয় যে তাহের একজন ব্যর্থ মানুষ ছিলেন বলে প্রতিপন্ন করা আমাদের লক্ষ্য। তাহেরের মতো মানুষেরা কোনো দিন ব্যর্থ হন না। এবং আমি কিন্তু কখনোই কর্নেল তাহেরকে একা-মানুষ হিসেবে দেখছি না। কর্নেল তাহেরের মাকে দেখবেন। রূপকথার মতো একটা মানুষ। সত্যিই রূপকথার মতো। আপনি তাহেরের ভাইদেরকে দেখবেন। অবিশ্বাস্য। একেবারেই অবিশ্বাস্য। আমি ধরে নিচ্ছি, আপনারা কর্নেল তাহের সম্পর্কে এ ঘটনাগুলো জানেন। শুনেছেন। কোনো না কোনোভাবে কথাগুলোর সাথে আপনারা পরিচিত। তা যদি না ও হয়ে থাকে, তাহলে খুবই দ্রুত, সংক্ষেপে, ক্রাচের কর্নেল পড়ে ফেলবেন। তাহলে ছবির মতো আপনার সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠবে 'কর্নেল তাহের'। বাহারের কথা ধরেন। আপনাদের চেয়ে অল্প বয়েসের একটা ছেলে। জাসদের গণবাহিনীর সেইসময়কার যে বিপ্লবী সুইসাইডাল স্কোয়াড, সেই সুইসাইডাল স্কোয়াডের ছয় জনের এক জন বাহার। তাহেরের ছোট ভাই। তাহেরেরই আরেক ছোট ভাই বেলাল। কর্নেল তাহেরের গ্রেপ্তারের পরে এদের যে অপারেশন সেটা দেখবেন।

আমরা তো রূপকথার মধ্যে ডুবে ছিলাম! আজকে যেটাকে রূপকথা বলে মনে হচ্ছে, আজকে যেটাকে অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে, আজকে যে মানুষগুলোকে ধরাছোঁয়ার বাইরের কাল্পনিক জগতের মানুষ বলে মনে হচ্ছে, সেই ধরনের মানুষ দিয়ে বাংলাদেশ ভরা ছিল। বাঙালি জাতি, বাঙালি কৃষক সম্প্রদায়, এই ভূখণ্ডের মানুষ তাঁদের মুক্তির জন্য নানাভাবে লড়াই করে গেছে, প্রস্তুতি নিয়ে গেছে, সুদীর্ঘকাল ধরে, হাজার খানেক বছর ধরে। এই হাজার খানেক বছরের জাতিগত, সম্প্রদায়গত, দেশগত প্রস্তুতির একটা চূড়ান্ত মুহূর্ত আমরা দেখতে পাই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে। আমাদের সেই মুক্তিযুদ্ধে আত্মদান করার মতো লোকের কোনো অভাব ছিল না। নতুন দেশ গড়ার জন্য যা প্রয়োজন তা-ই নিয়ে বাজি ধরার মতো লোকের কোনো অভাব ছিল না। অজস্র নাম না জানা লোক – তাহের যাঁদের সাথে লড়াই করেছেন, কামালপুরের মতো যুদ্ধে। তাহের যাঁদেরকে ট্রেনিং দিয়েছেন। অজস্র কৃষক। এঁদের মধ্যে অনেকের জীবন, অনেকের আত্মদান, অনেকের লড়াই, অনেকের আগ্রহ এমনকি তাহেরকে পর্যন্ত মুগ্ধ করেছে। বিস্মিত করেছে। সত্যি আমরা একটা রূপকথার যুগ পার হয়ে এসেছি। একটা গোটা দেশ তার সামগ্রিক জাগরণের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা একাত্তরের নয় মাস ধরে দেখিয়েছে। এত বড় ঘটনা,

এত বড় আকারের ঘটনা, এত বড় আয়তনের ঘটনা গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে আপনি খুব কম পাবেন।

আমি আজকে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি আরও একটা কারণে। আমার গর্ব লাগে যে কর্নেল তাহের এই দেশেরই মানুষ। খুব পরিচিত মানুষ। কাছের মানুষ। তাহেরের ভাইবোনেরা, তাহেরের সন্তান, তাহেরের স্ত্রী, তাহেরের আত্মীয়স্বজন, তাহেরের কমরেডরা আমাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে এখনও। এই বাংলাদেশে। এটা একটা অলৌকিক ঘটনা। চে গুয়েভারার নাম শুনলে আপনি যেরকমভাবে রোমাঞ্চিত হন, আমার সন্দেহ, তাহেরের নাম শুনলে আপনি সেই মাত্রায় রোমাঞ্চিত হন না। কারণ তাহের আপনার বাড়ির পাশের লোক। কিন্তু কর্নেল তাহের ঐ চে গুয়েভারা বা ফিদেল ক্যাস্ত্রোদের মাপের মানুষ। এবং এই মাপের মানুষদেরকে নিয়েই সেই সময় গঠিত হয়েছিল, গড়ে উঠেছিল, বাংলাদেশ। সেই মানুষেরা কেউ পদক পান নি। খেতাব পান নি। কিন্তু তাঁরা ছিলেন। তাঁরা ছিলেন বলেই বাংলাদেশ 'বাংলাদেশ' হতে পেরেছিল। প্রত্যেকের রক্ত টগবগ করেছিল। প্রত্যেকে অস্থির হয়ে ছিল। কীভাবে, কী করলে আমার বাংলাদেশ এই হাজার বছরের নিপীড়ণের হাত থেকে, চব্বিশ বছরের পাকিস্তানী নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পাবে। আমরা মুক্তি পাব। তার জন্য যা করা প্রয়োজন গোটা একটা জাতি তা-ই করবে বলে নিশ্চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল। অলৌকিক একটা সময়। রূপকথার মতো একটা সময়।

৮.৩ মুক্তিযুদ্ধের মহাজাগরণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো

এই রকম রূপকথার মতো একটা গণজাগরণ, মহাজাগরণ, (অনেক কিছু অর্জন করেও) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আজকে পেছন ফিরে তাকালে, দেখলে, অসম্ভব মনে হয়, কেমন করে এই মহাগণজাগরণ রাষ্ট্র-রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেও বেপথু হলো। (আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এই সীমাবদ্ধতার নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য সেলিম রেজা নিউটন, ২০১২।)

শিল্পে সাহিত্যে কবিতায় সামরিকতায় শিক্ষাদীক্ষায় – সমস্ত দিক থেকে সমস্ত রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করা একটা গোটা জনগোষ্ঠী অকল্পনীয় এক বিপর্যয়ের মধ্যে পথ হেঁটেছে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫-এর কালপর্বে। গভীর অন্ধকারের মধ্যে। কী হচ্ছে কেউ বুঝতে পারছে না। কোন দিকে যাচ্ছে কেউ বুঝতে পারছে না। খোদ জাসদের 'গণবাহিনী'র নিচের দিকের অংশ, 'জাসদ' নামের রাজনৈতিক দলটার সারা দেশের অংশ, অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টি, সেনাবাহিনী, আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা, তাঁদের সকলের মধ্যকার নানান রকমের মতের লোক, নানা রকমের পথের লোক সবাই একটা অসম্ভব কনফিউশনের মধ্যে। অসম্ভব বিভ্রান্তির মধ্যে। অথচ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার

মধ্যে দিয়েই একটা অন্ধকার পথ আমরা ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫-৭৬ পর্যন্ত পাড়ি দিয়ে আসলাম। আজকে এত বছর পরেও যখন পেছন ফিরে তাকাই, গোটা ইতিহাসটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। এখনও অনেক অস্পষ্টতা। অনেক গোপন নেটওয়ার্ক। অনেক গোপন লেনদেন। পরাশক্তিদের নানান ধরনের গুপ্ত তৎপরতা। আমাদের এখানকার রাজনৈতিক দলগুলোর নানান রকমের দোদুল্যমানতা। তাদের কারো রাশিয়ার দিকে দৌড়ানো। তাদের কারো আমেরিকার দিকে দৌড়ানো। তাদের কারো ভারতের দিকে দৌড়ানো। তাদের কারো চীনের দিকে দৌড়ানো। তাদের কারো মাথার মধ্যে আলবেনিয়া। তাদের কারো মাথার মধ্যে কিউবা। অসম্ভব অস্পষ্ট-এলোমেলো একটা পরিস্থিতি।

মুক্তিযুদ্ধের মতো মহাপ্লাবনিক গণজাগরণ যে প্রকৃত লক্ষ্যের চূড়া দেখে যেতে পারল না, কিংবা কর্নেল তাহেরকে কেন্দ্র করে পরিচালিত রূপকথাময় বৈপ্লবিক সংগ্রাম যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো, তার পেছনে আছে সমাজ-পরিবর্তন বিষয়ক বলশেভিক রূপকল্পের সীমাবদ্ধতা আর ব্যর্থতার প্রশ্ন। এ ব্যর্থতা শুধু মুক্তিযুদ্ধের নয়, কর্নেল তাহেরের নয়, বলশেভিক রাশিয়ার তথাকথিত সমাজতন্ত্রের পর্যুদস্ত হওয়ার মধ্যেও তা প্রকাশিত – প্রকটিত।

আমি খুব অল্প কথার মধ্যে দিয়ে বলার চেষ্টা করব। আমি এমনিতে বাচাল টাইপের লোক। সাঈদী টাইপের লোক। বেশি বকবক করা ছাড়া উপায়ও থাকে না। আমাদের এখানটা ধারণাগত জঞ্জাল-আবর্জনায় সয়লাব হয় আছে। স্বাধীনতা নিয়ে বা সমাজতন্ত্র নিয়ে এখানে মুক্তচিন্তার সামান্য কোনো বিকাশ-প্রকাশের চিহ্নমাত্র নাই বলতে গেল। যা আছে তা পাখিপড়া প্রশিক্ষণ, মুখস্ত-অধঃপতিত বৈষ্ণব-গোঁসাইদের মন্ত্রপড়া দীক্ষাপাঠ। সুতরাং রিকশার স্পোক নিয়ে কথা বলতে গেলেও এখানে জেনারেল মটরসের আলাপ তোলা ছাড়া পথ থাকে না। কিন্তু আমি খেয়াল করে দেখেছি, বাচালতা করে করে দেখেছি, হুট করে একটা লম্বা আলাপ তুললেই হয় না। বাচালতার জন্যে আসলে সদাপ্রস্তুত থাকেন না সবাই। তাই আমি অল্প কথায় বলব। অনেক কথা বাকি থেকে যাবে। খচখচ করতে থাকবে পাঠকের মনে প্রশ্নের কাঁটা। পরিশ্রমী মুক্তমনারা সময় নিয়ে অধ্যয়ন করবেন নিশ্চয়ই। আমার-আমাদের অন্যসব রচনা-আলোচনা জোগাড় করে দেখবেন হয়ত। হুট করে গালি দেওয়ার মানসিকতা যে সবার নয় সে বিশ্বাসের পাল নামিয়ে নিলে তো চলে না।

যাক গে এসব কথা। এখন আমার এবং আমাদের মতো তুচ্ছ মানুষদের জীবনের ছোট্ট একটা পর্বের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে দেখানোর চেষ্টা করব বলশেভিক রূপকল্পের দৃষ্টিভঙ্গিগত সীমাবদ্ধতা কীভাবে আমাদের প্রতিদিনের

রাজনৈতিক কাজকর্মের দিশাকে পরিসীমিত করে ফেলে। ঘটনা হলো: সাম্প্রতিক কালে, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সুশীল-সামরিক জরুরি জমানার তখনও অনাগত 'ওয়ান-ইলেভেন'কে আমরা মোকাবেলা করব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম। তো, সেই ওয়ান-ইলেভেন আসার আগেই আমরা তাকে মোকাবেলার প্রস্তুতির রূপকল্প প্রণয়নের চর্চা শুরু করি। এখানে উপস্থিত তুষার থেকে আরম্ভ করে, মুকুট থেকে আরম্ভ করে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঝাঁক অসাধারণ ছাত্রছাত্রী সেই প্রতিরোধ-যজ্ঞের সংগঠক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ভেবে দেখুন: ওয়ান-ইলেভেনকে আমাদের চ্যালেঞ্জ করতে হবে কেন? নিউটন কিংবা তুষার বা মুকুট অথবা বাধন টিটো, পার্থ ওরা এমন কে যে ওয়ান-ইলেভেনকে চ্যালেঞ্জ করার সিদ্ধান্ত ওদেরকেই নিতে হবে? এখানেই আসে দৃষ্টিভঙ্গি বা রূপকল্পের প্রশ্নে উদ্দেশ্য-উপায়গত স্বচ্ছতার প্রশ্ন।

আমাদের কাছে একদম ঝকঝকে পরিষ্কার ছিল: কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বা রাজনৈতিক ছাত্র-সংগঠন অন্তত ওয়ান-ইলেভেনকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য চট করে দাঁড়াবে না। রাষ্ট্র যখন তার যাবতীয় নিপীড়ন-যন্ত্র নিয়ে হুড়মুড় করে ঘাড়ের ওপরে নামে, প্রথম সারির নেতারা সব শ্রীঘরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন, তখন কোনো হুকুমতান্ত্রিক পলিটক্যাল পার্টির কর্মীবাহিনীকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এটাই নিয়ম। যাঁরা চিরকাল হুকুমের দাস হয়ে কাজ করেন, ওপরের নির্দেশ ছাড়া তাঁরা এক পা-ও ফেলতে পারেন না। যে শিশু 'আন্ডার ইন্সট্রাকশান' বেড়ে ওঠে, সে বড় হয়ে প্রবলেম সল্‌ভ্ করতে শেখে না, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে হিমশিম খায়। এঁরা মূলত অনুসরণকারী। অনুকরণকারী। পছন্দের মানুষের পেছনে দাঁড়াতে এঁরা ভালোবাসেন। পছন্দের মানুষকে চোখের পলকে নেতা-হুজুর-বস্ বানিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে থাকেন। দরকার হলে ঝুঁকিও নেন। ফলত, দেখলেন আপনারা, ওয়ান-ইলেভেনের মতো এই রকম একটাঘটনা – সে ঘটনাকে রুখে দাঁড়ালো না কেউ। পরের দিনই চ্যালেঞ্জ করল না কেউ। তবুও, আমরা জানতাম, একবার কেউ দাঁড়িয়ে গেলে অনেক মানুষকে পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই 'কেউ'টা রাজনৈতিক দলের কেউ হলে কাজ হবে না। কারণ বাংলাদেশে রাজনীতি মানেই ক্ষমতার রাজনীতি ('প্রিফিগারেটিভ পলিটিক্স' বা প্রাক-রূপায়নের রাজনীতি[১] বিষয়ক সামান্য ধারণাটুকু পর্যন্ত নেই এখানে), এবং সেই ক্ষমতার রাজনীতি তার ব্যর্থতার সীমা অতিক্রম করেছে। তাঁদের কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা আর ছিল না তখন। সুতরাং আমরা ঠিক করেছিলাম মহাকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তিকে, তা সে যে চেহারা নিয়েই

১ প্রিফিগারেটিভ পলিটিক্স বা প্রাক-রূপায়নের রাজনীতি কী বস্তু তা নিয়ে কথা আছে খানিক পরে।

আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, প্রতিরোধ করার, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গড়ে তোলার পথে যাব আমরা কোনো না কোনোভাবে।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অরাজপন্থী প্রিফিগারেটিভ পলিটিক্সের সচেতন ও প্রত্যক্ষ অনুশীলন শুরু করার বিকল্প ছিল না আমাদের সামনে। এবং আমরা প্রস্তুতি নেওয়ার কাজ শুরু করেছিলাম। নিজেদের মতো করে আমাদের সে কাজ কয়েক বছর ধরেই চলছিল। আড্ডায়, স্টাডি-সার্কেলে, গানের আসরে, ফর্মাল ও ইনফর্মাল আলোচনা-সভাগুলোতে। বিশ্ববিদ্যালয়কে ধরে এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক ইতিহাসকে ধরে পর্যালোচনা করছিলাম আমরা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্বাধীন বাংলাদেশের চার দশকের ইতিহাস, ১৯২১ সালে রাশিয়ায় গিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা এবং তার পরের ইতিহাস – এই সমস্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করছিলাম আমরা। পর্যালোচনা করছিলাম আমরা বাঙালি জাতির এক হাজার বছরের, কম পক্ষে এক হাজার বছরের, তিল তিল করে এগুনোর ইতিহাস। অচ্ছুৎ একটা জাতি – যার কোনো চাষা-সদস্যের ছায়াটুকু গায়ে পড়লে পরে নোংরা হয়ে যেতেন শাসক শ্রেণীর লোকেরা। এই ধরনের একটা জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করছিলাম আমরা। এবং আমরা একটা উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলাম। উপলব্ধিটা হচ্ছে, সমাজতন্ত্র আমরা সবাই চেয়েছি। এখনও চাই। কিন্তু সমাজতন্ত্রের নামে আমরা যার চর্চা করেছি, তার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের খুব কমই যোগাযোগ আছে। এরকম একটা মৌলিক উপলব্ধিতে আমরা পৌঁছেছিলাম।[২]

আমরা গোটা বলশেভিক ঐতিহ্যটাকে কমবেশি নাড়াচাড়া করে দেখছিলাম। সমাজতান্ত্রিক লড়াইয়ের প্রকৃত ইতিহাসটাকে বুঝে নিচ্ছিলাম। সাহায্য করছিল ইন্টারনেটের মুক্ত জ্ঞানভাণ্ডার। আমরা সার্বিকভাবে মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট ঐতিহ্যটা পর্যালোচনা করছিলাম। ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে আমার নিজের কথা বললে, কাজটা শুরু হয়েছিল আরো আগে থেকে। আলোচ্য প্রসঙ্গগুলো নিয়ে আমাকে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা-অনুসন্ধিৎসা-অনুসন্ধানে নিমজ্জিত থাকতে হয়েছিল সেই ৮৯-৯০ থেকে। আত্মরক্ষার দায়ে। আত্মা রক্ষার দায়ে। আত্ম-উপলব্ধির দায়ে। সেটা শুরু হয়েছিল সেই রুশ বলশেভিক রাশিয়ার মহাডিগবাজি খাওয়ার করুণ কালপর্ব থেকে। আমার

---

২ আমাদের সেই পর্যালোচনার আংশিক বিবরণী 'বাংলাদেশ: কর্তৃত্ব রাষ্ট্র স্বাধীনতা' নামের একটা বইয়ের পাণ্ডুলিপি হিসেবে প্রণীত-প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে। এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়টুকু ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে। সেটা এই 'অচেনা দাগ'-এ 'মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট: কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতন্ত্রের প্রচ্ছন্ন রূপকল্প' নামে সংকলিত হয়েছে।

নিজের ক্ষেত্রে এটা ছিল জন্মসূত্রে-পরিবারসূত্রে পাওয়া নিজের বলশেভিক-দীক্ষায়িত জীবনটাকে তার যাবতীয় উল্লম্ফন ও সরণ-প্রতিসরণ সহকারে বুঝে নেওয়ার তাড়না। এবং এসব পর্যালোচনা-সমালোচনা-সমীক্ষাজাত উপলব্ধির ফলেই আসলে বিশেষ অর্থে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমরা ওয়ান-ইলেভেন নিয়ে। বাংলাদেশে সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতা, ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি আইনের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি বিশেষত রাশিয়ায় ১৯২০-এর দশকে, স্পেনে ১৯৩০-এর দশকে এবং জার্মানিতে ১৯৪০-এর দশকে, সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব এবং তাকে আটকানোর ইতিহাস থেকে আমাদের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে ওয়ান-ইলেভেনকে যদি ইমিডিয়েটলি চ্যালেঞ্জ করা না যায়, তাহলে আমরা নিশ্চিন্তে আগামী দশ বছর বা কুড়ি বছরের জন্য মার্কোসের মতো বা এরশাদের মতো সামরিক আইনের পাল্লায় পড়ে যাব – সেটা যে নামেই জারি থাক না কেন। ভাত-কাপড়-থাকা-খাওয়ার কষ্ট তো ছিলই, আছেই, উপরন্তু মুখ থুবড়ে পড়বে বাংলাদেশের মানুষের সংগঠন-সমাবেশ-চলাচলের এবং চিন্তা করা ও কথা বলার স্বাধীনতা। ব্যক্তিগতভাবে ভুগব আমরা।

৮.৪ ঘুটঘুটে অন্ধকারে টিমটিমে লণ্ঠনের আলো

আমাদের ইতিহাস-অনুশীলন থেকে আমরা এ-ও জানতাম, 'এক-এগারো' টাইপের সামরিক শাসনের মূল শক্তি গণবিচ্ছিন্ন সৈন্যবাহিনী, কিন্তু সৈন্যবাহিনীর কর্তাব্যক্তিদের মতো অসহায় লোক পৃথিবীতে কমই থাকে। এদের মতো ভীতু, 'কাপুরুষ', বন্দুকনির্ভর মানুষ কমই পাওয়া যায়। বন্দুকধারী ব্যক্তি নিরস্ত্র মানুষের তুলনায় কম নিরাপদ। শুধু গায়ের জোরে, বন্ধুকের জোরে শাসন করা যায় না। শাসন করতে জনসম্মতিও লাগে। আর স্রেফ মিডিয়া-নির্মিত জনসম্মতি বেশি দিন টেকে না। আমরা জানতাম যে একবার রুখে দাঁড়ালে এরা থমকে দাঁড়াবে এবং গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে নিজেদেরকে। আমাদের জানা ছিল, বাংলাদেশের মানুষ এটা অবশ্যই রুখে দাঁড়াবে। ঘোরতর অন্ধকারে 'টিমটিম করে জ্বলা একটি লণ্ঠনের' (বিপ্রতীপ, ২০০৯) আয়োজন-সাধনা করে চলেছি আমরা তখন সকলের অগোচরে প্রায়। বারবার আমরা 'জরুরি আইন' লঙ্ঘন করেছি সেই সময়। রুখে দাঁড়ানোর প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই বটে। অন্তত তিন বার আমাদেরকে ঐ সময় জরুরি আইন লঙ্ঘন করতে হয়েছে। একেবারে আইনত। প্রকাশ্যে। প্রথমবার জরুরি আইনকে চ্যালেঞ্জ করি আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মহাজরুরি আইন জারি করার এক মাসের মাথায়। ২০০৭ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারিতে। প্রকাশ্য ধর্মঘট, মিছিল এবং ছাত্রসভায় অংশগ্রহণ করে, বক্তৃতা দিয়ে। সে সময় প্রকাশিত একটা খবরের

বিববরণ দেওয়া যেতে পারে, এই এত দিন পরে:

> গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে বির্তর্কিত সান্ধ্য-কোর্স বাতিলের দাবীতে [সেদিন] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত [হয়]। ... মোটা ফীর বিনিময়ে সান্ধ্য-কোর্স চালুর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মিছিল-মিটিং করে আসছিল শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের দাবী উপেক্ষা করে সান্ধ্য-কোর্সের ফরম বিক্রি শুরু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাশ-ইনকোর্স-মিডটার্ম পরীক্ষা হয়নি। সকাল থেকেই প্রতিবাদকারী শিক্ষার্থীরা জড়ো হন কলাভবনে। কলাভবনের সব ক'টি গেইট বন্ধ করে দেন এবং ভবনের মূল গেইটে অবস্থান নিয়ে ক্লাশ করতে আসা শিক্ষার্থীদেরকে কলাভবনে ঢুকতে বাধা দেন। ... আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা কলাভবনের মূল গেইট থেকে মিছিল বের করেন। মিছিলটি উপাচার্যের কার্যালয়সহ পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এসে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। বিক্ষোভ সমাবেশে এক পর্যায়ে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ বিভাগের শিক্ষক সেলিম রেজা নিউটন। (আজিজুল হক রাসেল, ২০০৭)

সেবারই আমি গ্রেপ্তার হওয়ার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিলাম ঢাকায়। যেকোনো কারণেই হোক সেটা তখন ঘটে নি। এর পরের দফায় আমরা জরুরি আইন লঙ্ঘন করি 'এক-এগারো' নামে সমধিক পরিচিত জরুরি অবস্থার মাত্র চার মাসের মাথায়, ২০০৭ সালের মে মাসের ২০ তারিখে। মেলা দিন হয়ে গেছে। এখন একটু ভেঙেই বলে রাখা দরকার এসব কথা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তখন সুশীল-সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নানান ধরনের কর্মকাণ্ড চলছিল। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে সাইজ করার পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছিলেন তাঁরা। আর আমরা সেইটাকে ধরেই দাঁড়াচ্ছিলাম। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কী চেঞ্জ আমরা চাই, এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে বাংলাদেশে কেমন ধরনের সমাজ আমরা চাই, ওয়ান-ইলেভেন আমরা কেন চাই না, এগুলো পরিষ্কার বাংলা ভাষায়, এক পাল সামরিক-বেসামরিক গোয়েন্দার উপস্থিতিতে আমরা তুলে ধরেছিলাম একটা সেমিনারে। জরুরি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারে হাত দেবেন, ছাতার আইন ওরফে আমব্রেলা অ্যাক্ট জারি হবে ইত্যাকার গুজবের প্রেক্ষাপটে আমাদের 'মানুষ নেটওয়ার্ক' ঐ বিশেষ আলোচনাসভা আয়োজন করেছিল। সভার আগে, একেবারে ঢোল পিটিয়ে, কয়েক হাজার হ্যান্ডবিল বিলি করে, সবাইকে জানানো হয়েছিল। এমনিতেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল গোয়েন্দা-অধ্যুষিত এলাকা। হ্যান্ডবিল বিলি করতে গিয়ে আমাদের শিক্ষার্থী-বন্ধুরা নিয়েছিলেন গ্রেপ্তার-নির্যাতনের ঝুঁকি।

কেননা সভাটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তৎকালীন সেনাসরকারের অনুগত রাবি-কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে। জরুরি আইনের সভাসমাবেশ-প্রচার সম্পর্কিত বিধিনিষেধ স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করে।

আমার মনে আছে: অডিয়েন্সের একটা পাশ জুড়ে ছিলেন নানা কিসিমের সামরিক-বেসামরিক গোয়েন্দারা। আরেকটা পাশ জুড়ে ছিলেন আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এবং মাত্র কয়েক জন শিক্ষক। 'জরুরি বিঘোষিত রাষ্ট্রযন্ত্রের তখন রীতিমতো নওজোয়ান তেজ। অনুমতি ছাড়া সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ। বাঘ আর হরিণেরা এক ঘাটে নাকানিচুবানি খাচ্ছে। বাচ্চারা গোয়েন্দা সংস্থার নাম মুখস্ত করছে। আতঙ্কে অজগর সাপ গড়াগড়ি খাচ্ছে রাস্তায়। ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া কুমির আত্মপ্রকাশ করছে ডোবায়।' (দ্রষ্টব্য: সেলিম রেজা নিউটন, ২০১১: ৬৩। দুই নম্বর অন্ত্যটীকা।) সেবারও ছিল গ্রেপ্তারের আতঙ্ক। সহকর্মীরা তো আসতেই চাচ্ছিলেন না সেখানে। সব মিলিয়ে ৪/৫ জনকে হাজির করা গিয়েছিল অনেক কায়দা-কানুন, অনুরোধ-উপরোধ করে। সাহসের সাথে হাজির ছিলেন বেশ কিছু শিক্ষার্থী অ্যাক্টিভিস্ট। তাঁরাই ছিলেন সভার হ্যান্ডবিল বিতরণকারী, সভার আয়োজক। তাঁদের অনেককেই আজকে এখানে দেখতে পাচ্ছি। ভালো লাগছে। তো সেই সভার একমাত্র আলোচক হিসেবে আমাকে সেদিন রীতিমতো বেপরোয়াভাবেই, উপস্থিত গোয়েন্দাদেরকে ইঙ্গিত করে বলতে হয়েছিল:

> অন্য কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ যদি [এখানে থেকে] থাকেন, তাঁদের কাছেও অনুরোধ যে আমাদের এই আলোচনাকে রেফার করার জন্য দরকার যদি পড়ে, যেকোনোরকমভাবে আমাদের আলোচনার বরাত দিয়ে যদি কিছু বলা লাগে, তো দয়া করে আমাদের কাছে চাইবেন। আমরা আমাদের গোটা আলোচনার সিডি দিয়ে দিব। গোটাটাই উন্মুক্ত। এখানে লুকানোর কিছু নাই এবং আড়াল করার কিছু নাই। যে-কারও যেকোনো প্রয়োজনে যদি আজকের আলোচনার প্রয়োজন পড়ে, এর বরাত দিয়ে কিছু বলার, কিছু লেখার, কোথাও কোনো প্রতিবেদন জমা দেওয়ার দরকার যদি পড়ে, তাহলে আমাদের কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ সিডিটা নেবেন। দয়া করে আমাদের নাম দিয়ে নিজেদের মতো করে কোনো রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবেন না। (দ্রষ্টব্য: সেলিম রেজা নিউটন, ২০১১; 'আলোচনার পদ্ধতি' অংশ।)

আসলে পরিস্থিতি ছিল সত্যি খারাপ। 'আলোচনার পরদিন তো [সভায় উপস্থিত গোয়েন্দাদের] একজন আমাকে স্বতঃস্ফূর্ত গলায় ফোন করে জানিয়েছিলেন, তিনি আমার আলোচনা থেকে উপকৃত হয়েছেন। এটা ছিল গোয়েন্দাদের পর্যবেক্ষণ, প্রশংসা, জিজ্ঞাসাবাদ, অত্যাচার, কৃতজ্ঞতা জানানো এবং দুঃখপ্রকাশ করার

কাল।' (দ্রষ্টব্য: সেলিম রেজা নিউটন, ২০১১: ৬৩। তিন নম্বর অন্ত্যটীকা।)

যাই হোক, তৃতীয় বার আমরা আর পার পাই নি। না ঢাকায়; না রাজশাহীতে। প্রথম বার জরুরি আইন ভেঙে ঢাবি-তে সভা-সমাবেশ-ধর্মঘট করার সময় ঢাকার সাংবাদিকতা বিভাগ এবং অন্যান্য নানা বিভাগের যেসব শিক্ষার্থী-সংগঠকের সাথে আমাদের যোগাযোগ দাঁড়িয়েছিল, তাঁদের অনেকেই ছিলেন ক-মাস পরের 'আগস্ট বিদ্রোহ' নামের বিপুল ক্যাম্পাস-আন্দোলনের আদি কারিগর। এঁদেরই মূল একজন সংগঠক ছিলেন ঐ বিভাগের শিক্ষার্থী খোমেনী ইহসান। তো সে বছর ২০শে আগস্টে ঢাবি-র খেলার মাঠে সেনা-সদস্যদের অসদাচরণের প্রতিবাদ জানানোর মধ্য দিয়ে সূচিত ঐ আগস্ট বিদ্রোহের ঠিক আগে, ১৮ই আগস্ট ২০০৭, খোমেনী আসেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাংবাদিকতা-সূত্রে। তাঁর সাথে আমার কথা হয় বিদ্যমান সুশীল-সামরিক জরুরি জমানাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর উপায়-পদ্ধতি নিয়ে। এসব নিয়ে পরে তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন আমার ব্লগ ডট কমে। পরে দেখেছি আমাদের সেদিনের কথাগুলো তিনি টুকে রেখেছেন তাঁর সেই লেখায়, যাতে ধরা পড়েছে আমাদের সেই সময়কার প্রস্তুতি-স্পিরিট:

> ঘুটঘুটে অন্ধকারে মানুষকে পথ দেখানোর জন্য পুরো জঙ্গল আলোকিত করার দরকার নাই। এটি পারাও যায় না। এ সময় দরকার হয় টিমটিম করে জ্বলা একটি লণ্ঠনের। যার ক্ষীণ আলোর রেখা দেখে মানুষ বুঝতে পারবে পথটি কোন দিকে। অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ানো মানুষ এতটুকু পেলেই নিজের নিজের কাজটি করে নিতে পারে। (বিপ্রতীপ, ২০০৯)

সবাই মিলে আমরা সেই লণ্ঠন জ্বেলেছিলাম। ঢাবি-তে ২০শে আগস্ট যখন শিক্ষার্থী-বিদ্রোহ আর সেনানিপীড়ন চলছে তখনও কথা হয়েছে আমার তাঁদের সাথে। একটু পর পর। এসবেরই পরিণাম রাবি-তে ২১শে আগস্ট। তা নিয়ে কথা আরেক দিন। এ নিয়ে বাচালতা আপাতত বন্ধ। কিন্তু নিজেকে নিয়ে, নিজেদেরকে নিয়ে এই বাচালতা করা হলো কেন এতক্ষণ? সেটা হলো: যে-ইতিহাস-উপলব্ধি থেকে জরুরি আইনকে আমরা বারবার বুড়ো আঙুল দেখিয়েছি, কারাবরণের ঝুঁকি নিয়েছি, অজস্র শিক্ষার্থী মিছিলে নেমেছেন, নির্যাতন ভোগ করেছেন, পঙ্গু হয়ে গেছেন, সেই উপলব্ধির সঙ্গেই জড়িত তাহেরকে নিয়ে আমাদের পর্যালোচনা, আমাদের আজকের উপলব্ধি। সে আলাপ তুলতেই আমাদের মতো পোকামাকড়ের কেচ্ছা নিয়ে এত বাচালতা।

ভেবে দেখুন: যখন আমাদের মতো কীটতূল্য মানুষেরা আসন্ন একটা রাষ্ট্রীয় বিভীষিকাকে মোকাবেলা করার জন্য ঐতিহাসিক-সমাজতান্ত্রিক পর্যালোচনাভিত্তিক

প্রস্তুতি নিতে পারে, তখন ঐ ২০০৬ সালে ২০০৭ সালে বুর্জোয়া-বলশেভিক ঘরানার রাজনৈতিক দলগুলো কেন নিঃসঙ্কোচে গা-ঢাকা দিয়ে উধাও হয়ে যায়?

৮.৫ প্রিফিগারেটিভ পলিটিক্স বা প্রাক-রূপায়নের রাজনীতি: রাজনীতির অরাজপন্থা

আমাদের সেই ইতিহাস-উপলব্ধি-পর্যালোচনার সূত্রপাত খোদ কার্ল মার্কস এবং 'প্রথম আন্তর্জাতিক' বিষয়ক অভিজ্ঞতা থেকেই বটে – অরাজপন্থায় বা অ্যানার্কিতে যা 'প্রিফিগারেটিভ পলিটিক্স' বা প্রাক-রূপায়নের রাজনীতি ও 'প্রত্যক্ষ তৎপরতা'র[৩] ধারণা ও চর্চার সাথে সংশ্লিষ্ট। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বতন্ত্র, রাষ্ট্রশক্তি এবং স্বাধীনতার ধারণা নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর মার্কসীয় বৈশিষ্ট্যই বাংলাদেশের সাফল্য-ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নিয়ামক হয় দাঁড়িয়েছে বারবার: একাত্তর থেকে এক-এগারো পর্যন্ত। আজকের দিনেও। আজকেও আমরা ঘুরেফিরে আরেকটা এক-এগারো মার্কা পরিস্থিতির মুখে এসে দাঁড়িয়েছি।

আমাদের উপলব্ধি যদি এই হয় যে রাষ্ট্রক্ষমতার সিংহাসনে আরোহন করে রাজশক্তির সবল প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র বা কিছু-একটা শুভবস্তুর উদয় ঘটাবো, তাহলে আমাদের পথ হবে এক রকম। সেই পথের ফরাসী বিপ্লব যুগের জ্যাকোবিনদের পথ। বন্দুক-বলপ্রয়োগ-বঞ্চনার পথ। এঁরা সবাই সামরিক রাষ্ট্র-শক্তির বৈধতায় বিশ্বাসী। জেলজুলুম-হিংসায় বিশ্বাসী। কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বে বিশ্বাসী। কর্তা হুজুর গুরু ফাদার পুরুত মাতব্বর জেনারেল এক্সপার্টে বিশ্বাসী। লেনিন-লাদেন-লিবারালপন্থা এখানে একই অন্ধকারে উদ্ভাসিত। জামাত জেএমবি জাতীয় পার্টি কিংবা আওয়ামী লীগ বিএনপি কমিউনিস্ট পার্টি এখানে একই বস্তুর পূজারী। সেই বস্তুর নাম কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি। এ ধারার মোদ্দা কথাটা হলো: 'আমরা শক্তি, আমরা বল – আমরা হুকুম-কল'। এঁদের তর্কটা শুধু রাষ্ট্র-ক্ষমতার মালিকানা নিয়ে। বাকিটা একই। নেতৃত্বতন্ত্র কর্তৃত্বতন্ত্র হুকুম করবেন, এক পাল পাবলিক-কর্মী-কর্মচারী পিপড়ার মতো লাইন ধরে সেটা মেনে চলবেন। নেতা-কর্তা ভালো হলেই দেশের মঙ্গল, দশের মঙ্গল। নেতা-কর্তা খারাপ হলে দেশের-দশের সর্বনাশ। আদেশ পালন করা ছাড়া ব্যক্তি-মানুষ এবং জনসাধারণের জীবনধারণের তেমন কোনো তাৎপর্য এখানে নাই। কর্তৃত্ব-হুকুম-(অ)মঙ্গল এখানে একই ধারণাসূত্রে গাঁথা। যুদ্ধই এখানে শান্তি। দাসত্বই এখানে স্বাধীনতা। হিংসাই এখানে বন্ধুত্ব। অন্ধত্বই এখানে সত্যদৃষ্টি।

---

৩ প্রত্যক্ষ তৎপরতা বিষয়ক ধারণা ও চর্চার জন্য দ্রষ্টব্য ডেভিড গ্রেইবার, ২০০৯; উইকিপিডিয়া, ২০১৩; ভল্টারিন ডি ক্লিরা, ১৯১২; মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, ১৯৬৩।

অরওয়েলীয় দ্বৈতচিন্তা/দ্বৈতস্বরই এখানে বাকস্বাধীনতার সীমা (দ্রষ্টব্য: সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩-ঘ)।

আর আমাদের উপলব্ধি যদি এই হয় যে মানুষ নিজেরা নিজেদেরকে পরিচালনা করতে সক্ষম এবং সেটাই কাঙ্ক্ষিত, তাহলে আর হুজুর-পুরুত-পাণ্ডা লাগে না। রাষ্ট্রশক্তির দাঁত নখ পেশী থাবা ছেঁটে ফেলাটাই তখন আসল কাজ। যে যেভাবে যতটা পারে সে সেভাবে ততখানি সেই কাজ করাটাই তখন আসল কথা। তথাকথিত বিপ্লব করতে গিয়ে সারাদেশ আত্মঘাতী দাবানল ছড়িয়ে দেওয়াটা তখন আর কাঙ্ক্ষিত নয়, বরং ঘুটঘুটে অন্ধকারে টিমটিমে লণ্ঠনের আলো ছড়ানোই তখন জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জরুরি কর্মপদ্ধতি। এ পথে জ্ঞানই মুক্তির চাবিকাঠি। এ উপলব্ধি মোতাবেক স্বাধীনতার অর্জনের একমাত্র পথ স্বাধীনতা খোদ। স্বাধীনতা মানে ভুল করার এবং শুধরে নেওয়ার স্বাধীনতাও বটে।

প্রথম উপলব্ধি মোতাবেক উদ্দেশ্যটাই আসল। যেকোনো উপায়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আরোহন করাটাই মূল ঘটনা। যেকোনো পন্থাই বৈধ পন্থা। কেননা আমার বিশ্বাস, আমার মতাদর্শই একমাত্র খাঁটি বিশ্বাস, খাঁটি মতাদর্শ তাতে তো কোনো সন্দেহই নাই। আর দ্বিতীয় উপলব্ধি অনুসারে উপায়টাই আসল। যে উপায়ে আমি কাজ করি তা যদি আমার উদ্দেশ্যের সাথে মানানসই না হয়, তাহলে সে উপায় বৈধ নয়, কাঙ্ক্ষিত নয়। অহিংসায় পৌঁছানোর একমাত্র পথ এখানে অহিংসা স্বয়ং। সাম্য -সমাজে পৌঁছানোর একমাত্র পথ সাম্য-প্রণালীতে পরিচালিত আত্মসংগঠনতন্ত্র। (দ্রষ্টব্য: সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩-গ।) একেই বলে 'প্রিফিগারেটিভ পলিটিক্স' বা প্রাক-রূপায়নের রাজনীতি (দ্রষ্টব্য: ডেভিড গ্রেইবার, ২০১১-ক; ডেভিড গ্রেইবার, ২০১২-ক)।

প্রিফিগারেটিভ পলিটিক্স বা প্রাক-রূপায়নের রাজনীতি বলতে বোঝায়: যা আমি চাই তা এখনই পরিস্ফূট হয়ে উঠবে আমার এই মুহূর্তের কর্মপ্রণালীর মধ্য দিয়ে। এটা পরিস্ফূট হয়ে ওঠে সাংগঠনিক কর্মপ্রণালীর ভেতর দিয়ে। আজকের রাজনৈতিক সংগঠনই আগামী দিনের কাঙ্ক্ষিত সমাজ-সংগঠনের ক্ষুদ্র-কিন্তু-বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তোলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'সকল শ্রমিকের সংগঠন' শ্রমিক-পরিচালিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড একেই বলে 'পুরনো সমাজের খোলসের মধ্যে নতুন সমাজের বীজ অঙ্কুরিত করা' (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, ২০১৩: ৩)। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শীর্ষ বৈঠক বন্ধ করে দেওয়া কিংবদন্তীর সিয়াটল-আন্দোলন (১৯৯৯) ছিল এই প্রিফিগারেটিভ পলিটিক্সের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত – দেখিয়েছেন ডেভিড গ্রেইবার (২০০৪) তাঁর 'ফ্র্যাগমেন্টস অফ অ্যান অ্যানার্কিস্ট অ্যানথ্রোপোলজি' বইয়ে।

সাম্প্রতিক ইউরোপ-আমেরিকা জোড়া অকুপাই আন্দোলনও এই ধরনের রাজনীতির অত্যুজ্জ্বল নজির (দ্রষ্টব্য: ডেভিড গ্রেইবার, ২০১১-ক; ডেভিড গ্রেইবার, ২০১১-খ; ডেভিড গ্রেইবার, ২০১১-গ)। ভয়ে ভয়ে পোকামাকড়ের ইতিহাসও বলি: আগস্ট বিদ্রোহে গ্রেপ্তার হওয়া শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকদের মুক্তির দাবিতে এবং 'মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন' অর্জনের লক্ষ্যে রাবি-তে গড়ে ওঠা 'কর্তৃত্ববিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ' ব্যানারে পরিচালিত ছাত্র-আন্দোলনও এই প্রিফিগারেটিভ পলিটিক্সের অঙ্কুর হিসেবেই বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে (দ্রষ্টব্য: আরিফ রেজা মাহমুদ টিটো, ২০০৮; আরিফ রেজা মাহমুদ টিটো ও পার্থ প্রতীম দাস, ২০০৮; পার্থ প্রতীম দাস, ২০০৮; রেজাউর রহমান প্রমুখ, ২০০৮; সেলিম রেজা নিউটন, ২০০৮-খ)।

৮.৬ প্রথম আন্তর্জাতিক: প্রিফিগারেটিভ পলিটিক্স বনাম রাষ্ট্রপন্থা

যে 'প্রিফিগারেটিভ পলিটিক্স' বা প্রাক-রূপায়নের রাজনীতির কথা আমরা বলছিলাম, সে দিক থেকে দেখলে বিপ্লবীদের একটা মুখ্য বিবেচনা হওয়ার কথা কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধনে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতার ভূমিকা কী হবে সে বিবেচনা। কর্নেল তাহের এবং তাঁর সাথী-অনুসারীরা তাঁদের নিজেদের ভাবধারা মোতাবেক যখন একটা বিপ্লবের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তখনও কিন্তু এই বিবেচনাটাই গোটা সেই বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের নির্ধারক ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। তাঁদের পদ্ধতি-প্রণালী ও ভিশনের তাৎপর্য ভালো করে বোঝার দায় থেকে বিশেষত প্রথম আন্তর্জাতিকের ভেতরকার মার্কসবাদী রাষ্ট্রপন্থা এবং নৈরাজ্যবাদী মুক্তিপন্থার নিরিখে জন্য রাষ্ট্র-প্রশ্নটাকে একটু আলাদা গুরুত্ব দিয়ে দেখে নিতে চেষ্টা করব।

ইউরোপে শিল্পবিপ্লব-কালপর্বের ভেতরেই গড়ে উঠেছিল 'শ্রমজীবী মানুষদের আন্তর্জাতিক সমিতি' ওরফে 'প্রথম ইন্টারন্যাশনাল'। লন্ডনের সেইন্ট মার্টিন হলে ১৮৬৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত এক গণশ্রমিক-সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত হয় এই প্রতিষ্ঠান। সেই সময়কার বৃটেন এবং ফ্রান্সের সবচেয়ে শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। ঐ গণশ্রমিক-সভা আয়োজন করার ক্ষেত্রে কার্ল মার্কসের কোনো অংশগ্রহণ না থাকলেও প্রথম ইন্টারন্যাশনালের অস্থায়ী জেনারেল কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। এবং অচিরেই এর নেতৃত্বে আসীন হন। (দ্রষ্টব্য: ব্রিটানিকা বিশ্বকোষ, ২০১৩।)

এই সমিতি গড়ে ওঠার পেছনে আছে সুদীর্ঘ আর্থ-সামাজিক-ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রীয় পটভূমি। অত কথা এখানে নয়। তারপরও অল্প কিছু কথা এখানে না বললেই নয়। কারণ এখনকার বাংলাদেশে বলশেভিক ধারার (বিশেষত তরুণ) বামপন্থীরা

এই ইতিহাস নিয়ে তেমন চর্চা করেন না। এ নিয়ে যেটুকু কথাবার্তা তাঁরা নেতাদের মুখ থেকে শোনেন তাও এক প্রকার মুখস্ত 'মার্কসবাদী' ঘরানার একপেশে কেচ্ছা। তাই এ নিয়ে সামান্য দু-একটা কথা এখানে বলে রাখতে চাই। বলতে চাই আপাতত কমিউনিস্ট ইতিহাসপ্রণেতা জি. এম. স্টেক্লফের লেখা 'প্রথম আন্তর্জাতিকের ইতিহাস' বইটার তৃতীয় অধ্যায়টুকু অনুসরণ করে (জি. এম. স্টেক্লফ, ১৯২৮)।

সংক্ষেপে বললে, গোটা ইউরোপের শ্রমিকরা একটা আন্তর্জাতিক সমিতির প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। সব দেশেই তাঁদের আর্থিক দুরবস্থা ছিল মূলত একই ধারার। সব দেশেই তাঁরা একই ধরনের শোষণ-পীড়নের শিকার হচ্ছিলেন। তার মধ্যে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মতো অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোয় শ্রমজীবীদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা অনেক বেশি কঠোর হয়ে পড়েছিল মালিকপক্ষের নিষ্পেষণ ও নানা রকমের রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের কারণে। এরই মধ্যে, আমরা বলছি ১৮৬০-এর দশকের কথা, পোলিশ জাগরণ এবং ইতালির জনসাধারণের মুক্তি-সংগ্রাম আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী জনতারর মধ্যে সংহতিসূচক উদ্দীপনা তৈরি করেছিল, বিশেষত ফরাসী ও বৃটিশ শ্রমিকদের মধ্যে।

এ সময়, ১৮৬২ সালে, লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয় কারখানা, প্রযুক্তি ও শিল্পকলা বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। ৩৬টা দেশের ২৮০০০ মানুষ এই প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। এই মেলায় আকৃষ্ট হয়েছিল ৬০ লক্ষ দর্শক। এই প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে গোটা ইউরোপ মহাদেশের শ্রমিকদের সাথে বৃটিশ শ্রমিকদের দেখাসাক্ষাতের উসিলা তৈরি হয়। ফ্রান্সের শ্রমিকরা, বিশেষ করে প্যারিস আর লিয়ন্সের শ্রমিকরা, তহবিল সংগ্রহ করতে শুরু করেন যেন ফরাসী শ্রমিকদের প্রতিনিধিদল এই মেলায় যেতে পারে। জার্মানি থেকেও শ্রমিক-প্রতিনিধিদল এই মেলায় আসেন। ১৮৬২ সালের ৫ই আগস্ট ফরাসী শ্রমিকদের ৭০ জনের প্রতিনিধিদলকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান বৃটিশ শ্রমিক-কমরেডরা। এই অনুষ্ঠানে বেশি বেশি করে উচ্চারিত হয় শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক একটা সমিতি গঠনের প্রয়োজনের কথা। এ সময় লন্ডনে অনেক ফরাসী শ্রমিক-উদ্বাস্তু বসবাস করতেন। উপরন্তু, ঐ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে আসা ফরাসী শ্রমিকদের কেউ কেউ বৃটেনে থেকে যান স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য। এঁদের মাধ্যমে দুই দেশের শ্রমিকদের মধ্যে যোগাযোগটা অক্ষুণ্ন থেকে যায়। অন্য দিকে, মার্কসকে কেন্দ্র করে একদল জার্মান শ্রমিক বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ গড়ে তোলেন। তাঁরাও তুলে ধরতে থাকেন গোটা ইউরোপের শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্বের কথা।

এ দিকে রুশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বররা যখন পোলিশ গণজাগরণকে রক্তগঙ্গায় ডুবিয়ে দেন, তখন প্রতিবাদে ফেটে পড়েন বৃটেন ও ফ্রান্সের শ্রমিকরা। তাঁদের

মধ্যকার যোগাযোগ নতুন করে চাঙ্গা হয়ে উঠতে থাকে। ১৮৬৩ সালের ২২ জুলাই ফরাসী শ্রমিকদের একদল প্রতিনিধি আবার আসেন বৃটেনে। তাঁরা আসেন তাঁদের কাছে বৃটিশ শ্রমিকদের পাঠানো পত্রের উত্তর নিয়ে। ঐ একই সন্ধ্যায় লন্ডনের সেইন্ট জেমস হলে পোল্যান্ডের মানুষদের সম্মানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফরাসী শ্রমিকরা। এইসব সভায় এবং আরো অন্যসব সভায় এই দুই দেশের শ্রমিকদের আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক একটা সমিতি গঠনের ব্যাপারে।

১৮৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যাণ্ড প্রশ্নে নতুন একটা সভা আয়োজনের উদ্যোগ যখন চলছিল, বেশ কিছু ফরাসী শ্রমিক-প্রতিনিধি তখন লন্ডনে আসেন। এবার তাঁরা আসেন সকল দেশের শ্রমিকদের মধ্যে তথ্য-যোগাযোগ চালিয়ে যাওয়ার মতো বিশেষ একটা কমিটি গঠনের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে। এই ফরাসী শ্রমিকদের স্বাগত-সম্বর্ধনা উপলক্ষে বৃটিশ শ্রমিক-সংগঠনগুলো আয়োজন করে বিরাট এক আন্তর্জাতিক সভা – ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে।

সভাটা অনুষ্ঠিত হয় সেইন্ট মার্টিন হলে। সভায় সভাপতিত্ব করেন দৃষ্টবাদী চিন্তক ও ইতিহাসের প্রফেসর এডওয়ার্ড স্পেন্সার বিজলি (কার্ল মার্কস ছিলেন এঁর বন্ধু)। শুরুতে বক্তৃতা করেন প্রফেসর বিজলি। তারপর বৃটিশ শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ফরাসী শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ পড়ে শোনান শ্রমিকনেতা ওডগার। এরপর ফরাসী শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করেন ফরাসী শ্রমিকনেতা তোলাইন। বক্তৃতা-টক্তৃতা হয়ে যাওয়ার পর সর্বসম্মতিক্রমে এই সভা একটা প্রস্তাব গ্রহণ করে শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক একটা সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে। ঠিক হয় যে এর কেন্দ্রীয় অফিস হবে লন্ডনে। ২১ সদস্যের একটা কমিটি নির্বাচিত হয়। কমিটির দায়িত্ব হয় সংগঠনের নিয়মকানুন ও গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা।

কমিটির বৃটিশ সদস্যরা ছিলেন ওডগার, হাওয়েল, অসবোর্ন, ল্যুক্রাফ্ট প্রমুখ খ্যাতনামা ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন 'ওয়েনাইট' (তথাকথিত ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী দার্শনিক রবার্ট ওয়েনের অনুসারী), কেউ কেউ ছিলেন 'চার্টিস্ট'। (চার্টিজম হচ্ছে ঊনবিংশ শতকের বৃটেনের প্রভাবশালী এক রাজনৈতিক-সামাজিক সংস্কার-আন্দোলন। ১৮৩৮ সালের 'পিপলস চার্টার' এর নাম অনুসারে এঁদের নাম হয় চার্টিস্ট।) কমিটির ফরাসী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন দুনুয়ালা, লু লুবেয, বুস্কে প্রমুখ। কমিটিতে ইতালির প্রতিনিধি ছিলেন ফোন্তানা। অন্য সদস্যরা ছিলেন মেজর এল. উল্ফ (ইনি ছিলেন ইতালির ঐক্য আন্দোলনের অবিসম্বাদিত নেতা জুযেপি মাৎজিনির সেক্রেটারি), ইকারিউস, প্রমুখ। কমিটির তালিকার একেবারে নিচে ছিল 'ড. মার্কস'-এর নাম। শ্রমিক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী

হিসেবে তাঁর সুনাম, লন্ডনে তাঁর অবস্থান, এবং সম্ভবত প্রফেসর বিজলির সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব তাঁকে এই কমিটিতে স্থান পেতে সাহায্য করেছিল। অচিরেই, আপন গুণাবলীর সুবাদে মূল নেতৃত্বে আসীন হন তিনি প্রথম ইন্টারন্যাশনালের।

কমিটি বৈঠকে বসে ৫ই অক্টোবর। আরো নানা দেশের শ্রমিকনেতাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। গঠিত হয় ৩২ সদস্যের অস্থায়ী সাধারণ পরিষদ বা 'জেনারেল কাউন্সিল'। কমিটির প্রথম কাজ ছিল 'প্রথম ইন্টারন্যাশনাল'-এর কর্মসূচির রূপরেখা ঠিক করা এবং নিয়মকানুন ও গঠনতন্ত্রের খসড়া করা। একটা খসড়া উপস্থাপন করেন মেজর এল. উল্ফ। এটা ছিল 'ইতালীয় শ্রমজীবীদের সমিতি'র নিয়মকানুন-গঠনতন্ত্রের অনুবাদ। দ্বিতীয় খসড়া পেশ করেন বিশিষ্ট চার্টিস্ট নেতা ওয়েস্টন। তৃতীয়টা পেশ করেন লু লুবেয। চতুর্থ খসড়াটা প্রণয়ন করেন কার্ল মার্কস। দীর্ঘ, প্রাণবন্ত আলোচনার পর গৃহীত হয় মার্কসের খসড়া। প্রথম ইন্টারন্যাশনালের আদি এই খসড়া আমাদেরকে রাষ্ট্র-প্রশ্নটাকে বিবেচনার সুযোগ করে দেয়। এবং এক্ষেত্রে তৈরি হয় পরস্পরবিরোধী দুই ধরনের বিবেচনাবোধ। একটা হচ্ছে রাষ্ট্র-রাজনৈতিক বিবেচনা, অপরটা আর্থ-সামাজিক বিবেচনা।

খসড়াটার প্রথম অংশ হচ্ছে 'ঘোষণা'; পরের অংশ 'অস্থায়ী নিয়মকানুন'। ঘোষণা-অংশে বলা হয়: 'শ্রমজীবী শ্রেণীর মহান কর্তব্য হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করা'। পরবর্তী সময়ে লেনিনবাদী ধারার বলশেভিক পার্টিকে আমরা এই চিন্তাধারা মোতাবেক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার ওপর প্রাথমিকতম গুরুত্ব আরোপ করতে দেখেছি। এই চিন্তাধারা শ্রমিকশ্রেণীসমূহের 'ভ্যানগার্ড পার্টি' হিসেবে একটা লেনিনবাদী গঠনের সুযোগও তৈরি করে।

কিন্তু কমিটির বৈঠকে মার্কসের খসড়ার নিয়মকানুন অংশের শুরুতে সংযুক্ত করে দেওয়া হয় একটা 'প্রস্তাবনা'। এতে বলা হয়: 'শ্রমজীবী শ্রেণীসমূহের মুক্তি অর্জন করতে হবে অবশ্য-অবশ্যই খোদ শ্রমজীবী শ্রেণীসমূহের দ্বারাই'। বিশেষ লক্ষণীয়: এতে করে শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে কোনো রাজনৈতিক পার্টি গঠনের অবকাশ থাকে না। কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড় হয়ে 'রাজনৈতিক' সংগ্রাম করাটা শ্রমজীবীদের জন্য অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে। শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি কেবল শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব – এই নৈরাজ্যমুখিন চিন্তার বীজ আমরা দেখতে পাই এই চিন্তাধারার মধ্যে।

উপরন্তু এই 'প্রস্তাবনা'য় বলা হয়: 'সুতরাং শ্রমজীবী শ্রেণীসমূহের অর্থনৈতিক মুক্তি হচ্ছে সেই মহান লক্ষ্য, প্রত্যেকটা রাজনৈতিক আন্দোলনকে একেকটি উপায় আকারে যে লক্ষ্যের অধীনস্ত থাকা উচিত হবে'। 'প্রস্তাবনা'য় আরো বলা হয়, 'শ্রমের মুক্তি' একটা 'সামাজিক সমস্যা'। তার মানে এটা কোনো রাজনৈতিক

রূপান্তরের মামুলি প্রশ্ন নয়, এটা আসলে সমাজ-রূপান্তরের প্রশ্ন। পরবর্তী সময়ের গোটা আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলনের সমস্ত ধারাকেই আমরা দেখেছি 'বিপ্লব' বলতে 'সামাজিক বিপ্লব' বোঝাতে – রাজনৈতিক বিপ্লব নয়।

একটা জিনিস এখানে বিশেষভাবে খেয়াল করা দরকার। সূচনাপর্বে প্রথম ইন্টারন্যাশনাল মোটেও কোনো মার্কসবাদী সংস্থা হিসেবে গড়ে ওঠে নি। এটা ছিল নানা দেশের নানা মতের নানা পথের শ্রমিক-আন্দোলন ও শ্রমিক-সংগঠনসমূহের একটা সাধারণ সমবায়। শুরু থেকেই এতে ছিলেন মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্রীরা, প্রুধোঁপন্থী মিউচুয়ালিস্টরা, ব্ল্যাঙ্কুইবাদী জঙ্গীপন্থীরা, এবং বাকুনিনপন্থী কর্তৃত্বতন্ত্রবিরোধী নৈরাজ্যবাদীরা। আরো ছিলেন জার্মানির লাসালপন্থীরা, বৃটেনের ওয়েনপন্থীরা ও চার্টিস্টরা, ইতালির মাৎজিনি-অনুসারী ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদীরা ইত্যাদি প্রভৃতি নানান মতপথের শ্রমজীবীরা।

বেশি দিন টেকে নি প্রথম ইন্টারন্যাশনাল। এর মতো বহুমত বহুপথের একটা সংস্থাকে পরিচালনার জন্য যে ধরনের উদার মনোভাব এবং স্বাধীনতা-স্বশাসনপন্থা অনুসরণ করার দরকার ছিল, কার্ল মার্কসের আত্ম-অভিমানী প্রকৃতি তার উপযোগী ছিল বলে মনে হয় না। উপরন্তু তাঁর কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বভিত্তিক সংগঠনচিন্তা ইন্টার-ন্যাশনালকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হয়। ১৮৭৬ সালে, প্রতিষ্ঠার ১২ বছরের মাথায়, বিলুপ্ত হয়ে যায় এই বহু আকাঙ্ক্ষিত এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি। কিন্তু এই এক যুগ কালপর্ব ছিল অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। আন্তর্জাতিক এই শ্রমিক-সংগঠন গোটা ইউরোপের এবং আমেরিকার ক্রমবিকাশমান পুঁজিবাদকে প্রতিদিন চ্যালেঞ্জ করছিল। একেবারে মোক্ষমভাবে। এই প্রথম ইন্টারন্যাশনালই শ্রমিকদের সামনে প্রথম পরিষ্কার -ভাবে হাজির করতে পারে: শ্রমিকরা, যদি চায়, তাহলে পৃথিবীটাকে বদলে দিতে পারে।

প্রথম ইন্ট্যারন্যাশনালের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে যায়। আমাদের আপাত-আলোচ্য প্রিফিগারেটিভ পলিটিক্সের প্রসঙ্গে এবং সামাজিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতাকে কীভাবে বিবেচনা করব সেই প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নটা হলো: শ্রমিকরা পুঁজিপতিদের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করে নিতে যদি পারে, তার পরে সমাজতন্ত্রের বিনির্মাণ হবে কেমন করে। তখন মার্কস-এঙ্গেলসদের ধারা শক্তিশালী ছিল প্রধানত ইংল্যান্ড এবং জার্মানির শ্রমিক-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। বলতে গেলে এই দুইটা দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই মার্কস এবং এঙ্গেলসের জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেসির ধারা গড়ে ওঠে। এই ধারা মনে করত, আমরা – কমিউনিস্টরা, শ্রমিকরা – রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করব, এবং রাষ্ট্রক্ষমতার নিপীড়ন করার যে ক্ষমতা আছে (সেনাবাহিনী আছে, পুলিশ আছে, বলপ্রয়োগ

করার নানান অ্যাপারেটাস আছে, যন্ত্রপাতি আছে) – সেই যন্ত্রপাতিগুলো আমরা আমাদের কব্জায় নেব। এবং আমরা এই যন্ত্রপাতিগুলোকে আমাদের মতো করে প্রয়োগ করব পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে – তাঁদের এতকালের অর্জিত শক্তি-কাঠামোকে একদম চিরতরে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

অন্য দিকে প্রথম ইন্টারন্যাশনালের একটা বিরাট অংশ – স্পেন, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড (নেদারল্যান্ড), বেলজিয়াম – এই দেশগুলো থেকে আসা শ্রমিক-আন্দোলন এবং তাদের সংগঠনের প্রতিনিধিরা একটা বিকল্প ধারা বা ধারণা দাঁড় করান। সেই ধারণাটা হচ্ছে: একবার আপনি যদি লঙ্কায় যান তাহলে আপনি রাবণে পরিণত হবেন। আপনি যত মহান ব্যক্তিই হন এবং আপনার উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক, একবার যদি আপনি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হন এবং রাষ্ট্রের এই বলপ্রয়োগ করার মেশিনগুলোকে প্রথম সুযোগেই ধ্বংস করে না দিয়ে নিজের হাতে নেন, তাহলে আগামীকাল আপনি (এক বছরের মধ্যে, বা ছয় মাসের মধ্যে) স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হবেন; জারের চাইতে বড় জারে পরিণত হবেন। এই ধারার অন্যতম বড় গলা ছিলেন রুশ বিপ্লবী মিখাইল বাকুনিন।

তো, বাকুনিনরা বলতেন: বিদ্যমান রাষ্ট্র – তার সেনাবাহিনী, পুলিশ প্রশাসন, কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র, মন্ত্রীসভা, সংসদ – তার যত রকমের বলপ্রয়োগ করার মেশিন আছে, প্রথম সুযোগেই সেই যাবতীয় মেশিনপত্রকে ধ্বংস করে দিতে হবে। এবং এর জায়গাতে এর বিকল্প হিসেবে কোনো বৈপ্লবিক সংসদ, কোনো বৈপ্লবিক সেনাবাহিনী, কিংবা কোনো বৈপ্লবিক পুলিশবাহিনী আমরা গঠন করব না। একবার যদি রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের দিকে শ্রমিক-আন্দোলন যায়, তাহলে গত পাঁচ হাজার বছরের বলপ্রয়োগের যে রাজনীতি (রাজনীতি মানেই বলপ্রয়োগের রাজনীতি), পাঁচ হাজার বছরের যে কর্তৃত্বতন্ত্র সেগুলোই সমাজে নব উদ্যমে ফিরে আসবে। এই ধারার রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র হবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মিথ্যা। অনেক পরের বলশেভিক 'সমাজতন্ত্র' বাকুনিনদের এই দাবিকে নির্মমভাবে সত্য প্রমাণ করেছিল ৭০ বছর ধরে – আমরা দেখেছি।

সামাজিক বিপ্লবকে এই মুক্তপরায়ণ সমাজতন্ত্রীরা আগামীকালের ঘটনা মনে করতেন না। এঁরা মনে করতেন আমি যে বৈপ্লবিক রূপান্তর চাই সমাজের, তা আমার বর্তমান চাওয়াচাওয়ির কর্মপ্রণালীর মধ্যেই প্রতিফলিত হতে হবে। আগামীকাল যে শুভ-সুন্দর-ন্যায়পরায়ণ সমাজ আমি চাই আমার আজকের সংগঠন-প্রণালীই তার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে যদি না তোলে তাহলে আমাদের পক্ষে অন্তত ঐ রকমের একটা সমাজগঠনের চিন্তা স্রেফ মুখের বুলি হয়েই থাকবে। এই বুলি হবে আর সব ভাঁওতা-বাজির বুলির মতোই যার লক্ষ্য ভালো ভালো কথা বলে রাষ্ট্র-রাজনৈতিক

ক্ষমতাটাকে কুক্ষীগত করা। তারপর আমি যা করব সেটাই হবে 'সমাজতন্ত্র'।

সুতরাং, 'প্রথম ইন্টারন্যাশনাল'-এর মুক্তিপরায়ণ সমাজতন্ত্রীরা এই প্রিফিগারেটিভ পলিটিক্সের প্রশ্নটাকে বড় করে সামনে এনেছিল। ইন্টারন্যাশনালের মুক্তি-পরায়ণ সেকশনগুলো ১৮৭১ সালে সুইজারল্যান্ডের সনভেলিয়ায় কংগ্রেসে মিলিত হয়। ইন্টারন্যাশনালের নয়টা সেকশনের ষোলো জন প্রতিনিধির এই 'সনভেলিয়া কংগ্রেস' একটা সার্কুলার পাঠায় ইন্টারন্যাশনালের অন্তর্ভুক্ত সকল ফেডারেশনের কাছে। (দ্রষ্টব্য: মার্কস-এঙ্গেলস, ১৮৭২)। 'সার্কুলার অফ দ্য সিক্সটিন' বা 'ষোল জনের সার্কুলার' নামে পরিচিত এই দলিলে বলা হয়:

> ইন্টারন্যাশনাল তার নিজের জন্য যে গঠনবিন্যাসটা তৈরি করেছে, ভবিষ্যতের সমাজ হবে – আবশ্যিকভাবে – সেটারই সর্বজনীন চেহারা। এ ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না। তাহলে অবশ্যই আমাদের এই সংগঠনকে এমন যত্নের সাথে গড়ে তুলতে হবে যাতে করে তা আমাদের আদর্শের যতটা সম্ভব কাছাকাছি যায়। কর্তৃত্বতান্ত্রিক একটা সংগঠনবিন্যাস থেকে সমতাপরায়ণ ও মুক্ত একটা সমাজ বেরিয়ে আসবে – এমনটা কেউ চাইতে পারেন কেমন করে? এটা অসম্ভব। ইন্টারন্যাশনাল যেহেতু ভবিবষ্যতের মানবসমাজের ভ্রূণ, এখন থেকেই একে তাই হয়ে উঠতে হবে আমাদের স্বাধীনতা-নীতি আর ফেডারেশন-নীতির বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি। এবং একে তাই প্রত্যাখ্যান করতে হবে এমন যেকোনো নীতিকে যা হয়ে উঠতে পারে কর্তৃত্ব-প্রবণ বা স্বৈরতন্ত্র-প্রবণ। (কে. জে. কেনাফিক, ১৯৪৮: ২৬২-২৬৩)

এরও আগে, ১৮৬৯ সালে, মিখাইল বাকুনিন লিখেছিলেন,

> ইন্টারন্যাশনালের গঠনবিন্যাস রাষ্ট্রের গঠনবিন্যাস থেকে পুরোপুরি আলাদা হবে। কারণ, এর লক্ষ্য নতুন নতুন রাষ্ট্র তৈরি করা নয়, বরং সকল বিদ্যমান সরকার-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা। রাষ্ট্রের ক্ষমতা যত কৃত্রিম, নিষ্ঠুর আর কর্তৃত্বপরায়ণ হবে, রাষ্ট্র যত বেশি উদাসীন ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে জনসাধারণের স্বাভাবিক বিকাশধারা, স্বার্থ আর আকাঙ্ক্ষার প্রতি – তত বেশি করে স্বাধীন আর স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক হয়ে উঠতে হবে ইন্টারন্যাশনালের গঠনবিন্যাসকে। তত বেশি করে একে ধারণ করতে জনসাধারণের স্বাভাবিক সহজাত প্রবৃত্তিগুলোকে আর আদর্শসমূহকে। (মিখাইল বাকুনিন, ১৮৬৯)

এভাবে, ইন্টারন্যাশনালের গঠনবিন্যাসের প্রশ্নে, ইন্টারন্যাশনাল পরিচালনার পদ্ধতির প্রশ্নে, এবং সমাজতন্ত্রের সাথে স্বাধীনতা ওতপ্রোত সম্পর্ক বিচারের প্রশ্নে বাকুনিনদের সাথে মার্কসদের মৌলিক মতপার্থক্য তৈরি হয়। এরই পরিণামে হেগে অনুষ্ঠিত ১৮৭২ সালে মার্কসদের 'কেন্দ্রায়িত সমাজতন্ত্র' আর বাকুনিনদের নৈরাজ্য

-বাদের ভেতরকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে কেন্দ্র করে ভেঙে যায় প্রথম ইন্টারন্যাশনাল (ব্রিটানিকা বিশ্বকোষ, ২০১৩)। ইন্টারন্যাশনাল থেকে বহিষ্কার করা হয় বাকুনিনদেরকে – স্পেন সুইজারল্যান্ড ফ্রান্স ডেনমার্ক নেদারল্যান্ডসের মার্কসবাদ-বিরোধী পুরো ধারাটাকে। বহিষ্কার করা হয় তহবিল তসরুপের নাম দিয়ে, গোয়েন্দা -গিরির অভিযোগ তুলে, উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি করার দোষারোপ করার মাধ্যমে। এই ধারাট ছিল অনেক শক্তিশালী। মার্কসের চিন্তাধারা দ্বারা অধিকতর মাত্রায় প্রভাবিত ইংল্যান্ড এবং জার্মানির শ্রমিক আন্দোলনের থেকে পরিমাণে-সংখ্যায়-আয়তনে-লিটারেচারে অনেক বড় একটা ধারা। এবং এই ধারাকে প্রথম ইন্টার-ন্যাশনাল থেকে যখন বহিষ্কার করে দেওয়া হলো, তার তিন-চার বছরের মধ্যেই প্রথম ইন্টারন্যাশনাল শক্তিশূন্য হয়ে পড়ে। উপরন্তু, বাকুনিনরা পাছে এই প্রথম ইন্টারন্যাশনালে নতুন করে প্রভাব বিস্তার করে ফেলে, তাই এর প্রধান কার্যালয় লন্ডন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় নিউ ইয়র্কে – মার্কসের উদ্যোগে (ব্রিটানিকা বিশ্বকোষ, ২০১৩)। পরের ক-বছর ধরে কোনো রকমে টিকে থাকার পর শেষে ১৮৭৬ সালে ফিলাফেলডিয়া সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত করা হয় প্রথম ইন্টারন্যাশনালকে। নৈরাজ্যপন্থীদেরকে বহিষ্কার করা, প্রধান কার্যালয় লন্ডন থেকে সরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি কারণ তো ছিলই – প্রথম ইন্টারন্যাশনাল বিলুপ্ত করে দেওয়ার আরো একটা কারণ ছিলেন মার্কস নিজেও। এসময় তিনি ইন্টারন্যাশনালের কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছিলেন, আর বেশি করে মন দিচ্ছিলেন পুঁজি সংক্রান্ত গবেষণা-অধ্যয়নে (অ্যানার্কোপিডিয়া, ২০০৮)।

প্রথম ইন্টারন্যাশনাল যতদিন ছিল, তার মধ্যে দুইটা ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কথা সত্য যে তাত্ত্বিক হিসেবে, পুঁজি গ্রন্থের প্রণেতা হিসেবে, ইউরোপের শ্রমিকদের মহান সংগঠক হিসেবে গোটা ইন্টারন্যাশনালের কাছে, সবার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন কার্ল মার্কস। উপরোক্ত তর্কগুলো যখন চলছিল প্রথম ইন্টারন্যাশনালে, যখন বাকুনিনদেরকে বহিষ্কার করা হচ্ছে, তখনও বাকুনিন নিজে কাল মার্কসের ক্যাপিটাল প্রথম বারের মতো রুশ ভাষায় অনুবাদ করছেন, এবং লিখছেন যে *ক্যাপিটাল* প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য অবশ্যপাঠ্য। (মার্কসের এবং এঙ্গেলসের রচিত কমিউনিস্ট ইশতেহারের প্রথম রুশ অনুবাদ করেছিলেন বাকুনিন ১৮৮২ সালে।) তার মানে তাত্ত্বিক হিসেবে ও গুরু হিসেবে এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে একটা মোটামুটি 'বিজ্ঞান-সম্মত' পাটাতনের ওপর দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে মার্কসের ভূমিকা নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মার্কস-কথিত 'জনগণের রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করার তত্ত্বের সঙ্গে যাঁরা একমত ছিলেন না, তাঁদের দিক থেকে স্পষ্ট একটা ধারণা গড়ে ওঠে এই মর্মে যে: সমাজতন্ত্র নামে যে শ্রমিক-আন্দোলন ইউরোপ-

আমেরিকাতে আছে তার মধ্যে আছে আসলে দুইটা পরিষ্কার ধারা। একটা হচ্ছে 'কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতন্ত্র'। অন্যটা 'মুক্তিপরায়ণ সমাজতান্ত্রিক' ধারা। কর্তৃত্ব-পরায়ণ সমাজতন্ত্র বিদ্যমান রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে রুলিং ক্লাসকে উচ্ছেদ করে দিয়ে নিজেরাই রাষ্ট্রটাকে কব্জা করে নিজেদের মতো করে পরিচালনা করার কথা ভাবতো। প্রকারান্তরে এঁরা বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্র নিরপেক্ষ একটা মেশিন। মেশিনটা যাঁরা পরিচালনা করবেন, সেই অনুসারে তা পরিচালিত হবে এবং সেরকম চরিত্র ধারণ করবে। পরিচালকরা যা চান, রাষ্ট্র তাই করবে, সেরকমই হবে। মুক্তিপরায়ণ সমাজ-তন্ত্র মনে করত রাষ্ট্রের নিজস্ব একটা চরিত্র আছে। এর প্রধান চরিত্র বলপ্রয়োগ করা, প্রতিপক্ষকে দমন করা। শুধু শ্রেণীগত প্রতিপক্ষই নয়, রাষ্ট্রের যেকোনো প্রতিপক্ষকেই। এমনকি সেই প্রতিপক্ষ যদি রাষ্ট্র-পরিচালক তথা রাষ্ট্র-ম্যানেজারদের নিজ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তও হয়ে থাকেন। সুতরাং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে তার সাহায্যে সমাজপরিবর্তন করতে যাওয়াটা আত্মঘাতী একটা পদ্ধতি।

তো, এই কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতন্ত্রের ধারাটাই আমাদের মতো দেশগুলোর আজকের দিনের বলশেভিক-রাজনীতির বীজ। আজকে আমরা যাকে বলশেভিক-বামপন্থা বলি আর কি। ১৯১৭ সালে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়াতে বলশেভিক পার্টির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের বিপ্লবের পর থেকে সারা পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র মানেই হচ্ছে এই লেনিনবাদী, কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতন্ত্র। কর্নেল তাহেরও এই মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট ধারা থেকেই গড়ে ওঠা, বিকশিত হয়ে ওঠা, এই রকমের একটা পরিবারের মধ্য থেকেই বেড়ে ওঠা মানুষ। পরবর্তী সময়ে এই ধারার কমরেডদের সঙ্গেই যোগাযোগ করে তিনি তার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সূচনা ঘটান।

৮.৭ শাস্ত্র, সায়েন্স এবং স্বাধীনতা

কর্নেল তাহের এর আগে, পঁচাত্তরের অনেক আগে, সিরাজ শিকদারের সঙ্গে কাজ করা শুরু করেছিলেন। সিরাজ শিকদার পলিটিক্যাল ক্লাস নিতেন, কর্নেল তাহের মিলিটারি ট্রেনিং দিতেন। (মিলিটারির সাথে পলিটিক্সের এই সংমিশ্রণই পরবর্তী বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের ইতিহাস রচনা করেছে।) এভাবে তাঁরা কাজ করছিলেন। এক পর্যায়ে সিরাজ শিকদারের সঙ্গে তাঁদের বনিবনা হয় না। সিরাজ শিকদারই বলতে গেলে কর্নেল তাহেরের কাছ থেকে দূরে সরে যান। সিরাজ শিকদার অভিযোগ তোলেন যে কর্নেল তাহের একজন মিলিটারি অফিসার। এবং একজন পেটিবুর্জোয়া মিলিটারি অফিসারের পক্ষে বিপ্লবী হওয়া সম্ভব না। তাঁকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু, তাহেরকে আমরা যারা চিনি তাঁরা জানি যে, তাহের সেই ছোটবেলা থেকে একটা সামরিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তাহের বিভিন্ন স্কুলে

পড়েছেন। তাঁর বাবা ছিলেন রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার। সেই কারণে আজকে এখানে কালকে ওখানে বদলি হয়ে হয়ে যেতে হয়েছে তাঁদেরকে। চট্টগ্রামে তাহের তখন পড়ছেন, যখন তিনি মেট্রিক পাশ করেন নি, তাঁর স্কুলের টিচার (মাস্টারদা সূর্যসেনের একজন প্রত্যক্ষ সহকর্মী তাহেরদের স্কুলের শিক্ষক ছিলেন) ক্লাসরুমে ঐ 'কোমলমতি' ছেলেমেয়েদেরকে, তের-চোদ্দ-পনের বছরের বাচ্চাদেরকে, শেখাতেন যে তোমাদের মতো বয়েসেই আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি বলতেন, আমি তখন ক্লাস টেনের ছাত্র ছিলাম। তাহেরকে বলতেন, তোমাদের বয়েসী আমরা ছিলাম তখন। তাহের ছিলেন সেই গল্পের প্রতি সেই ইতিহাসের প্রতি অনেক উৎসুক। এবং তাঁর ঔৎসুক্য দেখে সূর্যসেনের সেই কমরেড, জালালাবাদ পাহাড়ের বিপ্লবের অন্যতম প্রত্যক্ষ, সম্মুখযোদ্ধা, তাহেরকে নিয়ে, ঐ ছোট্ট বাচ্চাটাকে নিয়ে জালালাবাদ পাহাড়ে যান। দেখাতে থাকেন: জালালাবাদ পাহাড়ে দাঁড়িয়ে কোথায় সূর্যসেন যুদ্ধ করেছেন, কোথায় কোথায় দাঁড়িয়ে তাঁরা পজিশন নিয়েছেন, কীভাবে কীভাবে তাঁরা পরাজিত হয়েছেন, কীভাবে কীভাবে তাঁরা জিতেছিলেন, কীভাবে তাঁরা তাঁদের জয় রক্ষা করতে পারেন নি। স্বপ্নের বীজ তাহেরের মাথার মধ্যে বুনে দেন তিনি।

তার আগে থেকেই মায়ের সূত্রে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মন্ত্র পেয়েছিলেন তাহের। খুব অল্প বয়েসে, চট্টগ্রামের এ ঘটনারও আগে, তাহেরকে আমরা দেখেছি, একটা ডাকাত ডাকাতি করে ফিরে যাচ্ছে, কর্নেল তাহের একা, ছোট বাচ্চা, খালি হাতে সেই ডাকাতের সামনে গিয়ে রুখে দাঁড়াচ্ছেন, চ্যালেঞ্জ করছেন। মারামারি করছেন (অন্য একটা ঘটনায়)। তো, এই তাহেরকে আমরা দেখি, একেবারে ছোট বেলা থেকে উনি একটা যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছেন। এবং এই যুদ্ধ করার জন্যই, যুদ্ধ শেখার জন্য তাহের সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। সামরিক বাহিনীতে যাব, যুদ্ধ কেমন করে শিখব, সব ভালো মতো শিখে সামরিক বাহিনী ছেড়ে বাইরে আসব, জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে আমার দেশকে আমি পাকিস্তানীদের হাত থেকে মুক্ত করব। আর, সিরাজ শিকদার মনে করছেন, তাহের হচ্ছেন পেটি বুর্জোয়া আর্মি অফিসার।

খেয়াল করে দেখবেন: সিরাজ শিকদারকে খাটো করে দেখারও কিন্তু এক চুল জায়গা নাই। সিরাজ শিকদার আমাদের আরেক রূপকথার নায়কদের একজন। এরকম অজস্র রূপকথার নায়কদেরকে নিয়ে, আমি বলেছি, আমরা রূপকথার যুগ পার হয়ে এসেছি। সত্যিকারের রূপকথার যুগ। এটা আসলে রূপকথা ছিল না, বাস্তব ছিল। সিরাজ শিকদারের মাথায় ছিল একটা বলশেভিক থিওরি। শাসক ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রের মতো। ব্রাহ্মণদেরকে যেমন করে তাঁদের শাস্ত্র, তাঁদের মনুসংহিতা গাইড

করেছে তেমনই। মনুসংহিতায় যা লেখা আছে তার বাইরে ব্রাহ্মণেরা যাবেন না। মনুসংহিতায় যা লেখা আছে, তার মানে ব্রাহ্মণেরা বোঝেন অথবা না বোঝেন সেটাই মেনে চলবেন। তাঁরা প্রধানত না বুঝেই হাজার পাঁচেক বছর ধরে ঘাড়ে করে মনুসংহিতা বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন। মনে করেছেন: জীবনের চাইতে শাস্ত্র বড়। জীবনের চাইতে সায়েন্স বড়। জীবনের চাইতে 'সত্য' বড়। যে 'সত্য' আমি চিনেছি। আমার যেটা শাস্ত্র, আমার যেটা ডগমাটিজম, আমার যেটা অন্ধত্ব – সেটাই হলো 'আমার সত্য'; 'আমার সায়েন্স'। এই সায়েন্সের বাইরে ব্রাহ্মণরা (সারা পৃথিবীর সর্বপ্রকার ব্রাহ্মণ) এক চুলও সরেন নি। সাধারণ মানুষকে রাস্তা দিয়ে শুধু হেঁটে যাওয়ার অধিকার অর্জন করার জন্য, সাধারণ মানুষ যেন তার নিজের ছায়া নিয়ে সংকুচিত না থাকে তার জন্য লড়াই করতে হয়েছে তাদেরকে। নিজের ছায়াটুকুর স্বীকৃতি অর্জন করার জন্য! (এই ছায়া ব্রাহ্মণের গায়ে পড়ে গেলে তো সর্বনাশ! প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, হয়ত মেরে ফেলা হবে, হয়ত গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, হয়ত একঘরে করে ফেলা হবে।) বলশেভিকরাও শ্রেণীসংগ্রামের জগতে নিজেদেরেক এরকম উন্নত, নেতৃস্থানীয়, ভ্যানগার্ড ব্রাহ্মণই ভাবতেন বটে।

এই শাস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই-ই তো মানবজাতির মুক্তির লড়াই। মানবজাতির যেটাকে আমরা আমরা সভ্যতা বলি, যেটাকে আমরা সংস্কৃতি বলি, যেটাকে আমরা আমাদের স্বপ্ন বলি, স্বাধীনতা বলি, মুক্ত যে জীবনের কথা বলি, সেটা অর্জন করার জন্য মানবজাতিকে বারো হাজার বছর ধরে কোনো না কোনোভাবে শাস্ত্রের মোকাবেলা করতে হয়েছে।

সিরাজ শিকদারের মাথায় ছিল শাস্ত্র। বলশেভিক শাস্ত্র। সেই শাস্ত্র বলে দিচ্ছে যে কর্নেল তাহের একটা পেটিবুর্জোয়া আমি অফিসার। পাকিস্তানী আর্মির মতো নিপীড়ক আর্মির অফিসার। এই শাস্ত্রকে সিরাজ শিকদার শাস্ত্র হিসেবে চেনেন নি। তিনি তাকে মনে করেছেন সমাজবদলের সায়েন্স। মজার কথা হচ্ছে, সেই সায়েন্স-মতে, কর্নেল তাহের বিপ্লবী না, পেটিবুর্জোয়া লোক। তাহলে আমরা, এক কথায়, দেখতে পাচ্ছি, তাহেরের জীবন থেকে আমি এক নম্বর এইটা শিখলাম যে শাস্ত্রের চাইতে প্রকৃত ব্যক্তি এবং তার কর্মকাণ্ড অনেক বেশি জরুরি।

কিন্তু আনফর্চুনেটলি কর্নেল তাহের সেই চে গুয়েভারার সমর্থকই ছিলেন, যে চে গুয়েভারা কিউবাতে বিপ্লব হবার পরে প্রথম ফায়ারিং স্কোয়াডগুলোতে নিজে হাতে গুলি করে মানুষকে মেরেছেন; যে চে গুয়েভারা কিউবাতে প্রথম কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলি দাঁড় করান, রাশিয়ার মতো। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলো ছিল দাসদের ক্যাম্প, যেখানে সমস্ত লোককে, যাকেই মনে হচ্ছে বিপ্লবের বিরুদ্ধে, যাকেই মনে হচ্ছে আমার পক্ষে না, তাকেই বন্দি করে রাখা হতো। মানুষ বড় ছিল না। বড় ছিল:

আমার প্রতি অনুগত কে, অনুগত কে না। যে আমার প্রতি অনুগত না, সে-ই বিপ্লবের শত্রু। তাকে নিয়ে আমি কী করব? তাকে নিয়ে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আমি ঢোকাবো। সারা জীবন জেল খাটবে সে। পরিশ্রম করবে। তাতে করে উৎপাদন হবে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উৎপাদন দাঁড়াবে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোল্যুশন দাঁড়াবে এই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের দাসদের, দাস-শ্রমিকদের, সাধারণ শ্রমিকদের শ্রমে – যার জন্য বিপ্লব, যাদের মুক্তির জন্য বিপ্লব।

যে জেলখানা ভেঙে ফেলার জন্য বিপ্লব, সেই জেলখানা নিয়েই বলশেভিক সমাজতন্ত্র দাঁড়িয়েছে। আপনারা জানেন। আমি বাড়াচ্ছি না আর। রাশিয়া ছিল সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জেল সিস্টেম। কিউবা ছিল ল্যাটিন আমেরিকার সব চেয়ে বড় প্রিজন ক্যাম্পগুলোর একটা, প্রিজন সিস্টেমগুলোর একটা। আমাদেরকে – আমি শুধু এক কথায় বলি – আমাদেরকে এই গোটা বলশেভিক ধারা নিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। আমাদের কোনো ভুল ছিল না। আমরা যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, আমাদের পূর্বসূরীরা (তাহেরকে আমার ব্যক্তিগতভাবে বড় ভাই মনে হয়, বা এরকম অনেক মানুষকে) যাঁরা আমাদের মাত্র এক প্রজন্ম আগের মানুষ, তাঁদের কোনো ভুল ছিল না। তাঁদের পুরো যুগটা দেখবেন। ভিয়েতনামে হোচিমিন। এগারো-বারো-তেরো বছর ধরে স্বাধীনতা-যুদ্ধ চলছে। স্বাধীনতা-যুদ্ধ আস্তে আস্তে সমাজতান্ত্রিক পার্টির নেতৃত্বে একটা র‍্যাডিক্যাল লড়াইয়ে পরিণত হচ্ছে। এই কিউবা, ভিয়েতনাম, চীন, রাশিয়া, আলবেনিয়া – এদেরকে দেখে দেখে তাহেরেরা বড় হয়েছেন। আমরা এদের কথা শুনে শুনে বড় হয়েছি। আমাদের গোটা যুগটাই তো বলশেভিকদের যুগ। ১৯১৭ সালের পরে আমরা অন্ধ ঈমান এনেছিলাম: আমাদের 'নবী' আছে, আমাদের 'রসুল' আছে, আমাদের 'ধর্মগ্রন্থ' আছে, আমাদের 'মক্কা' আছে, 'বেহেশত' পৃথিবীতে আমরা তৈরি করেছি সোভিয়েত ইউনিয়নে। সুতরাং আমাদের এখানে কাজ হচ্ছে: 'জাস্ট টু ফলো'। শুধু অনুসরণ করে যাও। তাহলে পরেই তুমি মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে যাবে। কিন্তু, এই অন্ধ অনুসরণ – এটা যে আমাদেরকে অন্ধত্বের পথে নিয়ে যাবে এইটা আমরা ভাবিই নি।

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে খোদ কার্ল মার্কসকে যে ধরনের মতামতগুলো মোকাবেলা করে করে দাঁড়াতে হচ্ছিল, সেই মুক্তিমুখিন সমাজতন্ত্রের বিপুল ইতিহাসকে আমাদের সামনে আনতে পারে নি এই অন্ধ অনুসরণ। ১৯১৭ সালের পরে আমরা পৃথিবীতে পেয়েছি দুইটা সাম্রাজ্য। একটা মার্কিন সাম্রাজ্য। একটা হচ্ছে সোভিয়েত সাম্রাজ্য। দুই সাম্রাজ্য একইরকম পদ্ধতিতে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছে: গুপ্ত পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিশাল প্রিজন সিস্টেম, দাসপ্রথা, লেবার ক্যাম্প, এগুলোর ভিত্তিতে। এইটা জেল-সমাজতন্ত্র। রাশিয়াতে গড়ে

উঠেছে। চীনে গড়ে উঠেছে। এ ধারার প্রত্যেকটা 'কমিউনিস্ট' দেশে গড়ে উঠেছে।

আমার নিজেরও কিন্তু জন্ম হয়েছে একটা বলশেভিক পরিবারে। জন্মের পর মানুষ, বাচ্চারা, যে খেলনা নাড়াচাড়া করে ... আমি বিশিষ্ট্য প্যাকেটমোড়ানো লেনিনগ্রন্থ নিয়ে খেলতে খেলতে বড় হয়েছি। বইয়ের শুরুতে তাঁর ছবির ওপরে পাতলা ফিনফিনের কাগজের ঈষৎ-অস্বচ্ছ পর্দা থাকত। পবিত্র একটা অনুভূতি হতো। আমরা এই বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষ এই বলশেভিক ধারার সমাজতন্ত্রের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে, কোনো না কোনো দিন, কোনো না কোনো নামে, কোনো না কোনো চিহ্ন নিয়ে, কোনো না কোনো নেতার অধীনে লড়াই করেছি। আমরা সবাই জীবন দান করার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলাম।

কর্নেল তাহেরকে দেখেছি, তার গণবাহিনীর লোকদেরকে দেখেছি, এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দেখেছি, শুধু কী করতে হবে বলে দেন। তার জন্য আমি মারা যেতে উদগ্রীব। বাচ্চার কী হবে, বউয়ের কী হবে, আমার পরিবারের কী হবে, কিচ্ছু ভাবেন নি এঁরা। মানুষ বড় হয়ে গিয়েছিল। মনুষ্যত্ব তার স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু সেই মনুষ্যত্বকে নিয়ে আমরা আমাদের স্বপ্নের একেবারে দারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েও ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃত স্বাধীনতার জায়গাটাকে ধরতে পারি নি।

কেন নিতে পারি নি? সেটা দেখার জন্য যদি পেছনে তাকাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই মার্কসিজম-লেনিনজম নিয়ে আরেকবার ভাবতে হবে। কার্ল মার্কসের নিন্দা করা মানে আমার নিজেকে নিন্দা করা। বলশেভিজমকে অন্ধ বলা মানে আমাকে অন্ধ বলা। আমরা অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজকের অন্যতম আলোচক (নাজমুল হক) প্রধান ভাইদের সঙ্গে এক সঙ্গে রাস্তায় হাত ধরাধরি করে আমরা দশটা বছর পার করে দিয়েছি। আমাদের গোটা স্টুডেন্ট লাইফ। আমরা মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি বা দেব দেব করছি, এরশাদ সাহেব ক্ষমতা দখল করে নিয়েছেন। আমরা মাস্টার্স পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, তার আগে আমরা এরশাদ সাহেবকে বিদায় করেছি। আমাদের জেনারেশনের গোটা জীবনটাই গেছে রাস্তায়। কেডস পরে। এক ধরনের একটা যুদ্ধের মধ্যে। পিকেটিঙের মধ্যে। লড়াইয়ের মধ্যে। আমাদের বন্ধুরা মারা গিয়েছেন। জাসদের, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের। মানুষরা লড়াই করেছে। মারা গেছে। আমার ঘনিষ্ট বন্ধুরা, প্রধান ভাইয়ের ঘনিষ্ট বন্ধুরা, আমরা লড়াই করেছি, মারা গেছি, নানাভাবে পঙ্গু হয়েছি, আহত হয়েছি, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছি। আমি আমার নিজের সমালোচনা করছি। আমি তাহেরের সমালোচনা করছি না।

৮.৮ তাহেরের কাছ থেকে কী শিখতে পারি আমরা?

তাহেরের কাছ থেকে আমাদের যা শেখার, সেটা শিখে নিতে হবে। কী শিখতে পারি আমরা? ব্যক্তি কী হতে পারে তার মাপ পেতে পারি আমরা। মনুষ্যত্ব নামের বিরাট একটা ধারণা মানুষকে কত বড় করে ফেলতে পারে – তাহেরকে দেখে তা শিখতে পারি। আরো অনেককে দেখে শিখতে পারি। এই গোটা জেনারেশনটাকে দেখে আমরা শিখতে পারি। তাহেরকে দেখে শিখতে পারি আমরা যা অনুসরণ করছিলাম তা একটা অন্ধ শাস্ত্র। তাকেই আমরা মনে করেছি সমাজ বদলের সায়েন্স। অকাট্য বিজ্ঞান মনে করেছি। এবং সেই বিজ্ঞান আমাদের পকেটে আছে আমরা তাই মনে করেছিলাম। আমরা শুধু হুজুর খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। তাহের নিজে পর্যন্ত একটা উপযুক্ত পলিটিক্যাল লিডার খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। তাহের শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন যে কে পলিটিক্যালি গাইড করতে পারে। সিরাজুল আলম খানের কাছে তিনি গিয়েছেন। জাসদের কাছে তিনি গিয়েছেন।

কর্নেল তাহেরের আত্মত্যাগ, তার সাহসিকতা – এগুলো খুব স্বাভাবিক মনুষ্য-গুণাবলী। এগুলোকে আমি ব্যতিক্রমী গুণাবলী হিসেবে দেখি না। মানুষের সহজাত তথা জন্মসূত্রে পাওয়া এই গুণাবলী তাহের আত্মস্থ করেছিলেন। আমরা অনেকেই জন্মসূত্রে অর্জন করার পরেও সেটা বহন করতে পারি না। বহন করতে পারি না কেন? আমাদের সমাজকাঠামো, স্কুল-কলেজ থেকে আরম্ভ করে, আমাদের পরিবার থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রকাঠামো, আমাদেরকে এমন ট্রেনিং দেয় যে, আমরা শুধু অনুসরণ করতে চাই। নিজের ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি না। মানুষের মধ্যে ভগবান থাকেন। মানুষের মধ্যে স্বয়ং গড থাকেন। নেচার, গোটা ইউনিভার্স, তার সর্বোচ্চ-সুন্দর গুণাবলী দিয়ে মানুষ নামের একটা প্রজাতি সুষ্টি করেছে। এই প্রজাতির গুণাবলীর প্রতি আমাদের একটু সম্মান করা দরকার, নিজেদের প্রতি আমাদের সম্মান করা দরকার। আমরা কী পারি, আমরা কী পারি না, তা নিয়ে একবার ভাবা দরকার।

মাথার মধ্যে লম্বা ওয়াজ। সব কথা তোলারও উপায় নাই এখানে। সামরিকতা নিয়ে তাহেরের ধারণা সংক্রান্ত আলাপ আছে। সামরিকতা নিয়ে খোদ আমাদের সামরিক বাহিনীর ধারণা নিয়ে কথা বলার আছে। জাসদের গণবাহিনীর গঠনকাঠামো নিয়ে, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সংগঠনগত কাঠামো নিয়ে আমাদের এক্সপেরিমন্টগুলো নিয়ে কথা আছে। মুক্তিযুদ্ধের ১১ নম্বর সেক্টরে, পরে স্বাধীন দেশের কুমিল্লা ব্রিগেডে কর্নেল তাহের যখন ব্রিগেড-এর দায়িত্বে ছিলেন, সেইখানে উনি নতুন সেনাবাহিনীর গড়ার এক্সপেরিমেন্টগুলো চালাচ্ছিলেন সেইগুলো নিয়ে বলার আছে। সব মিলিয়ে

খোদ সামরিকতা জিনিসটার জায়গা সমাজে কোথায়? সমাজতন্ত্রের সাথে সামরিকতার সম্পর্ক কী? সময়কে পাল্টে দেওয়ার জন্য ব্যক্তি-মানুষ কী করতে পারে? কত দূর করতে পারে? পরিবার কী করতে পারে? ঘুম ভেঙে জেগে উঠলে একটা সমাজ কী করতে পারে? এসব নিয়ে প্রচুর কথা তোলার, বলার, অবকাশ থেকে গেছে আমাদের।

একটা জিনিস খেয়াল করা দরকার বিশেষ করে। এ দিকটা বলে কথা শেষ করব। সেটা হলো: রাষ্ট্র এবং সমাজ পরস্পরের শত্রু। রাষ্ট্র চায় গোটা সমাজ তার গোলাম হবে। আমলারা যা বলবেন, রাষ্ট্র-আইন যা বলবে, কেবল জন্ম নেওয়া বাচ্চা থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুপথযাত্রী পর্যন্ত তা মেনে চলবে। রাষ্ট্র এই গোলামি চায়। আর সমাজ কী চায়? সমাজ স্বাধীনতা চায়। সমাজ চায় রাষ্ট্রের নামে হোক, রাজনৈতিক দলের নামে হোক, ধর্মের নামে হোক, মতাদর্শের নামে হোক, সামরিক বাহিনীর নামে হোক সমাজের ওপরে যেন গোলামি চাপানো না হয়। রাষ্ট্রের সাথে সমাজের এই যে মুখোমুখি সম্পর্ক – এ সম্পর্কটাকে খেয়াল করেন নি তাহের। লেনিন থেকে আরম্ভ করে কার্ল মার্কস থেকে আরম্ভ করে গোটা বলশেভিক ট্রাডিশন এটা খেয়াল করে নি।

কার্ল মার্কসের কাছ থেকে, গোটা বলশেভিক ট্রাডিশনের কাছ থেকে, লেনিনের কাছ থেকে আমাদের শেখার মতো অজস্র বিষয় আছে। সবচাইতে বেশি করে শিখতে হবে: আমাদের স্বপ্নসৌধ সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন ঝুরঝুর করে হাওয়া হয়ে গেল একটা গুলি পর্যন্ত না ফুটিয়ে। বিনা লড়াইয়ে। বিনা প্রতিরোধে। বঙ্গবন্ধুর মতো বাংলাদেশের সমান একজন নেতা যখন সপরিবারে খুন হয়ে যাচ্ছেন, কেন তখন তার বিশাল ছাত্রলীগ, তার বিশাল আওয়ামী লীগ, তার বিশাল রক্ষীবাহিনী, তার বিশাল সেনাবাহিনী চোখের পলকে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে? সামান্যতম প্রতিরোধও দাঁড়াচ্ছে না কেন? প্রতিরোধ কোত্থেকে আসে? স্বাধীনতা কোত্থেকে আসে? অন্ধ অনুসরণ কোত্থেকে আসে? এবং শুধুমাত্র জানবাজি ধরলেই বিপ্লব করা যায় না। শুধু লোক জড়ো করে বিপ্লব হয় না। এই সামগ্রিক জিনিসগুলো নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, একটা একটা করে, বিস্তারিতভাবে, দীর্ঘ দিন ধরে আমরা যদি পর্যালোচনা করি তাহলে সেটা বিশেষ কাজের হবে। এ ছাড়া আমাদের পথ নেই।

৮.৯ এখনকার কর্তব্য নির্ধারণের প্রশ্ন

আমি জানি তাহেরের আগুন বুকে নিয়ে এইখানে অনেকে উপস্থিত। আমি জানি তাহেরের আগুন বুকে বাংলাদেশে অনেক তরুণ কোনো না কোনোভাবে বাংলাদেশকে সার্ভ করার জন্য পথ খুঁজছে। কিন্তু ছাত্রদের রাজনীতিবিমুখতা নিয়ে

এখানে শিপন অথবা তুষার যে শঙ্কা ব্যক্ত করেছেন – প্রিয়ভাজন জামি আর আমার বন্ধু শিবলী আরেকটু বলেছেন যেটা নিয়ে – আমি সেটাকে সেরকমভাবে দেখি না। ওঁদের কথা এক দিক থেকে ঠিকই। কিন্তু আরেক দিক থেকে দেখলে দেখবেন: বাংলাদেশের তরুণরা খোদ ছাত্র-রাজনীতি জিনিসটাকে প্রত্যখ্যান করেছেন। বাংলাদেশের মানুষ খোদ রাজনীতি জিনিসটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে আমার মনে হয়।

মুক্তিপরায়ণ সমাজতন্ত্রীরা স্পেনে দুই বছরের রক্ষক্ষয়ী লড়াইয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়নের লড়াইয়ে, কিউবাতে লড়াইয়ে আমাদেরকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে রাষ্ট্রপন্থার মারাত্মক কিপদের কথা। (প্রসঙ্গত কিউবাতে কিন্তু সমাজতন্ত্রের ধ্যানধারণা প্রথম ঢোকে স্পেন হয়ে। ফ্রান্স হয়ে। মুক্তিপরায়ণ সমাজতান্ত্রিক ধারা হয়ে। বাকুনিন হয়ে। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন হয়ে না।) গোটা পৃথিবী জুড়ে সমাজতন্ত্রের এই মুক্তিপরায়ণ ধারাটা কিন্তু আমাদেরকে বার বার করে বলেছে যে খোদ রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তার কথা। রাজনীতি মানেই হচ্ছে রাষ্ট্র। রাজনীতি মানেই হলো সেনাবাহিনী। উৎপাদনমুখী সেনাবাহিনীই বলেন আর যে সেনাবাহিনীই বলেন, সেনাবাহিনী সেনাবাহিনীই।

তাহেরের আলো নিয়ে, তাহেরের আগুন নিয়ে, তাহেরের স্বপ্ন নিয়ে, এবং ঐরকম আরো অজস্র মানুষের স্বপ্ন-আগুন-আলো নিয়ে আমরা লড়াই করে যাচ্ছি। এই আগুনকে বুকে রেখে আমরা যদি আরেকটু আলো জ্বালতে পারি, এবং সেই জ্বালা আলোতে তাহেরের, জাসদের, সিরাজ শিকদারের, হক-তোয়াহাদের, আরো সব বামপন্থী ধারার লড়াইগুলোকে, এমনকি মস্কোপন্থী পার্টিগুলির (যে পার্টিগুলির নানান ধরনের সীমাবদ্ধতা আমার দেখেছি, একাত্তরে, বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তরে অদ্ভুতভাবে তারা আওয়ামী লীগের সাথে মিশে গিয়েছিল, তাদের নিজস্ব কোনো সত্তা ছিল না) কার্যক্রমকে আমরা যদি পর্যালোচনা করতে পারি তাহলে সেটা কাজের হবে। আমরা যদি বুঝি যে: রাজনীতি মানেই হচ্ছে রাষ্ট্র, বলপ্রয়োগ, সৈন্যবাহিনী, গুপ্তসংস্থা তাহলে আমরা আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারব।

যেমন ধরুন বেলাল এবং বাহার। এঁদেরকে দেখলে সেই কর্তব্য সম্পর্কে আন্দাজ পাওয়া যায়। জাসদের সেন্ট্রাল কমিটির হুকুম ছাড়াই, সিরাজুল আলম খানের সাথে যোগাযোগ করা ছাড়াই, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার হুকুম ছাড়াই ভারতীয় হাইকমিশনারকে জিম্মি করার একটা জীবন-মরণ-স্বপ্নের মতো একটা অপারেশন তাঁরা চালিয়েছিলেন। কোন বিবেচনা থেকে চালিয়েছিলেন? নিশ্চয়ই এই বিবেচনা থেকে যে এখন আর হুকুম দেওয়ার কেউ নাই। এখন আর পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির মিটিং বসার মতো সময় নাই, এখন যা করার আমাকেই করতে হবে।

ছোট্ট বাচ্চা বাহার, বেলাল, ওদের বন্ধুরা – তারা আমাদেরকে পথ দেখাবে যেন আমরা কোনো রকম কেন্দ্রীভূত পার্টি, কোনো কেন্দ্রীভূত কমিটি, কোনো রকম কেন্দ্রীভূত কমান্ডের বাইরে নিজের উদ্যোগে, নিজের পাড়ায়, নিজের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, নিজের ডিপার্টমেন্টে, নিজের পরিবারে (তাহেরের মতো), এবং সর্বত্র ওঁদের মতো স্বপরিচালিত স্কোয়াড বানাতে পারি। এইসব স্কোয়াড গোটা বাংলাদেশ কোথায় গেল তাকিয়ে দেখবে না। নিজের বিবেচনামতো কাজ করবে। এই স্কোয়াডগুলো পারস্পরিক নেটওয়ার্ক তৈরি করার মাধ্যমে, পারস্পরিক ফেডারেশন তৈরি করার মাধ্যমে একেকটা স্বাধীন-স্বতন্ত্র নিউক্লিয়াস হিসেবে সবাই মিলে কাজ করবে। স্পেনের লিবার্টারিয়ান কমিউনিস্টদের মতো। ফ্রান্সের শ্রমিকদের সিন্ডিকেটের মতো। রাশিয়ার অ্যানার্কিস্টদের মতো। তখন একজন কেন্দ্রীয় নেতা অ্যারেস্টেড হয়ে গেলেই একটা বিপ্লব হারিয়ে যাবে না। একটা কেন্দ্রীয় কম্যান্ডের সবাইকে অ্যারেস্ট করে ফেললেই একটা বিপ্লব দুই দিনের মধ্যে রাস্তা থেকে উধাও হয়ে যাবে না।

কাঙ্ক্ষিত সেই বিপ্লব আমাদের সামনে আসছে। সেই বিপ্লবকে আমরা কত তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আসতে পারি সেটাই এখন প্রশ্ন। আমাদের সাথে করমর্দনের জন্য অপেক্ষা করছে সময়। আমাদের সাথে করমর্দনের জন্য অপেক্ষা করছে রূপকথা – আরেকটা অলৌকিক ইতিহাসের পর্ব। আমরা তাকে ডেকে আনতে পারি আমাদের জীবন-কর্ম দিয়ে। খুব সামান্য ঘটনা এইটা। সাধারণ কাজ এইটা। এর জন্য আপনাকে 'নবুয়ত' নিয়ে আসতে হবে না। এর জন্য আপনাকে অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে আসতে হবে না। অলৌকিক ক্ষমতা আল্লাহ্ বলেন, প্রকৃতি বলেন, নেচার বলেন আপনার মধ্যে দিয়ে দিয়েছে। একবার সেই ক্ষমতাকে ঘষা দেন: আগুন জ্বলুক, এবং সেই আগুনের আলোতে আমরা আরেকবার তাহেরকে চিনে নেই, আরেকবার ভবিষ্যতকে বানাই। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

বক্তৃতা ও অনুলিপি-প্রণয়ন: জুলাই ২০১১। পরিমার্জনা: ২১শে নভেম্বর থেকে ২৮শে ডিসেম্বর ২০১৩। দৈনিক বণিক বার্তা: ২৩শে নভেম্বর ২০১৩, ২১শে ডিসেম্বর ২০১৩, ২৮শে ডিসেম্বর ২০১৩, দৈনিক *সোনার দেশ*: ৭ই নভেম্বর ২০১৩, ২৩শে নভেম্বর ২০১৩, ৭ই ডিসেম্বর ২০১৩, ১৪ই ডিসেম্বর ২০১৩, ২৮শে ডিসেম্বর ২০১৩

তৃতীয় দাগ

সুশীল-সামরিক জরুরি জমানা

নয়

মহামান্য ভয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা

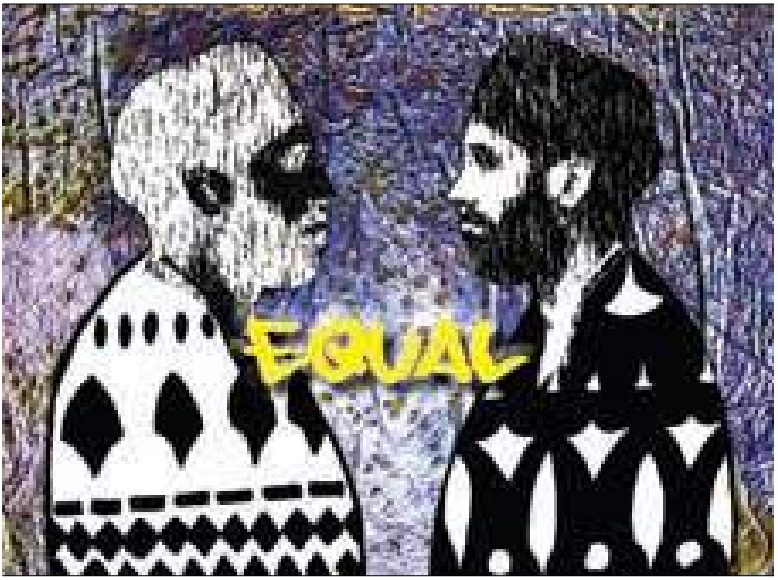

Fear of Freedom

৯.১ অবতরণিকা

এই লেখাটা তৈরি করা হয়েছিল ২১শে আগস্ট ২০০৭ তারিখে। সেদিন সকালে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অ্যাকাডেমিক কমিটির বিশেষ জরুরি সভা বসেছিল বোমা হামলার হুমকি-সম্বলিত উড়োচিঠি প্রসঙ্গে করণীয় নির্ধারণ করার জন্য। কিন্তু ঐ উড়োচিঠির হুমকির চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনাক্যাম্পের জওয়ানদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্র প্রহৃত হওয়াকে কেন্দ্র করে তপ্ত হয়ে উঠতে থাকা পরিস্থিতিজনিত উৎকণ্ঠা আমাদের মনকে আরও বেশি আচ্ছন্ন করে তুলছিল। ঐ সভায় বসে, প্রথম আলো পড়তে পড়তেই ঘটনাটা জেনেছিলাম আমি। পত্রিকাটা বাকিদের দিকে ঠেলে দিয়ে সবাইকে বলেছিলাম, আমাদেরও উচিত প্রতিবাদ করা। কী করা যায়, কী করা যায় ভাবতে ভাবতে ঠিক করা হলো একটা কলাম লেখা হবে, *প্রথম আলো* পত্রিকায় পাঠানো হবে, সবাই সেটায় স্বাক্ষর করবে। রচনার দায়িত্ব আমার ওপর। এ সেই রচনা।

রচনাটা শেষ করতে করতে সন্ধ্যা লেগে গেল প্রায়। সবার সই নিয়ে পাঠাতে পাঠাতে রাত আটটা পার। সম্পাদকীয় বিভাগের সাংবাদিক ফিরোজের সাথে কথা হলো, দেরির জন্যে ২২শে আর ছাপানো যাচ্ছে না, ২৩শে আগস্টে ছাপা হবে বললেন। ২৩শের পত্রিকায় লেখাটা না দেখতে পেয়ে ফিরোজকে ফোন করলাম। তিনি বললেন প্রথম পাতায় 'লক্ষ্য করুন' বিজ্ঞপ্তিটা দেখতে। দেখলাম: 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে ঢাবি এবং রাবি'র তরুণ শিক্ষকদের লেখা পড়ুন – ভেতরের পাতায়' এ-জাতীয় একটা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া আছে। অথচ ভেতরের পাতায় লেখা দুটো নাই! ফিরোজ আরও জানালেন ঢাবি'র গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের রোবায়েত ফেরদৌস-সহ অন্যসব শিক্ষকদের একটা লেখা ('ছাত্র-শিক্ষকের ক্যাম্পাসে সেনা পুলিশের ঠাঁই নাই' ধরনের শিরোনামে) এবং আমাদের এই লেখাটা আগের দিন বিকালে তিনি নিজে হাজির থাকতেই পেস্টিং হয়ে গিয়েছিল, পরে তিনি চলে আসার পর রাতে তুলে ফেলা হয়েছে। সম্পাদকীয় বিভাগ ছাপার জন্য পেস্টিং করার পরও শেষ মুহূর্তে 'কারা সেন্সর করল, কেন করল বুঝতেই পারছেন' – ফিরোজের ব্যাখ্যা শুনে চুপ থাকতে হয়। জরুরি ক্ষমতার অধীনে সংবাদপত্রে সেন্সরশিপের সাক্ষাৎ প্রমাণ হয়ে রইল এই সামান্য রচনা।

বিভাগের সভাপতি খাদেমুল ইসলাম ছাড়া আর সকল শিক্ষক লেখাটার সাথে সম্মত হয়ে স্বাক্ষর করেছিলেন। আমারসহ মোট দশজনের নামে এটা পত্রিকায় গিয়েছিল। অন্য শিক্ষকরা ছিলেন: আকতার জাহান, ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ, আ-আল মামুন, তানভীর আহমদ, দুলাল বিশ্বাস, মশিহুর রহমান, মুসতাক আহমেদ, মোছাঃ দিল আফরোজা খাতুন, এবং শাতিল সিরাজ। যৌথ রচনা হিসেবে এই রচনাটি যেহেতু এ-যাবৎ প্রকাশের মুখ দেখে নি, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের শ্বাসরুদ্ধকর চাপে আমার দুই কারাসঙ্গী ছাড়া বাকিরা যেহেতু এই রচনার চেতনার সাথে সংহতি বোধ করে প্রতিবাদের ধারা বজায় রাখেন নি এবং আদতে রচনাটা যেহেতু আমারই, সেহেতু এখানে এটা শুধু আমার নামেই পেশ করলাম।

বিভাগের সব শিক্ষক যেন সম্মত বোধ করতে পারেন, এবং যারা এমন সাংবাদিকতা করেন যে নিজেরা সেন্সর্ড্ হওয়ার দুঃখটা পর্যন্ত পাঠককে জানাতে পারেন না, সেই *প্রথম আলো*-র মতো একটা পত্রিকাও যেন লেখাটা ছাপাতে পারেন, তেমন সতর্কভাবে এটা রচনা করতে হয়েছিল, সে-কথা বলা হয়ত বাহুল্য নয়।

রাবি: ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০০৮

৯.২ আইন-শৃঙ্খলার ব্যথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দের উপর পুলিশ এবং সেনাসদস্যদের তথা 'আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী'র হামলার ঘটনায় আমরা অত্যন্ত ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ হয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দকে যেভাবে গণহারে পেটানো হয়েছে, এবং

তাদেরকে রক্ষা করতে গিয়ে তাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে যেভাবে শারিরীকভাবে লাঞ্ছিত, নিগৃহীত ও হেনস্তার শিকার হয়েছেন তা খুবই উদ্বেগজনক। অনেক শিক্ষার্থীকে আটক করে রাখা হয়েছে এবং তাদের ওপর নিপীড়ন অব্যাহত আছে বলেও শোনা যাচ্ছে। এই ঘটনাকে সারাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর হামলা হিসেবে বিবেচনা না করার কোনো কারণ আছে বলে আমাদের মনে হয় না।

৯.৩ জনপরিসর নিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টা

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা বিধিবন্দোবস্তের মধ্যে কোথায় কোথায় সংস্কার করতে পারলে শিক্ষার উন্নততর পরিবেশ নিশ্চিত করা যায় সেই সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা ও মতামত গঠনের প্রস্তুতি গ্রহণের কাজে যখন আমরা মনোযোগী হয়ে উঠছি, তখনই লক্ষ করা যাচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়-ক্যাম্পাস-গুলোতে নবীনবরণ, বিতর্ক, শিক্ষার্থীদের সুস্থ-স্বাভাবিক আড্ডা-মেলামেশা-চলাচল, মতবিনিময়, নাটক-আবৃত্তি-গান, এমনকি ত্রাণ-তৎপরতা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করার একটি অশুভ প্রচেষ্টা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই নিয়ন্ত্রণ-কর্মপ্রণালীর দৃশ্যমান উদ্যোক্তা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক-প্রক্টরিয়াল কর্মকর্তাদেরকে দেখা গেলেও তাদের সাথে প্রায় সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে পুলিশের উপস্থিতিও লক্ষণীয়। তার সাথে যুক্ত হলো নতুন মাত্রা: সেনাসদস্য ও সেনাক্যাম্প প্রসঙ্গ। এনতুনত্ব সকলের জন্যই নাজুক, স্পর্শকাতর ও বিপজ্জনক।

৯.৪ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনাক্যাম্প আপত্তিকর

জরুরি অবস্থার অজুহাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য যেকোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনা ক্যাম্প বসানোর সিদ্ধান্ত যদি হয়ে থাকে, তবে তা অত্যন্ত আপত্তিকর একটি কাজ। আমাদের অনুজপ্রতিম-সন্তানপ্রতিম শিক্ষার্থীরা যখন নিবিড় অধ্যয়নে এবং নানারকম শিক্ষামূলক, সেবামূলক, ব্যক্তিত্ব-বিকাশধর্মী ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত আছেন, তখন তাদেরকে সার্বক্ষণিক নজরদারির অধীনে আনার চেষ্টা করা, তাঁদের আত্মমর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা এবং ক্যাম্পাসে তাদের চিন্তা ও চলাচলের স্বাধীনতা খর্ব করার পেছনে ইতিবাচক কী কারণ থাকতে পারে তা উপলব্ধি করতে পারা সহজ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীগণ এবং শিক্ষকবৃন্দ 'আইন-শৃঙ্খলা বিনষ্ট' করার কাজে লিপ্ত আছেন এ রকম অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক ধরনের ঢালাও অনুমান প্রণয়ন করার কারণ বোঝা সত্যিই খুব কঠিন। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনা ক্যাম্প বা পুলিশ-ক্যাম্প বসানোর বা বহাল রাখার দরকার কী?

এ কথা না বোঝার কোনো কারণ নেই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-সংস্কৃতি-চিন্তা-ভাব ও স্বাধীনতার অবাধ চর্চার ওপর কোনো রকম বহিঃকর্তৃত্ব কায়েম, ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ করা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিপদগ্রস্ত করারই শামিল। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলে, স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক বুদ্ধিবৃত্তির প্রকৃত মুক্ত চর্চার বিকাশ পুরো সমাজকেই বিকশিত করে শত-সহস্র উপায়ে।

ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখলে এ-ও লক্ষ না করে উপায় নাই যে এরশাদের গণধিকৃত সামরিক শাসনের আমলেই কিন্তু আমাদের স্বাধীন দেশের পাবলিক বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলোতে পুলিশ-ক্যাম্প বসানো হয়েছিল। এবার 'সেনা সমর্থিত' সরকারের তরফে সেনা ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ তারই ধারাবাহিকতা কিনা, এই প্রশ্ন না উঠে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়-পরিবার বরাবরই সরকারী বন্দুকধারী বাহিনীসমূহের এরকম ক্যাম্প স্থাপনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে এসেছে। ভুলে যাওয়া অসম্ভব যে ১৯৮৩ সালের ১৪ই ফেব্র'য়ারিতে সামরিক আইনের বিরুদ্ধে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে পুলিশ-বিডিআর-সেনাবাহিনীর হামলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল, বেশ ক-জন ছাত্র নিহত হয়েছিলেন, অনেকে আহত এবং গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই দিনটি একটি কালো দিন হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছে। তদুপরি, এ কথা সত্য, এরশাদ-আমলে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন লঙ্ঘন করে যখনতখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর চড়াও হওয়া এত সহজ ছিল না। সার্বক্ষণিক পুলিশি নজরদারি এবং প্রহরায় দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-সংস্কৃতি-চিন্তা ও ভাবচর্চার অবাধ, মুক্ত-স্বাধীন বিকাশ ঘটবে এ কথা অবিশ্বাস্য।

৯.৫ সেনাসমর্থিত সরকার এবং সুশীল সমাজের মিডিয়া

এবারের ১১ই জানুয়ারির 'সেনা সমর্থিত' শাসন যে সামরিক শাসন নয়, এটা যে অতীতের সামরিক সরকারগুলোর ধারাবাহিকতা নয়, সে-ব্যাপারে সেনাপ্রধানের নিজের তরফ থেকে এবং শাসকশ্রেণী ও শাসক-কর্তৃপক্ষীয় বুদ্ধিজীবী-মহল থেকে দেশবাসীকে আকারে-ইঙ্গিতে এবং সুস্পষ্টভাবে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। দেশবাসী প্রতিদিনই এই আশ্বাসের সত্যতার সুস্পষ্টতম প্রমাণ প্রত্যক্ষ করতে চান। ভালোভাবে দেশ পরিচালনায় রাজনৈতিক দলগুলার চরম ব্যর্থতা এবং ভয়ঙ্কর কার্যকলাপে অতিষ্ঠ দেশবাসী এই সরকারকে শুরু থেকেই এক প্রকার নৈতিক সমর্থনই দিয়ে আসছে। গত দেড় দশক ধরে 'সুশীল সমাজ' ও মিডিয়ার লাগাতার প্রচার-প্রচারণাও এই নৈতিক সমর্থনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

কিন্তু নানান কারণে এই সরকার ও প্রধান ধারার মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে

জনমনে সংশয়-প্রশ্ন-দ্বিধা-অনাস্থা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, এ-কথা অস্বীকার করা বা গোপন করে রাখা দেশ-জাতি-সরকারের জন্য কোনোক্রমেই মঙ্গলজনক নয়। সকলপ্রকার গণবিরোধী দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে অবস্থানরত মানুষের প্রধান অস্ত্রই কিন্তু অবাধ-মুক্ত প্রচার-মাধ্যম কর্তৃক পরিবেশিত নির্জলা সত্য। মোবাইল ফোন, ইমেইল এবং অন্য নানাভাবে প্রকৃত খবরের চলাচল রোধ করা আজকের যুগে সম্ভব বলে ভাবাটা কারো পক্ষে কি আদৌ সম্ভব? অকপট সত্যভাষণ সমাজের শুভ ও মঙ্গলকেই আরও শক্তিশালী করে তোলে বলেই আমাদের বিশ্বাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনা ঘটার দিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় টিভি-সংবাদের আধেয় যে রকম 'কোমলভাবে' পরিবর্তিত-পরিমার্জিত-সংশোধিত হয়েছে এবং পরদিনের পত্রপত্রিকায় যে রকম 'বিশেষভাবে' ঘটনাটি পরিবেশিত হয়েছে, তা সচেতন পাঠক-দর্শক-মানুষের চোখ এড়ায় নি।

৯.৬ অপ্রকাশ্য আতঙ্ক হয়ে উঠেছেন মহামান্য ভয় স্বয়ং

বিগত সরকারগুলোর শাসনামলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের ওপর নির্বিচারে সরকারী কর্তৃত্ব কায়েম করা হয়েছিল রাজনৈতিক দলের ছাত্র-সংগঠনসহ নানান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দলীয় প্রশাসন-যন্ত্র, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে। এই রাষ্ট্রীয়-সরকারী কর্তৃত্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষকদের প্রকৃত স্বাধীনতা এবং শিক্ষার উদার পরিবেশকে মারাত্মকভাবে কলুষিত করেছিল। এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তৈরি হয়েছিল নীতিহীন, সুবিধাবাদী এবং সরকারী ও বিরোধীদলীয় শাসক-কর্তৃপক্ষের 'কর্মচারীসুলভ' তল্পীবাহক শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারী-দের একটি নির্লজ্জ গোষ্ঠী। শিক্ষকদের লাল-নীল রাজনীতি, ছাত্র-সংগঠনসমূহের হানাহানি-সন্ত্রাস এগুলো সবই কিন্তু সরকারী 'হালুয়া-রুটি' খাওয়ার অবাধ ও সরকারীভাবে উৎসাহিত প্রতিযোগিতা থেকে উৎসারিত হতো। আমরা চাই না বর্তমান সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কোনোরকম সরকারী প্রভাব খাটাক। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেদের মতো করে চলতে দিলে আমাদের সমস্যাগুলো আমরা নিজেরাই সমাধান করতে পারব। বিবেকের সামনে সততার সাথে দাঁড়ালে কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে বিগত বছরের অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বরের অচিন্ত্যনীয় প্রকাশ্য সন্ত্রাসের অবসান ঘটলেও ১১ই জানুয়ারি পরবর্তী বাংলাদেশে অপ্রকাশ্য আতঙ্ক হয়ে উঠেছেন মহামান্য ভয় স্বয়ং। দুর্নীতিবাজ গডফাদাররা আতঙ্কে কাঁপুক, আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু সারা দেশের সকলের জন্য মহামান্য ভয়ের ঢালাও প্রসার আমরা – নেহায়েৎ ভীতু মানুষেরা – অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করি। মানুষ হিসেবে সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য

অন্য কোনো পথ আমাদের সামনে খোলা নাই।

রাবি: ২১শে আগস্ট ২০০৭। প্রকাশ: প্রবাসী বাঙালিদের অনলাইন পত্রিকা *ইউকেবেঙ্গলি*, লন্ডন, রাবি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ছোটকাগজ *বহতা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১৪ই এপ্রিল ২০০৮।

দশ

অক্টোবর-মহাসংকট: মাৎস্যন্যায়-পর্ব

মঈনের ঘোড়াগুলি

হাজার হাজার বছর ধরে কেন্দ্রীভূত সশস্ত্র কর্তৃত্ব জনসাধারণকে উৎপাদন-উপকরণের সহায়-সম্পদের মালিকানা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে অস্ত্রের জোরে। ঐ একই সশস্ত্র শক্তির অপর ডানা বিদ্যাজীবীরা তাকে বিদ্যাবঞ্চিত করে রেখেছে অস্ত্রের সঙ্গে-সঙ্গে শাস্ত্রেরও জোরে। তার পরও, দুনিয়াজোড়া মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচার অজস্র আত্মত্যাগী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলে কর্তা-শাসকেরা এক পা এক পা করে পিছিয়েছে, বেড়েছে মানুষের স্বাধীনতার সীমানা। শাসকেরা আইন জারি করে একের পর এক অধিকার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে মানুষের। দিতে হয়েছে মানুষের ভোটাধিকার, এমন-কি গরিব মানুষের, নারীর এবং কালো মানুষেরও সর্বজনীন ভোটাধিকার: এক ব্যক্তির এক ভোট। শুধু আইনে হলেও, স্রেফ মুখে হলেও, মেনে নিতে হয়েছে যে জনগণই দেশের মালিক, তাঁদেরই সম্মতিতে, তাঁদেরই প্রতিনিধিরা দেশ চালাবে। কিন্তু একদিকে অর্থনৈতিক-বৈষয়িক বৈষম্য, অন্যদিকে সুদীর্ঘকালের কর্তৃত্বপরায়ণ ধ্যানধারণা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলো মানুষকে তাঁর প্রকৃত প্রতিনিধি নির্বাচনের সক্ষমতা থেকে দূরে রেখেছে, এবং কোনো একটা উচ্চতর সংস্থায় তাঁর প্রতিনিধি তাঁর হয়ে ঠিকমতো কাজ না করলে সেই প্রতিনিধিকে ঘাড় ধরে ফেরত নিয়ে এসে অন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করার অধিকার তাঁর এখনও অর্জিত হয় নি। নির্বাচন পরিণত হয়েছে কতিপয় নব্য রাজনৈতিক জমিদারদের ও মহা-

বড়লোকদের বাণিজ্য-সঙ্ঘগুলোর এবং এই উভয় তরফের ঔপনিবেশিক প্রভুদের টাকা-পেশি-মিডিয়ার কামড়াকামড়িতে। পার্লামেণ্ট সত্যি-সত্যি পরিণত হয়েছে 'শুয়োরের খোঁয়াড়ে', যে 'শুয়োরেরা' সারাদেশকেই নিজেদের 'খোঁয়াড়' বানিয়ে ফেলার উপক্রম করেছিল। এরা বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে সারাদেশের সমস্তকিছুকে লুটের মাল ধরে নিয়ে তার ভাগাভাগির উপযুক্ত বিধি-বন্দোবস্ত দাঁড় করাতে না পেরে প্রকাশ্য রাজপথে খুনোখুনি শুরু করে দেয়, আর মিডিয়া তা 'লাইভ' সম্প্রচার করতে থাকে। এই জীবন্ত সংকটেরই অপর নাম ২০০৬ সালের অক্টোবর-মহাসংকট: মাৎস্যন্যায়-পর্ব।

এখানে মাৎস্যন্যায় আর নৈরাজ্যর পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য, কেননা কথায়-লেখায়-মিডিয়ায় ডান-বাম নির্বিশেষে প্রায় সমস্ত মহল স্রেফ অজ্ঞতাজনিত কারণে আলোচ্য মাৎস্যন্যায়-পর্বকে নৈরাজ্য, অরাজকতা প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করেছে। নৈরাজ্য কিন্তু অতিশয় উন্নত নীতিবোধসমৃদ্ধ উন্নত মানবিক একটা সমাজ গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত একটা বিষয়। সর্বজনগ্রাহ্য কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অভাবে পৃথক পৃথক রাজশক্তি বা রাজনৈতিক দলসমূহের 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতির সশস্ত্র অভি-প্রকাশ-জনিত ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা হলো মাৎস্যন্যায়। 'রাজা নাই, অথচ সকলেই রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের দাবিদার। বাহুবলই একমাত্র বল, সমস্ত দেশময় উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খল শক্তির উন্মত্ততা; এমন যখন হয় দেশের অবস্থা, প্রাচীন অর্থশাস্ত্রে তাহাকেই বলে মাৎস্যন্যায়, অর্থাৎ বৃহৎ মৎস্য কর্তৃক ক্ষুদ্র মৎস্য গ্রাসের যে ন্যায় বা যুক্তি সেই ন্যায়ের অপ্রতিহত রাজত্ব!' (নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০২ বঙ্গাব্দ: ৩৮০) ২০০৬ সালের ২৮শে অক্টোবরকে ঘিরে ঠিক এরকম অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের দেশের ইতিহাসে আরও একবার, পাল আমলের আগে আগে, ৬৫০–৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এরকম মাৎস্যন্যায়-পরিস্থিতি বিরাজ করেছিল। সে-সময় সর্বসম্মতভাবে গণেশদেবকে রাজা নির্বাচনের মাধ্যমে সেই অবস্থার নিরসন ঘটে। অন্যদিকে, নৈরাজ্য তথা নৈরাজ্যবাদের নামে মেলা ভালোমন্দ-হাবিজাবি জিনিসের চল এখানে-সেখানে থাকলেও এর মূল সামাজিক আন্দোলনের ধারাটি ইউরোপে দীর্ঘকাল যাবৎ 'মুক্তিপরায়ণ সমাজতন্ত্র' 'মুক্তিমুখিন সাম্যবাদ' প্রভৃতি নামে পরিচিত। আমাদের দেশের বলশেভিক-ঘরানার কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতন্ত্রীরা স্বাধীন সমাজ-তন্ত্রের ঐ দুর্দান্ত ধারাটির ইতিহাস ও সাহিত্যের সাথে পরিচিত নয় বললেই চলে। কেননা ১৯১৭ সালে রুশ জনগণের মহান অক্টোবর বিপ্লবের পর স্বৈরতন্ত্রী বলশেভিকরা জনগণের ওপর রক্তাক্ত দমনপীড়ণ চালানোর মাধ্যমে নিরঙ্কুশ হুকুম-দারির রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার পর থেকে রুশ সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের জগৎজোড়া প্রচারণা ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রী অর্থে বলশেভিকদেরকেই তুলে

ধরেছে। যেমন ধরুন, ১৯৩৬ সালে স্পেনের সমাজতন্ত্রীদের অসাধারণ মুক্তিপরায়ণ বিপ্লবের কথা বলতে গেলে আমাদের কানেও আসে নি। খুব বেশি লোক জানেন না, ১৯৬৮ সালের 'প্যারিস-বসন্তের' ছাত্র-শ্রমিক-বিক্ষোভের পেছনেও ছিল মুক্তি-পরায়ণ সমাজতন্ত্রীদের নানান ধারার মুক্ত-স্বাধীন তৎপরতা। এটাও আমাদের জানা আছে কিনা সন্দেহ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবাদী তৎপরতার সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও ধারালো বুদ্ধিবৃত্তিক কণ্ঠস্বর, অতুলনীয় ভাষাতত্ত্ববিদ নোম চমস্কি আজকের দুনিয়ায় মুক্তিপরায়ণ সমাজতন্ত্রের প্রধানতম প্রচারকদের একজন।

তো প্রকৃতপক্ষে নৈরাজ্যবাদ হচ্ছে স্বাধীন সমাজতন্ত্র: যাবতীয় রাজা-রাজড়া-রাজতন্ত্র তথা সমস্ত প্রকার শাসকগোষ্ঠীকে বিদায় করে দিয়ে সুসংগঠিত জনগণের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব কায়েমের পথে অত্যন্ত সুবিন্যস্ত পরিচালন-ব্যবস্থার মাধ্যমে গোটা দেশকে অবাধ-মুক্ত-সৃজনশীল আত্মকর্তৃত্বের সুসংগঠিত কাঠামোসমূহের অধীনে নিয়ে আসা। কিন্তু সেই শিল্প-বিপ্লবের সময়কাল থেকেই, যখন থেকে শ্রমিকদের স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো গড়ে উঠছে তখন থেকে এখন পর্যন্ত, নৈরাজ্যকে বিশৃঙ্খল, গণ্ডগোল, মাৎস্যন্যায় প্রভৃতি অর্থে চালানোর লাগাতার প্রচারণা-প্রচেষ্টা শাসকশ্রেণীগুলোর তরফে চলে আসছে। এজন্যই নৈরাজ্যবাদের অন্যতম আদি প্রবক্তা প্রুঁধো বলতেন, 'নৈরাজ্য মানে নিয়ম, আর শাসক-সরকার মানে গণ্ডগোল'।

যাক। সপ্তম-অষ্টম শতকের মতো চরম ভয়ঙ্করভাবে রাষ্ট্র ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার আগেই দেশের সেনাবাহিনী এগিয়ে এলো। কিন্তু উন্মুক্ত আলাপ-আলোচনা সংলাপের মাধ্যমে সর্বসম্মতভাবে 'গণেশরাজা' নির্বাচনের পথে না গিয়ে বস্তুত বন্দুকের মুখে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ওরফে পুতুলের পুতুল-রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনকে দিয়েই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করালো, প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে তাঁকে আর তাঁর পারিষদ উপদেষ্টা-বর্গকে পদত্যাগে বাধ্য করল, নতুন উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করালো এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদের নামে রাজনৈতিক দলগুলোর দেউলিয়া নেতাদের ও তাদের সহযোগী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর দমন-অভিযান পরিচালনা করা শুরু করল। 'আন্তর্জাতিক মহল' তথা পরাশক্তিসমূহ এই পরিবর্তনকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো, তথাকথিত সুশীল সমাজ ও বহুজাতিক বাণিজ্য-সঙ্ঘগুলোর স্থানীয় কর্পোরেট-এজেন্টদের বাণিজ্যিক মিডিয়ার উল্লাসও গোপন থাকল না। ব্যাপকভাবে প্রচার করে বলা হতে লাগল, দেশের মানুষের ১০০ ভাগ সমর্থন এই সরকারের পক্ষে আছে। বাস্তবে সেই সমর্থনের প্রকাশস্বরূপ শত শত হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষের রাস্তায় জমায়েত হওয়ার বিন্দুমাত্র কোনো নমুনাও দেখা যায় নি। আবার একথাও ঠিক, এই সরকারের বিরুদ্ধেও তাৎক্ষণিকভাবে

কোনো প্রতিবাদও তাঁরা প্রদর্শন করেন নি।

অক্টোবর-মহাসংকটের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যই এইটা: জনগণের নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান। শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক দলগোষ্ঠীগুলো নিজেদের মধ্যে মারামারি চূড়ান্ততম পর্যায়ে নিয়ে গেছে, শাসকশ্রেণীরই নব্য ধনতান্ত্রিক প্রতিনিধি হিসেবে 'সুশীল সমাজ' নাম ধারণকারী এনজিও- আমলা- ব্যবসায়ী- মিডিয়া- আর আইনজীবী-এলিটরা তো কমপক্ষে ১৫-১৬ বছরের নিরলস, নিবিড় ও সাহসী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ১১ই জানুয়ারি টাইপের পরিবর্তনে মানুষ যেন হোঁচট না খান সেরকম একটা মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি নির্মাণ করেছেন, শাসকশ্রেণীর প্রচ্ছন্ন অংশ হিসেবেই সামরিক বাহিনী হস্তক্ষেপ করেছে, আন্তর্জাতিক শাসকশ্রেণীর মুরুব্বিরাও তাতে আড়াল থেকে হলেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

এই দীর্ঘমেয়াদী সুবিস্তৃত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার নিকট থেকে সতর্ক দূরত্ব রচনা করার কৌশলগত যে অবস্থান গণমানুষ গ্রহণ করেছে, সেটাই বিশেষ করে ২০০৬-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে ২০০৭-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়কালের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আর এখানেই আমাদের দুর্বল গণতন্ত্রের যাবতীয় মুশকিলের বীজ নিহিত। শাসকশ্রেণী এবং তাদের রাজনীতি সম্পর্কে গণমানুষের এই নির্লিপ্ততা একদিকে যেমন সুচিন্তিত, অন্যদিকে তেমনি দীর্ঘদিনের প্রশিক্ষণের ফলও বটে। এর কারণ ও প্রেক্ষাপট আলোচনা করা এখানে সম্ভব হবে না। কিন্তু এটুকু এমনিতেই বোধগম্য, রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগ-বাটোয়ারা করার যাবতীয় কর্মকাণ্ড থেকেই জনগণ নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, কিংবা পুরো প্রক্রিয়াটিকেই হয়ত তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। অথচ বিকল্প শক্তি হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তোলার উদ্যোগ তাঁরা নেন নি। যদি নিতেন, বাংলাদেশের ইতিহাস অন্যরকম হতো। আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আগামী দিনে জনগণের সক্রিয়তার ওপরই।

রাবি: জানুয়ারি ২০০৮। প্রকাশ: প্রবাসী বাঙালিদের অনলাইন পত্রিকা *ইউকেবেঙ্গলি*, লন্ডন, ১৩ই জুন ২০০৮।

আইনের শাসন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ

ইন্টারনেট থেকে

ইউকেবেঙ্গলি-সম্পাদকের নোট: গত আগস্টে সেনাবাহিনীর হাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে গড়ে ওঠা আন্দোলনে যুক্ত হবার কারনে কয়েকজন সহকর্মী-সহ জেইলে যেতে হয়েছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং প্রাক্তন চেয়ারপার্সন সেলিম রেজা নিউটনকে। কয়েক মাস কারাভোগের পরে নানা ধরণের রাষ্ট্রিক সন্ত্রাসের ঝক্কি পেরিয়ে সহকর্মীদের সাথে মুক্তি লাভ করেন তিনি। ক্যাম্পাসে ফিরে এসে জেইল-জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে নিজের ভাবনাকে মিলিয়ে লিখতে শুরু করেন সেলিম রেজা নিউটন। ইউকেবেঙ্গলি প্রকাশ করতে শুরু করেছে সেলিম রেজা নিউটনের জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরবর্তী পর্যায়ের লেখাগুলো।

লন্ডন: ২৫শে এপ্রিল ২০০৮

১১.১ কানাকে হাইকোর্ট দেখানো

অন্ধকে হাইকোর্ট দেখানো এ-দেশের মানুষের মুখের বুলি হিসেবে পুরোনো। কতো

অজস্র মানুষের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা এ-বুলির ভিতরে জমা আছে তা অনুভব করা সম্ভব। অন্ধকে হাইকোর্ট দেখানো কিন্তু আইনের শাসন প্রতিষ্ঠারই নামান্তর এবং বলা বাহুল্য নয়, আমাদের দেশে আইনের শাসন সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহান বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী। তাঁরা বিতাড়িত হওয়ার পর থেকে ক্রমাগতভাবে এখানে আইনের শাসন ভেঙে পড়তে থাকে। অবশেষে নয়া ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের অনুমোদনপুষ্ট আমলা-ব্যবসায়ী-সামরিক শাসকগোষ্ঠীর নেতৃত্বে বিগত ১লা জানুয়ারি ২০০৭ সাল থেকে বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে আমরা শুনে আসছি। শোনা কথা হলেও কথাটা সত্য। কোটিপতি থেকে শুরু করে নিঃস্ব ভিক্ষুক পর্যন্ত সারাদেশের লোক সেটা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তো বটেই, শিক্ষকরাও বাদ যান নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কানা ছাত্র-শিক্ষকদের রীতিমতো হাইকোর্ট দেখিয়েছে এই সরকার। কিন্তু আমরা শিক্ষকেরা সরকারকে আক্ষরিক অর্থে হাইকোর্ট দেখানোর আগেই মানুষের দাবি এবং গণ-অনুভূতির কাছে নতি স্বীকার করে সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাজাপ্রাপ্ত চার জন শিক্ষককে মুক্তি দিয়েছে। সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল দুই সপ্তাহের ভেতরে ঢাবি'র চার শিক্ষককেও মুক্তি দেওয়া হবে। ছাত্রদেরকেও মুক্তি দেওয়ার কথা ছিল। সরকার কথা রাখে নি। সময়ক্ষেপন করেছে। সরকারের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং শিক্ষক সমিতির নেতাদের ঠিক কোন কোন দিক থেকে আলোচনা চলছিল তার বিস্তারিত আমি জানি না। আলোচনা ভেঙেই বা গেল কেন তাও অজানা।

কিন্তু আমি যেটা জানি, সারাদেশের লোক এরই মধ্যে বুঝে ফেলেছে, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আনা মারাত্মক অভিযোগগুলো স্রেফ বানানো কেচ্ছা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণের কোনো পরিকল্পনা কোনো মহলে আদৌ ছিল কি না এবং সেই প্রশ্ন আড়াল করার আগ্রহেই তাড়াহুড়া করে ঐসব কেচ্ছা প্রচার করা হয়েছিল কিনা তা এখনও কেউ অনুসন্ধান করেছেন কিনা জানি না। কিন্তু বাস্তবত, নৈতিক প্রশ্নে নিদারুণ লেজেগোবরে মাখামাখি করেই সরকার মুক্তি দিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকেও যে মুক্তি দিতেই হবে, সেটাও স্পষ্ট। শিক্ষকদের দিকে অতি-মনোযোগ দিতে গিয়ে ঢাবি-রাবি'র শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং রাবি'র একজন ড্রাইভারের মুক্তির কথা সরকার যদি ভুলে যেতে চায়, তাহলে যে সমস্যা থেকেই যাবে, সে-কথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নির্যাতনবিরোধী-কর্তৃত্ববিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রতিদিনই মনে করিয়ে দিয়ে চলেছে।

তারপরও, মুক্তিদান আর মামলা চুকে যাওয়াতেই সব ফুরাবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষা এবং শিক্ষার্থীদেরকে নির্যাতন করার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে টাকা ঢেলে ছাত্র খেপানো এবং সহিংসতায় মদদ জোগানোর মতো অলীক-আশ্চর্য অভিযোগ আনা এবং তাদেরকে গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও কারাভোগ করানোর নজিরবিহীন ঘটনা ঘটানোটা রাষ্ট্র-ব্যবসায়ীদের পক্ষে আদৌ সম্ভব হলো কীভাবে, সেটা তো আমাদেরকে বুঝতে হবে। সেজন্য বহুলনন্দিত আইনের শাসনের আসল অন্তঃসার, কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্রী হয়ে ওঠার প্রবণতা এবং রাষ্ট্রীয়-কর্পোরেট যৌথ প্রচারণা-প্রকৌশলের ঐক্য ও টানাপোড়েন, এক কথায় জরুরি জমানার জরুরি বাক্‌ধারাসমূহ (ডিসকোর্স) বুঝে দেখার প্রয়াস জরুরি।

১১.২ আইনের শাসন কী বস্তু?

একেবারে প্রাথমিক অর্থে, আইনের শাসন মানে কিন্তু সবার জন্য ভালোভাবে খাওয়া-পরার, যার যার পছন্দমতো জীবিকা ও সৃষ্টিশীল কাজের এবং প্রত্যেক মানুষের অফুরন্ত সম্ভাবনার বিকাশের জন্য মানানসই মানবিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো গড়ে তোলা নয়; আর সামাজিক পরিসরে সমস্ত মানুষের ব্যক্তিগত ও যৌথ আত্মকর্তৃত্বের আকার-আয়োজনের প্রশ্ন তোলা তো শাসক সমাজের আলোকিত-দীপায়িত লোকদের কাছে নিতান্তই অবান্তর।

আদতে আইনের শাসন কায়েম করা মানে হচ্ছে চির-মহান শাসকদের কথা শুনতে, তাঁদের নির্দেশিত পথে চলতে দেশের নাগরিকদেরকে বাধ্য করা এবং যাঁরা অবাধ্য হবেন তাঁদের ওপর বলপ্রয়োগ করার পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত কায়েম করা। উদ্দেশ্য নিঃশর্তভাবে বিশ্বব্যাঙ্ক-আইএমএফের হুকুম মেনে চলার জন্য, তেল-গ্যাসের বহুজাতিক কর্পোরেশনসমূহ আর এন্টারটেইনমেন্ট- মিডিয়া- ও গ্ল্যামার-ইন্ডাস্ট্রির অবাধ লুণ্ঠন-বিচরণের ক্ষেত্র তথা বাজারের বিধিকে নিয়তি হিসেবে মেনে নিয়ে গোলামির সংস্কৃতিকে প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং বিশ্বজোড়া ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের দালালি করার জন্য জনসাধারণকে বাধ্য করার আইনসম্মত পরিবেশ প্রস্তুত করা। অস্ট্রেলিয়া থেকে বন্ধু বখতিয়ারের (রাবি'র নৃবিজ্ঞানের শিক্ষক) ইমেইল মোতাবেক, উন্নত দেশের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একে 'নিও লিবারাল অ্যান্টিবায়োটিক'ও বলা যায়।

এই ওষুধের প্রধানতম কাজ হচ্ছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, সত্যিকারের ভিন্নমত আর স্বাধীন চিন্তার ভাইরাসগুলোকে নির্মূল করা। তো, এই কাজ পুরোনো জমানার ঘুষখোর গরীব পুলিশবাহিনী আর দূরদৃষ্টিহীন দেউলিয়া রাজনীতিবিদদের দিয়ে বাংলাদেশে হচ্ছিল না। তাই বিধিসম্মত রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের কার্যকর বন্দোবস্ত

বানানোর জরুরি প্রয়োজন হাজির হয়। এই প্রয়োজনের স্বপক্ষের প্রচার-প্রচারণা চলেছে গত দেড় যুগ ধরে, তথাকথিত সুশীল সমাজের বুদ্ধিজীবীবৃন্দ ও মিডিয়ার নিবিড় নিরলস সাহসী ও সৃষ্টিশীল পরিশ্রমের মাধ্যমে। ফলে সামন্তযুগের ভুতের ঘাড়ে চড়ে ঘুরে-বেড়ানো গণবিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলোর দেউলিয়াত্বের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের উপযুক্ত উপলক্ষ পাওয়া মাত্র আইন এবং রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব নবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সর্বাত্মক স্বৈরাচারী একটা চেহারা নিতে শুরু করে। তার বলপ্রয়োগের সংস্থাগুলো আরও নিখুঁতভাবে নিপীড়ক হয়ে উঠতে থাকে। এই প্রক্রিয়াটিই জরুরি আইন নাম ধারণ করে ১১ই জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে সিংহাসনে আরোহন করে। বলে রাখা দরকার, ইতিহাসে দেখা গেছে, রাজশক্তিসমূহের বা শাসকগোষ্ঠীসমূহের বোঝাপড়া ভেঙে যাওয়া জনিত প্রতিটা মাৎস্যন্যায়ের পরই রাষ্ট্রের জুলুম-যন্ত্র তথা 'জয়ী' শাসকগোষ্ঠী আগের চাইতে বেশি কঠোর ও নিপীড়ক হয়ে ওঠার সুযোগ পায়।

আইনের বলপ্রয়োগ মানে প্রধানত আদালত রিম্যান্ড জেলজুলুম ক্রসফায়ার এনকাউন্টার এবং প্রকাশ্য দিবালোকে বা আধা-প্রকাশ্য রাত্রিলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে তথা যথোপযুক্ত লোকজনকে পুলিশ বা সামরিক-আধাসামরিক বাহিনী দিয়ে লাঠিপেটা করানো। একই সাথে 'মানুষকে প্রত্যাশিত সেবাদান হবে পুলিশের কর্মকাণ্ডের ভিত্তি' (৮ই জানুয়ারির ২০০৮ তারিখে পুলিশ-সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য) জাতীয় বক্তৃতা করাটাও আইনের সুশীল বাচনভঙ্গিরই আনুষ্ঠানিক অঙ্গ বটে। সরকারি বন্দুকধারী লোকজনের, মানে র‍্যাব-পুলিশ প্রভৃতি সংস্থার, বন্দুকের সেবাদান যে কতোটা নির্মম ও ভয়ঙ্কর হতে পারে, ভুক্তভোগী না হওয়া পর্যন্ত শাসক-পরিবারের সদস্যরা তা বুঝতে পারার মতো অনুভূতিশক্তির অধিকারী এখনও আছেন কি? নিপীড়ক রাষ্ট্রের পক্ষে বাম হাতে বন্দুক নিয়ে ডান হাতে সেবা দিতে যাওয়াটা যে নিতান্তই নির্মম ক্যারিকেচার, সেটা বুঝা কি খুবই কঠিন? নিরস্ত্র জনগণের সামনে ভয়ঙ্কর সব মারণাস্ত্রের অধিকারী একদল সংগঠিত মানুষ এসে যদি বলে, আমরা তোমাদেরকে উদ্ধার করতে এসেছি, অভিজ্ঞতাটা তাহলে সুখকর হয় না।

দেশী-বিদেশী ইতিহাস তা-ই বলে। বাস্তবে, বহুজাতিক কর্পোরেশনসমূহ আর ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে বলপ্রয়োগের নানান সব বন্দোবস্ত সাবলীল খরচ চালু করতে পারলে আপনি কার্যকর রাষ্ট্র, আর আপনার সরকার সুশাসনের সরকার, না পারলে আপনি ব্যর্থ রাষ্ট্র। আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জামাত-জাপার ক্যাডাররা মানুষ খুন করার বন্দোবস্ত গড়ে তুললে সেটা দুর্বৃত্তের শাসন, আর পুলিশ-র‍্যাব-কোবরা-চিতার রাষ্ট্রীয় 'ক্যাডার'দের মাধ্যমে বিনাবিচারে খুনের বন্দোবস্ত গড়ে

তোলা হলে, সেটা আইনের শাসন।

১১.৩ আইনের শাসনের মূর্তিমান সীমাবদ্ধতা

কিন্তু আইনের জোরে, জেলজুলুম-বন্দুকের জোরে 'অপরাধ' দমন করা যায় না। যে দুর্নীতির কথা বলে জরুরি আইন জারি করা হয়েছে, জেল-জুলুম-হুকুমদারির সমস্ত হাতিয়ার ব্যবহার করেও সেই দুর্নীতিকে বাগে আনা যায় নি। দুর্নীতির প্রশ্নে সরকার প্রশ্নাতীত সুনীতির পরিচয়ও রাখতে পারে নি। অপছন্দের দুর্নীতিবাজকে ধরা হয়েছে, পছন্দের দুর্নীতিবাজকে বাইরে রাখা হয়েছে। উপদেষ্টাদের নিজেদেরই সম্পত্তির হিসাব দেওয়ার প্রশ্নটিকে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। দুর্নীতিবাজদের তালিকা কাটাছাঁটা করতে হয়েছে, কাউকে-কাউকে ছেড়ে দিতে হয়েছে, ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে আর কাউকে ধরা হবে না বলে কথা দিতে হয়েছে ... একেবারে নাকানিচুবানি অবস্থা। বলপ্রয়োগের বাড়াবাড়িতে উল্টা বাজার-হাট দোকানপাট আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা-বাণিজ্য রাজনীতি-প্রতিষ্ঠান ছারখার হয়ে গেছে।

বোঝা গেছে, সমাজব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়া দুর্নীতি দূর করা সম্ভব না। যে গণতন্ত্রহীনতার কথা বলে জরুরি আইনের সরকার বসানো হয়েছে, সে সরকারই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলে নি; পাঁচ উপদেষ্টার পদত্যাগের কোনো ব্যাখ্যা সরকার দেয় নি; যে সেনাসদস্যটি ঢাবি-শিক্ষার্থীটিকে প্রহার করেছিল, তার কী বিচার হলো, জানা যায় নি; সেনা হেফাজতে নিহত মধুপুরের আদিবাসী নেতা চলেশ রিছিলের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার খবর মিডিয়ায় ছাপানো যায় নি; আরও কতো নিরাপরাধ মানুষ হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে, তার কোনো হদিস নেই; স্বচ্ছতার ব্যাপক অভাব থেকে গেছে; প্রধান উপদেষ্টা ও সেনাপ্রধানের দ্বৈত ক্ষমতাকেন্দ্র কখনও কখনও দৃশ্যমানভাবে সমান্তরাল হয়ে উঠেছে; প্রশ্নও উঠেছে, সদুত্তর মেলে নি। পুরোনো যুগের হাসিনা খালেদার মতোই প্রধান উপদেষ্টা দেদারসে ফিতা কেটেছেন, এটা-সেটা উদ্বোধন করেছেন, ক্যামেরা-ত্রাণ চালিয়েছেন। একই কাজ সেনাপ্রধানও চালিয়ে গেছেন, যাচ্ছেন সমানে। টিভি চ্যানেলগুলোকে দিয়ে উন্নতিমূলক প্রচারণা-ভিডিও চালানোও বাদ যায় নি। এ-রকম আরও অনেক দৃশ্য-কাঠামো সেই পুরোনো জমানার ছাঁচকে মনে করিয়ে দিয়েছে।

মিডিয়া স্বাধীন থাকে নি। টেলিফোন অ্যাডভাইস, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত সেন্সরশিপ এবং স্বারোপিত সেন্সরশিপের ঘটনা ঘটেছে অনেক, সাংবাদিকদের আটক করা হয়েছে, আটক করে নির্যাতন করা হয়েছে, মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে, কার্ফুর মধ্যে সাংবাদিকদের পরিচয়পত্র দেখে-দেখে পিটানো হয়েছে। শিক্ষকদেরকে গ্রেপ্তার

করার খবর পর্যন্ত পত্রিকায় এসেছে দু-আড়াইদিন পর, শিক্ষকদের মুক্তি দাবি করে মার্কিন সিনেটর এডোয়ার্ড কেনেডীর বিবৃতি 'প্রথম আলো'য় ছাপা হয়েছে টিভিতে প্রচারেরও সপ্তাহখানেক পর। সেন্সরশিপ-যে হচ্ছে, মিডিয়া সে কথা ঠিকমতো প্রকাশ পর্যন্ত করতে পারে নি, কিংবা ইচ্ছা করে নি। ভয় যেমন ছিল, তেমনি এ-সরকারের সাথে মহাজনী মিডিয়ার স্বার্থ ও এজেন্ডার শ্রেণীগত ঐক্যও ছিল। ভিতরে-ভিতরে দেন-দরবার সত্ত্বেও সেই ঐক্যে বেশিরভাগ সময় কাজ হয় নি।

১১.৪ রাষ্ট্র, বলপ্রয়োগ, দীক্ষায়ন-প্রকৌশল

রাষ্ট্রশক্তি যখন সর্বাত্মক দমনমূলক চেহারা নিতে থাকে, তখন সে তার নিজ শ্রেণীর লোকদেরকেও শিকারে পরিণত করতে পারে। বহুলকথিত শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র মানে যেমন প্রত্যেক শ্রমিকের রাষ্ট্র না, বিরলকথিত বুর্জোয়া রাষ্ট্র মানেও তেমনি প্রত্যেক বড়লোকের রাষ্ট্র না। কর্তৃত্বপরায়ণ আমলাতান্ত্রিক কাঠামোসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের খোদ পরিচালকবর্গ বা ম্যানেজার-গোষ্ঠী যে কোনো শ্রেণী-গোষ্ঠী-দল-ধর্ম-জাতির জন্য নিপীড়ক হয়ে উঠতে পারে। প্রসঙ্গত এটা এমন এক সত্য ইতিহাসে যার বহু প্রমাণ আছে, অথচ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, বুর্জোয়া উদারনীতিবাদী এবং অন্যান্য কর্তৃত্বপরায়ণ দলগোষ্ঠীগুলো তা উপলব্ধি করে বললেই চলে। এ জন্য, শুধু ভালো মানুষদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিলেই রাষ্ট্র ভালো হয়ে যায় না, রাষ্ট্রের কর্তৃত্বপরায়ণ কাঠামোর একেবারে আমূল পরিবর্তন ছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বির্মাণের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া সত্যিকারের গণমুখীনতা অর্জন করতে পারে না।

জনগণের স্বাধীনতার পরিসর বাড়াতে গেলে, অনিবার্যভাবে তাই আসে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক শক্তিকে ক্রমশ দুর্বল করার প্রশ্ন এবং জনগণের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সমাজ-সঙ্ঘ-শক্তিকে ক্রমাগতভাবে প্রসারিত করার এযাবৎ অনালোচিত প্রশ্ন। কেনো না, জরুরি হোক, আর শিথিল হোক, অল্পকিছু লোকের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলেই স্বৈরতন্ত্রী জুলুমের আশঙ্কা দেখা দেয়। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় কিনা বলা মুশকিল, কিন্তু সুন্দর নাম দিয়ে শাসন-পীড়নের বাস্তবতা ঢাকা যায় না। খেয়াল করা জরুরি যে, আইনের শাসন মানেও কিন্তু ঐ শাসনই। সুশাসকও শাসক, দুঃশাসকও শাসক।

বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক এবং সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান দুটিতে, শাসন মানে হলো 'দমন' 'গ্রহ' 'অত্যাচার' 'তিরস্কার' শাস্তিদান' 'ভর্ৎসনা' 'নির্দেশ' 'আজ্ঞা' 'বিধি' ইত্যাদি। সুব্যবস্থার সাথে প্রতিপালন, বা 'পরিচালনা' জাতীয় দুই-একটা কথাও অভিধানে (এবং শাসকদের লোক-শোনানো বুলিতে) আছে বটে। কিন্তু কে না জানে, কোনো শাসকই বলে না যে, আমি তোমাদের দমন এবং অত্যাচার

করার জন্য এসেছি, সুতরাং বাঁচতে চাইলে সুবোধ বালকের মতো একান্ত বাধ্যানুগত থাকতে হবে। (ঔপবেশিক ধাঁচের আবেদনপত্রগুলোর 'ইতি আপনার একান্ত বাধ্যানুগত' জাতীয় শব্দরাজি স্মরণ করে দেখুন।) সবাই বরঞ্চ সুব্যবস্থার সাথে প্রতিপালন, তথা সুশাসনের বুলিই শোনায়, কিন্তু বাস্তবে যা করে তার নাম শাসন।

আসলে হাজার বছরের নিরলস চেষ্টায় গানে কবিতায় শাস্ত্রে পীড়নে শাসনের ধারণাটিকে পরাজিত মানুষের অভ্যাসের মজ্জায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'শাসন করা তারই সাজে আদর করে যে', 'পেটে খেলে পিঠে সয়', 'ভাত দেওয়ার ভাতার না, কিল মারার গোঁসাই' এসব আদতে বস্তাপচা কিন্তু দাসত্ব-মনোবিকারগ্রস্তদের দ্বারা অভিনন্দিত প্রবাদ-প্রবচন শাসনের সুপ্রাচীন ধারণার অনুমোদন দেয়।

এক অর্থে, পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাস তো একদিকে কেন্দ্রীভূত শাসন-কর্তৃত্ব, অন্যদিকে গণদাসত্বের ইতিহাসও বটে। এ-ইতিহাস জুড়ে আপাত বিচারে কর্তৃত্বেরই জয়জয়কার হয়েছে। ফলে শাসকশ্রেণী দিবারাত্রি যখন আইনের শাসনের বুলি প্রচার করে, তখন খুব কম লোকেরই খটকা লাগে, সব প্রচারণাই মনে হয় স্বাভাবিক। ফলত পদ্মা নদী এবং তার পরিপার্শ্বস্থ নিসর্গে ঢাকা বিশাল জেলখানা দেখেও কারও খটকা লাগে না, মনে হয় যেন পদ্মা নদীর মতোই এটাও কোনো প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠান। এটা দীর্ঘদিনের প্রশিক্ষণ তথা শাসক শ্রেণীর দীক্ষায়ণ-প্রকৌশলের পরিণাম।

১১.৫ জুলুম, প্রতিরোধ এবং বিদ্রোহ

কিন্তু মানুষের ইতিহাস আদতে প্রতিরোধের ইতিহাসও বটে। বোধগম্য কারণে সে-ইতিহাস খুব একটা রচিতও হয়, প্রচারিতও হয় নি। *বাঙালীর ইতিহাসঃ আদিপর্ব* গ্রন্থেও দেখবেন জেলজুলুম কয়েদ-কারাগার-নিপীড়ন নির্যাতন-পরাধীনতা ও সে-সবের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধের ইতিহাস নিয়ে কোনো কথা নাই বললেই চলে, এ-বিষয়ে আলাদা একটা অধ্যায় থাকা তো নিছক কষ্ট-কল্পনা। তথাচ মানুষের নিরন্তর প্রতিরোধ জারি আছে। সেগুলোকে বিদ্রোহ নামে ডাকা হয় না, যেন সেগুলো 'আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি' মাত্র।

গত এক বছরের জরুরি অবস্থায় দমবন্ধ-করা মহামান্য ভয়ের রাজত্বেও কৃষকেরা শ্রমিকেরা গার্মেন্টস-কর্মীরা ছাত্রেরা শিক্ষকেরা প্রতিরোধ-আন্দোলনের আগুনে স্বাধীনতার শিখা সমুন্নত রেখেছেন। মানুষের অন্তরাত্মা এই শিক্ষা কখনও ভোলেনি, মুখে যদিও সকলে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার বুলিই আওড়ায়, তবু যে যায় লঙ্কায় সে-ই হয় রাবণ। মানুষের যৌথ-স্মৃতিতে রাবণ-রাক্ষসের রাজ-নীতি এখনও বহাল আছে। লেনিনের অনেক আগেকার রুশ বিপ্লবী বাকুনিনও ১৮৭০ সালে এই কথাই

বলেছিলেন: সবচেয়ে র‍্যাডিক্যাল বিপ্লবীটিকে আনুন এবং তাকে নিখিল রাশিয়ার সিংহাসনে বসিয়ে দিন অথবা তাঁকে একনায়কের ক্ষমতা দিয়ে দিন এবং এক বছর পার হওয়ার আগেই তিনি খোদ জারের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে পড়বেন। (নোম চমস্কি, ১৯৭০)। বলশেভিকদের ইতিহাস বাকুনিনকে অভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে।

ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালো মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আপনি যদি মানুষকে সেই 'শাসন'ই করতে চান, আপনার রাষ্ট্র-পরিচালন-কাঠামোটা যদি উচ্চ-নিচ ধারার কর্তৃত্ব-ক্রমতান্ত্রিক এবং আমলাতান্ত্রিকই হয় এবং রাষ্ট্রের ব্যাপক ক্ষমতা যদি অল্প কয়েকজনের হাতেই কেন্দ্রীভূত থাকে, তাহলে মানুষের দুর্ভোগ এড়ানোর উপায় থাকে না। এ-রকম 'গণতন্ত্রের' বুদ্ধি-ঠাসা মাথায় স্বৈরতন্ত্রীর শিঙ গজাবেই। মহামতি লেনিন বা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো শ্রেষ্ঠ নেতাকেও আমরা সাংঘাতিক স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে দেখেছি এবং সেটাই ছিল স্বাভাবিক।

আমাদের এই এক বছরের জরুরি জমানাতেও আমরা কখনও কখনও জারের ছায়া দেখতে পেয়েছি। লেনিনের 'চেকা', হিটলারের 'গেস্টাপো', শাহের 'সাভাক' বাহিনীর সুদূরবর্তী নিশানাও এখানে-সেখানে অগোচর থাকে নি। তদুপরি সে যুগ আর নাই। সেকালের গুপ্ত খুনের বদলে এখন এসেছে প্রকাশ্য রাষ্ট্রীয় খুনের যুগ। রাষ্ট্র এখন তার অপছন্দের নাগরিকদের চাইলে খুন করে, চাইলে হাতে-পায়ে নল ঠেকিয়ে গুলি করে পঙ্গু বানিয়ে পত্রিকায় খবর পাঠায়, টিভি-ক্যামেরা ডেকে পাঠায়। সম্ভাব্য প্রতিবাদীদের জন্যে, স্বাধীনতা মানবাত্মার জন্যে বার্তা ঘোষিত হয়: বুদ্ধিমানের জন্য বন্দুকের ইশারাই যথেষ্ট।

আর আমাদের ভাই-বন্ধুদেরকেই কিন্তু অপরাধী দমনের মতাদর্শ খাড়া করে রাষ্ট্রীয় নিধনযজ্ঞে নিয়োজিত করা হচ্ছে। আমাদের প্রাণপ্রিয় রাষ্ট্রটিই কিন্তু বিনাবিচারে মানুষ খুন করার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার এবং অকল্পনীয় নির্যাতন-নিপীড়নের মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠা করার চাকুরিতে নিয়োগ করেছে আমাদেরই দেশের সৎ ও দেশপ্রেমিক অফিসারদেরকে। থানা মানে জুলুম-কেন্দ্র। র‍্যাবের অফিস মানে নির্যাতন-কেন্দ্র। সারা বাংলাদেশকে টর্চার-চেম্বার বানিয়ে ফেললে কি দেশটা স্বর্গ হয়ে যাবে?

এ-সাধারণ সত্য প্রশ্নটা তোলার মতো বুদ্ধিজীবীর দেখা মিলছে না। রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মতাদর্শ মিডিয়া এবং শিক্ষিত সমাজ গিলছেন এবং প্রচার করছেন। খোদ খুনের চেয়ে খুনের মতাদর্শ বেশি ভয়ঙ্কর। অত্যাচারের চেয়ে অত্যাচারের বৈধতা আরও বেশি বিপজ্জনক। বলপ্রয়োগ করে মানুষের মঙ্গল করা যায় না, সে-কথা কে না জানেন? মনুষ্যত্ব-বিনাশী জল্লাদের চাকুরি থেকে আমাদের ভাই বেরাদর সন্তান বান্ধবদেরকে অব্যাহতি দানের ব্যবস্থা করার প্রশ্ন তোলাটাও আমাদের বৃহত্তর

পারিবারিক কর্তব্যই বটে।

১১.৬ আইনের শাসন ও কারাগার

নীতি-নির্ধারক যে ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রকে জালিম বানিয়ে তোলেন, তাদের রক্তমাংসের মুখ আড়াল করার জন্য জারের শাসন বা ফুয়েরারের শাসন বলে অভিহিত না করে আজকের শাসকেরা নিজেদেরকে কর্মকাণ্ডকে বলে থাকেন আইনের শাসন। অব্যাহতিপ্রাপ্ত বড় বড় চোখওয়ালা এক উপদেষ্টার মতোন প্রতিদিন মানুষকে তাঁরা ধমকান আর বলতে থাকেন, 'আইন তার নিজ গতিতে চলবে'। কিন্তু আইনের নিজের গতি মানে-যে কর্তা-শাসকদের মতিগতি মাত্র, সে-কথা এ যুগের পাগল এবং শিশুদেরও না বুঝার কথা না।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকদের নিষ্পাপ শিশু-সন্তানেরা কিন্তু প্রতি সপ্তাহে একদিন করে জেলে ঢুকেছে তাদের বন্দি পিতাদের দেখার জন্য। জেলখানা চিনে এসেছে পুষ্পসম লালন আর গার্গি। তারা ঠিক করেছে, বড় হয়ে তারা সকলকে বুঝিয়ে বলবে যে, সমাজে জেলখানার আসলে দরকার নেই। কেনো না, মানুষকে বন্দি করে রাখার মতো পাপ আর নেই। শাসকশ্রেণীর পাঁচ হাজার বছরের কর্তৃত্ববাদী সভ্যতার পাপের ফলে সৃষ্ট ক্ষতগুলো লুকানোর জন্যই বারো হাত তেরো হাত উঁচু ঐসব একটানা দেওয়াল রচনা করা হয়েছে। ঐসব দেওয়ালের নাম আইনের শাসন।

সুতরাং ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দেওয়াটা অতীব দরকারি হলেও, তার চেয়েও জরুরি প্রশ্নটা হলো, অতীতের মতোই, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কখনও জরুরি কখনও 'স্বাভাবিক' আইনের স্টিম-রোলার যদি চলতেই থাকে, তাহলে কেউ না কেউ তার তলায় পিষ্ট হতেই থাকবে। এটাই কিন্তু নীতিগত বিচারে গোড়ার প্রশ্ন। মানুষকে বন্দি করে রাখার কোনো অধিকার আদৌ কি কোনো শাসক বা শাসনতন্ত্রের আছে?

জেলখানায় আমি অনেক নিরাপরাধ মানুষ দেখে এসেছি, কেউ কখনও যাদের মুক্তি দাবি করে পত্রিকায় লেখেনি, লিখবে না। অথচ তাঁরা আমাদের মুক্তির জন্য আন্তরিকভাবে উৎকণ্ঠিত থেকেছে, দোয়া করেছে। তাঁদের কী হবে? দমনমূলক রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগ, কারাগার, আইনের শাসনের বিদ্যমান মৌলিক কর্মপ্রক্রিয়া ও নীতি-পদ্ধতিগুলোকে আমাদের বিদ্বৎসমাজ যদি এটা-ওটা অজুহাতে সঠিক বলে অনুমোদন করেন, তাহলে তাদেরকে এ-কথাও মানতে হবে যে, শিক্ষক-ছাত্রদের কয়েদ-খাটা ঠিকই আছে।

অসংখ্য নিরাপরাধ লোক (যাদের মধ্যে স্কুল-কলেজের শিক্ষকও আছেন) যদি দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ বছর জেল খাটতে পারেন, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পারবেন না কেনো? আর এ-বিদ্বৎসমাজ যদি মনে করে থাকেন, সমাজে

বিশ্ব-বিদ্যালয়-শিক্ষক বা শিক্ষিত এলিট লোকদের মূল্য বেশি, তাহলে সেটা গণতান্ত্রিক সম-চেতনার করুণ কন্ট্রাডিকশনকে চিত্রায়িত করবে। আমাদেরকে তার মানে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বিদ্যমান আইনের শাসনের খোদ প্রক্রিয়াটিকেই প্রশ্ন করতে হবে। জনগণের সৃজনশীল মনুষ্য-গুণাবলীর স্বাধীন বিকাশ ও আত্মকর্তৃত্বের সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলার কথা ভাবতে হবে।

১১.৭ বলপ্রয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয়, গণতন্ত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেক ও চিন্তা-প্রকাশের স্বাধীনতা যারা প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাঁরা কেমন করে বিস্মৃত হবেন যে, বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি কাঠামোগত প্রাতিষ্ঠানিক নিপীড়ন থেকে মুক্ত না হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে না? লক্ষ-লক্ষ বছরের বিবর্তন-প্রক্রিয়া ও প্রকৃতির সাথে লেন-দেন থেকে অর্জন করা বিবেক, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সংহতি, ভালোবাসা ও বিশ্বাসের পথে চলতে গেলে আপনাকেও হয়তো কারাগারে যেতে হবে। নিপীড়ক রাষ্ট্র-শাসকরা আপনাকে সহ্য করবে না।

তিয়াত্তরের অধ্যাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বাধীনতার বেশ খানিকটা বিধান করেছিল। তবু শিক্ষকেরা স্বাধীন হন নি; একদিকে পদ প্রমোশন হালুয়া রুটির লোভে এবং অন্যদিকে রাষ্ট্র-রাজনীতির বলপ্রয়োগের ভয়ে। রাষ্ট্রের সুদীর্ঘ শুঁড় ঢুকে তছনছ করে দিয়েছে স্বায়ত্তশাসনের ধারণা ও অনুশীলন। আসলে আইন করে কাউকে স্বাধীন বানানো যায় না। বাজারে রূপান্তরিত হওয়া আজকের সমাজের প্রচুর মানুষ ঐ লোভ আর ভয়ের তাড়নাতেই স্বাধীনতা তথা মনুষ্যত্বকে একটু একটু করে হারিয়ে ফেলছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে-বাহিরে ভয় আর লোভের চোখে চোখ রেখেই আমাদেরকে স্বাধীন হয়ে উঠতে হবে। রাজনৈতিক দলীয় ও প্রাইভেট অস্ত্রধারী বাহিনী, রাষ্ট্রীয় রক্তচক্ষু এবং সরকারি বন্দুকধারীদের হুকুমকে চ্যালেঞ্জ করে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকেরা এবং বুদ্ধিজীবীরা যদি চিন্তা-বিবেক-প্রকাশের স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ব পাহারা দিয়ে রাখতে পারতেন, তাহলে আজ বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজের এ-হাল হতো না।

আমরা কি রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগ, কারাগার এবং জুলুমের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে একটা সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার আলোচনা শুরু করতে পারি না? কারাগারের পেট থেকে বের হয়ে আসার পর এ-কথা আমাদের ভুলে যাওয়ার উপায় নাই যে, বলপ্রয়োগের প্রতিষ্ঠান থাকলে কিন্তু কারও না কারও ওপর বলপ্রয়োগ করা হবেই। তাতে চলেশ রিছিলদের মৃত্যু হবে। কারাগার থাকলে কিছু লোককে সেখানে ঢোকানো হবেই। বলপ্রয়োগের কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র ও কারাগার

ব্যতিরেকেই কেবলমাত্র একটা রাষ্ট্র সত্যিকারের সুশীল রাষ্ট্র হতে পারে। বলপ্রয়োগ করে, গায়ের জোরে, লাঠির জোরে, বন্দুকের জোরে শুভ-মঙ্গল-কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। মানুষকে বন্দি করে তার 'অপরাধ' সংশোধন করা যায় না, বন্দি করে মানুষকে স্রেফ নিঃস্ব ও ধ্বংসই করা যায়।

মানুষ তবু ধ্বংস হয় না। তার আত্মার ভেতরে আছে সৃষ্টিকর্তার আলো। জন্মসূত্রে মানুষ স্বাধীন। রুশো তাঁর *ডিসকোর্স অন ইনইক্যুয়ালিটি* (১৭৫৫) গ্রন্থে বলেছিলেন, 'মানুষের মৌলিক ও নির্ধারক ধর্ম হচ্ছে তার স্বাধীনতা। দাসত্বের প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁককে যাঁরা মানুষের ধর্ম বলে চালাতে চান, তাঁরা ভেবে দেখেন না যে, স্বাধীনতা এবং নিষ্পাপতা ও সৎকর্মের প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁকও মানুষের ধর্ম।' (উদ্ধৃত: নোম চমস্কি, ১৯৭০)

স্বাধীনতাই সৃজনশীলতার ধাত্রী। আর স্বাধীনতা আসে শুধু স্বাধীনতারই পথে। কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই স্বাধীনতার সূচনা ঘটায়। দ্রোহ ও সংগ্রামের পথে আসে সংহতি। উৎপাদনের উপায়-উপকরণের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা এবং তার পাহারাদার সশস্ত্র কর্তৃত্বের হাজার-হাজার বছরের নিষ্পেষণে মানুষ তার হারিয়ে ফেলা বিবেক, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সংহতি, ভালোবাসা, বিশ্বাস তথা মনুষ্যত্বকে মানুষ ফিরে পায় সংগ্রাম-সংহতি-স্বাধীনতার পথে।

প্রতিটা বিদ্রোহ আর সামাজিক আন্দোলন মানুষের মধ্যে শ্রেয়োচেতনা, উন্নত নীতিবোধ, হিতাকাঙ্ক্ষা আর সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের জন্ম দেয়। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলোতে ২০০৭ সালের আগস্ট-বিদ্রোহ এই প্রশ্নগুলোকেই সামনে টেনে আনলে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের পথে এগিয়ে যেতে পারব বলে আমার বিশ্বাস।

রাবি: ১২ই জানুয়ারি ২০০৮। প্রকাশ: প্রবাসী বাঙালিদের অনলাইন পত্রিকা *ইউকেবেঙ্গলি*, লন্ডন, ২৫শে এপ্রিল ২০০৮; ওঙ্কার, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৮।

বারো

জরুরি জমানার রাজনীতি ও প্রচারণা-প্রকৌশল

Johnnie Trice. Objects are Worse Than They Appear

১২.১ রাজনীতি নিয়ে জনগণের নির্লিপ্ততা

অন্যত্র বলেছি, ২০০৬ সালের অক্টোবর-মহাসংকটের সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে এই যে, শাসকশ্রেণীর নানান অংশের রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগ-বাটোয়ারা সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড থেকেই জনসাধারণ নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। এটা কিন্তু শুধু ২০০৬ সালেরই নয়। এ আমাদের স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পূর্বাপর বৈশিষ্ট্য। লক্ষণীয় হলো, শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে জনগণের এই আপাত দূরত্ব খোদ রাজনীতি সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত নির্লিপ্ততারই নামান্তর।

এর ব্যাখ্যা কী? ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত পাক্কা ষোল বছর প্রায় পূর্ণ সময়

ধরে একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল করার সুবাদে আমার কমরেডদের মতো করে আমিও মনে করতাম, রাজনৈতিক দল যারা করেন না, তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর জীব। আপামর সাধারণ মানুষ যে আসলেই রাজনৈতিক দলগুলোকে পছন্দ করছেন না, সেটাকে আমরা মনে করতাম তাঁদের অজ্ঞতা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারণার ফল। কেতাবি তত্ত্ব, বুলিবাগিশি বক্তৃতা এবং এক প্রকার অন্ধ আন্তরিকতার বাইরে বাস্তব পার্টি-জীবনের নানান রকম অজস্র খটকা থেকে হোঁচট খেয়ে দীর্ঘ বেদনাদায়ক চিন্তা-অনুসন্ধান-অনুশীলনের প্রক্রিয়ায় অবশেষে দেখা গেল, রাজনীতির ধারণার মধ্যেই আছে গোড়ার গলদ।

বাংলাদেশের মানুষ আমাদের জাতি-রাষ্ট্র গঠন-প্রক্রিয়ার লম্বা পথ অনুসরণ করতে করতে কোনো না কোনোভাবে এই গলদ টের পেয়েছেন। ফলে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করা পর্যন্তও রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যেরকম একাত্মতা বোধ করেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁদের অভিজ্ঞতা রাজনৈতিক দল সম্পর্কে যাবতীয় মোহভঙ্গের বেদনায় বিপন্ন।

১২.২ রাজনীতি হচ্ছে আধিপত্যের আর্ট

লম্বা-চওড়া লেকচার বাদ দিয়ে শাদা চোখে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, 'রাজনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রকর্মের ভেতর আর বাহির—উভয় দিককার কার্যকলাপ এবং তার সুস্পষ্ট অভিপ্রকাশ। অর্থাৎ, বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত শ্রেণীসমূহের সপক্ষে আমজনতাকে শোষণ করার এবং তার উপর আধিপত্য চালানোর আচার-অনুষ্ঠান-অনুশীলন তথা আর্ট এবং বিজ্ঞানের নাম রাজনীতি।' (মিখাইল বাকুনিন, 'রাষ্ট্র ও রাজনীতি', ১৮৭১) সমাজে বিদ্যমান কুৎসিৎ অর্থনৈতিক বৈষম্য তথা কোটি কোটি মানুষকে পাশবিক মনুষ্যত্বহীন জীবন যাপন করতে বাধ্য করার বর্তমান আর্থ-সামাজিক-বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিটিকে টেলিভিশন আর গ্ল্যামারের আড়ালে সুন্দর করে টিকিয়ে রাখা এবং এই টিকিয়ে রাখার বিরুদ্ধের শক্তি-চিন্তা-মতামত-কর্মতৎপরতাগুলোকে দমন-পীড়ণ-নিশ্চিহ্ন করার আয়োজন-বন্দোবস্তেরই অপর নাম রাজনীতি। 'ইতিহাসে অর্থনৈতিক শোষণ সবসময়ই রাজনৈতিক আর সামাজিক দমন-পীড়নের হাতে হাত রেখে এগিয়েছে। মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ আর মানুষের ওপর মানুষের শাসন-নিয়ন্ত্রণ অবিচ্ছেদ্য, এবং এদের একটা আরেকটার পূর্বশর্ত।' (হুডল্ফ হকার, ২০১১) রাজনীতি সংক্রান্ত গোড়ার গলদটা এইখানে।

১২.৩ ক্ষমতা-ভাগাভাগির সংকট ও জরুরি গণতান্ত্রিক ঐকতান

রাজনীতি আসলে কতিপয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত সম্পদ এবং কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্র-

ক্ষমতার ভাগাভাগির বিন্যাসও বটে। কারা কীভাবে কতটা সম্পদ এবং ক্ষমতার মালিক হবে এবং হতে পারবে তার ফয়সালাই রাজনীতি। আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত জাপা এই ফয়সালা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। এই ব্যর্থতারই নাম অক্টোবর-মহাসংকট: মাৎস্যন্যায়-পর্ব। আর এ ব্যর্থতা দূর করে নতুন রাজনৈতিক ফয়সালা প্রতিষ্ঠা করার মিশনই ১১ই জানুয়ারির সরকারের প্রকৃত মিশন।

মিশন শুরু হলো নবপর্যায়ের প্রচারণা-প্রক্রিয়া দিয়ে: আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র, সুশীল সমাজ, সামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বৈদেশিক / নয়া-ঔপনিবেশিক শক্তি-গুলোর যৌথ / ঐকতানমূলক প্রচারণা-প্রকৌশল। অন্যদিকে শুরু হলো আমলা-তান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তির একচেটিয়া কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া, অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিক মাত্রায়। একটু গুছিয়ে বলতে চাইলে, মূলত তিনটা প্রক্রিয়া-প্রপঞ্চকে বোঝা প্রয়োজন: (এক) বহুলনন্দিত আইনের শাসন কায়েমের প্রক্রিয়া, (দুই) কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্রী হয়ে ওঠার প্রবণতা এবং (তিন) রাষ্ট্রীয়-কর্পোরেট যৌথ প্রচারণা-প্রকৌশলের ঐক্য ও টানাপোড়েন।

এই প্রক্রিয়া-প্রপঞ্চগুলোই জরুরি জমানার রাজনৈতিক হৃৎস্পন্দনের আসল স্মারক। জরুরি আইনের নিজেরই যে একটা রাজনীতি আছে সেটা আড়াল করতেই সামগ্রিক প্রচারণা-যজ্ঞ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের মাধ্যমে উপযুক্ত সহযোগী তথ্যমাধ্যম গড়ে তোলা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। বাংলাদেশেও দেখা গেল, মিডিয়া নিজেও উপর্যুপরি দাবি করেছে, কর্তাদের মনে করিয়ে দিয়েছে, ১১ই জানুয়ারির সরকার শুধু 'সেনাসমর্থিত'ই নয়, সুশীল সমাজের 'মিডিয়া-সমর্থিত'ও বটে।

আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র, সুশীল সমাজ, সামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বৈদেশিক / নয়া-ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর উপরোক্ত এই 'যৌথবাহিনী'র ঐকতান সৃষ্টি হওয়াটা মনোযোগের দাবি রাখে। অধুনাবিলুপ্ত গণসাহায্য সংস্থার কর্ণধার মাহমুদুল হাসান নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে যখন সাড়ম্বরে সুলিখিতভাবে সুশীল সমাজের তত্ত্ব হাজির করেন, তখন থেকেই সুশীল সমাজের প্রধানতম গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাটির অন্তর্ভুক্ত ছিল এই মানদণ্ড যে, রাষ্ট্রযন্ত্র, রাজনৈতিক দল এবং সামরিক বাহিনীর বাইরের সমাজ হচ্ছে সুশীল সমাজ। এখন উপযুক্ত পরিপক্ক সময়ে সংজ্ঞটি ডিগবাজি খেল এবং তাঁদের স্বরূপ বোঝা গেল যখন তাঁরা বৈদেশিক / নয়া-ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের ছত্রছায়ায় ঐ রাষ্ট্রযন্ত্র আর সামরিক বাহিনীর সাথে মিলেমিশেই একটি জরুরি গণতান্ত্রিক ঐকতান সৃষ্টি করলেন। এই হচ্ছে সুশীল সমাজের রাজনীতির প্রাণভোমরা। এই রাজনীতির সারবত্তা উপলব্ধি করতে তথাকথিত 'রাজনৈতিক সরকার' এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের বৈপরিত্য ও অন্তর্দ্বন্দ্ব-

সমূহের স্বরূপ উপলব্ধি করা দরকার।

১২.৪ ক্ষমতা ও সম্পদের নিওলিবারাল বিন্যাস

রাজনীতি আদতে কী বস্তু আগেই বলেছি। রাজনীতি মানে স্রেফ রাজনৈতিক দল এবং তাদের কর্মকাণ্ড নয়। আওয়ামী লীগ বিএনপি জামায়াত জাতীয় পার্টি বিদায় নিলেই রাজনীতি বিদায় নেয় না। বিদ্যমান একচ্ছত্র একপেশে প্রচার-প্রচারণার ভাব দেখে মনে হয় সাংবাদিক, আইনজীবী, শিক্ষক, সামরিক অফিসার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সকলেই ভালো, শুধু রাজনীতিবিদরা খারাপ। রাজনীতিবিদদের প্রতি কোনো বিশেষ সহানুভূতি থেকে কথাটা বলছি না। আমার কাছে রাজনীতি মানেই শাসন। আমি খোদ রাজনীতিরই উচ্ছেদ চাই। আমার বিশ্বাস, জনগণও তাই চান।

রাজনীতির বদলে আমি চাই সুসংগঠিত মানুষের সত্যিকারের আত্মনিয়ন্ত্রণ। কোনো পেশাদার বা অপেশাদার শাসকগোষ্ঠীরই অধিকার নেই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার। আমি তাই চাই রাজনীতিক শাসন-প্রক্রিয়ার জায়গা নিক অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবন-কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষদের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিদের সমাজ-জীবন-পরিচালন-প্রক্রিয়া। কিন্তু জরুরি জমানার হর্তাকর্তারা তো আসলে রাজনীতিকে উচ্ছেদ করতে চান না। তাঁরা চান বিশেষ ধরনের রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁরা চান 'নতুন' ধারার কর্পোরেট-রাজনৈতিক কতিপয়-গোষ্ঠীর কাছে ক্ষমতা ও সম্পদ বিন্যস্ত করার নব-বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্ত রক্ষা করবে জনসাধারণের শ্রম ও ভূপ্রকৃতির সম্পদ লুণ্ঠনকারী বহুজাতিক বাণিজ্যসঙ্ঘসমূহের স্বার্থ, জীবনবিধ্বংসী ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ এবং তাদের এদেশীয় প্রশাসনিক-ব্যবসায়িক-সামরিক-সাংস্কৃতিক পার্টনারদের যাবতীয় স্বার্থ। এটাই সুশীল সামরিক জরুরি জমানার রাজনীতি।

১২.৫ রাজনৈতিক প্রচারণা কৌশলসমূহ

রাজনীতির প্রচারণা-যন্ত্রের একটা মৌলিক কৌশল হলো আপনি যা করছেন বা করতে চাচ্ছেন সেটা না বলে ক্রমাগতভাবে উল্টো কথা বলুন, অজস্র মুখে, অজস্র ইশারায়। আপনি যখন চাচ্ছেন রাজনীতিকে আপনার এবং আপনার রাজনৈতিক মিত্রদের সপক্ষে নতুন করে ঢেলে সাজাতে, তখন আপনাকে অনর্গল বলে যেতে হবে যে: আপনার সরকার অরাজনৈতিক সরকার, বলতে হবে যে, রাজনীতির বিরুদ্ধে জেহাদ করাকেই আপনি আপনার কর্তব্য বলে ঠিক করেছেন।

প্রচারণার আরেকটা প্রাথমিক কৌশল হলো, যাকে আপনি ঘায়েল করতে

চাচ্ছেন তাকে আগে গালাগালি করুন, তাকে একটা খারাপ নাম দিন। বিগত ১৫-১৬ বছর ধরে পুরোনো পর্যায়ের প্রচারণা-প্রকৌশলে সুশীল সমাজ এই কাজটাই করেছিল: রাজনীতিবিদরা খারাপ, তাঁরা অমুক তাঁরা তমুক, অন্তহীন সম্প্রচার। ১১ই জানুয়ারির নবপর্যায়ে এসে সেটা তীব্রতম মাত্রা অর্জন করল। এতে আরেকটা লাভ হচ্ছে, আপনার নিজেকে নিজে ভালো বলতে হলো না। রাজনীতিবিদরা খারাপ মানেই তো, তাদেরকে যারা দমন করছে তারা ভালো।

প্রচারণার অপর প্রধান কৌশলটা হচ্ছে আপনার একটা জাতীয় গণশত্রু বা জুজুবুড়ি লাগবে। ঐ জুজুবুড়ির ভয় দেখিয়ে আপনি সমস্ত 'বাচ্চাকাচ্চা'কে সাইজ করতে পারবেন। কেউ বেশি বেয়াদবি করলে তাকে ঐ জুজুরই চ্যালা হিসেবে আখ্যায়িত করবেন এবং চাইলে তা আদালতের মাধ্যমে প্রমাণেরও চেষ্টা করবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশির দশক পর্যন্ত এরকম জুজুর নাম ছিল রুশ কমিউনিজম, 'লাল আতঙ্ক' (যদিও বাস্তবে তা সমাজতন্ত্রই ছিল না, বাস্তবে ছিল একদলীয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ), পরে নব্বই দশক থেকে বুড়ির নতুন নাম হয়েছে 'ইসলামী সন্ত্রাসবাদ' (যদিও বাস্তবে ওসামার মাধ্যমে সারা দুনিয়ার 'ইসলামী সন্ত্রাসী'কে আফগানিস্তানে জেহাদের দাওয়াত দিয়ে ডেকে এনে খোদ সিআইএ-র লালন-পালনে আল-কায়দা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছিল)। ১১ই জানুয়ারির জরুরি সরকারপক্ষ এই জুজুবুড়ির নাম দিয়েছে 'দুর্নীতি' (পাকিস্তান ও থাইল্যাণ্ডেও 'দুর্নীতি'-মডেলই হাজির করা হয়েছিল)। বলা হলো, দুষ্ট রাজনীতিবিদদের এবং তাদের সাঙ্গোপাঙ্গো-দল-পরিবার-আত্মীয়-স্বজনের দুর্নীতি দমন করার মাধ্যমেই সুষ্ঠু নির্বাচন করা হবে, বাংলাদেশ আর ১১ই জানুয়ারির আগে ফিরে যাবে না।

১২.৬ খারাপ গণতন্ত্র ভালো স্বৈরতন্ত্রের চেয়ে ভালো

শতমুখী প্রচারণার ঢক্কা-নিণাদের আড়ালে একটা জ্বলন্ত সত্য ছাই-চাপা পড়ার দশা হয়েছে আমার সংশয়: ১১ই জানুয়ারির সরকারের 'দুর্নীতি দমন' অভিযান গণতন্ত্র দমনের অভিযানও বটে। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, সবচাইতে খারাপ গণতন্ত্রও সবচাইতে ভালো স্বৈরতন্ত্রের চেয়ে ভালো। এটুকু বুঝলে জরুরি জমানার রাজনীতি ও প্রচারণা-প্রকৌশল বোঝার একটা প্রধান চাবিকাঠি হাতে পাওয়া যাবে।

রাবি: জানুয়ারি ২০০৮। প্রকাশ: প্রবাসী বাঙালিদের অনলাইন পত্রিকা *ইউকেবেঙ্গলি*, লন্ডন, ২৪শে জুন ২০০৮।

স্বৈরতন্ত্রী গণতন্ত্র: দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন

Richard Mock, Oil Spill Kill

আইনের শাসনের ব্যানারে জরুরি জমানার সরকার বাহাদুর যে 'দুর্নীতি দমন' অভিযান চালাচ্ছেন, সে-অভিযানে বাস্তবে কিন্তু 'আইনের শাসন' বলে শনাক্ত করা যাচ্ছে বিশেষ রকম দুষ্টের দমন আর বিশেষ রকম শিষ্টের পালনকে। দুষ্ট মানে যারা দেশের সম্পদ নিজের ব্যক্তিগত পকেটে ভরেন, লুট করেন, আর অপছন্দের লোকদের ওপর নিপীড়ণ চালান, মানে সত্যিকারের দুষ্টু, যথা তারেক রহমান। আবার, দুষ্ট মানে মানুষের অধিকার, মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য যাঁরা শাসকদের অন্যায় আচরণ ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে প্রতিবাদ করেন, মানে রাষ্ট্রকথিত মিথ্যাকারের দুষ্টু, যথা অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। রাষ্ট্রের যখন-যাঁরা হর্তা-কর্তা-বিধাতা থাকেন, তাঁরা বিদেশী বহুজাতিক বাণিজ্য-সঙ্ঘের

সঙ্গে চুক্তির তরফে দেশের সম্পদ গাপ করে দিলেও এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার নামে মধুপুরের আদিবাসী নেতা চলেশ রিছিলকে নির্মমভাবে নিপীড়ণ ও খুন করলেও বা নাটোরের দেবরাজের মতো উজ্জ্বল যুবককে সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে পাঁচ মাস জেলের জুলুমে বন্দি রাখলেও রাষ্ট্রের চোখে 'দুষ্ট' বলে বিবেচিত হন না। আর শিষ্ট কারা? শিষ্ট মানে শাসকদের অনুগত, শাসকদের আত্মীয়, যাঁরা শাসকবর্গের গান নিজের-নিজেদের মাইক ও মিডিয়ায় পরিবেশন করেন, যথা মান্নান ভুঁইয়া, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী। শিষ্ট মানে যাঁরা লেখালেখি ও টক শো'র মাধ্যমে সরকারের সাথে নানান কৌশলগত ও ইস্যুগত প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করলেও একেবারে গোড়ার নীতিগত প্রশ্নে শাসকবর্গের সঙ্গে এক পাটাতনেই অবস্থান করেন, যথা সুশীল সমাজের ও মহাজনী মিডিয়ার তালিকাভুক্ত তারকা-বুদ্ধিজীবীবৃন্দ।

এই পাটাতন-পার্টনারশিপের কথা অন্যত্র বলেছি। তো, এই ঐকতানমূলক পাটাতন-পার্টনারশিপ কর্তৃক পরিচালিত গোটা কর্মকাণ্ডেরই অন্যতম ডাকনাম দেওয়া হলো গিয়ে আইনের শাসন। শুরু হলো আইনের শাসন কায়েম করার সপক্ষে মিডিয়া-মাইকিং: কানাকে হাইকোর্ট দেখানোর কাহিনী। জনগণ কানা না হলে তাদেরকে হাইকোর্ট দেখিয়ে সুবিধা হয় না। ইতিহাসের দিক থেকে বঞ্চিত ও পরাজিত হওয়ার কারণে তো গণমানুষ অনেক বিষয়ে এক প্রকার কানা হয়েই আছে। আইনের ডেইলি সোপ অপেরাসমূহের নায়ক-ভিলেন-ক্লাইম্যাক্স-সাসপেন্স-কমেডি-ট্র্যাজেডি ইত্যাদি-প্রভৃতির একেবারে সমস্তটা জনসাধারণ যেন পরিপূর্ণভাবে দেখতে পায় ও হৃদয়ঙ্গম করে তার জন্য তাঁদেরকে বাকিটুকু কানা করে দেওয়ার লক্ষ্যেই নবপর্যায়ের প্রচারণা-পর্ব সাজানো হলো।

প্রচারণা-প্রচারে এবং বিবিধ-মাত্রিক প্রহারে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দেখা গেল, উপযুক্তভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সেটা কোন মাত্রার রাষ্ট্রীয় জুলুম ডেকে আনতে পারে। গত একটা বছর জুড়ে জরুরি শাসনের দক্ষযজ্ঞ তার অকাট্য প্রমাণ। বলতে গেলে প্রত্যেকটা মানুষ একেবারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তার ঘাড়ের ওপর আইনের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস অনুভব করছেন। অনুভূতিটা প্রীতিকর নয়। নাগরিকদের সেবায় যেকোনো মুহূর্তে জেল-জুলুমের সাদর আমন্ত্রণ-পত্র রাষ্ট্রপক্ষের হাতে সদাপ্রস্তুত আছে। জেলখানাগুলোতে মানুষ আঁটছে না। ধারণ-ক্ষমতার কোথাও দুই গুণ কোথাও তিন গুণ করে মানুষকে ধারণ করে আছেন আইনের সুপ্রাচীন ধারক জনাব কারাগার। আইনের উপযুক্ত শাসন কায়েম হলে এরকমই ঘটে। গাদা গাদা তথ্যমাধ্যম থাকার পরও অনেকে জানতে পারেন না যে, এ জগতে সবচাইতে বেশি জেলখানাওয়ালা দেশটির নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আইনের শাসন যেখানে প্রশ্নাতীতভাবে কায়েম হয়েছে। আইনের শাসনের একেবারে গোড়ার আইডিয়াটা

হচ্ছে, পিটিয়ে ভয় দেখিয়ে বন্দি করে সুপ্ত ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে মানুষকে 'সুপথে' রাখা। এইভাবে ছোট বাচ্চাকেও মানুষ বানানো যায় না। হয় সে বখে যায়, না হয় সে চিন্তাশক্তি বিচারবুদ্ধি আর স্বাধীনতার আলো হারিয়ে কর্তার অনুগত গোলামে পরিণত হয়, আর পরিণামে অন্যের ওপর গোলামি করতে থাকে।

মানুষ তাহলে মানুষ থাকে কীসে? এই এক বছরে এই প্রশ্নটা পর্যন্ত কেউ তোলেন নি। কিংবা, একটা গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানে খোদ জরুরি আইনের মতো কালাকানুন আদৌ সন্নিবেশিত থাকবে কেন, সেই বিষয়ে প্রশ্ন তোলা তো দূরের কথা, সামান্য সংশয়ও অনুভব করেন নি মহাজনী মিডিয়ার তালিকাভুক্ত এই বিশিষ্ট শিষ্ট বুদ্ধিজীবীবৃন্দ। ভাবখানা এমন, জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তো জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতেই হবে, অন্য কী উপায়? ২০০৭ এর পয়লা জানুয়ারির আগে-আগে যে রকম মারাত্মক ধ্বংসাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তাতে জরুরি অবস্থা জারিই তো পথ, তাই না? এই হচ্ছে বিশেষভাবে শিষ্ট যুক্তি। কিন্তু মিডিয়া-মহারথী 'এক্সপার্ট'-দের প্রচারণা ও শোনা কথার বাইরে গিয়ে সামান্য একটু ভাবলেও বোঝা যাবে, রাষ্ট্রীয় জরুরি সংকটের সময়, এমনকি ভয়ানক যুদ্ধের সময়ও, সারাদেশের সমস্ত মানুষের সক্রিয় অটুট ঐক্যই হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করার একমাত্র উপায়। এই এক বছরের জরুরি অবস্থা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে, রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ বলপ্রয়োগের বৈধতা প্রদান করা ছাড়া জরুরি আইন জারির অন্য বিশেষ কোনো উপকার নাই। আর এই নিরঙ্কুশ বলপ্রয়োগের ক্ষমতা আর যাই হোক জনগণের সপক্ষে ব্যবহৃত হয় না, সেটা আমাদের এই এক বছরের জরুরি অবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে বোধগম্য। সবচেয়ে বড় কথা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের ওপর বল-প্রয়োগের যেকোনো পন্থা-পদ্ধতি অবৈধ। সুতরাং যে সংবিধান নিজেকে গণতান্ত্রিক বলে দাবি করে তাতে জরুরি আইন জারি করার মতো মানবাধিকারবিরোধী কালাকানুন সন্নিবেশিত থাকতে পারে না। গায়ের জোরে মানুষের মঙ্গল সাধন করা যায় না, এ-কথা পাগল এবং শিশুর পক্ষেও বোঝা সম্ভব।

বলপ্রয়োগের জোরে নয়, মানুষের উন্নত নীতিবোধের অটল ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা-সহযোগিতা-সংহতি-সৃজনশীলতার শক্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করার মতো দূরদৃষ্টি কারো আছে বলেও তো মনে হয় না। জরুরি অবস্থার এক বছর ধরে বহু কামান দেগে সব মিলিয়ে দাঁড়ালোটা কী? সবচাইতে বড় গোলন্দাজ-ব্যারিস্টার নিজেই সবান্ধব বিদায় হয়েছেন। আরও এক বছর ধরে ভালো মানুষদের জরুরি শাসন চলার পর সবচেয়ে ভালো অবস্থা কী দাঁড়াবে? 'যেসব সংস্কার হয়েছে তা কী করে অপরিবর্তনীয় রাখা যাবে? কোনো কিছুই অপরিবর্তনীয় রাখা যায় না। আপনারা ভাবছেন ভেবেচিন্তে ভবিষ্যতে রাজনীতিকদের হাত-পা বেঁধে দেবেন, তা

সম্ভব নয়। এক ধরনের সমঝোতার ভেতরে আসতে হবে। আইন করে যে সমস্যার সমাধান হয় না, তা আপনারা ভালো করেই জানেন।' (মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, 'সুষ্ঠু নির্বাচন হলেই কেবল সরকার প্রথম শ্রেণী পাবে', 'প্রথম আলো বিশেষ সাক্ষাৎকার', সাক্ষাৎকার গ্রহণে প্রথম আলো'র সহযোগী সম্পাদক মিজানুর রহমান খান, *প্রথম আলো*, পৃষ্ঠা ৮, ১১ই জানুয়ারি ২০০৮।)

শুধু তাই নয়, এক বছর ধরে রাজনৈতিক দলগুলোর সস্ত্রীক শ্রাদ্ধ করার পর আবার সেই থোর-বড়ি-খাড়া আওয়ামী লীগ, বিএনপি আর জাতীয় পার্টি। (সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা রামের মাসি!) এখন 'সামনে বাকি আছে ৯-১০ মাস, সর্বোচ্চ ধরেন ১১ মাস, এর মধ্যে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টিকে কীভাবে আমরা বিশুদ্ধ করব? পরিশুদ্ধ করব? এটা আমার-আপনার কাজ নয়। আপনাকে-আমাকে দিয়ে এটা সম্ভবও নয়। তো আমরা প্রচার করব, আমাদের কথা আমরা বলতে থাকব। যদি কখনো দলের নেতৃত্বের মধ্যে, কর্মীদের মধ্যে, মানুষের মধ্যে বোধোদয় হয়। না হলে এই নিপীড়ণ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, কালো টাকার মালিকদের অত্যাচার নির্যাতনের মধ্যে আমাদের থাকতে হবে। আর কিছুই করার নেই আমাদের। এটা তো হতাশাব্যঞ্জক। এটা তো হতাশারই কথা।' (মতিউর রহমান, 'উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠন ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা জরুরি', 'এটিএন বাংলার লিড নিউজ', বাঁকা হরফ সাক্ষাৎকারগ্রহীতার প্রশ্ন, সাক্ষাৎকার গ্রহণে এটিএন বাংলার প্রধান বার্তা সম্পাদক জ. ই. মামুন, *প্রথম আলো*, পৃষ্ঠা ৯, ৯ই জানুয়ারি ২০০৮।)

কী করুণ অবস্থা! সমঝোতা ছাড়া যদি পথই না থাকে, আইন করে যদি সমস্যার সমাধানই না হয়, শুধুমাত্র প্রচার করে বোধোদয়ের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই যদি করার না থাকে, তাহলে এই সুদীর্ঘ এক বছর ধরে সারা দেশের সমস্ত মানুষের ওপর দিয়ে অভাব-আতঙ্ক-অত্যাচারের স্টিম রোলার চালানোকে এত সোৎসাহে সমর্থন করতে গেল কেন সুশীল সমাজ! তার মানে গামছা দিয়ে হাত-পা-মুখ বেঁধে গায়ের জোরে গেরস্থের কল্যাণ করার নীতি ভুল ছিল। আর আপনি যদি বলেন, না, ভুল ছিল না, স্টিম-রোলার না চালালে রাজনৈতিক দলগুলোকে সোজা করা যেত না, তাহলে তো ভবিষ্যতেও রাজনৈতিক দলগুলোকে সোজা রাখার জন্য নিপীড়ণের সিস্টেম বানিয়ে রাখতে হবে, নইলে রাজনৈতিক দলগুলোকে আগের জায়গায় ফেরত যেতে না দেওয়ার অন্য উপায় কী? তাহলে কি সেরকম একটা নিপীড়ণের দীর্ঘমেয়াদী সিস্টেম যেন থাকে সেই ব্যবস্থারই আয়োজন চলছে? সেরকম কোনো আয়োজন দিয়ে, সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন ত্রাসের রাজত্ব বজায় রেখে বাংলাদেশের জনগণের অমঙ্গল ছাড়া কিছুই সাধিত হবে না।

ডান-বাম-উত্তম-মধ্যম রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং হরেক রকম সুশীল প্রতিষ্ঠান মিলেও যখন বছরের পর বছর ধরে গণতন্ত্রের সংকট এড়ানো গেল না, শেষ পর্যন্ত অক্টোবর-মহাসংকটের মাৎস্যন্যায় পর্ব এসে হাজির হলো, তখন যখন সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে জরুরি অবস্থা জারি করালো, তখন সেনাবাহিনীকে দোষারোপ করার কোনো সুযোগই ছিল না, এটাই রূঢ় সত্য। আপাত অর্থে আওয়ামী লীগ বিএনপি জামায়াত জাতীয় পার্টির হিংস্রতার হাত থেকে তাৎক্ষণিক নিষ্কৃতিই পাওয়া গিয়েছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু জরুরি অবস্থাকে মহিমান্বিত করারও কোনো সুযোগ ছিল না। বরঞ্চ, রাজনৈতিক দলগুলোর রাক্ষসতন্ত্রের জুলুম থেকে তাৎক্ষণিক নিষ্কৃতি পেতে গিয়ে রাষ্ট্রের অধিকতর কর্তৃত্বপরায়ণ ও স্বৈরতন্ত্রী হয়ে ওঠার বিপজ্জনক বাস্তবতাকে আমাদের সুশীল সমাজের মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবীরা হিসেবের মধ্যে নেন নি। এভাবে স্বৈরতন্ত্রের দাওয়াই দিয়ে গণতন্ত্র হয় না। গণতন্ত্রের কোনো শর্টকাট রাস্তা নাই। গণতন্ত্র অর্জন করার পথ শুধু গণতন্ত্রই, তাতে যত দুঃখ-কষ্টই আসুক না কেন। মুক্তিমুখিন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস ও সাহিত্যের সাথে আমাদের তারকা বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় থাকলে, অথবা নিদেনপক্ষে বাস্তবতা সম্পর্কে স্বাধীন সাধারণ জ্ঞান থাকলে, জরুরি অবস্থাকে তাঁরা আর যাই হোক মহিমান্বিত করার চেষ্টা করতেন না।

রাবি: জানুয়ারি ২০০৮। প্রকাশ: প্রবাসী বাঙালিদের অনলাইন পত্রিকা *ইউকেবেঙ্গলি*, লন্ডন, ২৪শে জুন ২০০৮।

জনগণের সক্রিয়তা: গণমানুষের গণতন্ত্র

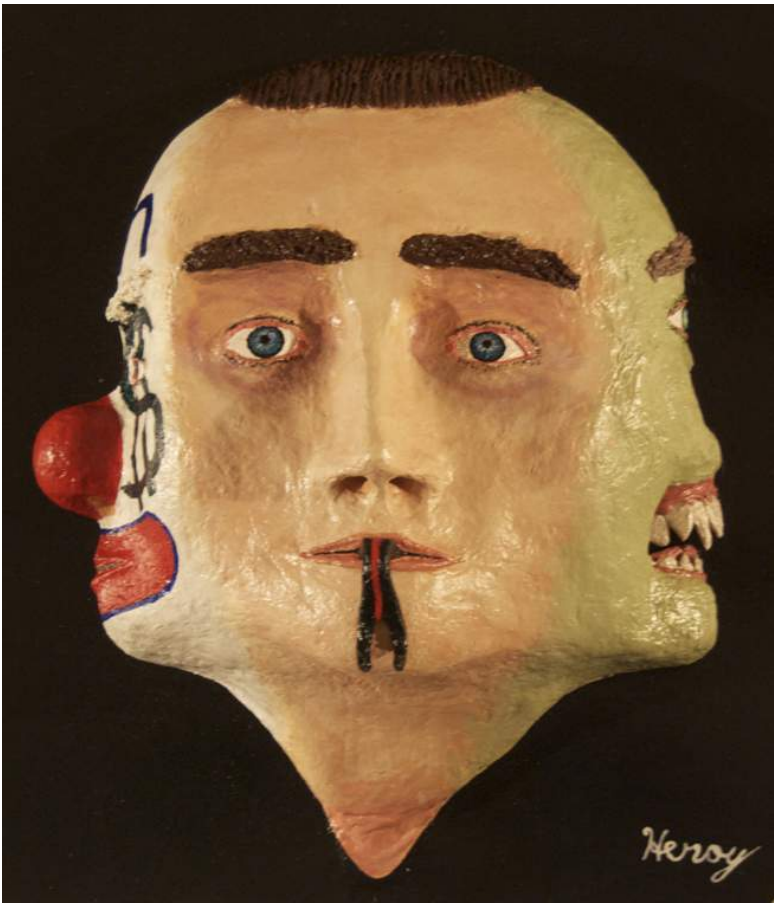

George Heroy. The Three Faces of Government

একেবারে আসল কথাটা বলে ফেলেছেন ড. আকবর আলী খান: 'আমরা যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব, গণতন্ত্রের ব্যর্থতার সমাধান গণতন্ত্রের অপসারণ নয়। কিংবা গণতন্ত্রের বাইরের অন্য কোনো ব্যবস্থা নিয়ে আসা

নয়। গণতন্ত্রের ব্যর্থতার সমাধান হলো আরও গণতন্ত্র এবং আরও গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্র বাড়াতে বাড়াতেই একসময় গণতন্ত্রের সমস্যার সমাধান সম্ভব।' ('প্রথম আলো গোলটেবিল বৈঠক: ১১ জানুয়ারি: নির্বাচন, গণতন্ত্র ও ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ', *প্রথম আলো*, পৃষ্ঠা ২২, ১১ই জানুয়ারি ২০০৮।) একটা গোটা বছর পার করে দেওয়ার পরে হলেও সুশীল সমাজের চিন্তনে এই উপলব্ধির প্রকৃত তাৎপর্য যদি উদ্ভাসিত হয় তাতেই বাংলাদেশের মঙ্গল। কিন্তু গণতন্ত্র বাড়ানোর রাস্তাটা কী, তা ড. আকবর আলী খানেরা কি ভেবে দেখেছেন? জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করলে কি গণতন্ত্র বাড়ে? নাকি কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্রের ঘাড়ে আরো বড় কর্তাকে বসিয়ে রাখা হয়? নির্বাচন কমিশনের কাছে গিয়ে দলের নাম রেজিস্ট্রি করালে কি গণতন্ত্র বাড়ে? নাকি জনগণের কাছে জবাবদিহি করার বদলে ক্ষমতাধর একটি আমলাতান্ত্রিক কমিশনের কাছে দলগুলোর দায়বদ্ধতা বাড়ে? দুর্নীতি দমন কমিশন বড়লোকদের আয়কর পরীক্ষা করে বেড়ালে কি রাষ্ট্রের আয় বাড়ে? গণতন্ত্র বাড়ে? গরিবের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়? নাকি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার নতুন একটা বন্দোবস্ত হয়? পাঁচ বছরে একদিন উৎসব করে ভোট দেওয়ার জন্যে পাঁচশত কোটি টাকার ভোটারতালিকা-পরিচয়পত্র বানালে কি গণতন্ত্র বাড়ে? কথিত জনপ্রতিনিধিরা কি তাদের ভোটারমণ্ডলীর কাছে দায়বদ্ধ থাকতে শুরু করে? নাকি পাঁচ বছরের জন্য ভোটারদেরই ওপর ছড়ি ঘোরানোর বৈধতা অর্জন করে? জরুরি অবস্থা সত্যি সত্যি অনেক জরুরি প্রশ্ন তুলে এনেছে, কিন্তু সেই প্রশ্নগুলোকে পুঁজিবাদী বহুজাতিক বাণিজ্য-সঙ্ঘের চিন্তনকাঠামোর গণ্ডির ভেতর থেকে বিবেচনা করেছে। সেনাবাহিনীর সত্যিকারের দেশপ্রেমিক অফিসারেরা এবং সুশীল সমাজের সত্যিকারের দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীরা চাইলে ফরাসী বিপ্লব, প্যারি কমিউন, রুশ বিপ্লব, স্পেনীয় বিপ্লবসহ মানবজাতির মুক্তিমুখিন ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের চিন্তন-প্রণালী ও কর্ম-পদ্ধতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখতে পারতেন সত্যিকারের গণতন্ত্র কী জিনিস।

সত্যিকারের গণতন্ত্র বলতে বোঝায়, নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করবে জনগণ, অর্থাৎ ভোটাররা। আর আমাদের জরুরি অবস্থার ও শিথিলাবস্থার উভয় প্রকার 'গণতন্ত্রেই' নীতিগত সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করে নির্বাহী বিভাগ। যেমন, জরুরি অবস্থা জারি করে কে? রাষ্ট্রপতি। বাজেট প্রণয়ণ করে কে? অর্থ-মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-আমলারা। আইন প্রণয়ণ করে কে? আইন-মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-আমলারা। এক কথায়, নির্বাহী বিভাগের সচিবালয়সমূহই যাবতীয় নীতি নির্ধারণ করে। পার্লামেন্ট সেগুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে মাত্র, তারপর সেগুলো একেবারে হুবহু বা যৎসামান্য এদিক-সেদিক করে পাশ করে দেয়। পার্লামেন্ট এখানে বাদশাহী আমলের

রাজসভার নবরত্ন হিসেবে শোভা বর্ধন করে মাত্র। রাজসভার রত œ গণ অনেক কথা বলতে পারেন, তবে সেটা বাদশাহের মন বুঝে, এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কিন্তু বাদশাহ্ই গ্রহণ করেন। যদি-বা পার্লামেন্ট কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত কখনো গ্রহণও করে ফেলে, সেই সিদ্ধান্ত দেখা যায় আদতে এক বা একাধিক আমলাতান্ত্রিক পার্টির (আসলে পার্টির কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কয়েকজন নেতার) সিদ্ধান্ত। পার্লামেন্টের সদস্যরা তো আসলে নিজ নিজ দলের নেতাদের কাছেই জবাবদিহি করেন। সবচেয়ে 'ভালো' পার্টিগুলোতেও (বৃটেন-যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে) ক্ষমতা থাকে নেতাদের কাছে, প্রেসিডিয়ামের কাছে, বা বড়জোর কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে, একেবারে নিচের সদস্যদের কাছে নয়। কর্তৃত্বক্রমতান্ত্রিক এসব পার্টিরও নীতি নির্ধারণ করে বাস্তবে প্রেসিডিয়াম বা পলিটব্যুরো; সম্মেলন বা কংগ্রেস তা অনেক কথাবার্তার পর অনুমোদন করে মাত্র। আমাদের নির্বাচন কমিশন যদি মডেল হিসেবে বৃটিশ-মার্কিন 'কতিপয়তান্ত্রিক গণতন্ত্র'কে অনুসরণ করেন তাহলে আমরা নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ভোটারদের কাছে দেব কীভাবে? এই লক্ষ্যে কি নির্বাচন কমিশন বা সরকার বা সুশীল সমাজ কোনো সংস্কার করার কথা ভাবছে? 'সংস্কার' 'সংস্কার' রবে তো কর্ণ বিদীর্ণ হওয়ার অবস্থা।

কল্পনা করা যাক, কোনো না কোনোভাবে নির্বাচকমণ্ডলী তথা ভোটাররা নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা অর্জন করলেন। কিন্তু তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যে নির্বাচক-মণ্ডলীর নির্ধারণ-করা নীতি বাস্তবায়ন করবেন তার নিশ্চয়তা কী? আমি মালিক, আমি আমার কর্মচারী-প্রতিনিধিকে বড় গঞ্জের দোকানে লেনদেনের জন্য নিয়োগ করেছি। সে যদি আমার হয়ে আমার নির্ধারিত নীতি মেনে কাজ না করে তাহলে তৎক্ষণাৎ আমি তার প্রতিনিধিত্ব বাতিল করে দিয়ে নতুন কর্মচারী নিয়োগ দেব, তাই না? বোঝা গেল ক্ষমতা আমার হাতে, আমি আমার প্রতিনিধি নিয়োগও দিতে পারি, তাকে ফেরতও নিয়ে আসতে পারি। আমাদের বিদ্যমান সংবিধানের অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সেখানে কিন্তু বলা আছে এই প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ। ('গণপ্রজা-তন্ত্র' না বলে 'গণসাধারণতন্ত্র' বললে আরও উপযুক্ত হয়, রাজা যেখানে নাই সেখানে প্রজার প্রশ্ন ওঠে না। সম্প্রতি *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধকালের মুজিবনগর সরকারের একটি দলিলের আলোকচিত্রে চমৎকার এই 'গণসাধারণতন্ত্র' শব্দটা পাওয়া গেল।) সংবিধানেই আরো বলা আছে, প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন কাজে নানান পদে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ আদতে প্রজাতন্ত্রেরই কর্মচারী। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও এ-হিসাবে জনগণের কর্মচারী হওয়ারই কথা। দেশ কীভাবে চলবে তা ঠিক করার কথা জনগণের, আর সে-মোতাবেক যা যা করণীয় তা বাস্তবায়ন করার কথা জনগণের কর্মচারী-প্রতিনিধিদের। অর্থাৎ আইনত দেশ চলার কথা মালিকের

মতে; বাস্তবে চলছে কর্মচারীদের হুকুমে। এখন তাহলে মালিকের কর্তব্য হলো এইসব প্রতিনিধি-কর্মচারীদের বরখাস্ত করে নতুন কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া। কিন্তু সংবিধানে মালিককে সেই অধিকার দেওয়া হয় নি। এই অধিকারটা দেওয়া হলে সত্যিকারের জনগণতন্ত্র বা গণসাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পথে বিরাট একটা ধাপ দেওয়া যায়। সেই মান্ধাতা আমলের প্যারি কমিউনেই ভোটারদের এই 'রাইট টু রিকল' এর বন্দোবস্ত ছিল। আমার নির্বাচিত প্রতিনিধিকে প্রয়োজনে আমি যদি বরখাস্ত করে নতুন প্রতিনিধি নিয়োগ দিতেই না পারি, কোথায় আমার ক্ষমতা? গণতন্ত্র মানে ক্ষমতা সত্যি সত্যি জনগণের হাতে। এর কোনো বিকল্প থাকার প্রশ্নই ওঠে না। এই লক্ষ্যে তাহলে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় সংস্কার কায়েম করুক। এই প্রশ্নে সুশীল সমাজের চিন্তাশালার দিকপালদের মতামতও প্রকাশিত হওয়া দরকার।

এমন একটা প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা আমি বলছি যেখানে রাজনৈতিক দলের কোনো প্রতিনিধি দরকার নাই। প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন পাড়া মহল্লা গ্রাম ইউনিয়ন পৌরসভা উপজেলা জেলা বিভাগ প্রভৃতি পর্যায়ের সমস্ত শ্রমজীবী ও পেশাজীবী মানুষের মধ্য থেকে। এতক্ষণ আমি যে প্রস্তাবগুলোর কথা বলেছি, সেগুলো কিন্তু অতি-অভিনব কোনো প্রস্তাব নয়। কমপক্ষে গত দুই শ বছর ধরে ধ্র'পদী উদারনীতিবাদী, মুক্তিপরায়ণ ও গণতন্ত্রী চিন্তা-আন্দোলনের ব্যক্তিবর্গ কমবেশি এই ধারায় কথা বলছেন। বাস্তব সমাজেও গণমানুষ বারবার এসব ধারণা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছে। ১৯১৭ সালে বৃটিশ চিন্তক উইলিয়াম পল তাঁর রাষ্ট্র: এর উৎপত্তি ও কাজ নামের বইতে বলেছিলেন, 'এভাবে, সামাজিক প্রশাসনের স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পরিষদসমূহে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব ঘটবে যাঁরা সামাজিক কাজকর্মাদি এবং সমাজের শ্রমকর্মসমূহের তথা শিল্পকলকারখানার দায়িত্ব বহন করেন। এভাবে, কর্ম-দায়িত্ব বহনকারী এবং সমাজ সম্প্রদায়ের চাহিদা সম্পর্কে গভীরভাবে অবগত মানুষজনের কাছ থেকে উৎসারিত হয়ে এ ধরনের প্রতিনিধিদের ক্ষমতা প্রবাহিত হবে ওপরের দিকে। কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক শিল্পকারখানা পরিষদ যখন বসবে, সামাজিক কাজকর্মের প্রতিটা পর্যায়কে তারা প্রতিনিধিত্ব করবে।'

নোম চমস্কিরই ভাষায় যদি সারসংক্ষেপ করি, 'তাহলে হয়ত আপনি শ্রমিক পরিষদ, গ্রাহক-ভোক্তা পরিষদ, কমিউন-সভা, আঞ্চলিক ফেডারেশন ইত্যাদি প্রভৃতি নিয়ে গঠিত একটা ব্যবস্থার কথা কল্পনা করতে পারছেন, যে ব্যবস্থার মধ্যে থাকছে এমন এক ধরনের প্রতিনিধিত্ব যা প্রত্যক্ষ ও প্রত্যাহারযোগ্য, এই অর্থে যে, সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত ও সুসংহত যে সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের পক্ষে এই প্রতিনিধিরা কোনো একটা উচ্চতর সংস্থায় কথা বলেন, সেইসব গোষ্ঠীর কাছেই তাঁরা প্রত্যক্ষ-ভাবে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন, আর সেই গোষ্ঠীগুলোর কাছেই তাঁদেরকে

প্রত্যক্ষভাবে ফিরে আসতে হয়। আমাদের প্রতিনিধিত্ব-ব্যবস্থার চেয়ে যে অনেক আলাদা জিনিস, সেটা এমনিতেই বোঝা যাচ্ছে।' (নোম চমস্কি, ১৯৭০)

অন্যত্র বলেছি, অক্টোবর-মহাসংকটের মাৎস্যন্যায়-পর্বের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল জনগণের সতর্ক দূরত্বে অবস্থান করা। রাজনীতি তথা ক্ষমতা-ভাগাভাগির পুরো প্রক্রিয়াটি থেকেই তাঁরা নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বা পুরো প্রক্রিয়া -টিকেই তাঁরা রীতিমতো সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু বিকল্প শক্তি হিসেবে নিজেদেরকে তাঁরা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন নি। রাজনৈতিক দলগুলোর চক্কর থেকে বেরিয়ে অনেকে গিয়ে পড়েছেন নগদ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ এনজিও সুশীল সমাজের মিষ্টি কথামালার খপ্পরে। সামান্য খেয়াল করলেই এর কারণটা বোঝা যাবে। সামন্ত-বুর্জোয়াদের আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগ তো বটেই, নিজেদেরকে বামপন্থী বলে বিশ্বাস করা দলগুলোও চিরকাল চেয়েছে জনগণের সব দায়িত্ব নিয়ে নিতে। জনগণের নিজেদের চিন্তা-পর্যালোচনা করার, নিজেরা সংগঠিত হয়ে নিজেদের সমস্যা সমাধান করার তথা নিজেরা নিজেদেরকে পরিচালনা করার শক্তি-সক্ষমতা বিকশিত হোক, সেটা এঁরা কেউই কোনোদিন চান নি। ভালোমন্দ ডানবাম দল সকলেই চেয়েছেন জনগণ তাঁদের 'সঠিক' নেতৃত্ব অনুসরণ করুক মাত্র, সেটাই জনগণের পবিত্র কর্তব্য। বিদ্যা দিয়ে এবং বেত দিয়ে জনসাধারণকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে। এখনও চলছে সেই একই ট্রেনিং। স্থানীয় কোনো সমস্যা দেখা দিলে নিজেদের সমাধান নিজেরা করার চেষ্টা করার দরকার নাই, বরং জমিদার-মাতব্বর-চেয়ারম্যান টিএনও-এমপি-ডিসি মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীকে গিয়ে বল, আবেদন-নিবেদন কর, ধর্ণা দাও। জাতীয় কোনো সমস্যা দেখা দিলে রাজনৈতিক দলের গুটিকয় নেতার প্রশ্নাতীত নেতৃত্বে সেই দলের নেতানির্ভর কর্মীকূল সেজে আর নাম-পরিচয়হীন দুর্বল মানুষের দল হয়ে বড় বড় সভা-সমিতিতে যাও, বিক্ষোভ করো, অকাতরে জীবন দাও। তারপর পরিস্থিতি বদলালে দেখতে পাবে নতুন দল নতুন নেতা নতুন সরকার এমনকি নতুন দেশ, কিন্তু সেই পুরোনো কর্তৃত্ব-পরায়ণতা সেই পুরোনো আমলাতন্ত্র সেই পুরোনো জেলজুলুম-আইন-আদালত, আর সেই চিরন্তন দুঃখ-দারিদ্র্য-নিপীড়ণ। এইসব করতে করতে এইসব দেখতে দেখতে মানুষ রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে, যাবতীয় দলের ওপর থেকে আস্থা হারিয়েছে; অথচ নিজেরা নিজেদের শক্তিতে সংগঠিত হয় নি, প্রয়োজনটুকু বোধ করে নি, হওয়ার মতো দূরদৃষ্টিও অর্জন করে নি, এবং আত্মশক্তি ও আত্মকর্তৃত্বের ওপর আস্থা রাখার কল্পনাও করতে পারে নি। ফলে এখনও তারা মনে করে মহান কোনো রাষ্ট্র-অবতার একদিন আকাশ থেকে অবতরণ করে তাদেরকে উন্নত জীবনের ব্যবস্থা কায়েম করে দেবেন। এখানেই আবহমান কালের শাসন-

কর্তৃত্বের সফলতা, আর এখানেই সত্যিকারের গণতন্ত্র গড়ে ওঠার পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা। অক্টোবর-মহাসংকটের এখানেই আসল বীজ।

বিগত ২০০৬ সালের অক্টোবরে বা তার আগে-আগে আওয়ামী লীগ বিএনপি জামায়াত কেউ চান নি ঘনায়মান গুরুতর সংকটে জনগণ রাস্তায় নেমে একটা অবস্থান নিক। তাঁরা বরং নিজ নিজ সশস্ত্র বাহিনীসমূহকে রাজপথে মোতায়েন করেছেন। জনগণকে নিঃশব্দ বার্তায় জানিয়ে দিয়েছেন তোমরা ঘরে থাকো, তোমাদের তথা দেশের শত্রুদেরকে সাইজ করার জন্য আমরাই যথেষ্ট (অবশ্য যদি তোমরা দাবা-বোর্ডের পদাতিক-বড়ে হিসেবে আমাদের দিকে 'যোগ' দাও, তাহলে মোস্ট ওয়েলকাম)। জনগণ কোনো পক্ষেই যোগ দেন নি। কিংবা ১১ই জানুয়ারির পর, সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন সরকারও জনগণকে ডাক দিয়ে বলেন নি, সকলে আসুন, ঐতিহাসিক সুযোগ এসেছে, এবার আপনারা নিজের হাতে আপনাদের নিজেদের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলো গড়ে তুলুন, যেন রাজনৈতিক দলগুলোর রাক্ষসেরা আর কোনোদিন ফিরে আসতে না পারে। তাঁরা তো বরং জনগণকে সশব্দ ঘোষণায়, রীতিমতো 'আইন' প্রণয়ন করে, মিডিয়া-মাইকিং করে, জানিয়ে দিয়েছেন, খবরদার, কেউ একত্রিত হবে না, সভা-সমাবেশ-সমিতি-সংগঠন করবে না, কথা-বার্তা-বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হবে না, যা করার আমরা করব, যা বলার আমরাই বলব, তাপরও আরো কিছু বলার থাকলে মিনমিন করে মিডিয়া বলবে, এতে তোমাদেরই মঙ্গল। এমনকি সুশীল সমাজের দণ্ডধারী কর্তাকত্রীরা এবং তাদের মিডিয়াও জনগণকে সংগঠিত করার বদলে নিজের শক্তির প্রদর্শন করার পথই গ্রহণ করেছিল। তাঁদের জোর বলতে অবশ্য তাঁদের গলার জোর বা প্রচারের জোর তথা পুঁজির জোর, আর নানাবিধ আঞ্চলিক-আন্তর্জাতিক মুরুব্বিদের ধমকের জোর, যে ধমকের উৎস সেই আঞ্চলিক-আন্তর্জাতিক সামরিক শক্তিই তো।

রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, বৈদেশিক পরাশক্তিসমূহ ও সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি জনগণের বিপুল অংশও যদি সংগঠিত স্বাধীন সচেতন শক্তি হিসেবে নিজেরা রাস্তায় অবস্থান নিতেন, তাহলে ২০০৬ সালের ২৮শে অক্টোবরের পরে ১১ই জানুয়ারির জরুরি অবস্থার দিকে নয়, বাংলাদেশের ইতিহাস হয়ত একেবারেই ভিন্নখাতে প্রবাহিত হতো। শাসকরা তো চিরকালই চায় জনগণের নিষ্ক্রিয়তা। জনগণ সক্রিয় হলেই কেবল আমরা সত্যিকারের গণতন্ত্রের আসল প্রশ্নগুলোকে জাতীয় আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে পারব। সর্বকালেই রাজায়-রাজায় যুদ্ধে তো উলুখাগড়ারই প্রাণ যায়, নিষ্ক্রিয়-সতর্ক দূরত্ব রচনা করে তাহলে লাভ কী? তার চেয়ে একবার যদি উলুখাগড়াও যুদ্ধে নামে, উন্নততর গণতান্ত্রিক সংগঠনে সংগঠিত হয়ে অধিকতর মানবিক নীতিবোধের সুবৃহৎ ঝাণ্ডা তুলে ধ'রে উচ্ছেদ করে দেশের

সকল রাজাকে তাহলেই আমরা পাব 'গণসাধারণতন্ত্রী' বাংলাদেশ রাষ্ট্র। আওয়ামী লীগ আর বিএনপির ভয়ের রাজত্বেও আমরা কানসাট-ফুলবাড়িতে জনগণের সংগঠিত সক্রিয়তার নমুনা দেখেছি। জরুরি অবস্থার আতঙ্কের রাজত্বেও আমরা কৃষক-শ্রমিক, বস্তিবাসী, গার্মেন্টস-কর্মী এবং ছাত্র-শিক্ষকের সক্রিয়তার উদ্ভাস ঘটতে দেখছি। পরিবর্তনকামী বৈপ্লবিক বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা যদি এই গণসক্রিয়তার সাথে সংহতি স্থাপন করতে পারে, তাহলে রাষ্ট্র আর সমাজের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক কাঠামো বিনির্মাণের পথ আমরা ঠিকই খুঁজে নিতে পারব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুক্তিমুখিন সমাজতান্ত্রিক ধারার সক্রিয় কর্মী-বুদ্ধিজীবী নোম চমস্কি একবার আর্জেন্টিনার আদিবাসীর কাছ থেকে শিখে এসে বলেছিলেন, লড়াইটা হচ্ছে খাঁচার মেঝেকে ক্রমাগতভাবে প্রসারিত করতে থাকার লড়াই। খাঁচার ভেতরে থাকা মানুষ যেমন খাঁচাটাকে ভেঙে ফেলতে চায়, খাঁচার বাইরে থাকা মনুষ্যত্ববিরোধী হিংস্র জন্তুরাও খাঁচাটাকে ভেঙে ফেলতে চায়। খাঁচাটা একদিকে যেমন আমাদেরকে বন্দি করে রাখে, স্বাধীনভাবে বিচরণের এলাকা সংকুচিত করে রাখে, অন্যদিকে তেমনি ঐ হিংস্র শ্বাপদদের দাঁত-নখ-থাবা থেকে আমাদেরকে রক্ষাও করে। সুতরাং বাহিরের মারাত্মক জন্তুগুলোর চেয়ে অনেক শক্তিশালী না হয়ে ওঠা পর্যন্ত এখনই খাঁচাটাকে আমরা দুর্বল করে ফেলব না, ভেঙে তো ফেলবই না, খাঁচার মেঝেটাকে বরং আমরা প্রসারিত করতে থাকব, খাঁচাটাকে আরও বড় করে তৈরি করতে থাকব যেন আরও প্রসারিত হয় মেঝেটা, সেই সাথে খাঁচাটাকে শক্তিশালীও রাখব। এভাবে, একদিকে বাড়াতে থাকব স্বাধীনতার সীমানা, অন্যদিকে প্রস্তুতি নিতে থাকব শেষ পর্যন্ত খাঁচাটাকেই উপড়ে ফেলতে। আমাদের দেশে গণতন্ত্র নামে চালু ব্যবস্থাটা যত দুর্বল এবং সীমিত ধরনেরই হোক না কেন, সেটাকে বাঁচিয়ে রাখা এবং শক্তিশালী করে তোলাটা আমাদের কাজ। এই গণতন্ত্রটুকু আছে বলেই সরকারের সশস্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ, সরকারের বাহিরের অন্ধ-পশ্চাদমুখী অপশক্তিগুলো আমাদেরকে অন্ধকারের যুগে নিয়ে যেতে পারে না। এমনকি কখনও কখনও তারা চেষ্টা করলেও ঐ গণতন্ত্রটুকুর দোহাই দিয়েই আমরা তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারি, গণ-লড়াইয়ে লিপ্ত হতে পারি। আর আমাদের প্রতিটা লড়াই গণতন্ত্রের কাঠামোটাকে আরেকটু শক্তিশালী করে, মানুষের স্বাধীনতার সীমাটা আরো খানিক বিস্তৃত হয়। এই করতে করতেই তো এত দূর।

রাবি: জানুয়ারি ২০০৮। প্রকাশ: প্রবাসী বাঙালিদের অনলাইন পত্রিকা *ইউকেবেঙ্গলি*, লন্ডন, ৪ঠা মে ২০০৮।

সমাজের বেসামরিক রূপান্তরের কর্তব্য

Francisco de Goya. The Execution of the Defenders of Madrid. 1814.

খবর: এক। লক্ষ্মীপুরের বিএনপি নেতা ও পিপি অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের চাঞ্চল্যকর মামলায় ফাঁসির দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামি এইচএম বিপ্লবের ফাঁসির দণ্ড মওকুফ করা হয়েছে। আসামির বাবার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান গত ১৪ জুলাই বিপ্লবের ফাঁসির দণ্ড মওকুফ করেন। বিপ্লব লক্ষ্মীপুর পৌরসভার মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা আবু তাহেরের ছেলে। সে লক্ষ্মীপুর পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী। — দৈনিক সমকাল

খবর: দুই। ঢাকা, জুলাই ১৮ (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম)- সাভারে ডাকাত সন্দেহে গণপিটুনিতে প্রাণ হারিয়েছেন ছয় ছাত্র। পুলিশ বলছে, এলাকাবাসীর উত্তেজনার কারণে কিছু করা যায়নি।

সোমবার ভোররাতে সাভারের আমিনবাজারের বড়দেশী এলাকার

কেবলার চরে স্থানীয়দের পিটুনিতে ছয় ছাত্র নিহত হন। এরা হলেন, ইব্রাহিম খলিল (স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ-বাংলা কলেজ), তৌহিদুর রহমান পলাশ (স্নাতক তৃতীয় বর্ষ-বাংলা কলেজ), কামরুজ্জাম কান্ত (স্নাতক প্রথম বর্ষ-বাংলা কলেজ), টিপু সুলতান (স্নাতক প্রথম পর্ষ তেজগাঁও সরকারি কলেজ), শামস্ রহিম শাম্মাম ('এ' লেভেল-মাস্টারমাইন্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ) ও মনির সেতাফ (বিবিএ-বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি)।

তাদের সবার বাসা মিরপুরের দারুস সালাম ও শ্যামলী এলাকায়। নিহতদের লাশ পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে। – বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

আমি যা যা বুঝলাম

১। এই রাষ্ট্র তার নাগরিকদেরকে আইনসম্মতভাবে খুন করার মাধ্যমে সমাজকে অপরাধশূন্য করতে চায়। এই চাওয়ার নাম আইনের শাসন। এমন একটি রাষ্ট্র আমাদের এখানে বহাল রয়েছে, যেখানে নাগরিকদের বাঁচামরা 'রাষ্ট্রপতি' নামক একজন ব্যক্তির হাতে। এখানে রাষ্ট্রই আজরাইল। (মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান কি তার স্ত্রী হত্যাকারীদের এইরূপ ক্ষমা করতে পারবেন? মহামান্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কি তার পিতার হত্যাকারীদের ক্ষমা করতে পেরেছেন?)

২। আমাদের দণ্ডবিধি ও বিচারব্যবস্থা (তথা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক গড়ন) 'খুনের বদলা খুন', 'দাঁতের বদলা দাঁত', 'চোখের বদলা চোখ' জাতীয় বাইবেলীয় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর সাথে ন্যায়বিচারের কোনো সম্পর্কই নেই।

৩। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ থেকে অপরাধ কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু বিদ্যমান আইনের শাসনে অপরাধ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। পরিসংখ্যান বলছে: মৃত্যুদণ্ড যে রাষ্ট্রে বেশি, খুনের সংখ্যাও সেখানে বেশি। যেখানে কারাগার বেশি সেখানে অপরাধও বেশি।[১]

---

১ এ নিয়ে তথ্য-পরিসংখ্যানের শেষ নাই। আপাতত ড. রাডেলেট এবং জনাব লেইককের ২০০৯ সালে করা একটা গবেষণার খবরটুকু দিয়ে রাখা যাক। ড. রাডেলেট ইউনিভার্সিটি অফ কলোরাডো-বোল্ডারের সমাজবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর এবং চেয়ারপার্সন। লেইকক ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই পিএইচডি-গবেষক। মৃত্যুদণ্ড খুনখারাবির হার কমায় কিনা তাই নিয়ে ওঁরা দু-জন নেতৃস্থানীয় সব অপরাধবিজ্ঞানীর মতামত সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁদের গবেষণায় দেখা গেল: মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে মানুষ খুন করা থেকে বিরত থাকে কিনা তা নিয়ে যত প্রত্যক্ষ-প্রামাণিক গবেষণা এ যাবত হয়েছে তাতে করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় যে

৪। ব্যক্তির সম্পাদিত খুনের বদলা হিসেবে রাষ্ট্রের করা খুন চললে, মানে খুনের বদলা খুন চললে, রাষ্ট্র দিনে দিনে হিংস্র হয়, সমাজ দিনে দিনে রক্তশূন্য হয়। চোখের বদলা চোখ নীতি সমাজকে অন্ধ করে দিতে থাকে [গান্ধী]। আমিনবাজারের 'ছয় খুন' এবং তার পরবর্তী ঘটনায় রাষ্ট্রের হিংস্রতা, সমাজের রক্তশূন্যতা ও অন্ধ হয়ে যেতে থাকার বিভীষিকাকে স্পষ্ট করে তুলেছে আরো একবার। হিংসা (হনন করিবার ইচ্ছা) এবং বলপ্রয়োগের (হিংস্রতা) ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-সমাজে এগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়, নতুন ঘটনাও নয়, অসম্ভব ঘটনাও নয়।

৫। আমিনবাজারের ঘটনাকে বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যর্থতা, তথা 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা'র ক্ষেত্রে ঘাটতি, হিসেবে অনেকে দেখছেন। এঁরা বলছেন, আইনের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলায় মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। যেমন ফরহাদ মজহার ভাবছেন:

> দুটোই আইন বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড। রাষ্ট্র আইন ভেঙ্গে আইনের বাইরে নাগরিকদের হত্যাকে ক্রসফায়ার বা এনকাউন্টার বলে সাফাই গায় আর মানুষ আইনের ওপর ভরসা ছেড়ে দিয়ে ধর ধর মার মার বলে কাউকে চোর ডাকাত, পকেটমার, ছেলেধরা ইত্যাদি গণ্য করে পিটিয়ে মারে। দুই পক্ষের কেউই আইন মানছে না। আইনী প্রক্রিয়ায় অপরাধীর বিচার ও শাস্তি সম্ভব দুই পক্ষের কেউই সেটা মানে না। (ফরহাদ মজহার, ২০০১)

তাজা ছয়টা মানুষের টগবগানো খুনের ঘটনাকে কেউ স্রেফ 'আইনের সমস্যা' বলে মনে করাটা 'আইনের শাসনের' বিদ্যমান মতাদর্শের দাপটেরই প্রমাণ। কিন্তু বাস্তবে এটা 'আইনের শাসন'-এর মামলা নয়। বরং উল্টা। যেটাকে শাসকশ্রেণীর মহাজনরা 'আইনের শাসন' বলেন, সেটা তো আসলে দমনপীড়ণমূলক আইনের শাসন। এখানে আইনের লক্ষ্যই হলো গুটিকয় মানুষ কর্তৃক বাকি সমস্ত অগণন মানুষকে দমন-পীড়ণ-শাসন-নিয়ন্ত্রণ করা। এই জাতীয় আইনের শাসন যত বাড়ে, সমাজে তত বেশি বাড়ে হিংস্রতা ও বলপ্রয়োগের বাসনা। তখনই বাড়ে গণপিটুনিসহ নানান ধরনের অপরাধের প্রবণতা। মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' হিসাব দিচ্ছে: '২০১০ সালে গণপিটুনির শিকার হয়ে মারা গেছেন ১৭৪ জন। সে হিসেবে গড়ে প্রতি দুই দিনে ১ জন গণপিটুনির শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন।' অধিকারের প্রতিবেদনে বলা

খুন করা থেকে কাউকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের ভয় কোনো প্রভাব ফেলে না। এবং এই গবেষণার প্রায়-সব অপরাধবিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন। (মাইকেল রাডেলেট এবং ট্রেসি লেইকক, ২০০৯) এই জাতীয় অনুসন্ধান-গবেষণার খোঁজ যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন, এ কোনো নতুন খবর না।

হয়েছে, 'আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমেই নাজুক হয়ে ওঠায় জনগণের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে' (http://bangla.newsbnn.com/2011/01/08/40433)। এতে করে তথাকথিত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার বর্তমান কালের রোগলক্ষণই বরং ফুটে উঠেছে।

ফরহাদ মজহারের আইন না মানার কথা বলেছেন। আইন না মানার ইঙ্গিত 'অধিকার'ও দিয়েছে। 'অধিকারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমেই নাজুক হয়ে ওঠায় জনগণের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে'। কিন্তু আদতে ভোট, আইনের শাসন, গণতন্ত্র এবং বর্তমান বলপ্রয়োগমূলক রাষ্ট্রকাঠামোর প্রতি বুদ্ধিজীবীদের, মানবাধিকার সংগঠন-সমূহের, এবং এদেশের মানুষের আস্থা মূলত অটুট আছে। এই বলপ্রয়োগমূলক রাষ্ট্রকাঠামোর প্রতি জনগণের মধ্যে অনাস্থা সৃষ্টি হলেই বরং ভালো হতো। তাতে করে নতুন ধরনের, বলপ্রয়োগ থেকে আরো মুক্ত, আরো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের কথা তুলতে সহজ হতো।

৬। আইনবিহীন মাৎসন্যায় কেউই চান না। কিন্তু দমন-পীড়ণ-নিয়ন্ত্রণমূলক আইনের শাসনের ব্যর্থতা অসংখ্যবার, পূর্ণ মাত্রায় প্রমাণিত হয়েছে। এই কেন্দ্রীভূত শাসন নিতান্তই রাজনৈতিক, কর্তৃত্বমূলক। এই আইন মৃত অক্ষর মাত্র, প্রাচীন শাস্ত্র মাত্র। এই আইন অন্ধ, বিবেকহীন, মনুষ্যোচিত বিবেচনাহীন। ঘটনা যা-ই ঘটুক, এই আইন সকলকে কানার মতো 'সমান'ভাবে দেখে। টাকা-প্রভাব-প্রতিপত্তি দিয়ে কেনা 'সাক্ষ্য' ছাড়া এই আইন কিছুই দেখে না। সাক্ষাৎ সম্মুখে ঘটা ঘটনার বিচারও করতে পারে না এই আইন। এই আইন শাস্তিমূলক, প্রতিশোধমূলক, বলপ্রয়োগ-মূলক। হিংসার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের দরকার পারস্পরিক সহযোগিতামূলক, সার্বিক সম্মতিমূলক, সামাজিক আইনের শাসন। আমাদের দরকার প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। সামাজিক গণতন্ত্র (রাজনৈতিক গণতন্ত্র নয়)। এখানে আইন প্রণয়ন করবেন পার্লামেন্ট নয়, কোনো জনপ্রতিনিধি রাখাল-প্রভু-শাসক-হুজুর নয়, খোদ জনগণ, খোদ সমাজ-সম্প্রদায়-কমিউনিটি। তাতে রাষ্ট্রের নাক গলানো চলবে না। কোনো লেনেদেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ-সম্প্রদায়-সমাজ স্বাধীনভাবে, স্বেচ্ছায়, নিজেরা-নিজেরা নিজেদের জন্য প্রযোজ্য আইন/নিয়ম/রীতিনীতি প্রণয়ন করবে। এ পথেই মানুষ পাড়ি দিয়ে এসেছে লক্ষ বছর।

কোনো হুজুর-কর্তৃপক্ষকে আইন প্রণয়ন বা প্রয়োগ করতে দেওয়া হবে না। বর্তমান আইন বৈষম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, বৈষম্যকে সৃষ্টি করে, বৈষম্যকে রক্ষা করে।

এটা বড়লোক-কর্তৃপক্ষের আইন। বড়লোককে-কর্তৃপক্ষকে পাহারা দেওয়ার আইন। এই আইন-আদালত-কারাগার না থাকলে বিদ্যমানে আর্থ-রাজনৈতিক বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে যাবে। বৈষম্য যাবতীয় অপরাধের প্রধান এক কারণ।

আমাদের দরকার 'আল্লার আইন' – প্রকৃতির বিধান। সকল প্রাণীর জন্য প্রকৃতির বিধান হচ্ছে: প্রেম, ভালোবাসা, সহযোগিতা, সংহতি, স্বনিয়ন্ত্রণ, কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বহীনতা, পূর্ণ স্বাধীনতা ও সমান সুযোগ। মানুষের সমাজও এই বিধানে চলা সম্ভব। আদি কাল থেকে তা-ই চলছে। চিরকালই ব্যগড়া বাধিয়েছে শুধু গুটিকয়ের কর্তৃত্ব-কর্তৃপক্ষ-বন্দুক-বরকন্দাজের আইন। কর্তৃত্বপরায়ণ আইন মানবপ্রজাতির লক্ষ বছরের সাধনায় অর্জিত এইসব সদগুণাবলীকে দূষিত করে। ক্ষমতা সর্বশ্রেষ্ঠকেও দূষিত করে। যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ।

৭। আমাদের বর্তমানের পুরো সমাজ (বুনিয়াদি সংস্থা পরিবার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ সংস্থা পর্যন্ত) হিংসা, বলপ্রয়োগ, এবং লোভলালসা, ক্রোধ ইত্যাদি রিপুর ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজকে বিদ্যমান (রবীন্দ্রনাথকথিত) 'বিভীষিকা-পন্থা'র হাত থেকে বাঁচাতে গেলে : (ক) সমাজ ও রাষ্ট্রের গোড়া থেকে বলপ্রয়োগকে সরাতে হবে। একে পুরোপুরি অবৈধ ও অকল্পনীয় গণ্য করার মতো মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে। (খ) রাষ্ট্রের দিক থেকে বলপ্রয়োগ করতে পারার মতো সমস্ত সংস্থাকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে এনে শেষমেষ বিলুপ্ত করে দিতে হবে। দণ্ডবিধিনির্ভর পুলিশীপ্রথা, প্রতিশোধপরায়ণ বিচারব্যবস্থা, কারাগার, সামরিক বাহিনী ও সংস্থাসমূহ প্রভৃতি মুক্ত একটা রাষ্ট্রের দিকে অগ্রসর হতে ক্রমাগতভাবে। (গ) নাগরিকদের স্বেচ্ছামূলক, স্বশাসনমূলক বন্ধুত্ব-ভালোবাসা-সহযোগিতার নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ বেসামরিক পূনর্গঠন সম্পন্ন করার দিকে মন দিতে হবে। তার জন্য শিক্ষাপ্রণালীতে, মিডিয়াপ্রণালীতে এবং বিজ্ঞাপনপ্রণালীতে ইতিবাচক মূল্যবোধগুলির প্রসার ঘটাতে হবে। খুনখারাবি-হিংসার শ্রুতি-দৃশ্য-উচ্চারণকে হারাম করে দিতে হবে।

৮। সমাজের বেসামরিক রূপান্তর ঘটানোর লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সারসত্তাকে সামাজিক সারসত্তায় রূপান্তরিত করা। বর্তমান রাজনৈতিক রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে সামাজিক রাষ্ট্রে পরিণত করা। রাষ্ট্র ও সমাজ এখানে বিশাল এক সমুদ্রের মতো যার মধ্যে একেকজন ব্যক্তি একেকটি স্বাধীন সামাজিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

৯। যাবতীয় নষ্টের গোড়া হলো রাজনীতি। রাজনীতি মানেই কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্ব, হানাহানি, যুদ্ধ, থানা পুলিশ-আইন-বিচার-কারাগার-র‍্যাব-ক্রসফায়ার-সৈন্যবাহিনী -মৃত্যুদণ্ড। রাজনীতি হলো গিয়ে সমাজবহির্ভূত ও সমাজের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত

একটি প্রতিষ্ঠান। এটি বলপ্রয়োগের জোরে (এবং মিথ্যা ও ফুসলানির মাধ্যমে) সমাজের মাথায় উঠে বসেছে। মাথায় বসে কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে। এই বিশাল দানবের ভার সমাজ আর সইতে পারছে না। সমাজের মৃত্যুদশা উপস্থিত। সুতরাং এই রাজনীতি-রাক্ষসকে সমাজের মাথা থেকে নামানো দরকার। রাজনীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা দরকার। রাজনীতির মূলমন্ত্র বলপ্রয়োগ ও মিথ্যাপ্রচার। রাজনীতিমুক্ত সমাজের মূলনীতি হবে: প্রত্যেক নাগরিক ও সম্প্রদায়ের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা এবং পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা।

১০। সমাজের বেসামরিক রূপান্তর ঘটানোর কাজে (ক) মুক্তিমুখিন সমাজতন্ত্র তথা নৈরাজ্যবাদ ও (খ) ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ [পশ্চিমের], এবং (গ) তন্ত্র-জেন-সুফি-সহজিয়া [প্রাচ্যের] ধারাসমূহের বাস্তব চর্চা ও ধ্যানধারণা-রূপকল্প আমাদের দিশাহারা সমাজকে দিশা [ভিশন] বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে বলে আমার ধারণা।

রাজশাহী: ২০শে জুলাই ২০১১

প্রকাশের তথ্য: এ লেখার আদি শিরোনাম ছিল: 'ফাঁসির আসামীর দণ্ড মওকুফ, আমিনবাজারে ছয় খুন এবং সমাজের বেসামরিক রূপান্তরের কর্তব্য'। আদতে এটা লেখা হয়েছিল 'রাজনৈতিক ডট কম' নামে একটা ওয়েবসাইটে। সাইটটা পরে বন্ধ হয়ে যায়। খেয়াল করার পরে তখন ফেসবুকে নোট আকারে তুলে রেখেছিলাম ২৬শে জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে।

চতুর্থ ভাগ

হিংসা বিদ্বেষ বসন্ত

ষোলো

বাংলা-বসন্ত: আসছে ফাল্গুনের আগাম ইশতেহার

New York Times: A 40-Year Quest for Justice

এ তো রীতিমতো অরাজকতা। খোদ রাজধানী থেকে রাজনীতি-রাজতন্ত্র উঠে গেল নাকি? রাজার অনুমতি ছাড়াই সমাবেশ হচ্ছে দিব্যি। তাও আবার রাস্তা বন্ধ করে সমাবেশ। মানুষের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। সর্বনাশের কথা। উপরন্তু শাহবাগের সমাবেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজনীতিকেরা সেখানে বক্তৃতা করতে পারবেন না। সাহারা খাতুন, মাহবুব-উল-আলম হানিফরা বক্তৃতা করতে গিয়ে অপদস্ত হয়েছেন এরই মধ্যে। এই সমাবেশ তার মানে রাজনীতিবিরোধী। অরাজকতা ছাড়া কী?

'অরাজকতা' মানে 'রাজা'বিহীন বন্দোবস্ত। রাজা-রাজনীতি-হুজুর-হোমরা চোমরা ছাড়াই নিজেরা নিজেদেরকে পরিচালনা করার স্বকৃত বিন্যাস। এরই তো নাম অরাজকতা। এই সমাবেশের রাজনীতিবিরোধিতার ভেতরে সুপ্তভাবে হলেও আছে 'অরাজ'-এর ধারণা: অরাজনীতি, অরাজতন্ত্র। অন্য ভাষায় একেই বলে নৈরাজ্য।

নৈরাজ্য মানে স্বাধীনতা। নৈরাজ্য মানে স্বনিয়ন্ত্রণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মকর্তৃত্ব। নৈরাজ্য মানে 'আমরা সবাই রাজা'। সুপ্ত এই উপাদানগুলো ক্রমশ স্পষ্ট ভাষায় যতো বেশি প্রকাশিত হয়ে উঠবে, শাহবাগ-সমাবেশ ততো বেশি এগিয়ে যাবে তাহরির স্কয়ারের দিকে। আরবিতে 'তাহরির' মানে কিন্তু 'স্বাধীনতা'ই বটে। শাহবাগ -চত্বর ঠিকই এগিয়ে চলেছে স্বাধীনতা-চত্বরের দিকে।

নব্বুইয়ের শুরুতে আরম্ভ হওয়া আইনের শাসনের অগোছালো বোলচাল ১/১১-তে আইনের সুসংগঠিত বিভীষিকাপন্থার দাঁত-নখ-পেশী দেখিয়েছিল। তারই অনুরাগে (কিছু পরে কিছু আগে) কর্তৃপক্ষীয়, চাপিয়ে-দেয়া, শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচারণা মাধ্যমে এতদিন শুনে আসলাম: 'আইন তার নিজের গতিতে চলবে'! এখন দেখছি খোদ 'আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল'-এর আদেশ লোকে মানছে না। আদালতের জন্য লজ্জার কথা। এ তো রীতিমতো আদালত অবমাননা। এই ক'দিন আগেও যে হাইকোর্টের হাইথট-ওয়ালা সব রুলজারির কথা শুনছিলাম, রেডিওতে কীভাবে বাংলা বলা হবে, হুমায়ূন আহমেদ কীভাবে উপন্যাস লিখবেন ইত্যাদি প্রভৃতি কিছুই বাদ যাচ্ছিল না আইনের সুদীর্ঘ হাতের নাগাল থেকে, সেই হাইকোর্ট এখন চুপচাপ। তাজ্জব বটে।

রাস্তায় সমাবেশ নাকি অবৈধ! রাস্তায় সমাবেশ করলে গাড়ি চলতে অসুবিধা হয়, পণ্য-পরিবহনে বিঘ্ন ঘটে। সেই রাস্তা অধিকার করে সমাবেশ চলছে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা, লাগাতার। আশ্চর্য ব্যাপার। অধিক আশ্চর্যের ব্যাপার: বেয়াদব জনসাধারণ এই রাস্তা-অধিকার-করা আন্দোলন নিয়ে বিরক্ত হচ্ছেন না, মিডিয়ার কাছে নালিশ করছেন না, উল্টো বাড়ি থেকে ভাত এনে ছেলেমেয়েদের খেতে দিচ্ছেন। বাবা এগিয়ে দিচ্ছেন তার মেয়েকে। মা দোয়া করছেন ছেলের জন্য। বান্ধবী বন্ধুকে ফেসবুকে মেসেজ পাঠাচ্ছে: 'বাড়ি ছেড়ে পালালাম; শাহবাগে যাচ্ছি।'

আইনের শাসন আপাতত উধাও তাহলে! যেকোনো সমাবেশ করার জন্য, মাইক ব্যবহার করার জন্য, মেট্রোপালিটন পুলিশ কমিশনারের কাছে লিখিত আবেদন পেশ করতে হবে। তারপর তারা দয়া করে অনুমতি দেবেন (আদৌ যদি দেন)। কোথায় গেল সেইসব কর্তৃপক্ষীয়, চাপানো আইন-কানুন? আওয়ামী লীগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী না হয় এই আন্দোলনে লাভবান হবেন ভেবে সৌজন্যবশত এর ওপরে মরিচের গুঁড়া ছিটাচ্ছেন না। কিন্তু 'জনদুর্ভোগ'! কোথায় 'প্রথম আলো'? কোথায় গেল তাদের এতোদিনকার প্রিয় এজেন্ডা? মানুষ এতো নির্লজ্জ হয়! না, হয় না। আসলে মানুষ এতো নির্লজ্জ হয় না: কিন্তু পুঁজি হয়, ক্ষমতা হয়, সার্কুলেশন হয়। ওগুলো আসলে মানুষ না, মনুষ্যোচিত না, মনুষ্যবান্ধব না। শাহবাগের সমাবেশ যতোদিন এসবের দিকে মন না দেবে ততোদিন আমাদেরকে কর্মময় অপেক্ষার

উপাসনা করে যেতে হবে বৈকি। আপাতত পুলিশ-র‍্যাবের পাহারা আর মিডিয়ার অতি-তেলে তৈলাক্ত হওয়ার বিপদ সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে কিন্তু।

আইনত এখনও মাঘ মাস, শীতের রাজত্ব। তবু বেআইনত যে ফাল্গুনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে! বোঝা যাচ্ছে, মানুষ রাস্তায় নামলে সব কিছু বদলে যায়। বিচারবিভাগ দুশ্চিন্তায় পড়ে। পুলিশবিভাগ রুটিন দায়িত্বের বাইরে বেরুনোর আগে ভাবে। মিডিয়া একটা অরাজক আন্দোলনকে কাভার করার জন্য রাত জাগে। আর রাজনীতিবিদেরা ভাবতে থাকেন: আমাদের দিন কি ফুরিয়ে যাবে? এইসব বাচ্চা কাচ্চারা সময়মতো দুধভাত খেতে ঘরে ফিরবে তো?

আসলে দশচক্রে ভগবান ভূত। দশ যেখানে, ভগবানও সেখানে। বহুমত আর বৈচিত্র্যই এই আন্দোলনের শক্তি। সেজন্যেই এর মধ্যে রাজনীতিকরা ঢোকার চেষ্টা করছেন। একটু-আধটু ঢুকেও পড়ছেন রাষ্ট্রক্ষমতার জোরে। তারা নিজেরা যদি এরকম সমাবেশ ডাকতেন, দলীয় কর্মীরা ছাড়া কেউই আসতেন না, সে কথা সবারই জানা। সেজন্যই তরুণদের প্রাণবন্ত সমাবেশে সরীসৃপের মতো ঢুকছে রাজনীতি। ঢুকছে ষড়যন্ত্রও। ষড়যন্ত্রকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে হলে শাহবাগ-সমাবেশকে ইতোমধ্যে বিদ্যমান বহুমত-বৈচিত্র্য-রাজনীতিবিরোধিতা ধরে রাখার পাশাপাশি আনুভূমিক ও গণতান্ত্রিক নতুন সাংগঠনিক কাঠামো এবং নতুন ভাষা সৃজন করতে পারতে হবে। এটাই তাদের জন্য আসল চ্যালেঞ্জ।

রাস্তায় এতদিন শুধু জামায়াত ছিল। তাদের পেট্রো-ডলারের দাপট ছিল। কালো টাকায় কেনা, কালো টাকায় ভাড়া করা অস্ত্র এবং অস্ত্রধারী ছিল। কাঁচের শিশির পেট্রোলবোমা ছিল। এখন নিরস্ত্র-কিন্তু-স্বপ্নসশস্ত্র মানুষও রাস্তায় নেমেছেন। আনন্দ সংবাদ।

রিক্লেইম দ্য স্ট্রিট!': ইঙ্গ-মার্কিন-ইউরোপীয় মুলুকে আমাদের লড়াকু তরুণদের বহুদিনের আদরের শ্লোগান। ষাট-সত্তর দশকের ইউরোপ-জোড়া প্যারিস-বসন্ত থেকে শুরু করে শ্রমচোষা-রক্তচোষা মালিকদের হাত থেকে শিক্ষার্থী-শ্রমিকদের কলকারখানা পুনর্দখল-আন্দোলন আর প্রশাসক-প্রফেসরদের হাত থেকে ক্যাম্পাস কব্জা করার আন্দোলন; বর্ণবাদ-পুরুষতন্ত্র-শ্রেণিবৈষম্য-বিরোধী আন্দোলন, প্রকৃতি পুনরুদ্ধারের আন্দোলন; আশির দশকের যুদ্ধবিরোধী-আগ্রাসনবিরোধী-পরমাণু অস্ত্রবিরোধী আন্দোলন; নব্বুইয়ে এবং তার পরের দশকে পুঁজির বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে সিয়াটল-জেনোয়া-কানকুনের আন্দোলন আর আফগানিস্তান-ইরাক-যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন; এবং তারপর এই একুশ শতকে এসে লন্ডনে ছাত্রবেতনবিরোধী শিক্ষার্থী-আন্দোলন ও ইঙ্গ-মার্কিন-ইউরোপ-জোড়া পুঁজিবাদবিরোধী অকুপাই-আন্দোলন: এই সমস্ত আন্দোলনের প্রধানতম আইডিয়া এবং শ্লোগান ছিল 'রিকেইম

দ্য স্ট্রিট!'

না, রাজপথ দখল নয়: রাস্তার জনমালিকানা নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা। রাজপথ তো রাজার। রাজা যায়, রানি যায়, বাঁশি বাজে, পথিক আটকে থাকে, পাজেরো ছোটে প্রাসাদের দিকে। আর রাস্তা মুসাফিরের। রাস্তা পথিকের। রাস্তা অনুসন্ধানের। সেই রাস্তার পুনঃমালিকানা দাবি করেছে শাহবাগের সমাবেশ।

বিগত কুড়ি বছর ধরে আমাদেরকে শেখানো হচ্ছে, মিডিয়া-মুখস্ত করানো হচ্ছে:পার্লামেন্টই সকল সমস্যার সমাধানের উৎস। পার্লামেন্টে যে নাই, আইনত সে নাই। সে অস্তিত্বহীন: নন-এগজিস্টেন্ট। পার্লামেন্টারি-রাজনীতির ঘেরাটোপে গড়া এই আইনের শাসনের যুগে শাহবাগ-মহাসমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ করা শপথ অনুযায়ী রাস্তায় আন্দোলন হবে 'গণমানুষের নেতৃত্বে'। হায়, হায়। পার্লামেন্টের কী হবে? বাংলাদেশের নিওলিবারাল পুঁজির উচ্ছিষ্টভোজীদের কী হবে? 'প্রথম আলো'র সুশীল সমাজের কী হবে?

হ্যাঁ, তারা চাইবেন এই সমাবেশ শুধু আওয়ামী-ক্যাম্পের সংকীর্ণ রাজনৈতিক এজেন্ডা পূরণ করে সুশীল বালক-বালিকার মতো ঘরে ফিরে যাক। তারা চাইবেন: এই সমাবেশ শুধু ফাঁসি ফাঁসি করেই চিল্লাক। তারা চাইবেন: এই সমাবেশ ১৯৭১-এর চেতনায় 'জনগণের, জনগণের-জন্য, জনগণের-দ্বারা' পরিচালিতব্য বাংলাদেশের রূপরেখা নিয়ে মনোনিবেশ না করুক। কিন্তু সেটুকু করতে না পারলে স্রেফ গুটিকয় রাজাকারের ফাঁসি দিতে পারলেই কি একাত্তরের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ পাবো আমরা, একাত্তরেরই ঘোষণা মোতাবেক যে বাংলাদেশের মালিক এদেশের জনসাধারণ?

সুতরাং শাহবাগ-সমাবেশকে ভাবতে হবে নতুন ধারার, সত্যিকারের গণমুখি সংগঠন-সংস্থা-সংঘ-সমিতি-প্রতিষ্ঠান-সমাজ-বিন্যাস-কাঠামো নিয়ে। আজ শুধু এটুকু উচ্চারণ করে রাখি: মুখস্ত শ্লোগান, গতানুগতিক আইডিয়া আর সংকীর্ণ কথাবার্তার মধ্যে নিজেদেরকে পরিসীমিত করে রাখলে আমরা সরকার-স্পন্সরড, মিডিয়া-তেলে-তৈলাক্ত একটা অসার ফাঁসি-আন্দোলনে পর্যবসিত হবো মাত্র। তারপর ফাঁসি টাসি শেষ হয়ে গেলে ঘরে ফিরে দেখব আমাদেরই গলায় সেই চিরপুরাতন রাজনীতির ফাঁসটা লেগে আছে: নেতারা পার্লামেন্টের খোঁয়াড়ে চেঁচাচ্ছেন, পরস্পরকে খুন করছেন, সাগর-রুনির আত্মা হাহাকার করে চলেছে, ক্রসফায়ার-গুম-রিমান্ডের বিধান আরো বিকশিত হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশের গত ৪০ বছরের যে রাজনৈতিক অচলায়তন, সেটিকে ভেঙে দেশকে সত্যিকারের নতুন পথে এগিয়ে নিতে হলে, তরুণদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। কোনো পার্টি, কোনো মতাদর্শ-শাস্ত্র, কোনো সংসদ, কোনো আদালত, কোনো

সশস্ত্রবাহিনী, কোনো রাজ-বুদ্ধিজীবীই এই সংকটের সমাধান ঘটাতে পারবে না। কেননা এঁরা সবাই মিলেই তো তিল তিল করে এই মহাসংকট, মহা-অচলাবস্থা তৈরি করেছেন।

পার্টিগুলো নিজেদের পেট-পকেট-প্রভুর দালালি করেছেন। মতাদর্শ-শাস্ত্র-গুলো মানুষকে অন্ধ করেছে, বিভক্ত করেছে, মুক্ত ভাব বিনিময়ের অযোগ্য করে তুলেছে। সংসদ-সদস্যরা কোনোদিন নীতির পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে, বিবেকের পক্ষে দাঁড়াতে পারেননি; নমিনেশন কিনেছেন আর সরকারি তহবিল ও আপামর মানুষের কাছ থেকে মেরে-ধরে খাজনা আদায় করে নমিনেশনের টাকা পূরণ করার লুটপাট করেছেন। সংবিধান সমুন্নত রাখার শপথ গ্রহণ করা আদালত বারবার আমাদের মহাসংকটে ঠুঁটো জগন্নাথের মতো পাথর হয়ে থেকেছেন। বৈধতা দিয়েছেন একের পর এক স্বৈরতন্ত্রকে বন্দুকের ভয়ে। বিবেকের ভয় তাদের ছিল না। এই সেদিনের ১/১১-তেও তারা একই কাজ করেছেন নির্লজ্জের মতো। আর সশস্ত্রবাহিনী একের পর এক অভ্যুত্থান, রক্তপাত, মারামারি, হানাহানি, মিথ্যাবিচার, গণফায়ারিং স্কোয়াড, উপর্যুপরি সামরিক শাসন জারি করে গণতন্ত্রের সর্বনাশ করেছেন, মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছেন স্রেফ ভয় দেখিয়ে, বন্দুকের জোরে। তো, আজকে বিপুলতম আকার ধারণ করা এই সর্পিল, পিচ্ছিল, প্যাঁচানো, কর্দমাক্ত মহাসংকটটা যারা নিজেদের হাতের বানিয়েছেন, আর যাই হোক সেই সব লোক-মত-ধারা এই সর্বগ্রাসী সংকটের সমাধান করতে পারবে না। এটা কমনসেন্স।

সংকট সমাধান করবেন কে তাহলে? করবেন তারাই যাঁরা এই সংকটের শিকার হয়ে খাঁচাবন্দি হয়ে আছেন যুগ যুগ ধরে। এই খাঁচাবন্দি মানুষ, বিশেষত তরুণ প্রজন্ম এবার, ছোট ছোট জানালা খুলে ফেলেছেন প্রযুক্তির কল্যাণে। ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ, নানান ওয়েবসাইট, গান, কবিতা, ছোটকাগজ, হাজারটা মিডিয়া এবং সর্বোপরি প্রেম-ভালোবাসা-ভাববিনিময়ের ভেতর দিয়ে তারা পরস্পরকে চিনছেন-জানছেন কোনো শাস্ত্র-মতাদর্শ ছাড়াই, অন্ধবিশ্বাস ছাড়াই, খোলামনে। তারা তর্ক করছেন, বিতর্ক করছেন, একমত হচ্ছেন, লাখো ধারায় কাজে নেমে পড়ছেন: কিছু না কিছু কাজ। আত্মপ্রকাশের আনন্দে তারা বিভোর হয়ে আছেন। আত্মপ্রকাশের এই আনন্দই স্বাধীনতা। সরকারি আইন-কানুনের বাইরে, সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণের বাইরে তারা ক্রমাগতভাবে আত্মকর্তৃত্বের-আত্মমর্যাদার রূপকাঠামো-বিন্যাসের কল্পনা করতে শুরু করেছেন ইতোমধ্যেই।

জেগে উঠতে শুরু করেছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার স্বাদ পেতে শুরু করেছে বাংলাদেশ। এই জাগরণেরই প্রথম, বৃহত্ ঝাপ্টা এসেছে আজ শাহবাগে ফাল্গুনের ঈষদুষ্ণ বাতাসের রঙ মনে মেখে। ফাল্গুন আমাদের চিরকালের দ্রোহ আর প্রেমের

পয়গাম। নতুন এই বাংলাদেশের প্রায় সকলেই রাজনীতিবিরোধী। রাজনৈতিক দলকে তারা আর বিশ্বাস করেন না। পার্লামেন্টকে তারা বিশ্বাস করেন না। আদালতের স্বচ্ছতা নিয়ে তারা সদাসন্দিহান। পুলিশ-র‍্যাব-সেনাবাহিনীকে দেখলেই তারা ভয় পান: এই বুঝি কোনো অঘটন ঘটে। মিডিয়াকে তারা সংকীর্ণ স্বার্থের ভাণ্ডারি মনে করেন। মুখস্ত বুলি আওড়ানো বুদ্ধিজীবীদেরকে মনে করেন বাঁচাল, দালাল। পুরানো বাংলাদেশের দিন শেষ। একাত্তরের রক্তসূর্য যে নতুন বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি নিয়ে উদিত হয়েছিল, সেই বাংলাদেশকে আগাগোড়া ঢেলে সাজিয়ে নতুন বাংলাদেশের বিন্যাসের ছবি আঁকার এটাই সময়।

বছরের পর বছর ধরে কবি সাহিত্যিক লেখক শিল্পী চলচ্চিত্রকর্মী ছোটকাগজকর্মী প্রকাশনাকর্মী ব্লগার ইন্টারনেট-অ্যাকটিভিস্ট ওয়েবসাইট-ডিজাইনার স্থপতি ভাস্কর ফটোগ্রাফার সাংবাদিক কম্পিউটার-বিজ্ঞানী সফটওয়ার-প্রোগ্রামার নাট্যকর্মী মুক্ত-সফটওয়ার-অ্যাকটিভিস্ট শিক্ষক-শিক্ষার্থী ব্যবসা-উদ্যোক্তা ইত্যাদি প্রভৃতি শত ধরনের তরুণ-যুবারা ছবিরহাট চারুকলা জাদুঘর শাহবাগ সোহরাওয়ার্দী-উদ্যান চত্বরকে ঘিরে আড্ডা মেরে চলেছেন। অথচ ভদ্রলোক বুদ্ধিজীবীরা এই পুরো এলাকাটাকে গাঁজাখোরদের নোংরা একটা জায়গা বলে এতোকাল নাক সিঁটকিয়েছেন। ছেলেমেয়েদের 'বেলেল্লাপনা'র জায়গা বলে বাঁকা চোখে তাকিয়েছেন এর দিকে। আজ সব সমালোচনা উপেক্ষা-উন্নাসিকতাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে শাহবাগ জ্বেলেছে আমাদের আশার প্রদীপ । (উল্লেখ্য: ঢাকার বাইরের সমাবেশগুলোর পেছনে এই কমিউনিটি হয়ে ওঠার চর্চা এখনও ভালো করে দাঁড়ায়নি বলেই পরিবর্তনের এই মুহূর্তেও সেগুলো নেতাদের গতানুগতিক বক্তৃতাবাজিতে সরগরম হয়ে আছে।) পৃথিবীর সমস্ত বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক-বাহাস-পড়াশোনা-হাসি-তামাশা-আনন্দ-মেলামেশা-প্রেম-ভালোবাসায় ভরপুর শাহবাগের দুর্দান্ত প্রাণবন্ত আড্ডা গত দুই দশকের বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মে শ্রেষ্ঠতম গণবিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। এটা হয়ে উঠেছে সৃজনবৈচিত্র্যে গমগম করা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিক্ষেত্র। ফান্ড দিয়ে, আমলা দিয়ে, প্রজেক্ট দিয়ে, এনজিও দিয়ে এরকম অবাধ স্বাধীনতাপূর্ণ একটা শিল্প-সৃজন-বিকাশ-অভয়ারণ্য বানানো যায় না। স্বাধীনতাই তো সৃজনশীলতার ধাত্রী। এই ধাত্রীই শত সহস্র তরুণ-যুবককে মানসিকভাবে সাবালক করে তুলেছে, আন্তরিক একটা বিরাট নিবিড় কমিউনিটি গড়ে তুলেছে শাহবাগে।

রাষ্ট্র মাস্তান মন্ত্রী ঠিকাদার এমপি দারোগা র‍্যাব প্রফেসর ক্যাডার জঙ্গি হুজুর গুরু পুরুৎঠাকুর হোমরা চোমরা এলিট-মহাজনদের সার্বক্ষণিক অত্যাচারে তো খোদ আমাদের সমাজটাই আজ কারাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। কোথায় আমাদের সেই ছোটবেলার

পাড়া-মহল্লা? সেখানে সবাই সবার বন্ধু ছিল, আত্মীয় ছিল। মারামারি-ঝগড়াঝাটি-কান্নাকাটি শেষে আবার সবাই একসাথে হাসতে হাসতে খেলতে শুরু করার সমাজ-সম্প্রদায়-গ্রাম আজ কোথায়? রাষ্ট্র এবং নির্বাচিত-অনির্বাচিত আমলাতন্ত্র আজ একেবারে তলার পরিবার পর্যন্ত বিস্তৃত তার শুঁড় দিয়ে সব কিছু শুষে নিচ্ছে। এখন সব 'ওয়ার্ড', 'ইউনিয়ন', 'উপজেলা', 'নির্বাচনী এলাকা'। এখন সবাই গলায় কুকুরের বেল্টের মতো পরিচয়পত্র ঝুলিয়ে নাগরিক হয়ে উঠতে বাধ্য হচ্ছেন। এখন সবাই ভোটার মাত্র। এখন সবাই ক্রেতা মাত্র। এখন সবাই যেন 'কোকাকোলা-দল' না হয় 'পেপসি-দল' হতে বাধ্য। সবাই এখন বিএনপি-আওয়ামী লীগ, কংগ্রেস-বিজেপি, ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকান। আর যেন পথ নাই, সমাজ নাই, সম্প্রদায় নাই, মা নাই, বাবা নাই, বয়োজ্যেষ্ঠর সম্মান নাই, ছোটদের আদরযত্ন নাই, বন্ধু-বান্ধব নাই। শুধু মারমার-কাটকাট প্রতিযোগিতার ছ্যাবলামি। আজকের শাহবাগ-সমাবেশ বিগত দুই-আড়াই দশক ধরে গড়ে ওঠা সমাজ-সম্প্রদায়-পাড়া-কমিউনিটি-বন্ধুত্ব-বোধেরই ফল। জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতেই হোক: আজকের শাহবাগ-স্বাধীনতা রাষ্ট্রের খপ্পর থেকে খোদ সমাজকে উদ্ধার করার, মুক্ত করার, সমাজের আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার অজস্রমুখি প্রচেষ্টার ফল। তাই তো আজ ফিরে আসছে একাত্তরের নয় মাসের মতো সর্বব্যাপী, বহুবৈচিত্র্যপূর্ণ, প্রাণবন্ত সমাজ-সম্প্রদায়-আত্মীয়তা-বন্ধুত্ব।

শাহবাগ এখনকার মতো যদি ফুরিয়েও যায় আরো অনেক শাহবাগ আসবে। অকুপাই-আন্দোলনের শ্লোগান উচ্চারণ করে বলি: 'দ্য বিগিনিং ইজ নিয়ার' (সন্নিকটেই শুরু)। এই গণজাগরণ কোনো না কোনো ভাবে আবার আত্মপ্রকাশ করবে। শাহবাগের স্মৃতি কখনো হারিয়ে যাবে না। খুন-গুম-ক্রসফায়ার, রাষ্ট্রীয় মাস্তানি, দলীয়করণ, দালালি, চামচামির বাইরে তরুণ-জনসাধারণ এবার সুনির্দিষ্ট-ভাবে ভাবতে শুরু করুক কেমন বাংলাদেশ তারা চান। কেমন পুলিশ চান, কেমন আদালত চান, কেমন জনপ্রতিনিধিত্ব চান। এগুলো নিয়ে সত্যিকার অর্থেই সর্বাত্মক-রূপান্তরধর্মী চিন্তা গড়ে তুলতে পারাই আজকের শাহবাগ-সমাবেশের প্রধান কাজ। কথাটা অল্পবয়েসী তরুণ এবং বৃদ্ধ-বয়স্ক তরুণেরা যদি মনে রাখেন আর নিজেদের মাথা ও আত্মকর্তৃত্বের ওপর আস্থা রাখতে শুরু করেন, বদলে যেতে শুরু করবে বাংলাদেশ। আগামীর সেই বৃহত্তর বাংলা-বসন্ত আমাদের দরজায় টোকা দিচ্ছে।

এই ফাল্গুনেও পূর্ণাঙ্গ বসন্ত এখনও আসে নি বটে। এখনও প্রস্তুতি পর্ব চলছে শাহবাগে আর সারাদেশে। প্রস্তুতি এখনও সম্পন্ন হয়নি। কিন্তু হবে। অচিরেই হবে। যখন-তখনই হবে। হয়ত সামনের কোনো শীতকালেই হবে। বসন্ত তো শীতেই আসে, তাই না? ঠিক যে: আর্থ-রাজনৈতিক দল-শক্তিগুলো এবং তাদের মিডিয়া

সংকীর্ণ একটা মেডিয়েটেড বসন্ত বানানোর চেষ্টা করছে নানা কারণে। তবু সেটা ঠিক তাদের মতো ইচ্ছানুযায়ী দাঁড়াচ্ছে না কিন্তু। আরব বসন্ত তো আর মিডিয়া দিয়ে বানানো যায় না: বাংলা-বসন্তও না। হ্যাঁ, যেকোনো প্রকৃত গণআন্দোলনকে ঘিরেই সব ধরনের ক্ষমতাশীলমহল প্যাঁচ কষতে থাকেন। তবু যে বালিকারা বালকদের সাথে ক্রোধের আনন্দে নাচছেন তাতে আমি আনন্দিতই বটে। এই সাক্ষাত্, নারীর সাথে পুরুষের, বড়দের সাথে ছোটদের, শিক্ষিতদের সাথে রিকশাওয়ালাদের, এ আমাদের সমাজের যাবতীয় অসামাজিক ব্যাধি-বালা-মুসিবত কমাবে, বাড়াবে সমাজের স্বাধীনতার সীমা: রাষ্ট্র-রাজনীতির একচ্ছত্র রাক্ষস-ক্ষমতার বিপরীতে। সুসমাচার বৈকি। বসন্ত যে এই বঙ্গে আসার জন্য মুখিয়ে আছে সেটা দিব্যি বোঝা যাচ্ছে: শাহবাগে, সারা বাংলাদেশে। আজকের শাহবাগ-সমাবেশ সেই বাংলা-বসন্তের আগাম ফাল্গুনী ইশতেহার।

রচনাটি ছাপা হয়েছিল *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম*-এ ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে এবং দৈনিক *ইত্তেফাক* পত্রিকায় ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে।

বাংলা-বসন্ত: উদ্দেশ্য ও উপায়

1971 War criminals of Bangladesh

১৭.১ বৈষম্য-বঞ্চনা-বলপ্রয়োগের সভ্যতা

বিগত কয়েক হাজার বছর ধরে কর্তৃত্বপরায়ণ শাসক শ্রেণীর হাতে তৈরি যে বস্তু ‘মানবসভ্যতা’ নামে অভিহিত হয়ে আসছে তার মধ্যে ভালো ভালো কথার কোনো অভাব নেই: কি বিদ্যমান শাসকদের তরফে, কি তাঁদের বিরুদ্ধে ‘প্রতিরোধ’ গড়ে তোলা ভাবি শাসকদের তরফে। উভয় পক্ষই দুনিয়ার সমস্ত মহত্ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে তাঁদের আকাঙ্ক্ষার কথা লাগাতারভাবে বলে আসছেন শত মুখে। এ নিয়ে রাজ-বুদ্ধিজীবীদের সৃজিত ও প্রচারিত শাস্ত্রীয় শিক্ষা-দীক্ষা-প্রকৌশলের শত শত রূপ, অজস্র চেহারা। মহৎ এইসব উদ্দেশ্যকে নিজেদের উদ্দেশ্য হিসেবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে কেউ কারো চেয়ে পিছিয়ে নেই; কারো সাথে কারো মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। তারপরও আজ সারা পৃথিবী জুড়ে বৈষম্য-বঞ্চনা-বলপ্রয়োগের কোনো অন্ত নেই। একদিকে, গুটিকয় বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত মানুষের সম্পদ-বিলাস-জৌলুষের অশেষ নেই। অন্যদিকে, কয়েক শ’ কোটি মানুষের অভাব-অসমতা-অভিযোগও অন্তহীন। সমস্যাটা তাহলে কোথায়? অনেকে হয়ত ভাববেন আমাদের পক্ষ থেকে যাঁরা যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং শাসন করার অধিকারী নেতা তাঁরা যথেষ্ট সৎ-আন্তরিক-ঈমানদার নন বলেই দুনিয়ার আজও এই অবস্থা।

১৭.২ সংগঠনের উপায়-প্রণালী

আমার মনে হয় সমস্যাটা মূলত সততা-নিষ্ঠা-আন্তরিকতা-আস্থা-উদ্দেশ্য-ঈমানের নয়। সমস্যাটা উপায়ের। এক কথায়, সকলেই আমরা নিজের নিজের মতো করে মানব জাতির মঙ্গল-শুভ-উন্নতির কথা বলি কিন্তু কী পদ্ধতিতে কী উপায়ে কী প্রণালীতে তথাকথিত মহৎ উদ্দেশ্য পূরণ করার কথা ভাবা হচ্ছে এবং শুধু কথায় নয়, খোদ বাস্তবেও কী উপায়ে সেইসব উদ্দেশ্য পূরণের পথে 'এগিয়ে' যাচ্ছি আমরা: সমস্যাটা সেখানেই। অন্ধ মতাদর্শের রঙিন চশমা-পরা চোখে নয়, শাদা চোখে বাস্তবের দিকে তাকাতে পারলে পলকেই দেখা যাবে যে, আমাদের আদর্শ-মতাদর্শ-উদ্দেশ্যের মধ্যে শত পার্থক্য থাকলেও (থাকাটা স্বাভাবিকও বটে) উপায়-পদ্ধতি-প্রণালীর প্রশ্নে কারও সাথে কারও মৌলিক কোনো পার্থক্য নাই। যেকোনো উদ্দেশ্য পূরণের, এমনকি উদ্দেশ্যের পক্ষে প্রচার চালানোরও, প্রথম সামষ্টিক উপায় হচ্ছে কোনো না কোনো প্রকারের সংগঠন-কাঠামো গড়ে তোলা। আর সংগঠনের প্রশ্নে পরস্পরবিরোধী-মতাদর্শওয়ালাদের মধ্যে সত্যিকারের কোনো পরস্পর-বিরোধিতা নেই বললেই চলে। সকলেই (আস্তিক-নাস্তিক-গণতন্ত্রী-সমাজতন্ত্রী-পুঁজিতন্ত্রী ইত্যাদি-প্রভৃতি সকল মতাদর্শের লোকই) বাস্তবে একই ধাঁচের, একই ছাঁচের সংগঠন-কাঠামোর অনুসারী। যাবতীয় রাজনৈতিক ধারার অনুসারীদের অনুসৃত সংগঠন-কাঠামোটি একই রকমের: উচ্চনিচ-ক্রমতান্ত্রিক ও কর্তৃত্বপরায়ণ, এবং হর্তাকর্তা-আমির-আমলা-জেনারেল-বিচারক-উপাচার্য-গুরু-পণ্ডিত-পুরো-হিত-মোল্লা-পাদ্রী-সেক্রেটারি-সম্পাদক-মহাসচিব-নির্ভর।

সাদা চোখে তাকালে দেখা যাবে: সংগঠন-কাঠামোর প্রশ্নে বলশেভিক-বামপন্থি ইসলামী-ডানপন্থি তথা উত্তরপন্থি-দক্ষিণপন্থিদের সকলেরই সাংগঠনিক কেন্দ্র রাজধানীতে; সকল সংগঠনেরই রাষ্ট্রপতি-সভাপতি-মহাসচিব-প্রধানমন্ত্রী-আমির একজন মাত্র ব্যক্তি। সংগঠনের মধ্যে সবচাইতে বেশি ক্ষমতার মালিক এই ব্যক্তিটি। সংগঠনের কাঠামোয় ইনি সবার ওপরে। তারপরেই আছে সভাপতিমণ্ডলী বা প্রেসিডিয়াম বা সম্পাদকমণ্ডলী বা মন্ত্রীপরিষদ বা মজলিশে শুরা টাইপের একটি সাংগঠনিক স্তর। তারপর জাতীয়-বিভাগীয়-আঞ্চলিক-জেলা-উপজেলা-কেন্দ্রিক বিভিন্ন পর্যায়ের সাংগঠনিক প্রণালী। আর বিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত এই যাবতীয় সংগঠন-কাঠামোর ক্ষেত্রেই সকলের নিচে আছেন সংগঠনের সাধারণ সদস্যবৃন্দ তথা আপামর জনতা। সংখ্যাগরিষ্ঠ এই সাধারণ সদস্যবৃন্দের বা আমজনতার হাতে তেমন কোনো ক্ষমতাই নেই। এঁদের কাজ শুধু ভোট দেওয়া আর নেতাদেরকে অনুমোদন দেওয়া। মুখে মুখে এঁদেরকেই সকল ক্ষমতার মালিক বলা হলেও বাস্তবে সকল

ক্ষমতার মালিক একেবারে ওপরের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। যাবতীয় সংগঠনে সিদ্ধান্ত-নির্দেশনা অর্থ-ক্ষমতার প্রবাহ উপর থেকে নিচের দিকে। নিচের দিকে ক্রমবিন্যস্ত সদস্যদের কাজ হলো উপরের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা। নিচের আপামর সদস্যবৃন্দের বা আমজনতার কোনো স্বাধীনতাও নেই। এঁদের কাজ শুধু উপরের প্রতি আনুগত্যের, অন্ধত্বের ও বিশ্বস্ততার নিরঙ্কুশ প্রমাণ দিতে থাকা, প্রশ্নাতীতভাবে উপরের আদেশ-নিষেধ-হুকুম তামিল করা এবং প্রয়োজনে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দেওয়ার জন্য সদাপ্রস্তুত থাকা।

বিদ্যমান সর্বগোষ্ঠী কর্তৃক অনুসৃত এই সংগঠন-কাঠামোটির সাথে এবার যদি আপনি আমাদের সমাজের প্রচলিত বাস্তব সংগঠন-সংস্থা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে মিলিয়ে দেখেন, তাহলে দেখা যাবে পাড়ার ক্লাব ও পাঠাগার থেকে শুরু করে এনজিও, ছাত্রসংগঠন, রাজনৈতিক দল, সেনাবাহিনী, বিচারবিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, সচিবালয় এবং খোদ রাষ্ট্র আসলে একই ধারার সংগঠন। মুখে যে যা-ই বলুক না কেন, এই যাবতীয় সংগঠনই বৈষম্য ও ব্যক্তিমালিকানায় বিশ্বাসী, বঞ্চনা ও বিলাসে বিশ্বাসী এবং জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী। কেউ আইনের নামে, কেউ গণতন্ত্রের নামে, কেউ বিপ্লবের নামে, কেউ ধর্মের নামে, কেউ অবিশ্বাসের নামে আসলে যা চান তা হলো বিদ্যমান কেন্দ্রীভূত ও জবরদস্তিমূলক রাষ্ট্রক্ষমতাকে দখল করা এবং যত বেশি দিন সম্ভব ছলে-বলে-কৌশলে নিজেদের হাতে তা কুক্ষিগত করে রাখা। এঁরা কেউই চান না সংগঠনের সাধারণ সদস্যরা নিজেরা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে গৃহীত স্বাধীন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিজেদের মতো করে সংগঠন পরিচালনা করুক, কিংবা অন্য কথায় বললে, এঁরা চান না দেশের জনসাধারণও একইভাবে নিজেরা নিজেদেরকে পরিচালনা করুক।

১৭.৩ উদ্দেশ্য ও উপায়ের অসঙ্গতি

এই যে কর্তৃত্বপরায়ণ সাংগঠনিক উপায়, এর সাথে ঘোষিত উদ্দেশ্যের সম্পর্ক কী? আজকে যাঁরা নিজেদের সংগঠন নিজেরা পরিচালনা করতে শিখছেন না, হর্তা-কর্তা-হুজুরের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁরা কালকে সত্যিকারের গণতন্ত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন? আজকে যাঁরা নিজের সংগঠনের ভেতরেই নিজেরা মুক্তবুদ্ধির, স্বাধীনতার ও ভিন্নমতের চর্চা করতে পারছেন না, তাঁরাই কালকে মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজ (তথা সমাজতন্ত্র) প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন? আজকে যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্তটুকু পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীনতার ভিত্তিতে গ্রহণ করতে সক্ষম নন, কাল তাঁরাই হাশরের মাঠে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের সারা জীবনের কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে দাঁড়ানোর মতো হিম্মত

অর্জন করে ফেলবেন? এ সব প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হওয়া সম্ভব নয়।

আজকে যাঁরা যুদ্ধাপরাধীদের ন্যায্য বিচারের দাবিতে, সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে, শাহবাগে এবং সারা দেশে সমবেত হয়েছেন তাঁরা কিন্তু বিদ্যমান জবরদস্তিমূলক থানা পুলিশ-আইন-আদালত-কারাগার ও সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সমন্বয়ে গড়ে রাষ্ট্র-সংগঠনটিকেই ধরপাকড়-জেল-জুলুম-গুলি-ফাঁসির পদ্ধতিতে পরিচালিত হতে প্ররোচিত করছেন। তাঁরা নিজেরা অত্যন্ত সঠিকভাবে অহিংস উপায়ের কথা বলছেন বটে, কিন্তু অন্য দিকে খোদ রাষ্ট্রকেই তাঁরা সহিংস পদ্ধতিতে যাওয়ার বৈধতা দিচ্ছেন। এখানেই তৈরি হচ্ছে উদ্দেশ্য ও উপায়ের অসঙ্গতি। আজকেও আমাকে নির্ভয়ে বলতে পারতে হবে যে, ফাঁসি-জবাই-মার-কাটের প্রতিশোধপরায়ণ হিংসানীতিকে শাহবাগের সংকীর্ণ শ্লোগানগুলো অতিক্রম করতে পারছে না। ফাঁসি-জবাই-মার-কাট কিন্তু একাত্তরে আমাদের শ্লোগান ছিল না। একাত্তরে আমাদের শ্লোগান ছিল ইতিবাচক ও সৃজনধর্মী। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেও নতুন একটি সুন্দর রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষাই ছিল আমাদের সকল শ্লোগানের প্রাণ। আজকে কেন তাহলে আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে চলমান আন্দোলনের মধ্যেই আমাদের নতুন সমাজের রূপকল্পের প্রশ্নটিকে সামনে আনতে পারছি না?

অনেকেই বলছেন, এক যুদ্ধাপরাধী ইস্যুতে হাজারটা আগাম ইস্যু, পরিকল্পনা ও ভিশন নিয়ে কনফিউশন তৈরি করা যাবে না; এতে করে ফোকাস নষ্ট হয়ে যাবে। কথাটা যে খুব মিথ্যা তা নয়। শাহবাগ-সমাবেশ এখন এসব কথা শোনার মুডেও নাই। ঠিক আছে, আপাতত শুধু এই একটা ইস্যুতেই আন্দোলন গড়ে তুলি চলেন। যুদ্ধাপরাধ প্রশ্নেই কাজ হোক। কিন্তু তার জন্য তো সংগঠন লাগবে। কাজটা তো মূলত অর্গানাইজ করারই কাজ, তাই না? বর্তমান মুহূর্তের এই কাজটাই কী উপায়ে কোন সাংগঠনিক কাঠামো-প্রণালীতে সম্পাদিত হচ্ছে তা নিয়ে কিন্তু কথা বলতেই হবে। কেননা উপায়ই উদ্দেশ্য। উপায় যদি উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়, খোদ উদ্দেশ্যই তাহলে ব্যর্থ হয়। প্রচুর শ্রম-ঘাম-রক্তেও আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। উদ্দেশ্য দিয়ে উপায়কে জাস্টিফাই করার সুযোগ নাই। উদ্দেশ্য দিয়ে উপায়কে জায়েজ করার নামই হলো সুবিধাবাদ।

১৭.৪ যুদ্ধাপরাধের বিচার ও শাস্তি এড়ানোর সুযোগ নেই

আমি জানি, সাধারণভাবে আমরা কিছু লোক যাবতীয় রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের বিরোধী হলেও, চাইলেই কিন্তু এক পলকের মধ্যে বিদ্যমান বল প্রয়োগমূলক রাষ্ট্র-কাঠামো এবং এর আইন-আদালত-কারাগার-নিবর্তন ইত্যাদি উবে যাবে না। চাইলেই আজ আইন-আদালত-কর্তৃত্ব-রাষ্ট্র-সচিবালয়-সেনাবাহিনী সম্পর্কিত বিদ্যমান ধ্যানধারণা

-গুলো চোখের নিমেষে গায়েব হয়ে যাবে না। আমি চাইলেই হাজার বছরের ইতিহাস-পরিক্রমায় গড়ে ওঠা অপরাধ, ফৌজদারি দণ্ডবিধি, বিচার-প্রণালী এবং জেল-জরিমানা শাস্তি সংক্রান্ত শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ-দীক্ষায়নজনিত বিশ্বাসগুলো তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল হয়ে যাবে না। সুতরাং সর্বপক্ষের আমজনতা যাকে এতদিন ধরে ন্যায্য বিচার বলে শিখে এসেছেন, সেই মানদণ্ড মোতাবেকই আজকে যুদ্ধাপরাধীদের এবং অন্য সব অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি হওয়ার দাবিকে কোনো যুক্তিতেই অবজ্ঞা করা সম্ভব না। এ কথা ঠিক যে, খুনের বদলা খুনের প্রতিশোধ-পরায়ণ চিন্তনই আমাদের আদালত-প্রথার ভিত্তি। খুন করা যদি সত্যি সত্যি অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে অপরাধী ব্যক্তিকে আইনত খুন করে ফেলার যুক্তি টেকে কীসের ভিত্তিতে? খোদ খুন করাটাই যদি অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে মৃত্যুদণ্ড প্রদানকারী বিচারক-কারাগার-জল্লাদও তো খুনের দায়েই অপরাধী হন। কিন্তু এতদিন এ কথা না বলে আজ হঠাৎ করে যুদ্ধাপরাধের বিচারের সময় এ কথা তোলাটা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে মনে তো হবেই। কাজেই, উপযুক্ত সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি আজ আর অবজ্ঞা করার কোনো অবকাশ থাকতে পারে না।

১৭.৫ খুনোখুনির দুর্বিপাক ও অন্তঃসারশূন্য স্বাধীনতার আশঙ্কা

তবে আজ আমাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় বিচারবুদ্ধি বর্জন না করে ভাবতেই হবে যে, শান্তিপূর্ণভাবে এই বিচারপ্রণালী সমাপ্ত করতে না পারলে, সারা দেশের সকল পক্ষের মানুষের শান্তি-স্থিতি-স্বস্তির বিনিময়ে গুটিকয় ভয়াবহ রকমের গণবিরোধী ঐতিহাসিক দুষ্কৃতকারীর উপযুক্ত শাস্তি দিতে গিয়ে আমাদের এই দুঃখিনী বাংলা আসলেই কি আরো এগুবে, নাকি আরও পিছিয়ে পড়বে? স্বাভাবিক-সামাজিক জীবনযাত্রা দিনে দিনে অচল হয়ে পড়তে থাকলে অভাব-অনটন দেখা দেবে। আমাদের ক্রমোন্নতিশীল সমাজ আবার পিছিয়ে পড়বে। এ ধরনের একটা পিছিয়ে পড়া সমাজই কিন্তু অন্ধ-বিশ্বাস আর অন্ধ-অবিশ্বাস বিস্তারের জন্য আদর্শ সমাজ। দেশে যখন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'খুনোখুনির দুর্বিপাক' শুরু হয়ে যায়, তখন সবচেয়ে লাভ হয় সকল পক্ষের অস্ত্রধারীদের; লাভ হয় জোর-জুলুম-জবরদস্তিওয়ালাদের; আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের সংস্থাসমূহের সক্ষমতা। আজকে আমরা রাষ্ট্রকে হাতে ধরে প্রতিপক্ষের ওপর জুলুমের বৈধতা দিচ্ছি, প্রতিপক্ষের সম্পাদক-সংবাদপত্র-ব্লগ-ওয়েবসাইট নিষিদ্ধ করার পাইকারি অনুমোদন দিচ্ছি, কিন্তু কাল যখন আমার-আমাদের যাবতীয় ভিন্নমতের ওপরও রাষ্ট্রের একই ধরনের জুলুম নেমে আসবে তখন আমরা সেটা ঠেকানোর কোনো নৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারব না। অথচ ভিন্নমতের স্বাধীনতা ছাড়া 'স্বাধীনতা' কথাটাই অর্থহীন,

অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে।

অন্তঃসারশূন্য স্বাধীনতা অর্জন করার জন্যই কি একাত্তর এসেছিল এই দেশে? আজকে যারা বিচারের এক পাল্লায় মুক্তিযুদ্ধকে, আর অন্য পাল্লায় রাজাকার-আল-বদরদেরকে রেখে ইতিহাস মাপছেন, মুক্তিযুদ্ধের সাগর-গভীর-মহত্ত্ব আর আকাশ-সমান-বিশালত্ব অনুভব করার মতো সময় তাঁদের হাতে নাই। তাঁরা বুঝবেন কী করে যে একাত্তর শুধু দুই পক্ষের বন্দুকধারীদের যুদ্ধ ছিল না। বারো বছরের এক বালকের সদ্য-ফোটা হাঁসের ছানাদেরকে বুকে আগলে নিয়ে নিজের আবাল্য গ্রাম-স্মৃতি-সংসর্গ ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকার নামও একাত্তর।

১৭.৬ পারস্পরিক হিংসার রাজনীতিতে নবীর ইমেজ ব্যবহার

আমার প্রিয়তম শিক্ষকদের এক জন হযরত মুহম্মদের কথা ভাবি (তাঁর ওপর অপার করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক)। উনি নিশ্চয়ই দেখছেন কীভাবে তাঁর নামে দুই পক্ষ অশান্তির আবাহনী গান গাইতে লেগেছেন। এক পক্ষ টাক-মাথায় নতুন গজানো চুলের আয়না দৃশ্যে এতই বিমোহিত যে, হযরত মুহম্মদকে নিয়ে গালাগালি-কুৎসা-পর্ণো রচনা না করলে তাঁদের নিজের কাছেই নিজের যুক্তিবুদ্ধির শিঙের ধার পরীক্ষা করা চলে না। এঁরা এতটাই যুক্তিবাদী যে, পৃথিবীর সবচাইতে নোংরা কল্পনায় আর নোংরা ভাষায় তাঁরা তাঁদের আত্মার ওপর জমে ওঠা পুঁজের আবর্জনার প্রকাশ ঘটানোর যুক্তি খুঁজে পান। এঁরা জানেন না যে, যুক্তি জিনিসটা জনাব হিটলারেরও ছিল; জিনিসটা ফ্যাসিবাদের পক্ষেও লাগে। আসলে যুক্তি বলতে এঁরা বোঝেন নিজের অবিশ্বাসের সপক্ষে অন্ধ প্রমাণ হাজির করার গোঁয়ার্তুমি।

হযরত মুহম্মদের (স.) বাস্তব আর্থ-সামাজিক-ঐতিহাসিক সূর্যকরোজ্জ্বল ভূমিকা সম্পর্কে সামান্য উপলব্ধিও যাঁর জন্মায়নি তাঁর জন্য তবু আমার মায়াই হয়। আহা মনুষ্যসন্তান, মতাদর্শের নামে এঁরা কতখানি ছোট করতে পারে নিজের আত্মাকে। 'আল্লাহ নাই' প্রমাণ করার জন্য এইসব নাস্তিকেরা এতটাই যুক্তিবাদী যে 'যা' নাই তারও যে একটা নাম আছে, আর যার নাম আছে সেটাও যে 'একটা কিছু' সেটুকু বোঝার মতো যুক্তি-সঙ্গতি তাঁদের নাই। বঙ্গের মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কিন্তু সেটা বুঝিয়ে বলেছিলেন: দেহ মাত্রেরই যেমন 'দেহী' থাকেন, তেমন নাম মাত্রেরই 'নামী' থাকেন। কিন্তু এই বঙ্গের সন্তান হয়েও চোরা কভু নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী। আল্লাহ আর মুহম্মদের নাম কলুষিত করতে পারলেই এঁরা খুশি, যেন এই নামগুলো এতই পলকা যে, দুই পাতা পর্নো লিখলেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। অন্যদিকে, আরেক পক্ষ হযরত মুহম্মদের 'মান-সম্মান'কে এতই পলকা ভাবেন যেন তাঁর মান-সম্মান বাঁচানোর জন্য অকথ্য ভাষায় 'নাস্তিক'দেরকে গালাগালি না করলে, অন্ধকারে

চাপাতি দিয়ে প্রতিপক্ষকে না কোপালে হযরত মুহম্মদের সম্মান বাঁচে না। ফেসবুক আর ব্লগের পাতায় চোখ বুলালেই এই উভয় পক্ষের সম্পর্কে বলা আমার কথাগুলোর সত্যতা পাওয়া যাবে।

আসলে উভয় পক্ষের উপায়-পদ্ধতি-প্রণালী একই: গালাগালি, নোংরা কথা, আর হিংসা। হিংসা মানে কিন্তু হননেচ্ছা: হনন করিবার ইচ্ছা। এক পক্ষ বাড়ি-ফেরতা নিরস্ত্র মানুষের গলায় চাপাতির কোপ বসানোকে পূণ্যকর্ম মনে করেন; অন্য পক্ষ যাবতীয় সহিংসতার দায়িত্ব রাষ্ট্রের বন্দুকধারী বাহিনীর ওপর ন্যস্ত করে পরোক্ষ-ভাবে মানুষ খুন করাকে যুক্তিপরায়ণ কম্মো বলে ভাবেন। এক পক্ষ ফাঁসি চান যুদ্ধাপরাধীদের; আরেক পক্ষ ফাঁসি চান নাস্তিকদের। এক পক্ষ রাষ্ট্রকে দিয়ে নিষিদ্ধ করাতে চান যুদ্ধাপরাধী দলগুলোকে, তাঁদের পত্রিকা-ব্লগ-সম্পাদকদেরকে; আরেক পক্ষ ঐ একই রাষ্ট্রকে দিয়ে নিষিদ্ধ করাতে চান 'নাস্তিক বামপন্থি'দের দলগুলোকে, আর তাঁদের পত্রিকাগুলোকে। উভয় পক্ষই বল প্রয়োগমূলক ও প্রতিশোধপরায়ণ আইন-আদালতের ওপর অগাধ আস্থা রাখেন। আমাদেরকে তাই বুঝতে হবে: আজকে যে রাষ্ট্র যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে, কালকে জামায়াত ক্ষমতায় গেলে সেই রাষ্ট্রই প্রতিপক্ষের রক্তপান করার জন্য আন্তরিকভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠবে।

১৭.৭ স্রেফ আইন-আদালত দিয়ে ইতিহাসের মীমাংসা হয় না

আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে: রাষ্ট্রের একটা দিক হলো তার লালন-পালন-সৃজনের আর্থসামাজিক সত্তা; আর রাষ্ট্রের অপর দিক হলো হত্যা-বলপ্রয়োগ-লুটপাটের রাক্ষস-রাজনৈতিক-শাসনমূলক সত্তা। রাষ্ট্র-রাক্ষসের নখদন্ত-থাবা যদি ক্রমাগতভাবে মুড়িয়ে দেওয়া না যায়, তার বদলে যদি রাষ্ট্রের রক্ততৃষ্ণাকে আরো আস্কারা দেওয়া হয়, তাহলে সেই যূপকাষ্ঠে দল-মত-মতাদর্শ নির্বিশেষে আমরা সবাই কখনো না কখনো বলি হবো। আমরা কি ভুলে যাব, এই সরকারই বন্ধ করেছিল ফেসবুক, বন্ধ করেছিল ইউটিউব? একবার খুলে দেওয়ার পরেও এখন আবার বন্ধ ইউটিউব।

মানুষের বিবেক-বুদ্ধি আর বিচার-বিবেচনার প্রকৃতি-দত্ত, আল্লাহ্-প্রদত্ত সক্ষমতার ওপর কেউই দেখছি ভরসা রাখেন না। সকলেই ভুলে যান, কোনো 'মহৎ' উদ্দেশ্যেই সরকার ও রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের সংস্থাগুলোকে আরো শক্তিশালী, আরো আক্রমণাত্মক, আরো সহিংস করে তোলাটা গোটা কওমের জন্য, পুরো কমিউনিটির জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক একটি কাজ। হিংসা আরো হিংসাকেই ডেকে আনে। রাষ্ট্রের বিপরীতে শক্তিশালী করে তোলা দরকার বরং আমাদের সমাজ-সত্তাকে,

সামজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে। রাষ্ট্র ও আইন-আদালতের জবরদস্তি দিয়ে একটা ভাবধারাকে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। নুরেমবার্গ ট্রায়াল দিয়ে নাজিবাদ নিশ্চিহ্ন করা যায়নি। সমাজই পারে উদারতা, স্বাধীনতা, বহুমত, অহিংসা, বোঝাপড়া, সংহতি, সহযোগিতা এবং সৃজনশীলতার ক্রমবিকাশ ঘটানোর মধ্য দিয়ে মতাদর্শের অন্ধত্বকে অগ্রহণযোগ্য করে তুলতে।

স্রেফ বিশেষ কোনো একটি আদালতের দেওয়া রায়ে কোনোদিন 'ইতিহাসের মীমাংসা' হতে পারে না। 'ইতিহাসের দায়' মেটানো কোনো ফৌজদারি মামলার বিষয় হতে পারে না। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন আর বল প্রয়োগের জোরে কোনো একটি রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করেই ইতিহাসের মীমাংসা করা যায় না। তাতে করে খোদ রাজনীতি টিকে যায়, চিরন্তন মর্যাদা লাভ করে। ইতিহাসের দায় মেটানো যায় বরং নতুন ইতিহাস রচনা করার মধ্য দিয়ে। ইতিহাসের দায় মেটাতে হবে রাষ্ট্র-সমাজের পুনর্জাগরণ-পুনর্গঠনমূলক রূপান্তর ঘটানোর মধ্য দিয়ে: রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সহিংস-সামরিক রাষ্ট্রসত্তা থেকে আর্থ-সামাজিক-অহিংস-বেসামরিক রাষ্ট্রসত্তার দিকে এগোনোর মধ্য দিয়ে।

১৭.৮ অ্যানার্কিস্টদের ভুল থেকে জামায়াত শিখতে পারে

অ্যানার্কিস্টদের ঐতিহাসিক ভুল থেকে জামায়াত চাইলে শিখতে পারে। উনবিংশ শতকের শ্রমিক-জনতার মুক্তিপরায়ণ আন্দোলনগুলির প্রধান একটি স্রোতোধারা ছিল নৈরাজ্যবাদ। তাকে কোনোভাবে আটকাতে না পেরে শেষে চরম জুলুমের পথ গ্রহণ করেছিল ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো। আইনী পন্থায় চলার সুযোগ সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হওয়ায় ১৮৮০-১৮৯০ দশকে চরম পন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে নৈরাজপন্থিরা। একাধিক রাষ্ট্রপ্রধান-কারখানামালিক খুন হন তাঁদের হাতে। অবশেষে ১৯০৭ সালের আমস্টার্ডাম-কংগ্রেসে ক্রমবর্ধমান গণবিচ্ছিন্নতার ভুল সন্ত্রাসবাদী পথের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিজেদেরকে গণশ্রমিক আন্দোলনের পথে ফিরিয়ে আনেন নৈরাজ্যবাদীরা। আজকে চাইলে অ্যানার্কিস্টদের সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পারে জামায়াত। তাঁরাও একটা ঐতিহাসিক ঢাকা-কংগ্রেস ডেকে স্বীকার করতে পারে একাত্তরের ঐতিহাসিক ভুলের কথা। পাক হানাদার-বাহিনীর গণহত্যা-গণলুণ্ঠন-ধর্ষণে সহায়তা করার অপরাধ কবুল করে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চাইতে পারেন তাঁরা বাংলাদেশের আপামর মানুষের কাছে। এবং তাঁরা ফিরে আসতে পারেন সন্ত্রাসবাদ থেকে জনসাধারণের কাতারে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা এখনও পরিপূর্ণভাবে বিবেক-বঞ্চিত হননি, কতিপয় যুদ্ধাপরাধী নরঘাতকদেরকে উপযুক্ত শাস্তির হাত থেকে বাঁচানোর গণবিরোধী প্রচেষ্টা অব্যাহত না রেখে তাঁরা ফিরে আসতে পারেন

শান্তির পথে, আল্লাহর পথে। ইসলাম বা যেকোনো বিশ্বাস মোতাবেক সমাজকে গড়ে তোলার চিন্তা করা কোনো অপরাধ নয়। কিন্তু জবরদস্তির পথ ইসলামের পথ নয়। আল্লাহ চাইলে জবরদস্তির ডিক্রি জারি করে ইসলাম কায়েম করতে পারতেন, তাঁর পেয়ারা হাবিব হযরত মুহম্মদকে সত্য প্রচারের দায়ে এত অপমান-অসম্মান-অবিচার-অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হতো না। কিন্তু জবরদস্তি দিয়ে আপাতভাবে মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিন্তু সৎ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

১৭.৯ ইসলাম ঈমান বিবেক বিচারবুদ্ধি ও স্বাধীনতা

ইসলাম মানে ঈমান, ফেইথ, বিশ্বাস। বিশ্বাস জিনিসটাই যুক্তিপূর্ণ। বিচারবুদ্ধি-পূর্ণ। বিশ্বাস-সংশয়-ভয় এবং যুক্তিবোধ সহজাত মানবিক বৈশিষ্ট্য। জন্মসূত্রে আল্লাহর কাছ থেকে মানুষ এগুলো পেয়ে থাকে। এগুলো মানুষের অন্তর্জাত গুণ। বিশ্বাসী মানুষ মাত্রেই তাই যুক্তিবাদী। সে যুক্তি খোঁজে নিজ বিশ্বাসের সপক্ষে, প্রমাণও খোঁজে, বাস্তব ইশারা খোঁজে। না পেলে সংশয় ভর করে, বিশ্বাস বদলায়। আর যে বিশ্বাস নিজের জন্য বদলানোর কোনো অবকাশ রাখে না, সে বিশ্বাস অন্তর্দৃষ্টিতে অন্ধ। অন্ধ-বিশ্বাস ডেকে আনে অন্ধকার। অন্ধকারের প্রধানতম আধেয় ভয়-বিভীষিকা-আতঙ্ক-আশঙ্কা। এদেরই বাহন জবরদস্তি। অন্যদিকে যে বিশ্বাস অন্ধ নয়, ওপেন: সে বিশ্বাস মানবিক, ধার্মিক। মানুষের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক গুণাবলী বা মনুষ্যধর্মকে তা ধারণ করে। তাই বলে বিশ্বাস পরিবর্তনের সুযোগ থাকা মানে কিন্তু সুবিধাবাদ নয়, উঠতে-বসতে (জান বাঁচাতে বা লোভে-মোহে) বিশ্বাস বদলানো নয়। বিশ্বাস বদলানোর সুযোগ থাকা মানে আসলে আন্তরিক বোঝাপড়ার সুযোগ থাকা: নিজের সাথে নিজের, নিজের সাথে আল্লাহর, এবং আল্লাহর অভিপ্রকাশ-সমূহের সাথে (মানে সৃষ্টিকুলের সাথে) নিজের ত্রিমাত্রিক বোঝাপড়ার সুযোগ। এই সার্বিক বোঝাপড়ার পথেই ব্যক্তি-মানুষ তার পরিবার-সম্প্রদায়-সমাজ-আত্মদায়ের পথ বেয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত, প্রসারিত, পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠতে থাকে।

এ জন্যই বিশ্বাস মানে বিবেকও বটে। বিবেক হচ্ছে সংশয়-যুক্তি-বিচারবুদ্ধির পথে বিশ্বাসকে শুদ্ধতর করে তুলতে থাকা। বিবেক তাই মূল্যবোধ। অন্যের কাছে নিজের মূল্য এবং নিজের কাছে অন্যের মূল্যের মধ্যে তুল্যমূল্য বিচারের বোধই মূল্যবোধ। অন্যের জায়গায় আমি হলে কী করতাম, আর আমার জায়গায় সে হলে কী করত, সেই বিচারবোধের নামই মূল্যবোধ। নীতিনৈতিকতা-মূল্যবোধ হলো: অন্যের স্থানে আমি হলে যে আচরণ প্রত্যাশা করতাম, আমার দিক থেকে অন্যদের সাথে সেই আচার-ব্যবহার-আদব-কায়দার অনুশীলন করা। বিশ্বাস-বিবেক-মূল্যবোধ মানে তাই সমবেদনাও বটে। অন্যের স্থানে আমি থাকলে যে বেদনা বোধ

করতাম, অন্যের সেই বেদনাকে সুষমভাবে উপলব্ধি করার নামই সমবেদনা। বিশ্বাসী মানুষ মানেই তাই বিবেকবান, যুক্তিশীল, নীতিবোধ-মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ। অন্যদিকে অন্ধ বিশ্বাস মানে জুলুমপন্থা। তার মধ্যে অভাব বোঝাপড়ার, বিচার-বিবেচনার, যুক্তিবুদ্ধির এবং বিবেকের।

বিশ্বাসী মানুষ মাত্রেই আবার স্বাধীন মানুষও বটে। কেননা আন্তরিক বোঝাপড়ার পথে সে নিজেকে খোলা রাখে যেকোনো পরিণাম মোকাবেলা করার জন্য। বিশ্বাসীরা পথিক: সহজ পথের, সিরাতুল মুস্তাকিমের। পথ কখনো আগে থাকতে মুখস্ত থাকে না, জানা থাকে না। পথ মানেই অচেনা অজানা পথ। পথ খোলা না থাকলে পথিক এগুতে পারে না। পথ বন্ধ তো পথিক অন্ধ। আর মুখস্ত পথ মানে রাজার পথ, হুকুম তামিল করার পথ। অন্ধ বিশ্বাসী এই জন্যই পরাধীন। নিজেরই বদ্ধ বিশ্বাসের হাতে সে নিজে বন্দি। খোয়া গেছে মনুষ্যসন্তান হিসেবে তাঁর স্বভাবদত্ত-প্রকৃতিদত্ত-আল্লাহ-প্রদত্ত স্বাধীনতার স্বাদ এবং সাধ। এবং নাস্তিকতাও এক প্রকার বিশ্বাস: আল্লাহর অস্তিত্বের প্রশ্নে অন্ধ-অবিশ্বাস। যা নাই তা না থাকার পক্ষে তথাকথিত 'প্রমাণ' হাজির করা। কিন্তু যা নাই তার না থাকা প্রমাণসাপেক্ষ হয় কোন যুক্তিতে তা ভাবার মতো সময় নাস্তিকের হাতে নাই। যুক্তির দিক থেকে দেখলে নাস্তিকতা তাই স্রেফ একটা 'ফ্যালাসি' (মিথ্যা যুক্তি, মিথ্যা বিশ্বাস বা হেত্বাভাস)।

১৭.১০ কর্তৃত্বপরায়ণ সংগঠনপ্রণালীই আসল সমস্যা

শাহবাগ-সমাবেশকে এগুতে হবে বিশ্বাস-যুক্তি-স্বাধীনতার পথে। আমাদেরকে বুঝতে হবে: এই তিনের মধ্যকার বহুল প্রচারিত আপাতবিরোধ আসলে যথাযথ উপলব্ধির অভাব মাত্র। অ্যানার্কিস্টদেরকে জবরদস্তিমূলকভাবে নিষিদ্ধ করতে যাওয়ার রাষ্ট্রীয় ভুল থেকে আজকের রাষ্ট্রপক্ষ এবং শাহবাগ-সমাবেশও চাইলে শিখতে পারে। নৈরাজ্যবাদকে নিষিদ্ধ করতে গিয়ে ইউরোপের রাজ রাষ্ট্রগুলো ডেকে এনেছিল দুই দশকের সহিংসতার হুল্লোড়। আজকের রাষ্ট্রপক্ষও কি সেই দিকেই নিয়ে যেতে চায় সমাজকে? যাঁদেরকে নিষিদ্ধ করার দাবি তুলছে তাঁদের রাষ্ট্র-সংগঠন-প্রণালী আর যাঁদের কাছে দাবি পেশ করছে শাহবাগ, তাঁদের রাষ্ট্র-সংগঠনপ্রণালী মূলত একই রকমের। এতকাল ধরে রাষ্ট্রকে যাঁরা খুন-গুম-নির্যাতন-কারাদণ্ড-মৃত্যুদণ্ড আর যুদ্ধের একটা অপ্রতিরোধ্য মেশিনে পরিণত করেছেন, সেই সব রাষ্ট্রাপরাধীদের গড়ে তোলা সংগঠন-কাঠামো দিয়েই কি যুদ্ধাপরাধীদের ন্যায্য বিচার সম্ভব? শাহবাগ-সমাবেশ কি রাষ্ট্রের বৈষম্য-বলপ্রয়োগ-ব্যক্তিমালিকানা নির্ভর নখদন্ত-থাবাগুলোকেই আরো শানিয়ে তুলতে চায়?

একবার বলেছি, সমাজ-সংগঠন-রাষ্ট্র যদি হুকুমতান্ত্রিক এবং যান্ত্রিকই থেকে

যায় তাহলে নাগরিকেরা ব্যক্তিগতভাবে ও সামাজিকভাবে নিজেকে-পরিবারকে-সমাজসংস্থাগুলোকে পরিচালনা করতে পারেন না; কারণ সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিকানা থাকে হুকুমতন্ত্রের একেবারে ওপরে গুটিকয় লোকের হাতে। যা বলি নি তা হলো: এই ধরনের সমাজ-সংগঠনই শেখায় আনুগত্য, অন্ধ-বিশ্বাস, অন্ধ-অবিশ্বাস এবং বল প্রয়োগের বৈধতা। সুতরাং ব্যক্তি-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে এই সাংগঠনিক উপায়-প্রণালী-কাঠামোকে বিদায় করতে না পারলে মতাদর্শিক অন্ধত্ব থেকে আমরা মুক্তি পাব না। সমাজে খুনোখুনি লেগেই থাকবে।

লেখাটি দৈনিক *ইত্তেফাক* পত্রিকার 'দৃষ্টিকোণ' পাতায় 'খর বায়ু বয় বেগে' শীর্ষক আমার নিয়মিত কলামে প্রকাশিত হয়েছিল ২৭শে ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

আমাদের বিড়াল, আমাদের ঘণ্টা

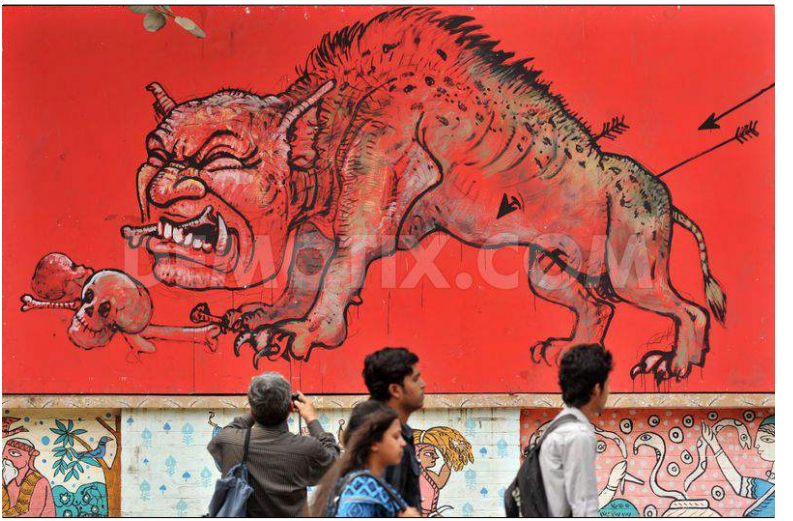

Bangladesh War Criminal Animal

১৮.১ আমাদেরকে কেন রাস্তায় লাশ হতে হবে?

যায়যায়দিন পত্রিকার বিশেষ একটি রিপোর্টের জন্য সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলা এবং পরে ঐ পত্রিকায় ২রা মার্চে মুদ্রিত আমার কথাগুলো একটি নোট আকারে ফেসবুকে পোস্ট করেছিলাম। অন্যদের মধ্যে কানাডায় উচ্চশিক্ষারত আমাদের এক প্রাক্তন শিক্ষার্থীও সেই নোটটি শেয়ার করেছিলেন। ফেসবুকে শেয়ারকৃত সেই নোটের নিচে মন্তব্যের ঘরে তাঁর এক বন্ধু গত ৩রা মার্চে লিখেছেন:

> আমি মোটেও কোনো ছাগুকে [মুক্তিযুদ্ধবিরোধীকে] সাপোর্ট করছি না।
>
> আমি নিজেও দুই বার শাহবাগ গিয়েছি। কিন্তু এখন যাচ্ছি না। আমার মতো আরো অনেকেই তাই করছে। তোরা বাইরে থেকে যা জানছিস, আর আমরা যা দেখছি, তার মধ্যে পার্থক্য অনেক যা তোকে বলে বুঝাতে পারব না। প্রতিদিন অগণিত মানুষ মারা যাচ্ছে, তারা সবাই কি যুদ্ধাপরাধী? গুলিবিদ্ধ ভাবীকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছিল যে ছেলেটি তাকে ধরে পুলিশ গুলি করে

মেরে ফেলেছে। ৬০ বছরের বৃদ্ধ লোকটি চা খেতে রাস্তায় এসেছিল, বোমার আঘাতে রাস্তায় পড়ে মরে থাকল, ওদের কী দোষ ছিল?

এই ভদ্রলোককে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। কিন্তু তাঁর কথা, আর অসহায় অনুভূতি আজ বাংলাদেশের আপামর মানুষের অনুভূতি। ফেসবুকে তিনি তাঁর ১লা মার্চের স্ট্যাটাসে আরো লিখেছেন:

আমরা কীসের মাঝে আছি জানি না। যেখানে আছি, সেখানে থাকতে পারব কিনা তা-ও জানি না। সকালে যখন বাসা থেকে বের হই, অফিস যেতে পারব কিনা তা যেমন জানি না, তেমনি অফিস থেকে বাসায় ফিরতে পারব কিনা তা-ও জানি না। বিচার হবে, শাস্তি হবে। সব ঠিক আছে, কিন্তু আমরা কী দোষ করেছি? আমাদের বাবা কী দোষ করেছেন? আমাদেরকে কেন রাস্তায় লাশ হতে হবে? গতকাল সন্ধ্যায় মিরপুরে ৬০ বছরের যে বৃদ্ধ লোকটি মারা গেলেন, তার কী দোষ ছিল? নোয়াখালিতে হিন্দুদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিল, তারা কী দোষ করেছে?

এই মুহূর্তের বাংলাদেশের এ এক মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন বটে। সামান্য, সাধারণ মানুষের লেখা। আমরা যাঁরা শত্রু শত্রু খেলার ডামাডোলে এখনও পুরোপুরি জ্ঞান হারাই নি তাঁরা কি মানুষের এই অসহায়ত্ব অনুভব করতে পারছি?

কী অবস্থা এখন বাংলাদেশের? বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারছে না। গরিব মানুষ পেটের দায়ে রিকশা নিয়ে, অটো নিয়ে, দৈহিক শ্রমশক্তিটুকু নিয়ে বাইরে বেরুতে পারছেন না। ব্যবসাবাণিজ্য উৎকণ্ঠায়। কৃষিকাজ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পথে। প্রত্যেকটা মানুষ আতঙ্কে অস্থির হয়ে আছেন। আমার ষাটোর্ধ্ব অসুস্থ মা কাতর কণ্ঠে ঢাকা থেকে জানতে চাইছেন রাজশাহীতে আমাদের অবস্থা কী? টেলিভিশনের-পত্রিকার খবর পড়া বা দেখা অসহ্য মানসিক চাপ তৈরি করছে। ও দিকে, ২৫ হাজার পর্যটক কক্সবাজারে আটকা পড়ে আছেন (*নিউ এজ*, ৩রা মার্চ)। একের পর এক লাগাতার হরতালে স্থবির হয়ে পড়ছে দেশ। আমরা আবার পিছিয়ে পড়ছি।

জামায়াত এবং বিএনপি আহুত মোট ৬০ ঘণ্টার লাগাতার হরতালের প্রথম দিনেই বগুড়ায় থানায় থানায় ফাঁড়িতে ফাঁড়িতে হামলা, র‍্যাবের গাড়িতে হামলা, রেলস্টেশনে ও বাণিজ্যমেলার স্টলে স্টলে আগুন, কুরিয়ার সার্ভিসে হামলা হচ্ছে (*বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম*, ৩রা মার্চ)। সিলেটে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে ছাত্রলীগ নেতাকে; রাজশাহীর গোদাগাড়িতে পুলিশ-জামায়াতের সংঘর্ষে মারা গেছে নয় বছরের মাসুম বাচ্চা (*প্রথম আলো*, ৩রা মার্চ)। রাজশাহীতে ট্রেনে আগুন, সীতাকুণ্ড-ফেনী-লালমনিরহাটে রেললাইনে আগুন, আর ফিসপ্লেট ও স্লিপার খুলে

ফেলার ঘটনা ঘটছে; নোয়াখালিতে রেললাইন উপড়ে ফেলা হয়েছে; অন্যত্র একই কারণে দুর্ঘটনায় পড়েছে আন্তনগর ট্রেন মহানগর গোধুলী (*বিডিনিউজ টোয়েন্টি-ফোর ডট কম*, ৩রা মার্চ)। কুমিল্লাতেও উপড়ে ফেলা হয়েছে রেললাইন; চাঁপাইয়ের শিবগঞ্জে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মতো একটা জায়গায় কার্যালয়, গুদাম ও আবাসিক এলাকায় আগুন ও লুটপাটের অকল্পনীয় তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে ৪৮টি পরিবার; সেখানে ১৫টি ইউনিয়নের ৫৮ হাজার গ্রাহক বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায়; ভেঙে পড়েছে বোরো খেতের সেচব্যবস্থা (*প্রথম আলো*, ৩রা মার্চ)। পুলিশকে যেভাবে মাথায় খন্তা ঢুকিয়ে হত্যা করা হচ্ছে তা পৈশাচিক। আবার, পুলিশ যেভাবে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে খুন করছে সেটাও রক্তবন্যার মতোই বটে।

পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, আরও যাচ্ছে। চট্টগ্রাম সিলেট নিলফামারীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় জামায়াত-বিডিআর-পুলিশের সহিংসতায় আরো ৪ জন নিহত হয়েছেন ২রা মার্চ (*ইত্তেফাক*, ৩রা মার্চ)। মাত্র এক মাসের মধ্যে, বলতে গেলে কয়েক দিনের মধ্যে, এ পর্যন্ত খুন হলেন কমবেশি অর্ধশতাধিক মানুষ (ইমদাদুল হক মিলন, *কালের কণ্ঠ*, ৩রা মার্চ)। আসলেই কত জন খুন হয়েছেন তার কোনো তালিকা কারো কাছে নাই। কেউ বলছেন ৩৭ থেকে ৪৫ জন নিহত হয়েছেন (*ডেইলি স্টার*, সম্পাদকীয়, ৩রা মার্চ), কেউ বলছেন ৪০ জন (*প্রথম আলো*'র সম্পাদকীয়, ৩রা মার্চ), কেউ বলছেন শুধু গত বৃহস্পতি-শুক্রবারে খুন হয়েছেন কমপক্ষে ৪৭ জন (*নিউ এজ*, ৩রা মার্চ), আবার কেউ বলছেন ৫৯ জন মানুষ এ পর্যন্ত নিহত হয়েছেন (সম্পাদকীয়, *নয়া দিগন্ত*, ৩রা মার্চ)। এর সাথে যোগ করুন জামায়াতের ৪৮ ঘণ্টা হরতালের প্রথম দিনে নিহত ২৩ জন (*সোনার দেশ*, রাজশাহী, ৪ঠা মার্চ ২০১১) এবং ২য় দিনে আরো ৩ জন মানুষ (*ডেইলি স্টার*, ৪ঠা মার্চ)। লাশ গুণে নামতা শেখার পাঠশালা খোলা হবে অচিরেই। ক্ষমতার চূড়ায় বসে এসএসএফ-নিরাপত্তায় থেকে দেশের অবস্থা কি বুঝতে পারছেন আমাদের মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীরা?

গুরুতর অবিবেচনার সাথে পাইকারি হারে গুলি করে পাখির মতো মানুষ মেরে ফেলার জন্য সরকারকে ধিক্কার দেওয়ার কোনো বিকল্পই নেই। পুলিশের যদি নিতান্তই আত্মরক্ষার প্রয়োজন পড়ে তাহলে ফাঁকা গুলি কিংবা বড়জোর হাঁটুর নিচে গুলি করতে হবে, এটাই চিরকালের পুলিশী রেওয়াজ। আত্মরক্ষার জন্য গণহারে বুক বরাবর গুলি করছে পুলিশ কোন যুক্তিতে? এ রীতিমতো রাষ্ট্রীয় বিভীষিকা। যুদ্ধাপরাধীদের সন্ত্রাসপন্থার বিপরীতে এই রাষ্ট্রীয় সহিংসতা গ্রহণযোগ্য নয়।

১৮.২ সর্বদলীয় দুষ্কৃতকারীদের সুবর্ণ সময়

যাঁরা সর্বদলীয় দুষ্কৃতকারী তাঁদের জন্য এটা সুবর্ণ সময়। যাঁরা অন্ধ-বিশ্বাসী এবং অন্ধ-অবিশ্বাসী তাঁদের জন্য এটা রীতিমতো আনন্দের উপলক্ষ্য। এই সুযোগে ডাকাতি বাড়বে, নাশকতা বাড়বে, অপরাধ বাড়বে। দোষ হবে জামাত-শিবিরের; দোষ হবে সরকারের। উভয় পক্ষ উভয় পক্ষকে দোষ দিতে পারলেই দায়িত্বমুক্ত হবেন, হয়ত আনন্দিতও হবেন। মরবে সাধারণ 'কর্মী'রা মানুষ, আর গরিব পুলিশ। ও দিকে, গত বৃহস্পতিবার থেকে বাগেরহাট, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় শুরু হয়ে গেছে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর, এবং তাঁদের প্রতিমা, ধর্মস্থান ও বাড়িঘরে বীভৎস আক্রমণ। চরম দুঃখজনকভাবে এই ঘটনাকে সরকারী ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া। এভাবেই চলতে থাকবে পারস্পরিক দোষারোপের নোংরা রাজনৈতিক খেলা। আরও বাড়বে। শনিবারে গাজীপুর বরিশাল নেত্রকোনা লক্ষ্মীপুর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আরও হামলা হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরস্ত্র মানুষের ওপর (*প্রথম আলো*, ৩রা মার্চ)।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যথাযথভাবেই জামাত-শিবিরের তাণ্ডব, খালেদা জিয়ার একপেশে বক্তব্য এবং সরকারের পাইকারি গুলিবর্ষণের নিন্দা করেছে (*বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম*, ৩রা মার্চ)। উভয় পক্ষকে তাঁরা সহিংসতা বন্ধে উদ্যোগ নিতে আহবান জানিয়েছেন; আর বাংলাদেশে এই সহিংসতায় জাতিসংঘ মহাসচিব পর্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন (*ইত্তেফাক*, ৩রা মার্চ)। ওয়াশিংটনে প্রেস ব্রিফিঙে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে বলা হয়েছে, সহিংসতা কখনো প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে না; এবং আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে সরকার পরিস্থিতি শান্ত করতে পদক্ষেপ নেবে; ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও এ ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতা মেনে নেওয়া যায় না বলে মত দিয়ে বলেছে এতে কেবল দেশের উন্নয়ন বিঘ্নিত হয় (*সমকাল*-এর সম্পাদকীয়, ৩রা মার্চ)।

প্রসঙ্গত, র‍্যাব-চিতা-কোবরা দিয়ে বেআইনী হত্যাকাণ্ডের মচ্ছব চলে আসছে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের গত কয়েকটা সরকারের নেতৃত্বে। সাথে, বিডিআর-বিদ্রোহের দায়ে আটক বন্দিদের মধ্যে বিচারের আগেই সেনা সরকারী সংস্থাসমূহের স্রেফ 'জিজ্ঞাসাবাদে' মারা গেছেন ৪৭ জন। বেআইনী হত্যাকাণ্ড কি তাহলে আরো আগে থেকেই এদেশে নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়ে যায় নি? আজ কি এসবেরও কুফল ঘটতে দেখছি না আমরা?

দেশ অচল হলে আমাদেরই ক্ষতি। আর যাবতীয় দুষ্কৃতকারীর লাভ। ইতোমধ্যে জামায়াত বিনষ্ট করছে গরিব এই দেশের অবকাঠামো। এরপর দেশের কী-পয়েন্ট-

ইন্সটলেশনগুলো আক্রান্ত হলে কে রক্ষা করবে? পুলিশ? বিডিআর? থানা পুলিশ-কারাগার দিয়ে সহিংসতা থামানো যায় না। পুলিশ কোনোদিন মানুষকে শান্তি-স্বস্তি দিতে পেরেছে? এরশাদ আমলে কি আমরা দেখি নি? আমরা অল্প কিছু তরুণ কি সেদিন মেশিনগান তাক করে রাস্তায় নামা সেনাদলকে রুখে দিই নি? সরকার যদি পুলিশ দিয়ে শান্তি কায়েম করার স্বপ্ন দেখে থাকে তাহলে তা অসার দিবাস্বপ্ন মাত্র। এখন থানা রক্ষা করার জন্য সেনা মোতায়েন করতে হচ্ছে (*বিডিনিউজটোয়েন্টি-ফোর ডট কম*, ৩রা মার্চ)। বিডিআর (বিজিবি) তো আগেই নেমেছে মাঠে। আমরা কি আবার সবাই মিলে এক-এগারো ডেকে আনছি না? ইতোমধ্যে বিবিসি'র বাংলা-বিভাগ বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ ছেপেছে (*বিবিসি* বাংলা, অনলাইন: মূল পাতা, ৩রা মার্চ)।

সব মৃত্যুই তো মৃত্যু। সব মৃত্যুতেই মায়ের কোল খালি হয়। জামাত-শিবিরের হাতে কেউ খুন হয়েছেন মনে হলে মিডিয়া যেভাবে তা কভার করছে, তার বিপরীতে জামাত-শিবিরের কর্মী-সমর্থকরা, এবং গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে মরা সাধারণ মানুষেরা, ডজন ধরে খুন হলেও তা নিয়ে কোনো মানবিক আবেদনপূর্ণ সংবাদ-কাহিনী নাই। প্রায় সব পত্রিকাকেই এখন এরশাদের 'দৈনিক বাংলা' মনে হচ্ছে। প্রায় সব টিভি-চ্যানেলকেই এখন 'বিটিভি' মনে হচ্ছে। আমরা এগুচ্ছি, না পিছাচ্ছি? প্রচারণার অন্ধকারে প্রতিদিন খুন হচ্ছে সত্য-সততা-বিবেক। এই অবস্থা আমাদের যেখানে নিয়ে যাবে সেখান থেকে ফেরার কোনো পথ কি সরকারের বা জামায়াতের বা প্রধান বিরোধী দলের আদৌ জানা আছে?

এদিকে বিরোধী দলের নেত্রীর সমালোচনায় শাহবাগ-সমাবেশের মুখপাত্র ডা. ইমরানকে দেখছি কথা বলছেন সরকারী দলের নেতাদের ভাষায়। আর তাঁদের সমাবেশে এতদিনকার নির্দলীয় অহিংস-নীতির ১৮০ ডিগ্রি বিপরীতে গিয়ে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা বলছেন বাঁশের লাঠি নিয়ে মাঠে নামার কথা (*প্রথম আলো*, ৩রা মার্চ)। এই সমাবেশের নেতৃত্ব চলে গেছে এখন সরকারী এবং সরকারী পক্ষের অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের নেতাদের হাতে, যাঁদের ডাকে সাধারণ তরুণ-যুবা ছাত্ররা কোনো দিন সাড়া দেয় নি। এই সব বন্ধ করা না হলে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে শাহবাগ-সমাবেশ। সে পরিণতি ঘটার আগেই তরুণ নির্দলীয়, রাজনীতি-প্রতারিত তরুণ প্রজন্মকে ভাবতে হবে নতুন উপায়ে সংগঠিত হওয়ার কথা।

শুধু তাই নয়, হাসপাতাল-ব্যাংক তো বটেই, পত্রপত্রিকা পর্যন্ত বন্ধ করার দাবি করছেন আজকের রাষ্ট্রপক্ষ শাহবাগ-সমাবেশের নেতারা, পত্রিকা-সম্পাদককে গ্রেপ্তারের সময়সীমা বেঁধে দিচ্ছেন তাঁরা। এগুলো আত্মঘাতী চিন্তা। কেউ মিথ্যা লিখলে আপনি সত্য লিখুন। কথা দিয়ে কথাকে মোকাবেলা করতে পারতে হবে।

রাষ্ট্রকে সেধে এনে পত্রিকা নিষিদ্ধ করা শেখানো যাবে না। মনে রাখতে হবে: ভিন্নমতের স্বাধীনতা ছাড়া স্বাধীনতা কথাটাই অর্থহীন। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বহু লড়াইয়ের পর আমরা মিডিয়ার সীমিত স্বাধীনতা অর্জন করেছি। প্রতিপক্ষকে দমনের নামে এ স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দেওয়া বিপজ্জনক কাজ। একবার নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ শুরু হয়ে গেলে আমরা আবার সামরিক স্বৈরাচারের মতো নব্য-স্বৈরতন্ত্রী অন্ধকারের অতলে নিমজ্জিত হবো। প্রসঙ্গত, বিনা বাধায় সাংবাদিকদেরকে কাজ করতে দিতে হবে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিবের পক্ষ থেকে তাঁর মুখপাত্রও (*ইত্তেফাক*, ৩রা মার্চ)।

১৮.৩ দরকার ব্যাপক জাতীয় ঐকমত্য

যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রশ্নে, সারা দেশের শান্তি-স্বস্তির প্রশ্নে, এই মুহূর্তে দরকার ঐকমত্য। ব্যাপক জাতীয় ঐকমত্য ছাড়া যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কবে কোথায় হয়েছে? কবে কোথায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পরে এরকম অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে? এ কথা ভুলে যাওয়ার সুযোগ নেই যে, আন্তরিকভাবে যুদ্ধাপরাধের বিচার করা এক ব্যাপার, আর নির্বাচনে জেতার জন্য মানুষের মুক্তিযুদ্ধ-আবেগ নিয়ে রাজনীতি করে ক্ষমতায় পাকাপোক্ত হওয়া আরেক ব্যাপার। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষ-বিপক্ষ সকলেই আড়চোখে তাকিয়ে আছেন রাষ্ট্রক্ষমতার মসনদের দিকে। ''যুদ্ধাপরাধীদের অবশ্যই উপযুক্ত বিচার হওয়া দরকার। উদ্যোগটা আওয়ামী লীগ নিয়েছে বলে তাদের অভিনন্দন। কিন্তু বিএনপিসহ সব দলকে নিয়ে উদ্যোগটা হলে বেশি ভালো হতো। প্রশ্নটা জাতীয়, দলীয় নয়।'' হ্যাঁ, একাত্তরে জামায়াতের তথাকথিত '' 'ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থান' বোধগম্য কিন্তু জনসাধারণের বিরুদ্ধে গণহত্যা-গণলুণ্ঠন-গণনির্যাতনের কর্মকাণ্ডে সুসংগঠিতভাবে অংশগ্রহণ করা একদম বোধগম্য নয়। তাদের উচিত চিহ্নিত নরঘাতকদের দল থেকে বহিষ্কার করে, দল হিসেবে একাত্তরের অপরাধ স্বীকার করে, জাতির কাছে আন্তরিকভাবে, বিনীতভাবে মাফ চেয়ে শান্তির পথে ফিরে আসা।'' তাদের উচিত যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রশ্নটিকে নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া, যুদ্ধাপরাধীকে দল থেকে বহিষ্কার করা, এবং তাদেরকে বাঁচানোর জন্য সারাদেশে নাশকতা সৃষ্টির পথ থেকে সরে শান্তির পথে ফিরে আসা। তারপর ভিন্ন নামে, ভিন্ন একটি গণতান্ত্রিক একটি দল হিসেবে নিজেদেরকে পুনর্গঠন করে সুস্থ রাজনীতিতে ফিরে আসার সুযোগ তাঁদের জন্য থাকা উচিত বৈকি। কেননা তাঁরা যখন সংগঠনগতভাবে, পাবলিকলি, আন্তরিক স্বরে আপামর দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইবেন, তখন তাঁদের একাত্তরের অপরাধমূলক অবস্থান পরিপূর্ণভাবে ভুল প্রমাণিত হবে। আর যদি তাঁরা মন থেকে ক্ষমা না চেয়ে লোক দেখানো কৌশলের ক্ষমা চান,

তাহলে তাঁদের ইসলামের নামে, আল্লাহ-রসুলের নামে পরিচালিত চরম সুবিধাবাদী নীতি মানুষের সামনে চূড়ান্তভাবে উন্মোচিত হবে। তখন তাঁদের মাফ পাওয়ার আর জায়গা থাকবে না। ''কিন্তু উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক, কোনো উসিলাতেই, কোনো অজুহাতেই রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের দিকে বাংলাদেশকে ঠেলে দেয়া যাবে না। পৃথিবীতে যত রাষ্ট্র আছে তার বেশিরভাগই রাক্ষস-রাষ্ট্র। রাক্ষসের নখদন্ত যত ছেঁটে দেয়া যায় ততই মঙ্গল। একবার এ রাক্ষস তার পূর্ণ চেহারায় হাজির হলে দেশটা আবার পিছিয়ে পড়বে। মারামারি-খুনখারাবি শুরু হলে লাভ হয় দুই পক্ষের অস্ত্রধারীদের। সমাজটা অস্ত্রধারীদের সমাজে পরিণত হয়। এ অবস্থায় সবাই চরমপন্থী হয়ে যেতে থাকে। বিবেকের স্বর আর শোনা যায় না। নিজের বন্ধুদের ভয়েই সত্য কথা বলতে মানুষ পিছপা হয়। এ অবস্থাতেই বিকশিত হয় অন্ধ-বিশ্বাস আর অন্ধ-অবিশ্বাস।'' এখন যুদ্ধাপরাধীদের শান্তিপূর্ণ বিচারের স্বার্থেই খুনোখুনি না বাড়িয়ে ''সরকারের উচিত জামায়াতকে বাদ দিয়ে বাকি সব দলকে নিয়ে 'জাতীয় সঙ্কট মোকাবেলা কমিটি' গঠন করে এ মুহূর্তে আন্তরিক সংলাপে বসা।''

যত যা-ই বলি না কেন, বিএনপিকে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী দল বলে চালানো যাবে না। মনে রাখতে হবে, ইতিহাস এবং চরিত্রের দিক থেকে বিএনপি এবং জামায়াত কখনোই এক নয়। ক্ষমতার সুবিধার্থে বিএনপি আর আওয়ামী লীগ উভয়ই জামায়াতকে আদর করে পাশে বসিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। বিএনপিকে 'জামায়াত' বলে আখ্যায়িত করাটা ভয়ঙ্কর আত্মঘাতী লাইন। এই লাইন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, দেশকে চরম অশান্তির জাহান্নামে পরিণত করবে, তৃতীয় শক্তি আর পরাশক্তির হাঙ্গর-কুমিরকে খাল কেটে ডেকে আনবে। সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে এ কথাই ঠিক যে: ''রাজনীতি মানেই ক্ষমতায় যাওয়ার এবং অনন্তকাল টিকে থাকার খেলা। যুদ্ধাপরাধের বিচারের সঙ্গে ক্ষমতায় যাওয়ার/থাকার সমীকরণই এখনকার সব অনাচারের উৎস।''[১]

সত্য যে, বিএনপির সীমাবদ্ধতার শেষ নাই। কিন্তু কেইবা ধোয়া তুলসি পাতা রাজনীতিতে? 'বাম'দের একটা অংশ কি এরশাদী সামরিক স্বৈরাচারের আমলে ১৫-দল ভেঙে বিএনপির সাথে মিলে পাঁচ-দল-সাত-দল খেলা খেলে নি? তাই বলে কি আজকের মহাজোট-মন্ত্রীসভায় তাঁদেরকে পাশে নেয় নি আওয়ামী লীগ?

---

১ এই প্যারার এবং এর আগের প্যারায় উদ্ধৃত কথাগুলো *দৈনিক যায়যায়দিন* পত্রিকার রিপোর্টারের প্রশ্নের উত্তরে লিখিতভাবে পাঠানো আমার বক্তব্য। যায়যায়দিনের সেই রিপোর্ট: সাখাওয়াত হোসেন, 'দেশের অনিশ্চিত যাত্রা: সামনে অন্ধকার সিঁড়ি: আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তছনছ চারদিকে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা', দৈনিক *যায়যায়দিন*, শনিবার, মার্চ ০২, ২০১৩।

এই মন্ত্রীসভারই শরিক দল জাসদ কি এই আওয়ামী লীগকে, শেখ মুজিবর রহমানকে উৎখাতের জন্য সামরিক বাহিনীতে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে নি। একদা বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলনে আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ নিজে কি নিজামীকে পাশে বসিয়ে সংবাদ-সম্মেলন করেন নি? তাহলে আজকে দেশের স্বার্থে, অর্থনীতির স্বার্থে, শান্তি-স্বস্তির স্বার্থে, সর্বোপরি যুদ্ধাপরাধের শাস্তিপূর্ণ বিচারের স্বার্থে বিএনপির সাথে বসতে সরকারের সমস্যা কোথায়? একাত্তরের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবও কি ইয়াহিয়ার মতো জেনারেলের সাথে সংলাপে বসেন নি?

আগামী নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রক্রিয়া-প্রণালী নিয়ে বিএনপির উদ্বেগ উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। আওয়ামী লীগ অনতিবিলম্বে বিএনপির সাথে আন্তরিকভাবে আলোচনায় বসুক। এই মুহূর্তের বৃহত্তম সংসদীয় দল হিসেবে তাঁদেরই দায়িত্ব বেশি। এইটুকু দায়িত্ববোধ কি আমরা মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী এই দলটির কাছ থেকে আশা করতে পারি না? আওয়ামী লীগকে এই সৎ পরামর্শ দেওয়ার মতো কোনো মানুষ কি শেখ হাসিনার আশেপাশে নাই? সকলেই কি বিবেকবর্জিত স্তাবকে পরিণত হয়েছেন? আওয়ামী লীগের উচিত বিএনপির সাথে বসে আগামী নির্বাচন সম্পর্কিত তাঁদের উদ্বেগগুলো নিঃশর্তভাবে দূর করা। বিএনপি আজকে জামায়াতের সাথে যে গেছে, সেটা তো সামনের নির্বাচনকে সামনে রেখেই, নাকি? নির্বাচন-প্রণালী ইত্যাদি নিয়ে তাঁদের উদ্বেগ দূর হলে তাঁদের সাথে সার্বিক সমঝোতায় আসা সম্ভব বলেই আমার বিশ্বাস। তাতে করে সব দিক থেকে মঙ্গল।

প্রচুর আলোচনা ও হোমওয়ার্কের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়াও শিক্ষক অধ্যাপক সাংবাদিক শিল্পী কবি সাহিত্যিক বিচারক সেনাবাহিনী পেশাজীবী ব্যবসায়ী ওলামা মাশায়েখ এবং তরুণ সমাজের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে একটি কার্যকর 'জাতীয় সংকট মোকাবেলা কমিটি' গঠন করা গেলে যুদ্ধাপরাধের বিচার কেউ ঠেকাতে পারবে না। মাঝখান থেকে আমরা পাব প্রাণবন্ত, সমঝোতাপূর্ণ একটি পার্লামেন্টের নেতৃত্বে পরিচালিত উন্নততর রাজনৈতিক পরিবেশ। মনে রাখতে হবে আগে মানুষ, তারপর আইন-আদালত-মতাদর্শ।

১৮.৪ ঘণ্টা বাঁধবে কে?

এখন প্রশ্ন, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? চিন্তাবৃদ্ধ দলীয় বুদ্ধিজীবীরা কোটারি স্বার্থ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন বলে মনে হয় না। ভরসা সুতরাং সেই তরুণরাই। তরুণরাই আমরা সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতৃত্বে সামরিক এরশাদশাহীর পতনের পর দুই নেত্রীকে রীতিমতো চাপ প্রয়োগ করে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনকে মেনে নিতে বাধ্য করেছিলাম। সেই সময় দুই নেত্রীর

সমঝোতাতেই 'রাষ্ট্রপতি সিস্টেম' থেকে আজ আমরা 'সংসদীয় সিস্টেমে'। দেশের ক্রান্তিকালে আজ দুই নেত্রীর সমঝোতা অসম্ভব হবে কেন? তরুণ বুদ্ধিজীবী লেখক শিক্ষক সাংবাদিক শিল্পী কবি সকলে মিলে চলুন আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ সকল দলের কাছে যাই। কারো জন্য অপেক্ষায় বসে থাকার সময় আর নাই। আমাদের বিড়ালের গলায় আমাদেরকেই ঘণ্টা বাঁধতে হবে।

রচনা: ৩রা মার্চ ২০১৩। প্রকাশ: দৈনিক *সোনার দেশ*, ৯ই মার্চ ২০১৩

জর্জ অরওয়েলের উনিশ শ চুরাশি: তোমার দ্বেষ আমার দ্বেষ বাংলাদেশ বাংলাদেশ

Anti-Vietnam March, Nineteen Sixty Seven. Anarchy and Art

> চিন্তা বলতে এখন আমরা যা বুঝি সেই অর্থে চিন্তা বলে কিছুই আর থাকবে না আসলে। গোঁড়ামি মানে চিন্তা না করা – চিন্তার প্রয়োজনই না পড়া। গোঁড়ামি হলো অচেতনতা। (জর্জ অরওয়েল, 'উনিশ শ চুরাশি', ১৯৪৯)

১৯.১ কে ছিলেন অরওয়েল?

জর্জ অরওয়েল ছিল তাঁর ছদ্ম নাম। প্রকৃত নাম এরিক ব্লেয়ার। জন্ম ১৯০৩ সালে। বৃটেনের তৎকালীন উপনিবেশ ভারতের পূর্ববঙ্গে। স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্র হিসেবে পড়াশোনা ইংল্যান্ডের অভিজাত স্কুলগুলোতে। কিন্তু সেসব স্কুলে শিক্ষার্থীদের ওপর স্বৈরাচারী নিয়ন্ত্রণের সাথে মানিয়ে নিতে পারেন নি তিনি। নিজেকে তাঁর নির্যাতিত মনে হতো। মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তিনি কলেজে পড়াই বাদ দিয়ে দেন। বৃটিশ রাজকীয় পুলিশবাহিনীর সদস্য হিসেবে চলে যান বার্মায়।

স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার কঠোর পুলিশী নিয়ন্ত্রণের প্রতি তাঁর ঘৃণা জন্মায়। ছুটি নিয়ে ফিরে আসেন ইংল্যান্ডে। এসেই ছেড়ে দেন চাকরিটা। মন দেন লেখালেখিতে।

ড্রইংরুম-লেখক ছিলেন না তিনি। লন্ডনের বস্তিতে ছেঁড়া কাপড় পরে জীবন-যাপন করেছেন। উত্তর ইংল্যান্ডের খনিশ্রমিকদের সাথে তাঁদের অধঃপতিত জীবন-যাপনও করেছেন তিনি। এসব অভিজ্ঞতা তাঁকে পুঁজিবাদ প্রত্যাখ্যান করতে শেখায়। আস্থা জন্মায় তাঁর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রতি। আরও পরে ১৯৩৬ সালে সাংবাদিক হিসেবে স্পেনে গিয়েছিলেন সেখানকার 'গৃহযুদ্ধ' তথা ফ্যাসিবাদের উত্থানের বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদী/সমাজতান্ত্রিক প্রতিরোধযুদ্ধ বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য। সেখানে ফ্যাসিবাদীদের বিভিষীকাপন্থা নিজের চোখে দেখেছেন। অংশ নিয়েছেন স্বাধীনতাশীল সমাজতন্ত্রীদের জনযুদ্ধে। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে লিখেছেন পরবর্তীকালে নোম চমস্কি কর্তৃক বহুল প্রশংসিত দালিলিক রচনা 'ক্যাটালোনিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি'। স্পেনে ফ্রাংকোর, জার্মানিতে হিটলারের এবং রাশিয়ায় স্তালিনের উত্থান তাঁর মনে সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রপন্থার প্রতি সুগভীর ঘৃণা এবং মনুষ্য-স্বাধীনতার প্রতি আন্তরিক অনুরাগের জন্ম দেয়।

১৯.২ কর্তৃত্বের প্রতি বিরাগ, স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ

এক কথায়, কর্তৃত্বের প্রতি বিরাগ এবং স্বাধীনতা-সৃজনশীলতার প্রতি অনুরাগই অরওয়েলকে দিয়ে *পশুখামার* (১৯৪৫) এবং *উনিশ শ চুরাশি* (১৯৪৯) নামে কালজয়ী উপন্যাস দুটি লিখিয়ে নিয়েছিল। রাশিয়া-জার্মানি-স্পেনে কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক কর্তৃত্বের মনুষ্যত্ব-বিধ্বংসী তৎপরতার যে পরাকাষ্ঠা তিনি দেখেছিলেন সেটাই তুলে ধরেছিলেন এই দুই লেখায়। ইংরেজি সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক কর্তারা রচনা দুটিকে (বলশেভিক ধারার) সমাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারের সমস্যা হিসেবে চালানোর চেষ্টা করলেও দুটো রচনাতেই আসলে তিনি সাধারণভাবে পুঁজিবাদ-পরবর্তী পাশ্চাত্য-সমাজে অর্থোডক্সির চূড়ান্ত পরিণতির চরম বিভীষিকাপূর্ণ ছবি এঁকে মানবজাতিকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলেন। সারা রাশিয়ায় 'সোভিয়েত' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আপামর শ্রমজীবী মানুষের অর্জিত মহান রুশবিপ্লবকে একটি ষড়যন্ত্রমূলক ক্যু-দেতা তথা রাজনৈতিক প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে নস্যাৎ করে দিয়ে লেনিনবাদী বলশেভিকদের প্রতিষ্ঠা-করা চরম ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের প্রচারণা-ভিত্তিক জয়জয়কার জর্জ অরওয়েলকে নিদারুণ ধাক্কা দিয়েছিল। এক দিকে বলশেভিকদের সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রপন্থাকে দুনিয়াজোড়া যোগাযোগহীনতা (আজকের তুলনায়), মানুষের জানার সুযোগের অভাব, আর স্রেফ প্রচারণার জোরে 'সমাজতন্ত্র' বলে চালাতে থাকা, এবং অন্য দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্য

দিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন অঞ্চলে বিপুল গতিতে প্রবর্ধমান চরম গণবিরোধী কর্পোরেট-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রপন্থার আশঙ্কাজনক বিকাশ অরওয়েলকে বিচলিত করেছিল।

১৯.৩ চিন্তাপরাধ, চিন্তাপুলিশ

কল্পনায় আঁটে এমন নিকৃষ্টতম মানবসমাজের একটা ধারণা পাই আমরা 'উনিশ শ চুরাশি'তে। ১৯৪৯ সাল। পারমাণবিক যুগের ঊষাকাল। তখনও ঘরে ঘরে টেলিভিশন ঢোকে নি। অরওয়েলের দূরদৃষ্টি পরমাণু-উত্তর যুগের এমন এক ছবি আঁকল যেখানকার ঘরে-বাইরে-পথে- প্রাঙ্গণে বসানো টেলিপর্দার মাধ্যমে প্রত্যেকটা মানুষকে সার্বক্ষণিক নজরদারির আওতায় আনার ধারণাটা আতঙ্কজনকভাবে সম্ভব বলেই মনে হয়। রচনাকালের ৩৫ বছর পরের ঘটনাবলী নিয়ে বিন্যস্ত, রক্তহিম-করা, এই অসাধারণ উপন্যাসটির ঘটনাকাল ১৯৮৪ সাল। ঘটনাস্থল লন্ডন, উপন্যাসের বিকল্প বাস্তবতায় যা ওশেনিয়া মহাদেশের 'এয়ারস্ট্রিপ ওয়ান' হিসেবে পরিচিত। অন্ধকার, হতাশ, নৈরাশ্যজনক স্বরে লিখিত এই রচনার মূলভাব হচ্ছে সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্রী রাজনৈতিক কর্তৃত্বের মনস্তাত্ত্বিক, প্রাযুক্তিক, শারিরীক এবং সামাজিক বিপদসমূহ – বিশেষত মনুষ্য-ভাষা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মনুষ্য-চিন্তার ওপর পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ কায়েমের প্রচেষ্টা।

উপন্যাসের মূল চরিত্র উইনস্টন স্মিথ শাসক-পার্টি 'ইংলিশ সোশ্যালিজম' বা 'ইংসক'-এর নিচু স্তরের সদস্য। যেখানেই তিনি যান, পার্টি তাঁর ওপর টেলিপর্দার মাধ্যমে নজরদারি করতে থাকে – এমনকি নিজের বাসাতেও। যেদিকেই তিনি তাকান, দেখতে পান পার্টির সর্বত্র বিরাজমান, সর্বজ্ঞ নেতাকে – বিশাল বিশাল টেলি-পর্দায়, বিরাটকায় সব পোস্টারে – সবার কাছে যিনি শুধু 'বিগ ব্রাদার' হিসেবে পরিচিত। (এ অবস্থা শুধু উইনস্টনের নয়। ওশেনিয়ায় মোট মানুষের ১৯ শতাংশ পার্টির সদস্য। এঁদের মধ্যে ১৮ শতাংশই বহিঃপার্টির সদস্য, আর বাকি এক শতাংশ অন্তঃপার্টির সদস্য। এই অন্তঃপার্টির সদস্যরাই আসল ক্ষমতাধর। পার্টি বলতে মূলত এঁদেরকেই বোঝায়। এঁরা বহিঃপার্টির সমস্ত সদস্যকে নজরদারিতে রাখেন। আর পার্টির বাইরেকার ৮১ শতাংশ লোক হচ্ছে প্রোল – প্রলেতারিয়েত – স্রেফ দাস। প্রোলরা ওশেনিয়ায় মানুষপদবাচ্যই নন। প্রোলদের তুলনায় বহিঃপার্টির সদস্যরা রীতিমতো সুবিধাভোগী, তা বলাই বাহুল্য।) সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করে পার্টি – ইতিহাস, ভাষা এবং চিন্তাকেও। এমনকি চিন্তার মধ্যে বিদ্রোহ নিয়ে ভাবাও বেআইনী। সমস্ত অপরাধের মধ্যে সবচাইতে বড় অপরাধ হলো 'চিন্তাপরাধ'। 'চিন্তাপরাধ' দমন করার জন্য ওশেনিয়ার সর্বত্র আছে 'চিন্তাপুলিশ'।

১৯.৪ বেআইনী ডায়েরি এবং মিনিস্ট্রি অফ ট্রুথ

উপন্যাসের শুরুতেই আমরা ওশেনিয়ায় পার্টির নিবর্তন এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণের ফলে উইনস্টনকে হতাশ অবস্থায় পাই। স্বাধীন চিন্তা, যৌনতা এবং ব্যক্তিত্ব সেখানে নিষিদ্ধ করেছে পার্টি। উইনস্টন তাই অপছন্দ করেন পার্টিকে। বেআইনীভাবে তিনি একটি ডায়েরি কেনেন। সেখানে তিনি তাঁর অপরাধমূলক ভাবনাচিন্তা লিখে রাখতে শুরু করেন। ও'ব্রায়ান নামের ক্ষমতাবান এক পার্টিসদস্যের সাথে তিনি খাতিরও পাতান। উইনস্টনের বিশ্বাস, ও'ব্রায়ান আসলে 'ব্রাদারহুড' নামের রহস্যময় এক গুপ্ত সংগঠনের গোপন সদস্য। এই সংগঠনের লক্ষ্য পার্টিকে উৎখাত করা। এরকম কোনো সংগঠন আসলেই আছে কিনা সেটা কেউ জানে না। লোকমুখেই শুধু শোনা যায় এর কথা।

উইনস্টন কাজ করেন 'মিনিস্ট্রি অফ ট্রুথ' বা 'সত্য সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়'-এ। সেখানে তাঁর কাজ হলো, পার্টির চাহিদামতো ঐতিহাসিক দলিলপত্র বদলে ফেলা। সেখানে তিনি কৃষ্ণকেশী এক নারী-সহকর্মীর দেখা পান, যিনি বারবার তাকাতে থাকেন উইনস্টনের দিকে। রীতিমতো উদ্দেশ্যপূর্ণ সেই চাহনি। উইনস্টনের দুশ্চিন্তা হতে থাকে – এ হয়ত পার্টিরই গুপ্তচর, নিশ্চয়ই এ তাঁকে তাঁর চিন্তাপরাধের জন্য পার্টির কাছে ধরিয়ে দেবে। ইতিহাসের ওপর পার্টির নিয়ন্ত্রণ নিয়েও বিচলিত বোধ করেন উইনস্টন। পার্টির দাবি, ইউরেশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ওশেনিয়া সব সময় ইস্টেশিয়ার মিত্র ছিল। কিন্তু উইনস্টন এমন একটা সময়ের কথা মনে করতে পারে যখন এ কথা সত্য ছিল না। পার্টি আরো দাবি করে, ব্রাদারহুডের তথাকথিত নেতা ইম্যানুয়েল গোল্ডস্টেইন ওশেনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক জীবিত ব্যক্তি। উইনস্টনের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। তাঁর সন্ধ্যাগুলো সাধারণত তিনি শহরতলীর দরিদ্রতম এলাকাগুলোতে হাঁটাহাটি করে কাটিয়ে থাকেন, যেখানে অত্যন্ত পুঁতিগন্ধময় পরিবেশে বাস করে প্রলেতারিয়েত বা 'প্রোল'রা। পার্টি-নজরদারির হাত থেকে তুলনামূলকভাবে এরা মুক্ত। ওশেনিয়ায় প্রোল আর পশুরাই শুধু স্বাধীন।

কৃষ্ণকেশী সেই নারী-সহকর্মীর কাছ থেকে এক দিন 'আমি তোমায় ভালোবাসি' লেখা একটা চিরকূট পান উইনস্টন। উইনস্টনকে তিনি জানান, তাঁর নাম জুলিয়া। পার্টি-নজরদারিকে ফাঁকি দিয়ে দিয়ে তাঁদের একটা গোপন সম্পর্ক শুরু হয়। এক সময় তাঁরা প্রোল-এলাকায় পুরোনো জিনিসপত্রের এক দোকানের ওপরকার একটা ঘর ভাড়া নেন, যেখান থেকে সেই ডায়েরিটা কিনেছিলেন উইনস্টন। তীব্র প্রেমের এই সম্পর্কটা চলতে থাকে। নিশ্চিভাবেই উইনস্টন জানতেন, আজ হোক কাল হোক একদিন ঠিক তাঁরা ধরা পড়ে যাবেন এবং তাঁদের শাস্তি হবে। নিয়তিবাদী উইনস্টন

জানতেন, যেদিন তিনি সেই ডায়েরিতে প্রথম লিখেছেন সেদিনই তাঁর নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেছে, ধ্বংস তাঁর অনিবার্য। জুলিয়া অবশ্য অধিকতর বাস্তববাদী এবং আশাবাদী। জুলিয়ার সাথে তাঁর সম্পর্ক যত এগুতে থাকে, পার্টির প্রতি তাঁর ঘৃণা ততই বাড়তে থাকে। অবশেষে তিনি সেই বার্তাটি পান যার জন্য তিনি অপেক্ষায় ছিলেন: ও'ব্রায়ান তাঁকে দেখা করতে বলেছেন।

ও'ব্রায়ানের অ্যাপার্টমেন্টে যান উইনস্টন আর জুলিয়া। উইনস্টন তো স্রেফ বহিঃপার্টির সদস্য – আর ক্ষমতাশালী অন্তঃপার্টির সদস্য হিসেবে ও'ব্রায়ান এমন বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন উইনস্টন যার কল্পনাই করতে পারেন শুধু। উইনস্টন আর জুলিয়াকে ও'ব্রায়ান আশ্বস্ত করেন যে, তাদেঁর মতো তিনিও পার্টিকে ঘৃণা করেন এবং ব্রাদারহুডের সদস্য হিসেবে আসলে তিনি পার্টির বিরুদ্ধেই কাজ করেন। উইনস্টন আর জুলিয়াকে তিনি ব্রাদারহুডের দীক্ষা দেন এবং পড়তে দেন ইম্যানুয়েল গোল্ডস্টেইনের বই – 'ব্রাদ্রারহুডের ইশতেহার'। ভাড়া করা সেই ঘরে উইনস্টন বইটা পড়ে শোনাতে থাকেন জুলিয়াকে। বইটা বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন ধরনের শ্রেণীভিত্তিক সামাজিক তত্ত্বের সংমিশ্রণ জাতীয় একটা জিনিস। হঠাৎ হুড়মুড় করে সৈন্যরা এসে ঢুকে পড়ে সেই ঘরে এবং তাঁদেরকে ধরে নিয়ে যায়। পুরোনো ঐ দোকানটার মালিক জনাব চ্যারিংটন আসলে চিন্তাপুলিশের সদস্য ছিলেন – আগাগোড়া।

১৯.৫ বিগ ব্রাদারের প্রতি ভালোবাসা

জুলিয়ার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে উইনস্টনকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় যার নাম 'ভালোবাসা সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়'। সেখানে তিনি দেখতে পান ও'ব্রায়ানও আসলে পার্টিরই গুপ্তচর। ব্রাদারহুড-সদস্য হওয়ার ভাব ধরাটা ছিল স্রেফ একটা অভিনয়। তিনি আসলে ফাঁদ পেতেছিলেন যেন পার্টির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহী তৎপরতা চালানোর দায়ে উইনস্টনকে একদম হাতেনাতে ধরা যায়। এবার তাঁকে নির্যাতন করা এবং তাঁর মগজধোলাই করার পেছনে মাসের পর মাস ব্যয় করেন ও'ব্রায়ান। আর প্রতিরোধ করার জন্য রীতিমতো সংগ্রাম করতে থাকেন উইনস্টন। ও'ব্রায়ান আগাগোড়াই চাইছিলেন উইনস্টন যেন মন থেকে জুলিয়াকে ছেড়ে দেন, কেননা প্রেম-ভালোবাসা-যৌনতা পার্টির কাছে অতিবিপজ্জনক এবং নিষিদ্ধ বস্তু। কিন্তু কিছুতেই মন থেকে জুলিয়াকে মুছে দিতে রাজি হন না উইনস্টন – স্রেফ অকল্পনীয় শারিরীক নির্যাতনেও না। অবশেষে ও'ব্রায়ান তাঁকে ভয়ঙ্কর কক্ষ নং ১০১ এ পাঠিয়ে দেন। এটাই হচ্ছে পার্টিবিরোধীদের আখেরি পরিণাম। ও'ব্রায়ান বলেন, এখানে তাঁকে তাঁর নিকৃষ্টতম ভয়কে মোকাবেলা করতে বাধ্য করা হবে। পুরো উপন্যাস জুড়ে উইনস্টন উপর্যুপরি দুঃস্বপ্ন দেখেন ইঁদুরের। ও'ব্রায়ান তাঁর মাথার

সাথে ইঁদুরভর্তি একটা খাঁচা বেঁধে দেন এমনভাবে যেন ইঁদুরগুলো তাঁর মুখমণ্ডল খেয়ে ফেলতে পারে। এবার সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েন উইনস্টন। কাকুতিমিনতি করতে থাকেন – এই কাজ জুলিয়ার সাথে করা হোক, তাঁর সাথে নয়।

এখন মানসিকভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়া অবস্থায় উইনস্টনকে মুক্তি দেওয়া হয়। জুলিয়ার সাথে তাঁর দেখা হয়, কিন্তু তিনি আর মেয়েটার প্রতি কোনো টান অনুভব করেন না। পার্টিকে এখন তিনি সম্পূর্ণত গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং বিগ ব্রাদারকে ভালোবাসতে শিখেছেন। এখানেই শেষ হয় উপন্যাস।

১৯.৬ নয়া-জবান, দ্বৈতচিন্তা, অর্থোডক্সি

এবার আসি অর্থোডক্সির প্রশ্নে, চিন্তার প্রয়োজন না পড়ার প্রশ্নে, চিন্তা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার প্রশ্নে – যা দিয়ে আমরা আলাপ শুরু করেছি। ঠিক কী বলছিলেন তিনি? উপন্যাসে এ প্রশ্নটা উঠেছিল সমস্ত মানুষের চিন্তাদাসত্ব সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ওশেনিয়ার পার্টি কর্তৃক সম্পূর্ণ নতুন এক ভাষারীতি চালু করার ব্যাপার নিয়ে। উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯৮৪ সাল নাগাদ পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় তাদের নিজেদের উদ্ভাবন-করা ভাষারীতি চালু করার। 'নয়া-জবান' হিসেবে আখ্যায়িত নতুন এই ভাষারীতির লক্ষ্য এমন সব আগাম ব্যবস্থা করা যাতে করে সমাজে কোনো প্রকার বিদ্রোহ হতে না পারে। মানুষ যেন বিদ্রোহের চিন্তাও না করতে পারে। এই লক্ষ্যে বিদ্রোহ, স্বাধীনতা, অধিকার ইত্যাদি যাবতীয় শব্দ উৎপাটন করার মাধ্যমে শুরু হয় নয়া-জবান প্রণয়নের কাজ। পুরোনো ভাষারীতি বা আদি জবান ছিল প্রমিত ইংরেজি ভাষা। আর নয়া-জবান হচ্ছে ওশেনিয়ার সরকারী ভাষা – রাষ্ট্র অনুমোদিত একমাত্র ভাষা। নয়া-জবানই হচ্ছে ইংসক, আর ইংসক হচ্ছে নয়া-জবান।

এর প্রথম কথাই হচ্ছে 'দ্বৈতচিন্তা'। পার্টির চাপিয়ে দেওয়া মিথ্যাকে যদি সবাই মেনে নেয়, সমস্ত দলিলপত্র যদি একই কেচ্ছা গাইতে থাকে, তাহলে সেই মিথ্যা ইতিহাসে ঢুকে পড়ে এবং সত্যে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে পার্টির স্লোগান হলো, অতীতকে যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন, ভবিষ্যৎকে তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করেন, আর বর্তমানকে যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন, অতীতকেও তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন। ঘটনা হচ্ছে, এত দিন পর্যন্ত যা সত্য ছিল, অন্তহীনকাল থেকেই তা সত্য বলে পরিগণিত ছিল। ব্যাপারটা এরকমই সহজসরল ছিল। আর এখন যা দরকার পড়ল তা হচ্ছে মানুষের স্মৃতির ওপর দিয়ে একের পর একের এক দখলদারিত্বের অনন্ত স্রোত বইয়ে দেওয়া। একেই তাঁরা বলেন 'বাস্তবতা-নিয়ন্ত্রণ', নয়া-জবানে বললে এটাই 'দ্বৈতচিন্তা'।

এ জিনিস প্রথম চালু হয় পার্টির পত্রপত্রিকা-মিডিয়ায়। অচিরেই পার্টির ভাষা-বিশেষজ্ঞরা নয়া-জবানের অতিকায় সব অভিধান রচনা করতে শুরু করেন।

একের পর এক সংস্করণ ছাপা হতে থাকে সেসব অভিধানের। নয়া-জবান হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র ভাষা প্রতি বছর যার শব্দসংখ্যা কমতে থাকে, কেননা এর লক্ষ্য হচ্ছে চিন্তার পরিসরকে সংকীর্ণ করে আনতে থাকা, চিন্তাপরাধকে অসম্ভব করে তোলা। এর লক্ষ্য নিজেকে ক্রমশ এমন এক স্তরে উন্নীত করা যাতে করে চিন্তাপরাধকে প্রকাশ করার মতো শব্দই খুঁজে পাওয়া না যায়। নতুন এই ভাষারীতি যখন খাঁটি পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে কেবল তখনই সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে পার্টির বিপ্লব। নয়া-জবানের দুর্দান্ত নমুনা পাওয়া যাবে খোদ পার্টির একেবারে মূল তিনটা স্লোগানে, বিশাল বিশাল হরফে যা খোদাই করা আছে সত্য সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের গায়ে। স্লোগান তিনটা হচ্ছে: **যুদ্ধই শান্তি / দাসত্বই স্বাধীনতা / অজ্ঞতাই শক্তি**।

এসব স্লোগানেই ফুটে ওঠে নয়া-জবানের মূল বৈশিষ্ট্য। এ রকম আরো নমুনা পাওয়া যায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নামকরণে। যে মন্ত্রণালয়ের কাজ পার্টির চাহিদা মোতাবেক ইতিহাসের সত্যকে প্রণালীবদ্ধভাবে, সুবিশাল আয়োজনসহকারে, নস্যাৎ করা, তার নাম 'সত্য সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়'। যেমন, যে মন্ত্রণালয়ের কাজ আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার নামে সন্দেহভাজন ব্যক্তিবর্গকে অমানুষিক নিপীড়ন করা, তার নাম 'ভালোবাসা সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়'। যে মানুষ স্বভাবতই অর্থোডক্স বা এমন গোঁড়া রকমের গতানুগতিক যে, 'খারাপ চিন্তা' করতেই অক্ষম, নয়া- জবানে তাকে বলে 'শুভচিন্তাসম্পন্ন' মানুষ।

তো, সাইম নামে উইনস্টনের পরিচিত এক লোক, যিনি নয়া-জবান বিষয়ক অভিধানের একাদশ সংস্করণের বিশেষজ্ঞ-বুদ্ধিজীবী, একদিন কথায় কথায় তাঁকে বলছিলেন, 'তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছ উইনস্টন, আমরা এখন যে ভাষায় [অর্থাৎ আদি জবানে] কথা বলছি আগামী এক শ বছরের মধ্যে সে ভাষা বোঝার মতো কোনো লোক আর বেঁচে থাকবে না? – শুধুমাত্র প্রোলরা ছাড়া', এবং যেন কিছুই না এমন একটা ভঙ্গিতে যোগ করেন সাইম, 'প্রোলরা মানুষ নয়'। তার মানে, সাইম বলতে থাকেন,

> ২০৫০ সালের মধ্যে, অথবা সম্ভবত তার আগেই, পুরোনো ভাষারীতির সমস্ত সত্য-জ্ঞান হারিয়ে যাবে। অতীতের সমস্ত সাহিত্য ধ্বংস করে দেওয়া হবে। চসার, শেক্সপিয়ার, মিল্টন, বায়রন – এদের অস্তিত্ব থাকবে শুধু নয়া-জবানের সংস্করণে। এদেরকে পরিবর্তিত করে যে স্রেফ আলাদা কিছুতে পরিণত করা হবে তা নয় – এমনভাবে বদলানো হবে যে তাঁরা আগে যা ছিলেন তার উল্টা জিনিসে পরিণত হবেন। এমনকি পার্টি-সাহিত্যও বদলে যাবে। বদলে যাবে এমনকি স্লোগানগুলোও। স্বাধীনতার ধারণাই যখন বিলুপ্ত হয়ে যাবে তখন তুমি এমন স্লোগান কোত্থেকে পাবে যে 'দাসত্বই স্বাধীনতা'? চিন্তার পুরো

বাতাবরণটাই আলাদা হয়ে যাবে। চিন্তা বলতে এখন আমরা যা বুঝি সেই অর্থে চিন্তা বলে কিছুই আর থাকবে না আসলে। গোঁড়ামি মানে চিন্তা না করা – চিন্তার প্রয়োজনই না পড়া। গোঁড়ামি হলো অচেতনতা।

এভাবেই তুলেছিলেন অরওয়েল অর্থোডক্সি সংক্রান্ত আমাদের আদি প্রশ্নটা, অর্থাৎ চিন্তার প্রয়োজন না পড়ার, তথা চিন্তা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার প্রশ্নটা। তো, আজকের প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের মুক্তচিন্তা ও মুক্তপ্রকাশের অধিকার, শিক্ষায়তনিক স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ের সাথে অরওয়েলের আলোচিত এই অর্থোডক্সি বা চিন্তাহীন গতানুগতিকতার সম্পর্ক কোথায়?

১৯.৭ আজকের যুগে বাস্তবতা নিয়ন্ত্রণ

একটা বিষয় তো ইতোমধ্যেই পরিষ্কার, যে বাস্তবতা তথা বাস্তবতা-নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অরওয়েল চিন্তিত ছিলেন, সেই বাস্তবতা আজকের দুনিয়ারই বাস্তবতা। ফ্র্যাংকো-স্তালিন-হিটলার আজ নেই ঠিকই, বলশেভিকদের জগৎজোড়া সাম্রাজ্য হাওয়া মিলিয়ে গেছে তাও ঠিক, কিন্তু মার্কিন কর্পোরেট সাম্রাজ্যবাদ এবং দুনিয়াব্যাপী কর্তৃত্বপরায়ণ চিন্তনের প্রাবল্য অরওয়েলের উদ্ভাবিত শব্দমালা ও উদ্ধৃতিরাজিকে আজকের সমাজের সাধারণ জ্ঞানে পরিণত করেছে। তাঁর অনেক শব্দই আজকের ইংরেজি ভাষার অভিধানের শব্দ এবং তাতে উল্লেখ থাকে যে এটি জর্জ অরওয়েলের বানানো শব্দ। যেমন, দ্বৈতচিন্তা বা 'ডাবলথিংক' শব্দটা। মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের এনকার্টা রেফারেন্স লাইব্রেরির ২০০৪ সালের এনকার্টা-অভিধানে এর অর্থ 'পরস্পর-বিপরীত দুটো বিশ্বাসকে একই সাথে সঠিক বলে গ্রহণ করা'। আমাদের আজকের পরিচিত পৃথিবীর সর্বত্রই কি আমরা এই জিনিসের অস্তিত্ব দেখছি না?

আবার ধরা যাক নয়া-জবান বা 'নিউস্পিক' শব্দটা। অরওয়েলের বরাত দিয়ে ঐ একই অভিধান এর অর্থ 'দ্ব্যর্থবোধক ভাষা' বলে সাব্যস্ত করেছে, 'এমন ভাষা যা দ্ব্যর্থবোধক এবং সত্য গোপন করার মতো করে বানানো, বিশেষত মাঝেমধ্যে আমলাবর্গ এবং প্রচারণাবিশারদেরা যা ব্যবহার করে থাকেন'। আজকের মার্কিন মন্ত্রীরা স্বাধীন রাষ্ট্র ইরাক দখল করার সময় যখন বলেন তাঁরা ইরাকীদের মুক্ত করার জন্য এসেছেন; কিংবা যখন তাঁদের 'নিখুঁত' বোমাবর্ষণে নিহত বেসামরিক ব্যক্তিদের কথা বলার সময় তাঁরা ব্যবহার করেন 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ' বা 'পারস্পরিক ক্ষতি'র মতো শব্দমালা; অথবা যখন আমাদের দেশের পুলিশ প্রভৃতি বাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে বলপ্রয়োগ করার পর তার নাম দেওয়া হয় 'সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা' কিংবা নিরীহ লোকজনের 'জানমাল রক্ষা'র চেষ্টা; কিংবা যখন আমাদের

বিশেষ সরকারী বাহিনী মানুষজনকে পূর্বপরিকল্পিতভাবে, ঠাণ্ডা মাথায় তুলে নিয়ে গিয়ে পূর্বনির্ধারিত স্থানে নেহাৎ একতরফাভাবে খুন করে তার নাম দেয় 'ক্রসফায়ার' বা 'বন্দুকযুদ্ধ' বা 'এনকাউন্টার' বা 'গুলিবিনিময়' এবং এরকম রাষ্ট্রীয় বিধি-বন্দোবস্তের নাম দেওয়া হয় 'আইনের শাসন'; কিংবা যখন কতিপয় ব্যক্তিবর্গের গণ-স্বার্থবিরোধী শাসনব্যবস্থাকে বলা হয় 'গণতন্ত্র'; অথবা যখন সমাজের একেবারে ওপরতলার বড়লোকদের একচ্ছত্র শাসনক্ষমতাকে বলা হয় 'জনগণের সরকার'; অথবা যখন অসহায় সমাজবিড়ম্বিত নারী বা শিশুকে পুলিশ বা ঐ জাতীয় কর্তৃপক্ষের অধীনস্ত অমানবিক, দুর্দশাপূর্ণ কোনো স্থানে দিনের পর দিন অনিশ্চিত অবস্থায় ফেলে রাখাকে খোদ আদালত বলেন 'নিরাপত্তা হেফাজত'-এ রাখা; অথবা যখন রাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন বা পুলিশ কর্তৃক আইনী অনুমতি সাপেক্ষে নিদারুণ নির্যাতনকে 'জিজ্ঞাসাবাদ' বলা হয়, তখন আমাদের অরওয়েল-কথিত নয়া-জবান আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। আসলে সর্বকালের সর্বস্থানের কর্তৃত্বতন্ত্র অরওয়েল-বর্ণিত এই নয়া-জবানেই কথা বলে এসেছে।

১৯.৮ ঘৃণার পতাকা

হাজার হোক, আমরা তো আজকে ঘৃণাকেই সর্বদলীয়-সর্বজনীন মনুষ্যধর্মের ধ্বজায় পরিণত করেছি আমাদের রক্তের দামে অর্জিত বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং তার সর্বপ্রকার পার্টি, মিডিয়া, রাজ-বুদ্ধিজীবীদের কল্যাণে, তাই না? এই পরিপ্রেক্ষিতে জর্জ অরওয়েল আমাদেরকে একটু কাঁদাতেও পারতে পারেন হয়ত। 'তোমার দ্বেষ, আমার দ্বেষ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ'-এ মানুষ তো আজকে কাঁদতে ভুলে গেছে। ঘেন্নাঘাটির ভ্যাপসা গরমে কান্না গেছে শুকিয়ে।

অনলাইন *প্রাইম খবর*, ৬ই মার্চ ২০১৩

বিশ

মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নৈরাজ্য

Many pieces of art are displayed in the area of Shahbag as part of the protest

> সহিংসতার ঘনীভূত ও সুসংহত রূপের প্রতিনিধিত্ব করে রাষ্ট্র। ব্যক্তির আত্মা থাকে, কিন্তু রাষ্ট্র যেহেতু আত্মাবিহীন একটা মেশিন, সেহেতু তা কখনোই সহিংসতা থেকে মুক্ত হতে পারবে না— কেননা এর খোদ অস্তিত্বটাই তো সহিংসতার কাছে ঋণী। (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-ক: ৩১৮)

২০.১ মুখের মহাত্মা নয়, অহিংস প্রতিরোধ

এই ৩০শে জানুয়ারি ছিল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ৬৫তম মৃত্যুবার্ষিকী। চে গুয়েভারার সহিংস ইমেজ-ইতিহাস নিয়ে বাংলাদেশে যাঁরা কর্পোরেট-ব্যবসায় এবং বাম-ব্যবসায় নিয়োজিত আছেন, তাঁদের কারো পক্ষেই এই দিনটাকে স্মরণ করা সম্ভব হয়নি। কর্তৃত্বপরায়ণ ও হিংসাজীবী বুদ্ধিজীবী-দল-প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে ব্যবসায় নিয়োজিত হওয়া নিতান্তই কঠিন। কেননা এঁরা সকলেই আজ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে কোনো না কোনোভাবে নিয়োজিত। আর মহাত্মা গান্ধীর খুন-হয়ে-যাওয়া ইমেজ-ইতিহাস তো আগাগোড়াই রাষ্ট্রহীন

সমাজের অভিসারী। তিনি যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপ্রধানের নোংরা গদিতে বসেননি, সেটা কিন্তু এমনি-এমনিই নয়। শুরুতেই উদ্ধৃত মহাবাক্যটি তার ইশারা মাত্র। শৈব-তান্ত্রিক মুক্তি-সাধক মহাত্মা গান্ধীর চমকে দেওয়ার মতো এই বাক্যটি সম্পর্কে কি আমরা জানতাম? কিংবা রাষ্ট্রের সহিংস চরিত্র সম্পর্কে গান্ধীর এই বিশ্লেষণ-ধারা প্রসঙ্গে কি আদৌ আমরা কিছু জানতাম? না, জানতাম না।

ধন্যবাদ ইতিহাসকে এবং শাসন-দীক্ষায়ন-প্রকৌশলকে: গান্ধীকে আজ মুখের 'মহাত্মা' বানিয়ে, প্রতিরোধ-অসম্ভব-অহিংসা বানিয়ে, ফটো করে তুলে রাখা হয়েছে রাষ্ট্রীয় অফিসের দেওয়ালে দেওয়ালে। মহাত্মা গান্ধী বলতে আজ আমরা স্রেফ দুধ-ভাত-অহিংসার কথা মুখস্থ করি; ভুলে যাই 'সাহসীদের অহিংসা'র কথা (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৪৬: ১২৯), কিংবা 'অহিংস প্রতিরোধ'-এর কথা (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-খ: ৫০৭)।

২০.২ গান্ধী কি অ্যানার্কিস্ট ছিলেন?

গান্ধীর কাছ থেকে রাষ্ট্র সম্পর্কে এরকম তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো নৈরাজ্যপ্রবণ মতামত শুনতে আমরা, আমি অন্তত, প্রস্তুত ছিলাম না। অথচ খোদ কংগ্রেস পার্টির শুরুর দিককার সভাপতি স্যার শঙ্করন নায়ার ১৯২২ সালেই সুবিস্তারিত তথ্যপ্রমাণ-সহ আস্ত একটা বই লিখে ফেলেছিলেন এ কথা প্রমাণ করার জন্য যে গান্ধী আসলে একজন অ্যানার্কিস্ট (স্যার শঙ্করন নায়ার, ১৯২২)। তাঁর অভিযোগ সত্য ছিল। তাঁর প্রমাণাদি গ্রাহ্য ছিল। কিন্তু আমার দশক-জোড়া নৈরাজ্য-অধ্যয়নের ধারা-বাহিকতায় কয়েক বছর আগে যখন 'গান্ধী কি অ্যানার্কিস্ট ছিলেন?' নামের রচনাটা (জোশ ফাত্তাল, ২০০৬) চোখে পড়ে, তখন আমার বিরাগই উত্পন্ন হয়েছিল বরং।

মার্কসীয় ডগমার সাথে অন্তরঙ্গ-ঐকান্তিক-সুদীর্ঘ সংসর্গ থাকার কারণে আগা-গোড়াই আমি যেকোনো, বিশেষত অ্যানার্কিস্ট, ডগমা সম্পর্কে সাবধান থাকি। তাই, এর আগে, লেভ তলস্তয় খ্রিষ্টিয় অ্যানার্কিস্ট ঘরানার সক্রিয় মানুষ ছিলেন বলে যাবতীয় নৈরাজ্য-ইতিহাসবিদের কাছে শুনেও বিরক্ত হয়েছিলাম, যদিও সেসব ইতিহাসবিদ (যেমন পিটার মার্শাল, ২০০৮: ৪২২-৪২৭) কেউই ফেলনা ছিলেন না। কিন্তু যখন সত্যি সত্যি তলস্তয়ের 'রুশ উদারনীতিবাদীদের প্রতি একটি চিঠি' (১৮৯৬), 'দেশপ্রেম ও সরকার' (১৯০০), 'তুমি খুন করবে না' (১৯০০), 'নৈরাজ্য প্রসঙ্গে' (১৯০০), 'জার এবং তাঁর সহকারীদের প্রতি' (১৯০১), 'শ্রমজীবী জনগণের প্রতি' (১৯০২), গান্ধী-তলস্তয় পত্রবিনিময়-সংকলন (তলস্তয়, ১৯৩৭) ইত্যাদি রচনা পড়তে থাকলাম তখন হাঁ হয়ে যাওয়া ছাড়া পথ থাকল না। বিশেষ করে যখন ডেভিড স্টিফেন্সের সম্পাদনা করা তলস্তয়-রচনা

সংকলন *সরকার মানে সহিংসতা* (তলস্তয়, ১৯৯০) হাতে এল তখন একেবারে টাশ্‌কি খেয়ে গেলাম: তলস্তয়ের অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও স্বরচিত নৈরাজ্য-প্রবণতা সম্পর্কে আর সামান্যতম সংশয়ও থাকল না।

তারপরও গান্ধী নৈরাজ্যবাদী ছিলেন কিনা তা নিয়ে জোশ ফাত্তালের উপরোক্ত অন্বেষণ আমাকে সংশয়েই রাখে। রচনাটিতে সেকেন্ডারি সোর্স থেকে কোট করা গান্ধীর এমনসব গা শিউরানো নৈরাজ্যিক কথা ছিল, যেগুলো গান্ধীর নিজের বইয়ে স্বচক্ষে দেখা ছাড়া শান্তি পাচ্ছিলাম না। আজকের শুরুর উদ্ধৃতিটাও ফাত্তালের কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। তিনি সেটা পেয়েছিলেন ইগনাটিয়াস জেসুডাসান (১৯৮৭) এর গ্রন্থে। শেষ পর্যন্ত, ক-দিন আগে ভারত-সরকারের প্রকাশ করা মহাত্মা গান্ধীর ৯৮ খণ্ডের, ৫০ হাজার পৃষ্ঠার, রচনা সংগ্রহ (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৯৯) ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করার পর ঐ উদ্ধৃতি-সম্বলিত মূল রচনাটা যখন চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে থাকল তখন আর হতাশার সীমা থাকল না। আমি নিরুপায় হয়ে স্বরাজ-অরাজ-নৈরাজ্যের দৃষ্টান্ত দেখতে থাকলাম পাতার পর পাতায়।

২০.৩ আত্মাহীন মেশিনের কথা

তো, কী প্রসঙ্গে কোথায় রাষ্ট্রের সহিংস চরিত্র আর আত্মাহীনতার কথা তুলেছিলেন গান্ধী? সেটা ছিল ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে গান্ধীর প্রাইভেট সেক্রেটারি নির্মল কুমার বসুর নেওয়া একটি সাক্ষাত্‌কারে। প্রথমে সেটা দ্য *মডার্ন রিভিউ পত্রিকায়* এবং পরে দ্য *হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকায়* ছাপা হয়। এবং সেটা মোটেও কোনো মুখ-ফস্কানো কথা ছিল না। কথা উঠেছিল খাদি দিয়ে পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতিদেরকে ঠেকানো যাবে কিনা তাই নিয়ে। সে কথা গিয়ে ঠেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সাথে অহিংসার সম্পর্ক প্রসঙ্গে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অসমতা যেহেতু সমাজে হিংসা তৈরি করে, নির্মল বসু তাই জানতে চাইছিলেন সম্পত্তির ব্যক্তি-মালিকানার জায়গায় রাষ্ট্রীয় মালিকানা কায়েম করে তাহলে আমরা সহিংসতা কমিয়ে আনার চেষ্টা করব না কেন। উত্তরে গান্ধীর কথা তাঁর মুখ থেকেই শুনি:

> এটা ব্যক্তি-মালিকানার চেয়ে ভালো। কিন্তু সহিংসতার নিরিখেই— সেটাও আপত্তিকর। এটা আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস যে রাষ্ট্র যদি সহিংসতা দিয়ে পুঁজিবাদকে দমন করে, তাহলে রাষ্ট্র নিজেই সহিংসতার চক্রে জড়িয়ে যাবে, এবং কখনোই তা অহিংসার জন্ম দিতে পারবে না। সহিংসতার ঘনীভূত ও সুসংহত রূপের প্রতিনিধিত্ব করে রাষ্ট্র। ব্যক্তির আত্মা থাকে, কিন্তু রাষ্ট্র যেহেতু আত্মাবিহীন একটা মেশিন, সেহেতু তা কখনোই সহিংসতা থেকে মুক্ত হতে পারবে না— কেননা এর খোদ অস্তিত্বটাই সহিংসতার কাছে ঋণী। (মোহনদাস করমচাঁদ

গান্ধী, ১৯৩৪-ক: ৩১৮)

এরকম সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা শোনার পরও নির্মল বসু রাষ্ট্রের হাতে অন্তত কিছু ক্ষেত্রে 'সহিংসতার ন্যূনতম প্রয়োগ' এর দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে নাছোড়। বিশেষ একটা উদাহরণ দিচ্ছেন তিনি। বলছেন: ধরুন, এক জন শিল্পী তাঁর ছেলের কাছে কিছু ছবি রেখে গেলেন। ছেলেটা ছবিগুলোর মূল্য বুঝল না। সে সেগুলো বেচে দিল বা নষ্ট করে ফেলল। এতে করে এক জনের আহাম্মকির জন্য পুরো জাতির একটা ক্ষতি হয়ে গেল। তখন কি গান্ধীর মনে হবে না যে ঐ ছেলের কাছ থেকে ছবিগুলো নিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহিংসতার ন্যূনতম প্রয়োগ করাটা রাষ্ট্রের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত? উত্তরে গান্ধী বলছেন:

> হ্যাঁ, রাষ্ট্র আসলে ঐ জিনিসগুলো নিয়ে নেবে, এবং আমার বিশ্বাস, [এক্ষেত্রে] রাষ্ট্র যদি সহিংসতার ন্যূনতম প্রয়োগ ঘটায় তবে সেটা যুক্তিসঙ্গতও হবে। কিন্তু এই ভয়টা সবসময়ই থেকে যায় যে রাষ্ট্রের সাথে যাঁরা ভিন্নমত পোষণ করবেন তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র হয়ত সহিংসতার অতিরিক্ত প্রয়োগই ঘটাবে। (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-ক: ৩১৮)

নিজেরই মনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই: এ কি গান্ধীর কথা শুনছি নাকি প্রুধোঁ বাকুনিন লুইজ মিশেল গিওম হিন্স ক্রপোৎকিন ম্যালাতেস্তা বা এমা গোল্ডম্যানদের কথা শুনছি! কিন্তু এখানেই থেমে যাচ্ছেন না গান্ধী। বলছেন:

> ব্যক্তিগতভাবে যেটা আমি বেছে নেব সেটা রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতার ঘনীভবন নয় ...; কেননা আমার মতে, রাষ্ট্রের সহিংসতার চেয়ে ব্যক্তি-মালিকানাজনিত সহিংসতা কম ক্ষতিকর। (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-ক: ৩১৮)

এবার নির্মল কুমার বসুর প্রশ্ন:

> তাহলে কি বাপু আমরা ধরে নেব আপনার সাথে সমাজতন্ত্রীদের [পড়ুন 'বলশেভিক সমাজতন্ত্রীদের'] মৌলিক পার্থক্যটা এইখানে যে আপনার বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ যতটা না অভ্যাসের বশে জীবন চালায় তার চেয়ে বেশি চালায় আত্ম-নির্দেশনার সাহায্যে, আর তাঁরা বিশ্বাস করেন নিজ সিদ্ধান্তের তুলনায় অভ্যাস দিয়েই বরং জীবন চালায় মানুষ। তা-ই যদি হয় তাহলে আপনি আত্মশুদ্ধির চেষ্টা চালাতে থাকেন কেন যখন নাকি তাঁরা সচেষ্ট হন এমন একটা সিস্টেম গড়ে তুলতে যেখানে একজন মানুষের অন্য মানুষকে শোষণ করার বাসনা চরিতার্থ করাটা অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে? (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-ক: ৩১৮)

ইউরোপের উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গড়ে ওঠা 'শ্রমজীবী মানুষদের আন্তর্জাতিক সমিতি' তথা 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর ভেতরে মার্কসবাদীদের সাথে নৈরাজ্যবাদীদের রাষ্ট্রতর্ক তীব্র হয়ে উঠেছিল যে প্রশ্নে, এ তো ঠিক সেই প্রশ্ন! এখানে নির্মল কুমার বসু যেন প্রতিনিধিত্ব করছেন মার্কসবাদী-বলশেভিক রাষ্ট্রতন্ত্রীদের, আর গান্ধী যেন প্রতিনিধিত্ব করছেন নৈরাজ্যবাদীদের। তো, নির্মল বসুর উপরের প্রশ্নটার উত্তরে গান্ধী বলছেন:

> মানুষ যে আসলে অভ্যাস দিয়েই চলে সে কথা স্বীকার করে নিয়েও আমার মনে হয়, নিজের ইচ্ছাশক্তির অনুশীলনের সাহায্যে বাঁচাটাই তার জন্য অধিকতর ভালো। আমি আরো বিশ্বাস করি, মানুষ তাঁদের ইচ্ছাশক্তিকে এতটা দূর পর্যন্ত উন্নত করে তুলতে সক্ষম যে তার ফলে শোষণের ব্যাপারটা কমে এসে ঠেকবে একেবারে ন্যূনতম পর্যায়ে। রাষ্ট্রের ক্ষমতার বাড়বাড়ন্তকে আমি চরমতম ভয়ের চোখে দেখি, কেননা যদিও নাকি দেখতে মনে হয় যে শোষণের প্রশমন ঘটানোর মাধ্যমে রাষ্ট্র আমাদের মঙ্গল সাধন করছে, কিন্তু আসলে তা মানব-জাতির সর্বোচ্চ ক্ষতি সাধন করে— ব্যক্তিসত্তার ধ্বংস ঘটানোর মাধ্যমে; অথচ যাবতীয় প্রগতির গোড়ায় আছে এই ব্যক্তিসত্তাই। (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-ক: ৩১৯)

কিন্তু গান্ধীর মতো সমাজ-শিক্ষকরা তো আর প্রতিদিন দুনিয়ায় জন্মান না, কালেভদ্রে আসেন। তাহলে মানুষের আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে গান্ধীর মতো মানুষদের ব্যক্তি-প্রভাবের ওপর নির্ভর করে পরে খেই হারিয়ে ফেলার চাইতে বিশেষ কোনো প্রকার সমাজ-সংগঠন গড়ে তোলা এবং তার ওপর নির্ভর করাটাই কি বেশি কাজের নয়? নাছোড় নির্মলের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পিছ ছাড়ে না। তাতে অবশ্য গান্ধীর 'স্বরাজ'-এর নৈরাজ্যমুখীনতাকে বুঝতে আমাদের সহজ হয়। নির্মলের উত্তরে গান্ধীর কথা:

> আমার কথা বাদই থাক। আপনাকে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে, মানব-জাতির সমস্ত মহান শিক্ষকের প্রভাব তাঁদের জীবন অতিবাহিত হওয়ার পরেও থেকে গেছে। মুহম্মদ বুদ্ধ যিশুর মতো প্রত্যেক নবীর শিক্ষার মধ্যে একটা অংশ থাকে স্থায়ী ধরনের, আর আরেকটা অংশ থাকে যা তাঁদের সময়ের প্রয়োজন ও চাহিদার জন্য উপযোগী ধরনের। ... কিন্তু তা যা-ই হোক, আপনি দেখতে পাবেন যে এইসব মানুষের প্রভাব তাঁরা চলে যাওয়ার পরও টিকে থেকেছে। অধিকন্তু, যা আমি অনুমোদন করি না তা হলো বলপ্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংগঠন, যেমন রাষ্ট্র। তবে, স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠন তো থাকতেই হবে। (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-ক: ১৩৯)

অধিকন্তু: গান্ধী যে 'আদর্শ সমাজ' এর স্বপ্ন দেখেন সেটা 'রাষ্ট্রহীন সমাজ'-এর দিকে অগ্রসরমান একটা পথই বটে (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৪৬: ১২৯)। থামতে পারছি না, গান্ধীকে কোট করতে ভালো লাগছে:

> ... একটা আদর্শ সমাজে কি রাষ্ট্র-ক্ষমতা থাকবে কিংবা এরকম একটা সমাজ কি রাষ্ট্রহীন হবে? আমার মনে হয় এই প্রশ্নটা অবান্তর। আমরা যদি এরকম একটা সমাজ গঠন করার দিকে কাজ করে যেতে থাকি, অন্তত কিছুটা পর্যন্ত তো সেটা বাস্তবায়িত হতে বাধ্য এবং ততটা পর্যন্ত তো মানুষ তা থেকে উপকার পাবেই। ইউক্লিড সরলরেখার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে করে তার কোনো প্রস্থ থাকার কথা না, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ সে রকম কোনো সরলরেখা আঁকতে পারেন নি এবং কোনো দিন কেউ পারবেনও না। তার পরও আমরা জ্যামিতিতে উন্নতি ঘটাতে পারি শুধু মাত্র এই ধরনের একটা সরলরেখার কথা অনুমান করে নিয়েই। প্রত্যেকটা আদর্শের ক্ষেত্রেই কথাটা সত্য।' (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৪৬: ১২৯)

২০.৪ স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি

আজকের রাষ্ট্র-কর্পোরেট-রাক্ষসের হাত থেকে আমাদের সমাজটাকে বাঁচানোর জন্য চাই গান্ধীর মতো স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। কেবল স্বাধীন (স্ব+অধীন) যাপন ও অনুশীলনের সার্বক্ষণিক, আমৃত্যু প্রচেষ্টার ভেতর দিয়েই এরকম মাথা-উঁচু বিনয়ী ব্যক্তি গড়ে উঠতে পারেন। কর্তৃত্বপরায়ণ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ তো অনেকেই আছেন কিন্তু অন্যের স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদাকে নিজের স্বাধীনতার আর আত্মমর্যাদার গ্যারান্টি হিসেবে দেখার মতো মানুষই আজ চাই।

কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র-ক্ষমতার বিপরীতে গান্ধীর এই যে ব্যক্তিসত্তার 'আত্মনির্দেশনা' > আত্ম-অধীনতা > স্ব-অধীনতা > স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা অভিমুখিন চিন্তা-তৎপরতা – এরই নাম মুক্তিপরায়ণতা, নৈরাজ্য। গান্ধীর জন্য যেটা স্বরাজ, আমার মতো অ্যানার্কিস্টের জন্য সেটাই অরাজ। উপরন্তু 'স্বরাজ' কথাটা দিয়ে প্রত্যেক মানুষের নিজেই নিজের 'রাজা' হয়ে ওঠার কামনাকে ধারণ করা যায়। কিন্তু এক দিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এক-দেড় দশকের অন্ধকার কাল-পর্বে সন্ত্রাসবাদের কারণে এবং অন্য দিকে বিপুলতম নৈরাজ্যবিরোধী প্রচারণার কারণে সারা বিশ্বে এমন বিভ্রান্তি তৈরী হয়েছে যে আজও লোকে নৈরাজ্য বলতে বিশৃঙ্খলা বোঝে। অন্ধকার ঐ কাল-পর্বে নৈরাজ্যবাদীদের সামান্যতম আইনী তত্পরতার সুযোগও রাখে নি ইউরোপের সরকারগুলো। ফলে গভীর হতাশায়, নির্মম অত্যাচারে বিগড়ে গিয়ে সন্ত্রাসের জনবিচ্ছিন্ন পথ বেছে নেন নৈরাজ্যবাদীদের একটা অংশ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়াতেই, সেই ১৯০৭ সালের আমস্টার্ডাম-কংগ্রেসে শুধরে

নিয়ে তাঁরা ফিরে আসেন পথে। আর আজকের একুশ শতকের নৈরাজ্যবাদীদের 'অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট আন্দোলন' তো প্রবলভাবে গান্ধীর অহিংস প্রতিরোধের পথই বেছে নিয়েছে (ডেভিড গ্রেইবার, ২০১১-খ; ডেভিড গ্রেইবার, ২০১২-খ)।

২০.৫ রাষ্ট্রীয় হিংসানীতির ক্রমবর্ধমান বিপদ

আজকের বাংলাদেশে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এমন কোনো মানুষ নাই যে আতঙ্কে নাই, দুশ্চিন্তায় যার ঘুম ব্যাহত হচ্ছে না। অপারেশন ক্লিন হার্ট, র‍্যাব-চিতা-কোবরা প্রভৃতির ক্রমাগত ক্রসফায়ার, সেনা কেয়ারটেকার-সরকারের সময় সারাদেশব্যাপী যৌথবাহিনীর আপামর নির্যাতন, এবং বিডিআর-বিদ্রোহের জন্য ঘোষিত রাষ্ট্রীয় সাধারণ ক্ষমা কার্যত প্রত্যাহার করে নিয়ে হাজার হাজার জওয়ানের চাকুরিচ্যুতি, কারাদণ্ড নির্যাতন, পরিবার তছনছ হয়ে যাওয়া, আর আটকাবস্থায় ৪৭ জন তাজা মানুষের মৃত্যু ঘটানোর মতো পরিস্থিতি রচনা করার মধ্য দিয়ে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্র আজ (মার্কিন দূতাবাসের উইকিলিকস-তারবার্তা মোতাবেক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ-সাংবাৎরিক সামরিক-আইনগত-প্রশিক্ষণগত তত্ত্বাবধানে প্রাপ্ত অস্ত্র, সমরবিদ্যা, জেরা-জিজ্ঞাসাবাদ-নির্যাতনের উন্নততর তত্ত্বের বাস্তব অনুশীলন করে চলেছে আজ বহু বছর ধরে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে জামাত-বিএনপির অযৌক্তিক অবস্থান এবং প্রকারান্তরে বিচারের ও খোদ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাঁদের সুসংগঠিত সহিংসতার উসিলায় রাষ্ট্র আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যুদ্ধাপরাধ-বিচারের বিরোধীদেরকে সামরিক কায়দায় মোকাবেলা করতে গিয়ে আমরা যে আমাদের গরিব গণতন্ত্রের বিদ্যমান মুক্ত পরিসরগুলিকেও সামরিকতার আওতায় না এনে ফেলি। আমরা যেন সমাজকে একেবারে ভিন্নমতশূন্য করে ফেলার দিকে ঝুঁকে না পড়ি। তা না হলে অত্যাসন্ন সদা-দুঃস্বপ্নময় রাষ্ট্রীয় নিগ্রহ থেকে সামনের দিনগুলোতে শেষ পর্যন্ত আমরা কেউই বাঁচব না। এ নিয়ে এখনও যাঁরা যথেষ্ট ভাবিত নন, তাঁদের জন্য মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্র এবং সহিংসতা সম্পর্কিত চিন্তাপ্রণালী উদ্দীপক হয়ে ওঠার সুযোগ আছে বৈকি।

রচনা: জানুয়ারি ২০১৩। পরিমার্জনা: মার্চ ২০১৩। দৈনিক বণিক বার্তা: ৯ই মার্চ ২০১৩

চাঁদে সাঈদী: যোগাযোগ-বার্তার অর্থ নির্ধারণ প্রসঙ্গে

ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

দেলাওয়ার হোসেন সাঈদীর মুখ চাঁদে দেখতে পাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে একটি লেখা ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন মীর্জা তাসলিমা। (দ্রষ্টব্য: (মীর্জা তাসলিমা[১], ফটোশপে ম্যানিপুলেশন ক্যামনে গরীবের রাজনীতি?[২] ফেসবুক-নোট, ৯ই মার্চ ২০১৩।) তাঁর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কিছু মন্তব্য তাঁর নোটের নিচে পেশ করেছিলাম। নিজের (এবং হয়ত আরো কারো কারো) সুবিধার জন্য মন্তব্যগুলো আলাদা নোট আকারেও টুকে রেখেছিলাম ফেসবুকে। সেই নোটটিই এখানে হাজির করছি।

১ https://www.facebook.com/smirzataslima

২ https://www.facebook.com/notes/mirza-taslima/ফটোশপে-ম্যানিপুলেশন-ও-গরীবের-রাজনীতি/10151400286949145

ধন্যবাদ জানাই লেখকের তরফে গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা পেশ করার জন্যে এবং পাঠকদের তরফে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মতামত পেশ করার জন্য। আমারও কিছু বলার আছে। নিচে বললাম:

২১.১ চাইলেই কি যা খুশি তাই গুজব ছড়ানো যায়?

কেন কিছু গুজব পাইকারি হারে বিশ্বাসযোগ্য হয়, কেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা গৃহীত হয় না? কেউ চাইলেই কি যেকোনো গুজব সারাদেশের গ্রামাঞ্চলে সফলভাবে, গ্রহণযোগ্যভাবে ছড়িয়ে দিতে পারেন? ধরা যাক, সাঈদীর ছবি 'দোজখে' (ধরুন বিভীষিকাপূর্ণ আগুনে পুড়তে) দেখা যাচ্ছে, এমন একটা ছবি কেউ ফটোশপে বানালো, তারপর কতটা সফলভাবে, গ্রহণযোগ্যভাবে তা প্রচার করা যাবে বলে মনে হয়?

২১.২ যোগাযোগ-বার্তার অর্থ কি যোগাযোগকর্তাই নির্ধারণ করতে পারেন?

যোগাযোগের ক্ষেত্রে, বার্তা কীভাবে প্রণয়ন করা হলো এবং কোন মাধ্যমে তা প্রচার করা হলো, তার ওপর কতটা সেই বার্তার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করবে, কিংবা সেই বার্তাটি কী অর্থে (কীভাবে) বার্তা-গ্রাহকদের তরফে বিবেচিত হবে না হবে তা নির্ভর করবে বলে মনে হয়? মানে, বার্তার অর্থ নির্ধারিত হবার ক্ষেত্রে কোন দিকটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বা কোন দিকটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ: বার্তা-বিনির্মাণ-প্রান্ত, নাকি বার্তা-নির্ধারক-প্রান্ত (বার্তার অর্থ-নির্ধারক প্রান্ত, তথা বার্তার গ্রাহক-প্রান্ত)?

২১.৩ যোগাযোগ-বার্তার অর্থ নির্ধারণে বার্তা-গ্রাহকদের সামাজিক-মতাদর্শিক সম্পর্কজাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে

উমবার্তো ইকো'র যোগাযোগ-গেরিলা বিষয়ক দুর্দান্ত একটি আলোচনা এ প্রসঙ্গে বিবেচনাযোগ্য (উমবার্তো ইকো, ১৯৬৭)। ইকোকে টেনে না এনে (কিংবা আরো অনেক তত্ত্ববিৎ, গবেষক, পর্যালোচককে ডেকে এনে; কিংবা স্রেফ কমনসেন্স দিয়ে) বোঝানোর চেষ্টা করা যেতে পারে যে বার্তা-উৎসের (বা বার্তা-বিনির্মাণ-প্রান্তের) 'বিশ্বাসযোগ্যতা', বার্তা-উৎসের সাথে বার্তা-গ্রাহকদের সামাজিক-মতাদর্শিক সম্পর্কজাল (এবং সেই সম্পর্কের প্রকৃতি) ইত্যাদি গ্রাহক-প্রান্তে বার্তার অর্থ নির্ধারণে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন বিটিভি (বা *প্রথম আলো* বা *আমার দেশ* বা

আল-জাজিরা বা *সিএনএন* ইত্যাদি) কী বলল সেটা 'খবর' হিসেবে একেক জনের কাছে একক রকম অর্থ বহন করতে পারে। এ নিয়ে যোগাযোগ-সাহিত্যে বিপুল রচনা গবেষণা-তত্ত্ব-পর্যালোচনা আছে। সেগুলো আমলে নেওয়া দরকার।

২১.৪ এনকোডিং-এর চেয়ে ডিকোডিং জরুরি

বার্তাকে কীভাবে প্রণয়ন বা এনকোড বা কোডিং করা হচ্ছে (ইকোর দোহাই দিয়ে বলছি: বার্তার অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে), তার চেয়ে অনেক জরুরি প্রসঙ্গ হচ্ছে গ্রাহক-প্রান্তে সেই বার্তাটির অর্থ কীভাবে নির্ধারিত হচ্ছে। উপরন্ত, গ্রাহক-প্রান্তে অবস্থানরত যোগাযোগ-গেরিলারা গ্রাহকদের সাথে কীভাবে (কী অর্থে) সম্পর্কিত থেকে বার্তার আদি এনকোডিংটাকে বদলে দিচ্ছেন, সেটা অধিকতর দরকারি প্রসঙ্গ।

২১.৫ প্রশ্নহীন বিশ্বাস বনাম বিচার-সক্ষমতা

কেন কিছু লোক গুজবকে বিচার-বিশ্লেষণ করে, অন্য সূত্রের সাথে যথা-সম্ভব ক্রসচেক করে দেখে তার পর সেটিকে গ্রহণ-বর্জন-বিবেচনার সিদ্ধান্ত নেন, আর কেন কিছু লোক সহজেই গুজবে বিশ্বাস করেন? এ নিয়ে একটা ধ্রুপদী, তাৎক্ষণিক গবেষণা আছে ১৯৩৮ সালের একটি রেডিও নাটক নিয়ে (নিউ ইয়র্ক ইত্যাদি শহরে কল্পিত মঙ্গলগ্রহবাসীদের হাইটেক আক্রমণ বিষয়ক)।[৩] সেখানে দেখা গেল: রেডিও-শ্রোতাদের (সাধারণভাবে বললে গ্রাহকদের) শিক্ষার ধরণধারণ ও স্তর এবং বিচার-সক্ষমতা (বা ক্রিটিক্যাল এবিলিটি) বার্তার অর্থ নির্ধারণে জরুরি ব্যাপার।

২১.৬ টেকনোলজিকে বুঝতে সামাজিক জটিলতা বুঝতে হবে

প্রশ্ন ওঠার সুযোগ আছে: এই ছবি বানানোর কারিকুরিকে কতটা পর্যন্ত স্রেফ (যান্ত্রিক/কারিগরি) 'উপায়' হিসেবে ব্যাখ্যা করা যাবে। একে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অনেক অনেক আর্থ-সামাজিক-মতাদর্শিক-বিশ্বাসগত উপাদানকে (সর্ব-সামগ্রিক যোগাযোগ-প্রণালীকে) বিবেচনায় নেওয়ার বিকল্প নাই হয়ত। তার মানে সহজ-সরল ব্যাখ্যার চেয়ে 'জটিল' ব্যাখ্যাই এই ক্ষেত্রে বেশি দরকারি। ('জটিল' প্রসঙ্গগুলোকে উপযুক্ত স্পষ্টতার সাথে উপলব্ধি করতে পারলে এবং প্রকাশ করতে পারলে তা আর 'জটিল' থাকবে না 'সহজ-সরল' হয়ে যাবে।)

---

৩ চাইলে এ নিয়ে আমার পর্যালোচনা দেখা যেতে পারে: সেলিম রেজা নিউটন, ২০০৮।

কোনটা তথ্যগতভাবে ‘সঠিক বার্তা’, কোনটা ‘প্রচারণা’, আর কোনটা ‘গুজব’ খোদ এই ব্যাপারগুলো নির্ধারণ করার ক্ষেত্রেও উপরোক্ত প্রসঙ্গগুলোকে বিবেচনায় নেওয়া ছাড়া পথ আছে বলে মনে হয় না।

ফেসবুক-নোট: ১৫ই মার্চ ২০১৩

হেফাজতে ইসলাম নিয়ে অল্প কয়টা কথা

Richard Mock, Raper Vapor

সূচনা-টীকা: এই রচনাটা ফেসবুকে খুব তাড়াহুড়া করে, ফেসবুকে রিফাত হাসানের[১] একটি নোট ('হেফাজতের লংমার্চ: আমার একটি সেক্যুলার ভ্রমণ কাহিনী'[২]) পাঠের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে, লেখা হয়েছিল। পৃথক একটা নোট হিসেবে তা আপলোড করেছিলাম ফেসবুকেই। পরে ২৯শে এপ্রিল ২০১৩ তারিখে সেটিকে পরিমার্জনা সম্পাদনা করে, কিছু কথা যোগ করে, নতুন ভাষ্যটাই আপলোড করে রেখেছিলাম। সেটাই এখানে ছাপা হচ্ছে।

রিফাত, দুর্দান্ত লাগল আপনার বিবরণীটা। এই ধরনের প্রত্যক্ষদর্শীর একটা বিবরণী

১ www.facebook.com/rifathasan

২ https://www.facebook.com/notes/rifat-hasan/হেফাজতের-লংমার্চ-আমার-একটি-সেক্যুলার-ভ্রমণ-কাহিনী/10151523724844710

চাচ্ছিলাম মনে মনে। কিন্তু কয়েকটা জায়গায় আমি একমত না। আপনি লিখেছেন:

> আমরা আগেই বলেছি, এদের কোন ইসলামী রাষ্ট্রের দাবী নেই। স্রেফ রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক করে তোলারদাবী আছে। এদের দাবীগুলো কোন ফ্যাসিস্ট দাবী নয়। এই সমাবেশের লোকজন বিরোধীদের জবাই জবাই জবাই জবাই কর জাতীয় কোন আধুনিক শ্লোগান দেয় নাই। আমার চোখে একবারও পড়ে নাই।

এ সব নিয়ে আমার কথাগুলো অতি সংক্ষেপে পয়েন্ট আকারে নিচে দিলাম:

১। ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা (যদিও কোরানে ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণাই নাই), শরিয়া আইন (এটা হযরত মুহাম্মদ সাঃ প্রণীতও নয়, কোরান-প্রণীতও নয়, পরবর্তী কালে রচিত) ইত্যাদি এই হেফাজত আন্দোলনের সুপ্ত প্রাণ। নাস্তিকদের মৃত্যুদণ্ড দাবি করাটা শরিয়া আইনের প্রচলিত ব্যাখ্যারই অনুসারী। হেফাজতে ইসলাম একটা রাজনৈতিক আন্দোলন। রাজনৈতিক আন্দোলন মাত্রেই ব্যক্তিস্বাধীনতাবিরোধী (এমনকি নিজের সদস্যদের ব্যক্তিস্বাধীনতারও) এবং ক্ষমতাপিপাসু, ক্ষমতাকেন্দ্রিক। এই লংমার্চ সমাবেশে অসংখ্যবার সরকার-উৎখাতের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

২। রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক করে তোলার দাবির সাথে মতপ্রকাশের দায়ে মৃত্যুদণ্ড চাওয়াটা মানানসই নয়। লেখাকে লেখা দিয়ে, মতকে মত দিয়ে মোকাবেলা করাই গণতান্ত্রিক স্পিরিট।

৩। 'জবাই কর'র জঘন্য স্লোগান সরাসরি এঁরা দেন নি ঠিকই, কিন্তু আমি কয়েক ঘণ্টা ধরে সমাবেশের লাইভ সম্প্রচার দেখেছি। প্রচুর বক্তা চরমভাবে চিৎকার করে'আমরা রক্ত দিতে প্রস্তুত', 'আমরা রক্ত দিতে প্রস্তুত', 'আমরা রক্ত দিতে প্রস্তুত'বলে যাচ্ছিলেন। বেশিরভাগ বক্তাই। রক্তদানের উদ্দেশ্য নাস্তিকদের খতম করতে রাষ্ট্রকে বাধ্য করা। (শাহবাগও বরাবরই রক্তদানে প্রস্তুত: রাজাকারদেরকে খতম করতে রাষ্ট্রকে বাধ্যকরার জন্য।) উপরন্তু, হেফাজতের ঢাকা-চট্রগ্রামের সমাবেশ এবং অন্যান্য বক্তব্যের নিবিড় পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ভিন্নমতা বলম্বীদেরকে 'জবাই' করার বাসনা, প্রতিপক্ষের 'টুঁটি টিপে ধরা'র বাসনা তাঁদের মধ্যে ভীষণ ও মারাত্মক রকমের প্রবল।

ভাববেন না যে আমি আলাদা করে হেফাজতের হুজুরদের দোষ দিয়ে আনন্দ পাচ্ছি। যে সমাজে সুশীল সমাজের বড় হুজুরদের সবচেয়ে প্রিয় পত্রিকায় ক্রিকেট খেলার মতো আনন্দময় ও বন্ধুত্বপূর্ণ একটা ঘটনার রিপোর্ট লিখতে গিয়ে পর্যন্ত রিপোর্টার লিখতে পারেন 'তবু ৬৫ রানে ৩ উইকেট তুলে নেওয়ার পরও টুঁটি চেপে

ধরা যায়নি জিম্বাবুয়ে ব্যাটসম্যানদের' ('বাংলাদেশের দারুণ শুরুর পর সেই টেলর', তারেক মাহমুদ, হারারে থেকে, *প্রথম আলো*, ১৮ই এপ্রিল ২০১৩, প্রথম পাতা) সে সমাজের রাজনীতিবিদদের কাছে আর কীইবা প্রত্যাশা করা যেতে পারে?

আর প্রতিপক্ষকে জবাই করার বাসনা কোনো 'আধুনিক' বাসনা নয়। এটা রাষ্ট্র-রাজতন্ত্রের সমান বয়সী। এবং সেই অর্থে মহাকর্তৃত্বপরায়ণ 'সভ্যতার' সমান বয়েসী একটা ধারণা। এই ধারণার জন্য বিশেষ করে 'আধুনিক'দের দায়ী করার সুযোগ নাই। 'আধুনিকতা'র অনেক সীমাবদ্ধতা আছে বটে। কিন্তু রেঁনেসার গর্ভজাত এই বস্তুটির ভালো দিকের কোনো শেষ নেই। 'আধুনিকতা'কে এতটা ঢালাওভাবে কটাক্ষ করা কাজের কথা নয়।

৪। নারী-সাংবাদিকেরওপর হামলাকে হেফাজতের কর্মীদের বা তাঁদের মধ্যে ঘাপটি-মারা অন্য কারো হামলা বলে বিশ্বাস করাটাই যথেষ্ট নয়। এই বিশ্বাসকে পাবলিকলি প্রচার করার সময় আসলে কারা হামলা করেছেন, বা আদৌ হামলা হয় নি বলে, প্রমাণকরার দায়ও বর্তায়।

৫। নারী-সাংবাদিক না হোক, খোদ আপনার চট্টগ্রামে এঁরা একাত্তর টিভির ওপর রীতিমতো হামলা করেছেন। তার ভিডিও ফুটেজ আমি দেখেছি।

এ ছাড়া সার্বিকভাবে বললে, হেফাজতের রাজনৈতিক কৃষ্টির কতকগুলো মৌলিক জায়গার সাথে (এই লংমার্চে যা দেখা গেছে) সরকার, রাষ্ট্রও সকল রাজনৈতিক দলের পার্থক্য কম। সংক্ষেপে একটু বলি:

(ক) এঁরাও ভ্যানগার্ডে বিশ্বাস করে, জনতাকে স্রেফ স্বকীয় চিন্তাবিমুখ অনুসারী-অনুগত বানাতে চান, ওঁরাও চান।

(খ) এঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কতিপয়-গুটিকয় নেতা-হুজুর, ওদেরও তাই।

(গ) এঁরাও দণ্ডবিধিকে সর্বোচ্চ নীতিনৈতিকতা মনে করেন, ওঁরাও তাই।

(ঘ) এঁরাও রাষ্ট্রকে নিবর্তনমূলক করে তুলতে চান, ওঁরাও তা-ই চান।

(ঙ) এঁরাও মতবাদকে 'চূড়ান্ত সত্য' মনে করেন, ওঁরাও তাই।

(চ) এঁরা এ দেশকে 'মুসলমানের দেশ' মনে করেন, আর ওঁরাএ দেশকে বাঙালি-সেকুলার-আধুনিকদের দেশ মনে করেন। উভয়ই স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যবিরোধী। উভয়ই একপেশে।

(ছ) উভয়ই মুখে মুখে অহিংস, কিন্তু দাবি না মানলে সহিংসতার হুমকি স্ট্যান্ডবাই থাকে। উপরন্তু হেফাজতে ইসলাম হিন্দুদের শ খানেক মন্দিরে এবং অগুনতি বাসাবাড়িতে হামলা-অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির সামান্য মৌখিক নিন্দাটুকুও করেন নি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারও তাঁরা চান নি।

(জ) উভয় পক্ষের কেউই আলোচনা সংলাপ-সমঝোতা-বোঝাপড়া-সহিষ্ণুতায় আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন না। সত্যিকারের গণতন্ত্র এবং/কিংবা হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) মদিনা সনদ ও হুদায়বিয়ার সন্ধির আলোচনা-সংলাপ-সমঝোতা-বোঝাপড়া-সহিষ্ণুতার স্পিরিটের কোনোটাতেই এঁরা কেউই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন না।

(ঝ) উভয়েই মিথ্যা প্রচারে, মানে প্রচারণায়, বিশ্বাস করেন। তার চর্চাও করেন। মিথ্যা বলায় উভয়েই পটু। অন্য পক্ষেরটা তো সবাই জানেনই, সারা বছর ধরেই তা দেখা যাচ্ছে। হেফাজতের নেতাদেরকে দেখলাম অনেক অনেক বার করে বলতে যে এই সরকার নাস্তিকদের সরকার। এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা। খোদ রাষ্ট্রপ্রধানকেও তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে নাস্তিক আখ্যায়িত করলেন বারংবার। এই দাবিও ডাহা মিথ্যা।

রিফাত, আপনার বাকি প্রায় সব পর্যবেক্ষণ, বিশেষত হেফাজতের লংমার্চে যোগদান-কারীদের আপনার দেখা অংশটুকুর মধ্যকার আপাত-ইতিবাচক গুণাবলীগুলোর পর্যবেক্ষণের সাথে আমি মোটামুটি একমত। আমি কিন্তু 'হেফাজতের লংমার্চে যোগদানকারীদের আপনার দেখা অংশটুকুর'কথা বলছি। রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে হেফাজতে ইসলামের প্রতি এইসব পর্যবেক্ষণ আমার তরফে প্রযোজ্য না। আর এইসব গুণাবলীকে ঢালাওভাবে 'ইতিবাচক' হিসেবে 'টেকেন ফর গ্র্যান্টেড' হিসেবে আগাম গ্রহণ না করে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বিচারবুদ্ধি-বিশ্লেষণ সহকারে বোঝা দরকার আছে। এই জন্যই এইসব গুণাবলীকে আমি আপাতত 'আপাত-ইতিবাচক' বলে আখ্যায়িত করেছি।

আরো একটা কথা, রিফাত। সরকার, রাষ্ট্র ও সকল রাজনৈতিক দলের যেসব মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা ওপরে বললাম, এমনকি শাহবাগের মঞ্চ-মাইক-মুরুব্বি-মুখপাত্রদের মধ্যেও সেগুলো পুরো মাত্রায় দেখা গেছে ('ক' এবং 'ঝ' বাদ দিয়ে)। এসব নিয়ে অন্যত্র লিখেছি আমি।[৩] কিন্তু শুধু এগুলোই শাহবাগের আসল বৈশিষ্ট্য

৩ 'শাহবাগের স্বাধীনতাই শাহবাগের পথ', কুমিল্লা সংস্কৃতি উৎসব ২০১৪-এ উপস্থাপিত

নয়। শাহবাগের সুবিশাল জনসমুদ্রের অজস্র স্বতন্ত্র কেন্দ্রকে ঘিরে জমায়েত হওয়া মানুষের মধ্যে দেখা গেছে এসবের ঠিক বিপরীত দিকগুলো। এর সত্যিকারের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য আছে সুপ্রচুর। সেগুলোও আমার অন্যান্য রচনায় বলেছি। সামনেও আরো বলার দরকার পড়বে। এবং তা এই কারণে যে সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শাহবাগের পথই বাংলাদেশের পথ। আমাদের মুক্তির পথ।সেই পথ থেকে উপরে বর্ণিত কাঁটাগুলো অপসারণ করে একে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় নবপ্রাণে-নবরূপে উজ্জীবিত করাটাই আমাদের এখনকার কাজ। শাহবাগের পথই আমার পথ। হেফাজতের পথ আমার পথ নয়।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দুর্দান্ত একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী পেশ করার জন্য।

ফেসবুক-নোট: এপ্রিল ২০১৩

সেমিনার-প্রবন্ধ, অষ্টপ্রহর-ম্যাগাজিন, দৈনিক বণিক বার্তা, তিন কিস্তিতে মুদ্রিত: ৮ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ২২শে ফেব্রুয়ারি ২০১৪। এ ছাড়া, বর্তমান প্রবন্ধের চতুর্থ দাগের কয়েকটা রচনা দ্রষ্টব্য। এ রচনাটি বর্তমান বইয়ের ৩৪-সংখ্যক রচনা।

কপট অহিংসা, অকপট হিংসা

Truthful Political Illustrations and Artworks

২৩.১ হেফাজতের কপট অহিংস নীতি

শুরু করছি হেফাজতে ইসলামের স্মরণে। এবং এই স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছেন আরো অনেক বস্তু। যেমন জামায়াতে ইসলামী। যেমন জাতীয়তাবাদী ইসলামী ওরফে বিএনপি। এঁরা সব ঘুপেঘাপে আছেন হেফাজতের পেটের ভেতরে। আরো নানান কিছুই নিরাপদ হেফাজতে আছেন হেফাজতে ইসলামের নিরাকার, অন্তহীন পেটের ভেতর। খালেদা জিয়ার তামাদি হয়ে যাওয়া ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম আছেন। জাতীয় পার্টির এরশাদ তো হেফাজতের মুখপাত্রে পরিণত হয়ে আছেন। আরো অনেক মঞ্চ-মাইক-মুরুব্বি আছেন। টাকা-পয়সা আছেন। পাকিস্তানী রূপাইয়া আছেন। আরবজাহানের পেট্রোডলার আছেন। 'আইএসআই'সমূহ আছেন। নানামুখিন প্রচারণা আছেন। ফরহাদ মজহার আছেন। আগে থেকে বলে-কয়ে নিষিদ্ধ-করা 'আমার দেশ' তো আছেনই, পরে এসে আচমকা বন্ধ করে দেওয়া 'দিগন্ত টেলিভিশন' এবং 'ইসলামী টিভি'ও আছেন। ইত্যাদি-প্রভৃতি সব মিলিয়ে কপটতা শঠতা গুজব আন্তরিকতা এবং অগ্নিকাণ্ডের বিরাট এক কারখানা তৈরি হয়েছে। অধিকন্তু তৈরি হয়েছে বিরাট এক নাম: 'হেফাজতে ইসলাম'। এই নাম এরই

মধ্যে পরিণত হয়েছে 'কপট অহিংসা'র প্রতিশব্দে।

একেবারে উলঙ্গভাবে উন্মোচিত হয়েছে হেফাজতের 'অহিংস নীতি'র স্বরূপ। তাঁদের ঢাকা-অবরোধের দিনে। গোটা মতিঝিল সেদিন লণ্ডভণ্ড করে ফেলা হলো তাঁদেরই নিরাকার ব্যানারের অধীনে। তসবিহ-জিকির-জায়নামাজ নিয়ে অহিংস সমাবেশের ঘোষণা স্রেফ একটা প্রোপাগান্ডায় পরিণত হলো। তাঁদের এক মাস আগের শাপলা-সমাবেশের মতো এবার কিন্তু জনতা তাঁদের জন্য শরবত-সাহায্য নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন না। আগের বারের মতো নিজেদের প্রতিশ্রুতির হেফাজত করতে পারে নি নতুনভাবে আবির্ভূত এই নিরাকার রাজনৈতিক জোট। লাখো অনুসারীকে রক্তসাগর রচনার জন্য চূড়ান্ত শপথ করিয়ে নিজে নিরাপদ হেফাজতে থাকলেন আল্লামা শাফি। অন্য নেতারাও সটকে পড়লেন সময়মতো। পরম দয়াময়ের কৃপা: আহত-নিহত হন নি নেতাদের কেউ। আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন। কিন্তু ইবলিসি রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি-খেলার পরোক্ষ খেলোয়াড় এইসব নেতারা মোটেও মঙ্গলজনক কিছু করেন নি সে দিন। এবং সেটা যে তাঁরা করবেন না তার ঘোষণা তাঁরা আগের বারের শাপলা-সমাবেশেই দিয়ে গিয়েছিলেন। ইসলাম রক্ষার নামে ও নবীজীর ইজ্জত রক্ষার নামে রক্তপাত-রক্তবন্যা-খুনখারাবির আগাম বিস্তারিত ঘোষণা ছিল সেটা।[১]

এখন এটা পরিষ্কার: হেফাজতের 'অহিংস' আন্দোলন এবং 'শান্তিপূর্ণ' প্রতিবাদের কথা ছিল নিতান্তই রাজনৈতিক কৌশল। একান্তই কপট কৌশল। দাবি মানলে তাঁরা অহিংস। দাবি না মানলে সহিংসতার ভাণ্ডারী।[২] তার চেয়েও বড় কথা: বিদ্যমান 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রটার জন্য এবং তার 'রাজধানী'-শহরটার জন্য সামান্য করুণাও তাঁদের আছে বলে মনে হলো না। তাঁরা যেন বিদেশের বাহিনী। বিদেশী এজেন্ট। ঢাকায় তাঁদের ব্যান্যারে পরিচালিত 'পোড়া-গাছ' নীতি অন্য কিছুই প্রমাণ করে নি। একেবারে সুস্পষ্ট ঘটনা। চোখের সামনে দেখা গেল।

আরো একটা জিনিস এখন পরিস্কার: অহিংসার বুলি তাঁরা ধার করেছিলেন সেই 'শাহবাগী'দের কাছ থেকেই, যাঁদের ফাঁসির দাবির উসিলায় তাঁদের ব্যানারে

---

১ এ প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে এই বইয়ের 'হেফাজতে ইসলাম নিয়ে অল্প কয়টা কথা' রচনাটি।

২ নিজেরা তাঁরা ঘোষণা দেন নি হিংসার। বরং অহিংসার কথা বলেই ডেকেছেন সমাবেশ। কিন্তু তাঁদের সমাবেশকে আশ্রয় করে যে হিংসা ঘটানো হতে পারে সে আশঙ্কা ষোলো আনাই ছিল। তাঁরা সেই আশঙ্কা নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন না। বরং প্রশ্রয় পেয়েছে হিংসা তাঁদের সমাবেশকে আশ্রয় করে। এই অর্থে হিংসার ভাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করেছেন তাঁরা।

এতটা সহিংস আস্ফালন পরিচালিত হলো। খোদ আল্লাহর নামে, নবীজীর (সঃ) নামে, কোরানের নামে, ইসলামের নামে, আলেম-সমাজের নামে এত বড় কপটতা, এত ভয়ঙ্কর প্রতারণা, এমন নির্লজ্জ মিথ্যাচার ও শপথভঙ্গের ঘটনা বাংলাদেশ কখনও দেখে নি। (শাহবাগ কতটা অহিংস সে কথায় পরে আসছি, কিন্তু শাহবাগ যদি কথা-কাজের কিছু অসঙ্গতি ঘটিয়েও থাকে তবু সেটা তো আল্লাহ-রসুল-কোরান-হাদিস-ইসলামের নামে ঘটায় নি!)

কোটি কোটি মানুষের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হলো। পোড়ানো হলো সহায়-সম্পদ। বড়লোক-গরিবের মালিকানা বিচার না করে। পুড়িয়ে দেওয়া হলো হলো ব্যাংক-বীমা, দোকানপাট, প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, বিরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। পোড়ানো হলো গাছপালাও। আগুন দেওয়া হলো কোরান-হাদিস, গীতা, বিজ্ঞান আর সাহিত্যের দোকানে। বেশিরভাগই গরিব মানুষের দোকান। সস্তায় বই কেনার দোকান। এ সবই ঘটল হেফাজতের ব্যানারে। তথাপি, এই প্রকাশ্য পাইকারি সহিংসতা আর ধর্মবিশ্বাসগত গণপ্রতারণার জন্য আমি তাঁদের আইনের আওতায় আনতে চাইব না। আদালতের কাঠগড়ায় আনতে চাইব না তাঁদের। তাঁদের বিচার চাইব না। রাষ্ট্রের কোনো শৃঙ্খলা-সংস্থার কাছেও না, দণ্ডবিধির দরবারেও না। কারণ, গায়ের জোরের রাষ্ট্র অথবা বলপ্রয়োগের দণ্ডবিধিকে আমি ব্যক্তি, মানুষ, সমাজ ও ধর্মের হেফাজতকারী বলে মনে করি না। (খোদ রাষ্ট্রযন্ত্রের সার্বিক হিংসাধর্ম নিয়েই তো গুরুতর কথা আছে। সে কথায় আসব খানিক পরেই।)

'হেফাজতে ইসলাম' যা করেছে বিশুদ্ধ বঙ্গাল-জবানে তাকে বলে 'পলিটিক্স'। পলিটিক্স বলতে বোঝায় চাতুরি, জালিয়াতি, আর নিয়মমাফিক লোকঠকানো। অন্য সব গণবিরোধী লাল-নীল পার্টির মতোই হেফাজতের নেতারাও মাঠে নেমেছেন পলিটিক্স করতে। সামনে নির্বাচন রেখে বাকি সব রাজনৈতিক জোট ও দলের মতো তাঁরাও লিপ্ত হয়েছেন ক্ষমতার হানাহানিতে। আর তাতে বলতে গেলে হারিয়েই দিয়েছেন বাকি সব রাজনৈতিক দল-ধারা-জোটকে। বিরাষ্ট্রীকৃত গোষ্ঠীবদ্ধ হিংসার এই মুহূর্তের চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তাঁরা। অন্তত তাঁদের ব্যানার তো বটেই।

২৩.২ রাজনীতি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের অকপট হিংসাধর্ম

আর যা-ই করি আমি রাজনীতি করি না। পলিটিক্স করি না। ক্ষমতার হালুয়ারুটির পিছে ঘুরি না। সুতরাং আমি এতটা বিচারবুদ্ধিহীন কিংবা বিবেকহীন নই যে যাবতীয় দোষ সব 'হেফাজতে ইসলাম ইনকর্পোরেটেড'-এর ওপর চাপিয়ে আওয়ামী মহা-জোটের ডুগডুগি বাজাতে বসব।

বহুলপ্রচারিত ও মিডিয়া-মহিমান্বিত 'দিল্লী-ধর্ষণ' উপলক্ষ্যে ঢাকার ইত্তেফাক

পত্রিকায় আমার এক লেখা বেরিয়েছিল। নাম 'বলপ্রয়োগ বলাৎকার ধর্ষণ'। সে রচনা মোতাবেক বৈষম্য-বঞ্চনা বলপ্রয়োগ মামুলি ঘটনা মাত্র। আমাদের রাষ্ট্রে ও সমাজে। (অন্যান্য রাষ্ট্রেও একই অবস্থা। আমাদের রাষ্ট্রে চরমে।) 'সভ্যতা' নামের দীক্ষায়ন ও প্রশিক্ষণের কারণেই এই অবস্থা। তথাকথিত এ সভ্যতা গড়ে উঠেছে শেষ ক হাজার বছর ধরে। এছাড়া, রাজনীতি-রাষ্ট্রের অকৃত্রিম হিংসাধর্ম (এমনকি শাহবাগের অহিংস নীতির সীমাবদ্ধতা নিয়েও) কমবেশি খোলাসা করেছি আমি আমার ইদানীংকার লেখাগুলোতে। এসব লেখায়[৩] এবং আমার *নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য* গ্রন্থে (সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩-খ) আমি দেখিয়েছি: শুধু রাষ্ট্রই নয় – রাজা, রাজতন্ত্র, রাজনৈতিক দল-পার্টি-গোষ্ঠী এবং ক্ষমতাগন্ধী আন্দোলনের মূল ধর্মই হচ্ছে হিংসাধর্ম। হিংসা ছাড়া এসব জিনিস বাঁচতেই পারে না। কাজেই আজকের বাংলাদেশে রাষ্ট্র-রাজনীতির যে রাক্ষসতন্ত্র আমরা দেখছি, তা এই সামগ্রিক রাজনীতি-কাণ্ডেরই রূপায়ন। জামাত, শাহবাগ, সরকার, ও হেফাজত কেউই এর মৌলিক কোনো ব্যতিক্রম নয়। (এঁদের মধ্যে শাহবাগকে অবশ্য এগিয়ে রাখতে হবে নিজেরা অন্তত প্রত্যক্ষভাবে সহিংসতায় লিপ্ত না হওয়ার জন্য।) সুতরাং আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর হিংসা-রক্তপাত-শক্তিলীলা ছাড়া আর কী আশা করতে পারি আমরা?

জামাত-হেফাজত-আ'লীগ-বিএনপিসহ যাবতীয় বৃহৎ রাজনৈতিক দল-জোট -শক্তিগুলো আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের নানা রকম নাটবল্টুই বটে। এঁদেরকে নিয়েই গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র। রাজনৈতিক দল মাত্রেই রাষ্ট্রের অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান। অথচ দেখাই যাচ্ছে, এঁরা কেউই আমাদের রক্তেকেনা বাংলাদেশকে আসলে ভালোবাসেন না। আর দল-কাঠামো-গঠনপ্রণালী ইত্যাদি দিকে থেকে বলতে গেলে চুনোপুঁটি শক্তি-সাইজের ডান-বামদের লেফটরাইট-প্যারেডও বৃহৎ দলগুলোর মতোই।[৪] এঁদের মধ্যে কে কখন রাষ্ট্রের মসনদের আরোহন করলেন না করলেন তাতে পরিস্থিতির বিবরণ একটুও বদলায় না।

এই হচ্ছে আজকের বাংলাদেশ। যাবতীয় দল-শক্তির মধ্যে সত্যিকারের অকপট কেউই নন আজকের বাংলাদেশে। কিন্তু রাষ্ট্রকে তবু অকপট বলতেই হবে। কারণ আইনতই রাষ্ট্রের ধর্ম হচ্ছে হিংসাধর্ম। 'হিংসা' মানে হনন করিবার ইচ্ছা। বাংলাদেশ রাষ্ট্রেরও আইনী প্রতিষ্ঠা এই সদিচ্ছার ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। সাক্ষী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মহান সংবিধান।

এমনকি রাষ্ট্র এবং সরকারও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে

---

৩ বর্তমান গ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম দাগের বিভিন্ন রচনা দ্রষ্টব্য।

৪ এই বইয়ের 'বাংলা-বসন্তের উদ্দেশ্য ও উপায়' নামক ১৭-সংখ্যক রচনাটি দ্রষ্টব্য।

কেয়ার করেন না। আমাদের যাবতীয় সামরিক সংস্থাগুলোকে তাঁরা মার্কিন সামরিক বাহিনীর পরিশিষ্টে পরিণত করে চলেছেন ক্রমাগতভাবে। স্রেফ ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে ইউরো-মার্কিন বাণিজ্য-বণ্টনের কাছে কাছা খুলে দিচ্ছেন তাঁরা বাংলাদেশের দুর্বল শিল্পবাণিজ্যের। ক্ষমতার দুর্গন্ধে দিশাহারা হয়ে বাংলাদেশের সামরিক স্বার্থের অন্দরমহল উদোম করে দিচ্ছেন তাঁরা বিশেষত মার্কিনী সামরিক বাহিনীর কাছে। এ কিন্তু শুধু আওয়ামী-রাষ্ট্রের কারবার নয়। অধিকন্তু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের আমলেই এই প্রক্রিয়া জোরেশোরে শুরু হয়েছিল। মাঝে আরবি কাটিঙের বাংলা ভাইদের সাথে মাখামাখি করতে গিয়ে বিরাগভাজন হন তাঁরা ইউরো-মার্কিনী বড় ভাইদের কাছে। এগুলো সবই এখন প্রমাণিত সত্য। এসবের গোপন মার্কিন নথিপত্র এখন উইকিলিকসের আর্কাইভেই আছে। অনলাইনে। যেকেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।[৫]

২৩.৩ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, উইকিলিকস এবং বলিভিয়া-সমাচার

উইকিলিকসের কথা যখন উঠলই, বলিভিয়ার অতিসাম্প্রতিক কাহিনী বলি। আমার উপরোক্ত দাবির সত্যতা তাতে করে জ্বলজ্বলে হয়ে উঠবে। ঠিক এক সপ্তাহ আগে ফেসবুকে লেখা আরেকটা সংক্ষিপ্ত নোটে আমাদের মিডিয়ায় বেমালুম গাপ হয়ে থাকা একটা সংবাদ পরিবেশন করেছিলাম। নোটটার নাম ছিল: 'বলিভিয়া থেকে USAID বহিষ্কৃত: উইকিলিকসের তারবার্তা-উন্মোচনের পরিণাম'। ঘটনা হচ্ছে: বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট মোরালেস তাঁর দেশ থেকে 'ইউএসএইড' নামের পুরো প্রতিষ্ঠানটিকেই বহিষ্কার করে দিয়েছেন। কারণ, উইকিলিকসের উন্মোচন করা গোপন মার্কিন তার-বার্তাসমূহ থেকে জানা গেছে, উন্নয়ন-সাহায্যগিরি করার নামে 'ইউএসএইড' আসলে গোটা বলিভিয়ার সামাজিক-আদিবাসী আন্দোলনসমূহকে বিভক্ত করার জন্য অনেক দিন ধরেই কাজ করে চলেছিল। উল্লেখ্য, এই সামাজিক আন্দোলন-গুলোই বলিভিয়ার বর্তমান আদিবাসী-নেতৃত্বাধীন সরকারের মূল শক্তি। এই আন্দোলন-সংগঠনগুলোই ২০০৩ এবং ২০০৫ সালে বলিভিয়া থেকে দুই-দুইটা মার্কিনপন্থী, 'নিওলিবারাল', কাছাখোলা-সরকারকে উৎখাতের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। এ বিষয়ক আন্তর্জাতিক রিপোর্ট পড়া যাবে এখানে: www.greenleft.org.au/node/48865। 'পাবলিক লাইব্রেরি অফ ইউএস ডিপ্লোমেসি' তথা 'কিসিঞ্জার কেবলস' নামে অতিসম্প্রতি উন্মোচন-করা উইকিলিকসের এই গোপন তারবার্তাগুলো আগাগোড়া দেখতে যাওয়া যাবে উইকিলিকসের নিজস্ব

৫ আমি আমার *বিডিআর-বিদ্রোহ: পর্যালোচনা ও নথি* নামের অর্ধসহস্রাধিক পৃষ্ঠার প্রকাশিতব্য গ্রন্থে এ নিয়ে খানিকটা আলোচনা করেছি।

ওয়েবসাইটে (www/wikileaks.org/) এবং তাদের এ সংক্রান্ত বিশেষ সার্চইঞ্জিনে: search.wikileaks.org/plusd/।

কথা হচ্ছে: বাংলাদেশে 'ইউএসএইড' 'ইউকেএইড' ইত্যাদি-প্রভৃতি সাহায্য-সংস্থা তথা 'এইডস-সংস্থা' উন্নয়ন-সাহায্যগিরির নামে কী কী করে চলেছেন সে খবর কি আমরা রাখছি? সাম্প্রতিক অবস্থা দেখে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে 'রাষ্ট্র রাষ্ট্র খেলা' ওরফে 'শত্রু শত্রু খেলা' ওরফে 'হিংসা হিংসা খেলা' বর্তমানের চরম আকার ধারণ করেছে বলে মনে করার কারণ আছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দূতাবাসের পেট্রোডলার ঢুকছে গলগল করে। ঢুকছে ইউএস ডলার। ঢুকছে ইউরোপিয়ান ইউরো। আর 'সাহায্য-কোম্পানিসমূহ' তো আছেই। আরো আছেন একেবারে কাঁচা (RAW) ভারতীয় রৌপ্যমুদ্রা রূপি। এগুলোও সব রাষ্ট্রীয় সহিংসতার জ্বালানির মধ্যে পড়ে বৈকি। এইগুলো এক দিকে রাষ্ট্রশক্তি এবং অন্য দিকে বিরাষ্ট্রীয় শক্তি-সমূহকে ক্রমাগতভাবে সহিংস করে তুলছে। এইসব টাকাপয়সা আর এসপিওনাজ-আস্কারা ছাড়া এত রক্ত এত মৃত্যু আমাদেরকে দেখতে হতো না কিছুতেই। বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর এইসব ধনদৌলত-কুমন্ত্রণা ছাড়া আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক হিংসা কিছুতেই এই চরম আকার ধারণ করত না। এইসব দান-খয়রাত-সাহায্য-এইডস কী করতে পারে তারই অসংখ্য নমুনা উন্মোচন করে দিয়েছে বিশ্বজনগণের সাংবাদিকতা-সংস্থা, বিশ্বমানুষের গোয়েন্দা-সংস্থা 'উইকিলিকস'। আমি শুধু বলিভিয়ার উদাহরণটুকুই দিলাম এখানে।

বলে রাখা খুব দরকার: 'কিসিঞ্জার কেবলস'-এর এইসব তারবার্তার মধ্যে বাংলাদেশ বিষয়ক তারবার্তাও আছে। বিপুল পরিমাণে আছে। যত দূর মনে পড়ে, হাজার ছয়েক। আমাদের সাংবাদিকরা এখান থেকে এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট করতে পারবেন প্রচুর। মোট লাখ দশেকের এই তারবার্তা-ভাণ্ডারের নিজস্ব সার্চ-ইঞ্জিনে 'বাংলাদেশ' লিখে সার্চ দিলেই ফকফকা। একেবারে লাইন ধরে তারিখ মোতাবেক গুপ্ত দলিল আত্মপ্রকাশ করতে থাকবে চোখের সামনে। প্রতিটার ওপরই 'সাবজেক্ট' লেখা আছে। খুব সহজেই, খুব দ্রুতই সব দেখে নেওয়া যাওয়া যায়। এসবের মধ্যে শেখ মুজিব সরকারের সময়কার অতি জরুরি সব ঘটনা, যেমন রক্ষীবাহিনী, মুজিব-হত্যাকাণ্ডের বিবরণ ইত্যাদি আছে। আছে খালেদা জিয়া সরকারের সময়কার মারাত্মক নানা ঘটনা। যেমন খালেদার বিরুদ্ধে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল, প্রাক্তন আওয়ামী মন্ত্রী, নূরউদ্দিনের সেনা অভ্যুত্থান-প্রস্তাব[৬] তথা উদ্যোগের কথাবার্তা। আছে মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কার সেনা অভ্যুত্থান-চেষ্টার বিস্তারিত। এ ছাড়াও আছে জেএমবি ইত্যাদির উত্থান বিষয়ক গোপন মার্কিন

৬ এ প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছে। রাষ্ট্রদূত সম্মত হন নি।

তথ্যাদি এবং আরো আরো অনেক কিছু।

২৩.৪ হেফাজতের হিংসা, রাষ্ট্রের মারাত্মক জুলুম

হেফাজতের সমাবেশের ব্যানারে সংঘটিত সহিংসতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-ধারণাদি নিয়ে আরো একটু বিচার করার অবকাশ আছে। ***প্রথমত*** এই ধারণা যে: হেফাজতের সমাবেশের নামে যেসব হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে সেগুলো হেফাজতের কর্মীরা ঘটান নি আসলে, ঘটিয়েছে সেখানে ঘাপটি মেরে থাকা জামায়াত-শিবিরের লোকজন। এই ধরনের কথা হেফাজতের বড় নেতা জনাব বাবুনগরী রিম্যান্ডে থাকা অবস্থায় বলেছেন বলে পুলিশের বরাত দিয়ে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। তিনি নাকি বলেছেন, সমাবেশে শেষ পর্যন্ত হেফাজতের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। জনাব বাবুনগরী এ কথা প্রকৃতপক্ষে বলুন বা না ই বলুন, এরকম একটা ধারণা নানা মহলে আছেই। কিন্তু কথা হলো, সমাবেশে হেফাজতের নিয়ন্ত্রণ যদি না-ও থেকে থাকে, তাঁদের সমাবেশে তাঁদের নিজেদের কর্মীদের বাইরে সরকারী-বেসরকারী, দেশী-বিদেশী 'অনুপ্রবেশ-কারী'রা (তাঁরা যাঁরাই হোন না কেন) ঢুকেও যদি হিংসাত্মক ঘটনাবলী ঘটিয়ে থাকে, তাতে করেও দায় কিন্তু হেফাজতের সমাবেশ-আহবানকারীরা এড়াতে পারেন না। কেননা এটা তো জানা কথাই যে দেশের সামগ্রিক হিংসাত্মক পরিস্থিতিকে আরো নাজুক করে তোলার সুযোগ নানা পক্ষ নিতে চাইতে পারেন তাঁদের শাপলা-সমাবেশকে আশ্রয় করে। এই নোংরা খেলার নামই তো রাজনীতি। এই পরিস্থিতিতে লাখো মানুষের সমাবেশ ডাকার সময় ঝুঁকি-বিপদ-সাবোটাজের ব্যাপারগুলো সম্পর্কে পূর্বাপর না ভাবাটা চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতা ও হঠকারিতার মধ্যে পড়ে। বিশেষ করে একই সময় বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম এবং গদি উল্টানোর ঘোলাটে পরিস্থিতিতে হেফাজতকে ব্যবহার করা হবে মাঠের প্রধান জমায়েত-শক্তি হিসেবে একথাও সবাই-ই জানতেন। হেফাজতের অন্তত কোনো কোনো অংশ নিজেরাও যে তা চাইতে পারেন সে কথাও অবোধগম্য থাকার কথা না কারো কাছে। সার্বিক এ অবস্থার টানটান উত্তেজনার কথা হেফাজতে ইসলামের নেতাদের না বোঝার কি কোনো কারণ থাকতে পারে? তাঁরা কি দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা? তা-ই যদি হয়, তাহলে পুরো দেশের কাছে তওবা করে রাজনীতির মাঠ থেকে তাঁদের বিদায় নেওয়া উচিত ছিল এতদিনে। কিন্তু তাঁরা হুমকি-ধামকি-আস্ফালন করেই চলেছেন। সুতরাং দায়িত্ব-ভাগ তাঁদের কাঁধে বর্তায়ই।

আবার নানা ধরনের উগ্র রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে হেফাজতের নিরাকার ব্যানারের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে, অনুপ্রবেশ করে যদি এরকম মাত্রার ভয়াবহ নাশকতা ঘটানো সম্ভবই হয়, তাহলে কোথায় গেল হেফাজতের বহুলকথিত 'ইসলামী

শৃঙ্খলাবোধ'? কোথায় গেল তাঁদের অহিংসার জায়নামাজ-তসবিহ-জিকির? আর কেনই বা নানা ধরনের নাশকতা শুরুর সাথে সাথেই তাঁরা সমাবেশ বন্ধ ঘোষণা করে চলে গেলেন না? এইসব নাশকতার মধ্যে, লেলিহান অগ্নিশিখার ভেতরেও যেভাবে তাঁরা আক্রমণাত্মক বক্তব্যে জারিত করে গরম করে রাখলেন তাঁদের শাপলা-সমাবেশ, উপরন্তু পুলিশের কাছে তাঁদের দেয়া সমাবেশ-সময়সীমার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে রাতেও থেকে গেলেন, তাতে করে মনে হয় যেন তাঁদের ব্যানারে জামাত-শিবির বা অন্য কোনো অনাকাক্ষিত আগন্তুকের নাশকতা চালানোর ক্ষেত্রে তাঁদের তেমন কোনো আপত্তি নাই। সেক্ষেত্রেও নাশকতার দায়দায়িত্ব তাঁদের ওপর বর্তায়। খালেদা জিয়ার আচমকা ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটামের সাথে এইসব ঘটনাবলী মিলিয়ে দেখলে পুরো পরিস্থিতি থেকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ক্ষমতা-দখলীয় পাঁয়তারার প্রচ্ছন্ন নকশাটিও স্পষ্ট না হয়ে পারে না।

আরেকটা যে জিনিস নিয়ে, ***দ্বিতীয়ত***, খুব কথাবার্তা চলছে সেটা হলো: সহিংসতা প্রকৃতপক্ষে যাঁরাই ঘটান না কেন, তার সূচনা ঘটেছে আদিতে সরকারের দলীয় সশস্ত্র ক্যাডারবাহিনী এবং খোদ পুলিশের উস্কানিতে। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, শুরু থেকেই হেফাজত-ব্যানারের ঢাকামুখিন 'শান্তিপূর্ণ' মিছিলগুলোতে খোঁচাখুঁচি করেছেন তাঁরা।

এ অভিযোগ যদি সত্যিও হয়, ধরে নিলাম সত্যিই এবং সেটা বোধগম্যও বটে, তাতে করেও ধরে নিতে হয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বভাবপ্রকৃতি-ধর্ম বিষয়ে হেফাজত-নেতারা নিতান্তই শিশুসুলভ অজ্ঞ। এই টাইপের অজ্ঞতা নিয়ে এত বড় সমাবেশের ঝুঁকি তাঁরা নেন কীভাবে? সরকার বা জামায়াত বা আর-কেউ তো চাইবেনই টানটান, বেপরোয়া ক্ষমতা-দখলীয় পরিস্থিতির সুযোগ নিতে! সেটার মুখেও যদি তাঁরা অহিংস থাকতে না পারেন, তাহলে উদ্ভূত পরিস্থিতি কীভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা হবে সে বিষয়ে তাঁদের কর্মকৌশল কী ছিল? নাকি এই জাতীয় সরকারি খোঁচাখুঁচির উসিলা পাওয়া গেলে তার 'ন্যায্য প্রতিক্রিয়া' হিসেবে অজ্ঞাতপরিচয় অ-হেফাজতিদের দিক থেকে জেহাদি জোশ প্রদর্শনের একটা মওকা জুটে যাওয়ার হিসাবটা আগেই থেকেই বিবেচনায় রাখা হয়েছিল? হেফাজতের নেতারা যে আগে থেকেই বারবার করে বলছিলেন, 'শান্তিপূর্ণ' সমাবেশে যদি বাধা দেওয়া হয় তাহলে সারাদেশে আগুন জ্বলবে, সেটার নমুনাই কি তাঁরা মতিঝিলের মহা-আগুনে পেশ করলেন? তার মানে কি এই না যে তাঁরা তাঁদের আওড়ানো অহিংস-বুলির আড়ালে সহিংসতাই স্ট্যান্ডবাই রেখেছিলেন![৭] সর্বপক্ষের ক্ষেত্রেই অবস্থাটা আসলে এমন যে সকলেই

৭ তাঁদের এই পূর্বাপর কর্মকৌশলের কথা, অর্থাৎ অহিংস-বুলির আড়ালে স্ট্যান্ডবাই সহিংসতার কর্মকৌশলের কথা, আরো কারো কারো মতো আমিও আগেই লিখেছিলাম।

অহিংস, কিন্তু দরকার পড়লে চোখের পলকে সহিংস হয়ে উঠছেন, উঠবেন। এমনটাই চলছে বছর খানেক ধরে। এভাবে সবগুলো পক্ষ মিলে খোদ রাষ্ট্রযন্ত্রের হিংসাধর্মকেই আরো পরিপুষ্ট করে চলেছেন। এই ভয়াবহতর হয়ে উঠতে থাকা হিংসাত্মক রাষ্ট্রযন্ত্রটার দাঁত-নখ-থাবা-পেশীর নিদারুণ মূল্য পুরো সমাজকে আরো বেশি দিতে হবে সামনের দিনগুলোতে। সে কথা কেউ মনে রেখেছেন বলে মনে হয় না।

এবার আসি, ***তৃতীয়ত***, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাতের অন্ধকারে হেফাজতের সমাবেশে তিন হাজার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করার নিতান্ত গায়েবি গুজব ওরফে রাজনৈতিক অভিযোগের প্রসঙ্গে। আজকের রাষ্ট্র ক্রমশ বল্গাহীনভাবে হিংসাত্মক হয়ে উঠছে সত্য। সেই সূত্রে আমরা ভিন্নমতহীন একটা সমাজের অন্তহীন অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করছি তাও সত্য। আত্মঘাতী এই অন্ধকার অভিযাত্রার সামনে-পেছনে মূলত মার্কিন যুদ্ধ-কর্পোরেট রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ইন্ধন আছে সেও হক কথা। আজকের যাবতীয় হিংসাপন্থীরা রাষ্ট্রকে এরকম হিংসাত্মক হয়ে উঠতে সাহায্য করছেন সে কথাও না বোঝা কঠিন। উপরন্তু আমাদের বিএনপি-আলীগ-সেকুলার ধর্মতান্ত্রিকেরা কিংবা জামাত-হেফাজত-তরিকত ধর্মবিচারকেরা আসন্ন ফেরাউনি বালা-মুসিবত-গজবের বিপদ যে আসলেই বুঝতে পারছেন না বা ক্ষমতা-অন্ধ হয়ে আমলে নিচ্ছেন না তাও ভয়ঙ্কর সত্যই বটে। কিন্তু গুজবের গণতন্ত্রওলারা কি ভেবে দেখেছেন, এক রাতের দুই-তিন ঘণ্টার অন্ধকারে তিন হাজার বা তিনশত তিরিশ জন মানুষের লাশ বেমালুম গায়েব করে দেওয়াটা কীভাবে সম্ভব? আজকের অজস্র ক্যামেরাচোখী ডিজিটাল যুগে সেটা আদৌ সম্ভব? হিটলারের গেস্টাপোবাহিনীও এটা পারে নি। জানাজানি হয়ে গেছে। আজকের আওয়ামী রাষ্ট্রের পক্ষে সেটা সম্ভব! স্রেফ অবিশ্বাস্য!

তারপরও, রাতের অন্ধকারে, আলো নেভানো অবস্থায়, সরকার-সমালোচক দুটো টিভি-চ্যানেল আচমকা বন্ধ করে দিয়ে শিশু-বৃদ্ধ-অধ্যুষিত হেফাজতের হাজার হাজার মানুষের সমাবেশে রাষ্ট্রীয় বাহিনীসমূহের ক্র্যাকডাউনের দায়দায়িত্ব সরকারও এড়াতে পারেন না। যে সমাবেশের আইনশৃঙ্খলাগত পরিস্থিতি সরকার সামলাতে পারবেন না সেই সমাবেশের অনুমতি তাঁরা দেন কী করে? মানুষের শান্তি-স্বস্তি-উৎকণ্ঠা আকাশে তুলে দেওয়ার বিনিময়ে ক্ষমতার খেলাধুলায় ঠাণ্ডা মাথায় মত্ত হয়ে ওঠার যে দৃষ্টান্ত সরকার দেখালো তা অভূতপূর্ব। প্রথম ধাপে মতিঝিলে রাজনৈতিক ফাঁদ পেতে 'ডেকে এনে' সমাবেশ করতে দেওয়া হলো হেফাজতে ইসলামকে। নানা-ভাবে সহিংসতার দিকে তাঁদের উস্কে দেওয়া হলো সমাবেশের পথে ও প্রান্তে। পরের

দ্রষ্টব্য এই বইয়ের 'হেফাজতে ইসলাম অল্প কয়টা কথা' নামের রচনাটি।

ধাপে বলতে গেলে তাঁদেরকে পরিকল্পিতভাবে প্ররোচিত এবং/অথবা বাধ্য করা হলো উস্কানির প্রতিক্রিয়া দেখাতে। পরিণামে হেফাজতের জমায়েতের ব্যানারে সংঘটিত প্রতিক্রিয়া তার অগ্নিকাণ্ডমূলক রূপ সম্যকভাবে ধারণ করার পর ধ্বংস আর আগুনের লেলিহান শিখার বিস্তার টেলিভিশনে 'লাইভ' প্রদর্শন করা হলো। অতঃপর টিভি-উৎপাদিত 'জনসম্মতি' রান্নাবান্না হয় গেলে গরম গরম তা পরিবেশন করা হলো মধ্যরাতের আবছায়াতে। সাউন্ডক্র্যাকার-বন্দুকবাজির গা-শিউরানো ক্র্যাক-ডাউন ঘটিয়ে। এভাবে হেফাজতওয়ালাদের অতি-আত্মবিশ্বাসের জালে তাঁদেরকেই আটক ফেলার চাতুর্যপূর্ণ রাজনৈতিক খেলাধুলা আয়োজনের দায় রাষ্ট্রকে নিতে হবে বৈকি। তাঁরা দেখালেন ক্ষমতা দখলের অভিলাষে বিরোধীপক্ষ যেমন যেকোনো খেলা খেলতে পারে, সরকারপক্ষও তেমনি ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সাধারণ মানুষের জিম্মি করে ফেলতে সামান্য দ্বিধা না করে চালিয়ে যেতে পারে একই খেলা – মাঠের উল্টা পাশ থেকে।

ক্ষমতার ডালপুরি নিয়ে সার্বিক এই রাজনৈতিক টুর্নামেন্ট আসলে সরকার এবং বিরোধী পক্ষের সকল মহলের আন্তরিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছে একটি সর্বজনীন-সর্বদলীয় রাষ্ট্রীয় টুর্নামেন্ট। এই অর্থে সর্বাত্মক জাঁকালো এ রাষ্ট্রীয় শো অনেক আদর করে দেখিয়ে দিল সকল রাজনৈতিক পক্ষ মিলেই তো রাষ্ট্র। জনগণ শুধু দশকে দুইবার করে ভোট দেওয়ার দিন দুটিতে বৈধতার সিলমোহর অঙ্কন করবেন। সে আঁক আবার চারকোনা ব্যালট-খোপের বাইরে যেতে পারবে না তো বটেই, খোপের কিনারা-দাগকে ছুঁতে পর্যন্ত পারবে না। ছুঁলেই মৃত্যু। ভোট বাতিল উক্ত খোপবন্দি ভোটারের। এ-ই আমাদের বিদ্যমান রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সাম্প্রতিকতম স্বরূপ।

২৩.৫ ফরহাদ মজহারের মার্কসীয় শ্রেণী-সহিংসতা

সহিংসতার সপক্ষে লাগে সম্মতি-সম্প্রচার-সাফাই। সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার রাষ্ট্রীয় সহিংসতার জন্যই শর্তটা আবশ্যক একটা শর্ত। সে শর্ত পূরণে এগিয়ে আসলেন বুদ্ধিজীবী ওরফে বুদ্ধিচারী ওরফে বুদ্ধি-কর্মচারীবৃন্দ। কর্তা-ক্র্যাকার-ককটেল আর বোমাবাজ-বন্দুকধারীদের পরিচয়-পদবি মোতাবেক তাঁরা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। নিজ নিজ স্বার্থসুবিধা ও পছন্দ মোতাবেক দুই পক্ষে ভাগ হয়ে যেতে থাকলেন তাঁরা। আর প্রায় সবাই সবাইকে সন্দেহ করতে থাকলেন। গালাগালি করতে থাকলেন।

সুতরাং বিচারের ও ক্যারিকেচারের নবলব্ধ আইনের শাসন অনুসরণ করে যুদ্ধাপরাধী নির্মূল কর্মসূচির সপক্ষে দেখা গেল এক পাল সরকারী বুদ্ধি-কর্মচারীকে।

গলার রগ ফুলিয়ে তাঁরা বলতে থাকলেন রাজাকার-আলবদরদের জনকতক নেতাকে অবিলম্বে ফাঁসি দিয়ে ফেলতে পারলে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের প্রিয় এই মাতৃভূমির সর্ব মুশকিল আসান হয়ে যাবে। কারো কোনো দুঃখকষ্ট থাকবে না। কিন্তু হিংসা তো একচ্ছত্র না। বহুচ্ছত্র। বহু ছাতা। বহু মাথা। ফলত প্রতিহিংসাও দাঁত বের করল। তর্ক উঠল হিংসা ভালো, না প্রতিহিংসা ভালো। যুক্তির অভাব ঘটল না। কেউই দেখলেন না: উভয়ই আদতে একই পদার্থ। আর সেই পদটার অর্থ 'হিংসা'। আমার হিংসা ভালো, ন্যায্য, যৌক্তিক। তোমার হিংসা অন্যায্য, অমঙ্গলজনক, যুক্তিহীন।

ঐতিহাসিকভাবে সুচিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাতিল করার প্রকাশ্য দাবিতে জনসাধারণের জীবনযাত্রায় বোমা-ককটেলজনিত জোরজুলুম, দিনদুপুরে পুলিশের ওপর একের পর এক বীভৎস হামলার 'লাইভ' সম্প্রচার-পরিস্থিতি সৃষ্টি করা, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, এবং গৃহযুদ্ধের অবারিত হুমকি দিতে থাকা ইত্যাদি প্রভৃতি জামায়াতী কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে তাঁদের হিংসাপ্রণালীর সপক্ষে দার্শনিক-তাত্ত্বিক-যৌক্তিক পাটাতন রচনার স্বনিয়োজিত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন কতিপয় বুদ্ধিজীবী। তাঁদের একেবারে সামনের সারিতে দেখা গেল জনাব ফরহাদ মজহারকে। স্বরচিত তত্ত্ব দিয়ে, অক্ষরের যুক্তি দিয়ে, নানা কিসিমের দর্শনের দোহাই দিয়ে কথার খেলা জমাতে পারলেই যেকোনো রকমের অবস্থা বা রাজনৈতিক কৌশলকে জায়েজ করে তোলা যায় বলে ফরহাদ মজহার প্রমুখের আত্মপ্রতারণা-মূলক ধ্যানধারণা সত্যি বেদনাদায়ক। কিন্তু বেদনাদায়ক হলেও এরই নাম রাজনীতি। নিজের কবি পরিচয়টিকে সবচেয়ে বড় করে তুলে ধরলেও ফরহাদ মজহার আসলে রাজনীতিই করে চলেছেন। এবং তাঁর রাজনীতি যাবতীয় অর্থে আর-সব সুপ্রচল ক্ষমতা-রাজনীতির মতোই বটে। সকল অর্থেই এই রাজনীতি মানে শত্রু শত্রু খেলা। আরো একবার দেখা গেল: রাজনীতির জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্রক্ষমতা বজায় রাখার এবং রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে কাউকে গায়ের জোরে উৎখাত করে নিজেরা একই সিংহাসনে ভিন্ন নামে আসীন হওয়ার জন্য শত্রু লাগে। লাগে শ্রেণীশত্রু, ধর্মশত্রু, জাতিশত্রু, রাজনীতি-শত্রু। লাগে হিংসা। হিংসা মানে হনন করিবার ইচ্ছা।

আর এইসব শত্রু শত্রু খেলার রাজনীতিকে জায়েজ করার জন্য হাতিয়ার বা ইন্সট্রুমেন্ট হিসেবে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে যুক্তি নামক ভয়াবহ অস্ত্রটি। যুক্তির এই ইন্সট্রুমেন্টাল ব্যবহারটিকে নিদারুণভাবে উন্মোচিত করেছিলেন জার্মান মরমী অ্যানার্কি ধারার চিন্তক গুস্তাভ ল্যান্ডাওয়া, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফ্যাসিবাদী প্রেক্ষাপটে। বলেছিলেন তিনি, যুক্তি হয়ে উঠতে পারে ফ্যাসিস্ট, বিশেষত কার্যকারণ টাইপের যান্ত্রিক যুক্তি (গুস্তাভ ল্যান্ডাওয়া, ২০১০)। নিজেও তিনি নিহত হয়েছিলেন

ফ্যাসিবাদের হাতেই। ভয়ঙ্করভাবে। এই যুক্তি-ফ্যাসিবাদের প্রশ্নে কি ওয়াহাবি ধারা, কি লেনিনবাদী-লাদেনবাদী ধারা, কি সুশীল পার্লামেন্টারি লিবারাল ধারা – সবই এক গোয়ালের হাম্বা। আজকের বাংলাদেশে দর্শনশাস্ত্রের মোড়কে যুক্তির ফ্যাসিবাদী প্রয়োগের সবচেয়ে অন্ধকার উদাহরণে পরিণত হয়েছেন ফরহাদ মজহার।

আওয়ামী জাতীয়তাবাদী, বাঙালি জাতীয়তাবাদী, ভাষা-জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিবাদী তত্ত্বের প্রতিক্রিয়া রচনা করতে গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলতাকে রচনা করতে শুরু করেছেন ফরহাদ মজহার। এ-ই হয়। অনেক সতর্ক না থাকলে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের খেলার অংশ হিসেবে দর্শন চর্চা করতে গেলে নিজেকেও প্রতিক্রিয়াশীলতার গাড্ডায় ফেলে দেওয়া হয়। এবং সেই গাড্ডাকেই রাষ্ট্রক্ষমতাপন্থীদের কাছে মনে হয় ক্রুসেড, জেহাদ অথবা শ্রেণীসংগ্রাম (যার যেটা পছন্দ)। মার্কসের 'জনগণের রাষ্ট্র' বিষয়ক তত্ত্ব-ধারণার সবচাইতে ঈর্ষণীয় বাঙালি/বাংলাদেশী প্রতিনিধি হচ্ছেন ফরহাদ মজহার। হেফাজতি হিংসা আর জুলুমবাজ রাষ্ট্রতন্ত্র যখন পরস্পরকে পরিপূরণ করে চলেছে তখন বিদ্যমান হিংসাপ্রণালীর পক্ষে সবচাইতে দুর্দান্ত তত্ত্ব-যুক্তিগত সাফাই গেয়ে চলেছেন ফরহাদ মজহার। আর এই প্রশ্নে ফরহাদ মজহারের অন্যতম সাফাই হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছেন কার্ল মার্কস। হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে যার যার প্রয়োজন মতো দেশ-জাতি-ধর্ম-শ্রেণী উদ্ধারের প্রজেক্টে ওয়াহাবি-জ্যাকোবিনদের ধারার সাক্ষাৎ ও মোক্ষম উত্তরসূরী হচ্ছেন মার্কস। ফরহাদ মজহারের মতো করে মার্কসকে ব্যবহার করার সুযোগ খোদ মার্কসের তত্ত্বের কোথাও কোথাও আছে বটে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে কার্ল মার্কসের কোন অংশটিকে কে কীভাবে কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন সেটার দায় স্রেফ মার্কসের নয়। মুক্তিপিপাসু মানুষের কাছে কার্ল মার্কস নিরন্তর স্বাধীনতাশীলতার উৎস।[৮] কিন্তু ফরহাদ মজহারের

---

৮ যেমন ধরা যাক জার্মানি-নেদারল্যান্ডস-সুইজারল্যাণ্ডে অর্ধ শতকের বেশি সময় ধরে বৈপ্লবিক মার্কসীয় রাজনীতির সংগঠক, কাউন্সিল কমিউনিস্ট আন্টন পানেকুক মনে করতেন, নতুন একটা পরিচালক-শ্রেণী, নতুন একটা শাসক-শ্রেণী শ্রমিকদের মুক্তি এনে দিতে পারে না কখনও (আন্টন পানেকুক, ১৯৭০)। পানেকুক ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের ইতিহাসবেত্তা, মার্কসবাদী পণ্ডিত এবং রাস্তার সংগঠক। এই মার্কসবাদ সরকারি মার্কসবাদ নয়, বৈপ্লবিক মার্কসবাদ। এই মার্কসবাদ শ্রমিকশ্রেণীর মুরুব্বি হিসেবে কোনো ভ্যানগার্ড পার্টি গঠন করে না। পানেকুকের ভাষায়, 'পার্টি গঠন করাকে আমরা এড়িয়ে চলি। সেটা এইজন্য নয় যে আমরা সংখ্যায় খুবই কম, বরং এই জন্য যে পার্টি এমন একটা সংগঠন যার লক্ষ্য হলো শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব দেওয়া, শ্রমিকশ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করা' (আন্টন পানেকুক, ১৯৩৬)। এবং সেই কারণেই এই মার্কসবাদ সমালোচনা করে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতা-অভিসারী নতুন ব্লাঙ্কুইপন্থার অনুসারী রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (আন্টন পানেকুক, ১৯২০); এবং রূপরেখা প্রণয়ন করে

পছন্দ কর্তৃত্বপরায়ণ কার্ল মার্কস। বাকি সব শ্রমজীবী শ্রেণীর তুলনায় কারখানা-শ্রমিকদের প্রশ্নাতীত ঐশ্বরিক শ্রেয়ত্ব, অনিঃশেষ শ্রেণীসংগ্রাম, সর্বহারার একচ্ছত্র একনায়কত্ব, জনগণের রাষ্ট্র তথা শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র ইত্যাদি প্রভৃতি ধ্যানধারণার নামে কর্তৃত্বপরায়ণ কার্ল মার্কসের মোদ্দা কথা হলো মধ্যশ্রেণীর নেতা-বুদ্ধিজীবী-টেকনোক্র্যাট শ্রেণীর তরফে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা। এবং পুঁজিপতি শ্রেণীকে উচ্ছেদের নামে সেই রাষ্ট্রক্ষমতাকে সর্বাত্মক স্বৈরতন্ত্রী রূপদান করা। এই বস্তুরই নাম তাঁরা দিয়েছিলেন 'সমাজতন্ত্র'।

তো, মার্কসকে এই প্রশ্নে পরিপূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল 'প্রথম আন্তর্জাতিকের' মধ্যকার মুক্তিপরায়ণ শ্রমিক-আন্দোলনের বৃহত্তর ধারাটি। তখনই এই চিজের নাম এঁরা দিয়েছিলেন 'কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতন্ত্র'। এবং এই জিনিসের

কলকারখানার ওপর শ্রমিকদের স্বনিয়ন্ত্রণের (আন্টন পানেকুক, ১৯৪৬)। কারখানা পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অটোনমির আওয়াজ আমরা তুলতে দেখি এমনকি কর্শের মতো প্রথাগত মার্ক্সবাদীকেও (কার্ল কর্শ, ১৯১৯) এবং তা সমাজতন্ত্রের মুক্তিপরায়ণ অভিমুখিনতার জন্যই বটে। বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম পল তো সুস্পষ্টভাবেই মনে করতেন যে রাষ্ট্রের মালিকানা দিয়ে উৎপাদন চালানো মানে স্রেফ একটা আমলাতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের ভাগাড়ে টেঁসে যাওয়া। লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনার খানিক আগে রচিত তাঁর রচিত 'রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রিয়াকর্ম' গ্রন্থ মুক্তিপরায়ণ সমাজতন্ত্রের বিস্তারিত দিশা অনুসন্ধান করেছিল (উইলিয়াম পল, ১৯১৭)। আসলে মার্কসবাদ নামে যা প্রচলিত আছে তা স্রেফ এককাট্টা ক্ষমতা-কেন্দ্রিক রাষ্ট্রপ্রণালী নয়। আমাদের মধ্যে কে কোন মার্কসবাদকে নিজের জন্য সুবিধাজনক বলে বেছে নেন সেটা লক্ষ্য করে দেখার মতো বিষয়। যেমন ধরা যাক, মাত্রই যেমনটা দেখলাম, পানেকুকদের বিশাল মার্কসবাদী ঐতিহ্য শ্রমিকদের মুরুব্বি-পার্টি গঠন করতে না চাইলেও ফরহাদ মজহার পারলে হেফাজতে ইসলামকেই শ্রেণীসংগ্রামের পার্টি হিসেবে চালিয়ে দিতে চান। দুর্ভাগ্যজনক যে আমাদের মতো দেশগুলোতে সমাজতন্ত্র বলতে বোঝায় মস্কো-পিকিঙের বলপ্রয়োগমূলক রাষ্ট্র-ক্ষমতা-পন্থা যার নেতৃত্বে থাকে লাল রঙের একটা শাসকশ্রেণী। তাদের হুকুমতন্ত্রই ফরহাদ মজহারদের কাছে সমাজতন্ত্র নামে প্রচলিত হয়েছে। শুধু ফরহাদ ভাইরা নন, সেলিম ভাই মঞ্জু ভাইদের সিপিবি থেকে শুরু করে জামান ভাইদের বাসদ হয়ে মেনন ভাইদের ওয়ার্কার্স পার্টি পর্যন্ত সমস্ত বাংলাদেশের সমস্ত বলশেভিক-বামপন্থার কেউই এর ব্যতিক্রম নন। এ আমাদের ঐতিহাসিক নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসল ঘটনা হলো: শ্রমজীবী জনতা যদি নিজেরা নিজেদেরকে শোষণমুক্ত করতে পারে, নিজেরা সমাজ-অর্থনীতি পরিচালনা করতে পারে, তাহলে পার্টি-হুজুর-মুরুব্বিদের আর কোনো দরকার থাকে না। এটাই মুক্তিপরায়ণ মার্কসবাদের সাথে সরকারী লেনিনপন্থী মার্কসবাদের পার্থক্য। সুতরাং বাংলাদেশের বামপন্থার পর্যালোচনা করার কর্তব্য সুতরাং আমাদের অগ্রজদের সমালোচনা করা স্রেফ নয়, আমাদের দরকার তাত্ত্বিক-দার্শনিক জায়গাগুলোর ঐতিহাসিক নবায়ন।

পরিণাম কী হতে পারে তার প্রফেটিক প্রতিবেদন দাখিল করেছিলেন তাঁরা তখনই। সবিস্তারে। তুলে ধরেছিলেন 'মুক্তিপরায়ণ সমাজতন্ত্রের' ধারণা। তাঁরা বলেছিলেন, যে যায় লঙ্কায় সে-ই হয় রাবণ। বলপ্রয়োগমূলক রাষ্ট্রক্ষমতাকে তাঁরা পরিচালক-নিরপেক্ষ সত্তা হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। তথাকথিত ভালো পরিচালক, ভালো বাদশাহ, কিংবা ভালো পার্টি রাষ্ট্র চালালেই সেই রাষ্ট্রকাঠামোটি পৃথক কোনো আচরণ করে না। বরং রাষ্ট্রের একটা ম্যানেজেরিয়াল ক্লাস তৈরী হয়। এই শাসকশ্রেণীটির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-স্বার্থ-বিবেচনা অনুসারেই পরিচালিত হয় রাষ্ট্র। কোনো অর্থনৈতিক-সামাজিক-প্রাকৃতিক-ঐশ্বরিক পূর্বনির্ধারিত বিধান অনুসারে পরিচালিত হয় না রাষ্ট্র। এ বস্তু চলে কর্তৃত্বতন্ত্রের তথা বৈষম্য-বঞ্চনা বলপ্রয়োগের 'চিরন্তন' দণ্ডনীতি মোতাবেক।

স্বনামধন্য মার্কিন প্রফেসর নোম চমস্কি বুঝিয়ে বলেছেন কেন এই শ্রেণী-রাষ্ট্র-জবরদস্তির তত্ত্ব সর্বদেশে সর্বকালে বিশেষত মধ্যবিত্ত এলিট-মহাজনী শ্রেণীর কাছে লোভনীয়। কথাটা সহজ, সাধারণ: বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোটিকে অক্ষুন্ন রেখে 'ভবিষ্যতে' নিজেদেরকে তার সিংহাসনে আসীন করার এমন সুন্দর-স্বর্গীয় স্বপ্ন-তত্ত্ব আর হয় না। ফলে মধ্যবিত্ত বলশেভিক-বামপন্থী, মধ্যবিত্ত ডানপন্থী জেহাদীবৃন্দ, মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া লিবারালবৃন্দের সকলের কাছে এই তত্ত্ব নিঃসংশয়ে জনপ্রিয়।

এই তত্ত্বের আরেকটা মজা হচ্ছে ভ্যানগার্ড-তত্ত্ব বা রাখাল-থিওরি। আহাম্মক আমজনতা অচেতন শ্রমিকশ্রেণী শাস্ত্রশিক্ষাহীন ধর্মীয় উম্মাহ ইত্যাদি প্রভৃতি নিজেদেরকে নিজেরা পরিচালনা করতে অক্ষম। কাজেই তাঁদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য জ্ঞানী-গুণী-হুজুর-কর্তা-শিক্ষক-রাজনীতিবিদ-মোল্লা-পুরুত-পাদ্রি-বিজ্ঞানী-ম্যানেজারবৃন্দকে দরকার। এঁরা নিজেরা উচ্চতর-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক হলেও স্রেফ যুক্তিবলে-তত্ত্ববলে-শাস্ত্রবলে তথা চাপা মারার জোরে তাঁরা জনগণের বা শ্রমিকশ্রেণীর বা আপমার উম্মাহর 'ঐশ্বরিক' প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য প্রতিপন্ন করতে পারেন। সুতরাং ফরহাদ মজহারের আর উপায় থাকে না। মধ্যশ্রেণীর মানুষ হয়েও তিনি শ্রমিকশ্রেণীর মানুষ হয়ে যান 'ন্যাচারালি'। এবং অতি সহজে তিনি জামায়াতকে আর হেফাজতকে গরিব-সর্বহারা-কৃষক-শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরতে পারেন মার্কসের দোহাই দিয়ে। এবং তাঁদের হিংসাতন্ত্রকে শ্রেণীসংগ্রাম ওরফে জেহাদ হিসেবে জায়েজ করতে পারেন। এর মধ্যে তিনি বাংলাদেশের 'মুক্তি' দেখতে পান অতি সহজেই। কিন্তু 'মার্কসীয় বিজ্ঞান' অনুসারেই কি হেফাজতি হিংসার শ্রেণীবিচার করার কোনো দরকার নেই আমাদের? তাঁদের তাণ্ডবের শিকার হলেন কারা? শহুরে সর্বহারা মেহনতি মানুষই তো! তাঁদেরকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছে হেফাজতিদের

অগ্নিহিংসা। এই সব গরিব মানুষ কী করে উঠে দাঁড়াবেন আবার? আর আমজনতার ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় সম্পদের নির্বিচার ধ্বংসযজ্ঞই বা কোন বিচারে সমর্থনযোগ্য? আবার, 'জামায়াতে ইসলাম' বা 'হেফাজতে ইসলাম' নামের রাজনৈতিক দল-জোটের সমর্থক মানুষজনের শ্রেণীগত চরিত্র কী আসলে? এঁরা গরিব হলেও মার্কসীয় বিচারে পরগাছা-অনুৎপাদক গরিব, অথবা কৃষকশ্রেণী থেকে আসা গরিব। শুধু তাই নয়, মাদ্রাসার শিক্ষকেরা-শিক্ষার্থীরাও শুদ্ধ পরগাছা একটা শ্রেণী। (বিশ্ববিদ্যালয়-সেনাবাহিনী-আমলাতন্ত্র ইত্যাদির মতোই পরগাছা।) ধর্মের নামে ভিক্ষা করে খাওয়া, দেশবিদেশের দানখয়রাতে চলা, কিংবা রাষ্ট্রের পয়সায় চলা গরিব বা মধ্যবিত্ত এঁরা।

সাহায্যেরও শ্রেণীবিচার আছে। কানাডার-মার্কিনের-মধ্যপ্রাচ্যের দানখয়রাত মানেই রাজনৈতিক সাহায্য। বাংলাদেশের মতো গরিব দেশগুলোকে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-মুসলমান এবং এমনকি ছদ্মবেশে ইহুদি ধর্মের বৈদেশিক প্রভুদের হুকুমে-হেফাজতে পরিচালনা করার সাহায্যই বটে। (সত্যিকারের মানবিক সাহায্যের বিরল ব্যতিক্রম এ ক্ষেত্রে তেমন প্রাসঙ্গিক নয়।) সাহায্যগুলো আসে কিন্তু বড়লোক দেশগুলোর শাসক-বড়লোক শ্রেণীর তরফে। আসে উন্নয়নের নামে। নানান রঙের এনজিও'র নামে। মসজিদ-মক্তব-মাদ্রাসা-মিশনের নামে। ইসকন-মন্দির-মহাপ্রভুর নামে। এবং হাসপাতাল আর ইস্কুলের নামে। আর এইসব যাবতীয় দান-খয়রাত-ঋণ-সাহায্য-এইড ইত্যাদির কোনোটাই যে যথাযথ সততা-স্বচ্ছতা-সমতার সাথে ব্যবহৃত হয় না, সে কথাও আজকের বাংলাদেশের ধনী-গরিব-ফকিন্নি সকলেই জানেন। এইসব উন্নয়ন-সাহায্য-সংস্থার রাজনীতিটা কী সেটাও বলিভিয়া-ইউএস-এইড-সমাচার থেকে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

শ্রেণীবিচারের আরো দিক আছে। ফরহাদ মজহারের মার্কসীয় তরিকা মোতাবেক শ্রেণীবিচার করলে আ'লীগ-বিএনপি-জাপা'তেও তো গরিব শ্রেণীর মানুষের অভাব নেই। বেশুমার। ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, তুলনামূলক বিচারে এইসব দলের গরিবের বেশিরভাগটা আবার উৎপাদক গরিব বটে। (তার মানে মার্কসীয় মতে উচ্চ পর্যায়ের বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন মেহনতি-শ্রমজীবী গরিব; অচ্ছুৎ, লুম্পেন প্রলেতারিয়েত নন।) তাহলে এইসব রাজনৈতিক দলও তো ফরহাদ মজহারের মার্কসীয় বিচার-আচারে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির দূত!

ফরহাদ ভাইয়ের স্বরচিত মার্কসবাদ বাদ দিয়ে যদি আমরা বিশুদ্ধ মার্কসীয়-লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করি তাহলে দেখব: কি হেফাজতি, কি জামায়াতি, কি আওয়ামী, কি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী – সকল ধারার আম-সমর্থকই মূলত গ্রামীণ ও আধা-গ্রামীণ কৃষকশ্রেণীর মানুষ। ফরহাদ মজহারের গুরু কার্ল মার্কস স্বয়ং

এঁদেরকে অত্যন্ত নিচু চোখে দেখতেন। বলতে গেলে ঘৃণাই করতেন। তাঁর মতে কৃষকদের ঈমানের কোনো ঠিক নাই। এঁদেরকে একদমই বিশ্বাস নাই। এঁরা ভীষণ দোদুল্যমান শ্রেণী। নিদারুণ সুবিধাবাদী শ্রেণী। সুযোগ পেলেই এঁরা 'খাঁটি বিপ্লবী' শিল্পশ্রমিকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। এটাই মার্কসীয় 'ইতিহাসের নিয়ম'। কাজেই এঁরা মার্কসীয় বিপ্লবের সহায়ক শ্রেণী তো নয়ই, রীতিমতো বিরুদ্ধ-শ্রেণী। ফরহাদ ভাইয়ের মার্কসীয় শ্রেণীবিচার, সুতরাং, দিশাহারা উদ্দেশ্যপরায়ণতার ঊর্ধে উঠতে পারে না।

সব কিছুর পরও এ কথা স্বীকার না করে উপায় থাকবে না যে কৃষি-বিজ্ঞান-ভাব -টেকনোলজি-কবিতা-গণিত-লজিক-জড় ও জীবন প্রসঙ্গের যে অবতারণা ফরহাদ মজহার বিশুদ্ধ ঝরঝরে বাংলায় করে গেছেন দীর্ঘকাল ধরে, তার তুলনা খুব বেশি নাই। তাঁর প্রতি আমার প্রীতি যথামহলে সুবিদিত। একান্ত বন্ধুদের নিন্দামন্দ উপেক্ষা করে আমি তাঁকে অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে রেখেছি অনেক দিন হলো। শেখার মতো ইশারা পেয়েছি তাঁর রচনায় অঢেল। তাঁকে নিয়ে মোটামুটি সার্বিক পর্যালোচনা আমার তরফে আমার নিজের কাছেই বকেয়া পড়ে আছে। উপরওয়ালার দিক থেকে তৌফিক পেলে সে বকেয়া নিশ্চয়ই পরিশোধও করতে পারব। কিন্তু আপাতত আমার সিদ্ধান্ত-অনুকল্পটুকু জানিয়ে রাখতে দ্বিধা নেই: যতই পড়েছি ততই দেখেছি মার্কসীয় বিদ্বেষতন্ত্র এবং বলপ্রয়োগমূলক রাষ্ট্রপন্থার ডুগডুগি-বাজানো মতবাদের ফেরিওয়ালা ছাড়া তিনি আর তেমন কিছু নন। উদ্দেশ্য ও উপায়ে তাঁর সামঞ্জস্য থাকে না। উদ্দেশ্য দিয়ে তিনি জায়েজ করেন উপায়কে। তাঁর কাব্য ও জ্ঞানসাধনার বিশাল আয়োজনের সবই শেষ পর্যন্ত হিংসাবিদ্বেষপন্থারই অভিসারী হয়ে থেকে যায়। আন্তরিক বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনার বিপরীতে প্রত্যেককে এই ক্যাম্পের বা ঐ ক্যাম্পের ছাপ্পা-মারা লোক হিসেবে চিহ্নিত করার এবং লাগাতার গালাগালি করার প্রবণতা ফরহাদ মজহারের মতো মানুষদেরকে স্রেফ মতান্ধ-মতবাদী ঘেরের মধ্যে আটকে রাখে। আমাদের সমাজের এ এক দুর্ভাগ্যই বটে! এ অবস্থা অবশ্য এক দিনে তৈরি হয় না। আর এ অবস্থা শুধু ফরহাদ মজহারেরই হয় না। আরো অনেকেরও হয় বৈকি।

২৩.৬ অকপট অহিংসার আন্তরিক নীতিধর্ম

রাষ্ট্রের, রাজনৈতিক দলসমূহের, রাষ্ট্রীয় দূতাবাসগুলোর এবং আন্তর্জাতিক দাতা-সংস্থাগুলোর এই সামগ্রিক হিংসাধর্মের বিপরীতে সত্যিকারের অহিংসনীতি আসলে কী বস্তু তা গায়েবি কথাবার্তা বলে বোঝানোর দরকার পড়ে না। বাস্তব বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১১ই এপ্রিলে 'হেফাজতে ইসলাম অল্প কয়টা কথা' নামের এক

ফেসবুক-নোটে সরকার ও হেফাজতের মধ্যে তুলনা করে বলে রেখেছিলাম: 'উভয়েই মুখে মুখে অহিংস, কিন্তু দাবি না মানলে সহিংসতার হুমকি স্ট্যান্ডবাই থাকে।' শুধু দাবি না মানলেই নয়, প্রতিপক্ষের কথা-কাজ-ভাবসাব অপছন্দ হলেই লাঠি-গুলি-টিয়ারগ্যাস-ককটেল-বোমা সদা-প্রস্তুত। 'অহিংস' হেফাজতের হাতে তাই উঠে আসে জায়নামাজ-তসবির বদলে লাঠিসোটা-বোমা-গুলি-ককটেল-ইটপাটকেল। উঠে আসে নির্বিচার অগ্নিকাণ্ড। আর শান্তিপূর্ণ সরকার ও রাষ্ট্রের হাতে তো ব্যাটন-বন্দুক-বলপ্রয়োগ মজুদ আছেই। পাইকারি মানুষ খুন তাঁরা ঘটিয়েই চলেছেন। শহীদমিনারে গরিব শিক্ষকদের ওপর পশ্চিমা ঝালমরিচের গুঁড়া স্প্রে করা, এবং বৈজ্ঞানিক জলকামানের তপ্ত-রঙিন পানি ছিটানোর আনন্দ তো নবপ্রবর্তিত আওয়ামী রাষ্ট্রের ছিলই, সাথে যুক্ত হয়েছে শত কোটি টাকায় কেনা নতুন টাইপের ট্যাঙ্কের মতো সাঁজোয়া-যান। রাজশাহীর এক অটো-চালক সেদিন এরই কথা বলতে গিয়ে বলছিলেন 'মানুষ মারার গাড়ি'। কথা আর কাজের প্রকাশ্য পার্থক্য রচনা করতে লজ্জা করে না কারোরই। লজ্জা করে নি কারোরই। অহিংসা এঁদের সব্বার মুখের বুলি মাত্র। সাম্প্রতিকতম সরকারি-বেসরকারি সহিংসতার ঘটনাবলী এদের সকলের সহিংস সত্যকে একেবারে উলঙ্গ করে দেখিয়েছে।

রাষ্ট্র এবং জামায়াত-হেফাজতের কাল্পনিক মধ্যখানে অবস্থিত শাহবাগ কতটা অহিংস, কেমন ধরনের অহিংস, সে কথাও প্রশ্নাতীত নয়। দরকার মনে করলে 'অহিংস' শাহবাগ-কমিটিও দেয় লাঠিমিছিলের মহড়া। জানিয়ে দেন তাঁদের অধুনা অথর্ব-হয়ে-পড়া মঞ্চ-মাইক-মুখপাত্র-মুরুব্বিরা: প্রয়োজনে সহিংসতা আসিতেছে। সময়ের ব্যাপার মাত্র। আর মারো-কাটো-জবাই-করোর স্লোগান তো ছিলই। এখনও আছে। মুশকিল হলো: নিজেরা অহিংস থাকার ঘোষণা বাস্তবায়ন করে চলার পাশাপাশি যুদ্ধাপরাধ দমনের নামে স্বভাব-সহিংস রাষ্ট্রযন্ত্রকে আরো বেশি করে সহিংস হয়ে ওঠার মারাত্মক বিপজ্জনক দায়িত্ব অর্পন করেছে শাহবাগ। ফৌজদারি দণ্ডবিধির মামলায় ক্রমাগতভাবে স্রেফ 'রাষ্ট্রপক্ষে' পর্যবসিত হচ্ছে শাহবাগ। শাহবাগের মঞ্চ-মাইক-মুরুব্বি-মুখপাত্ররা (শাহবাগের সত্যিকারের বহুবিচিত্র-বহুমত-বহুস্বর-কেন্দ্রিক নির্দলীয় আবালবৃদ্ধবণিতার কথা বলছি না) ক্রমাগতভাবে আওয়ামী দলীয় পক্ষ হয়ে উঠেছেন এবং শাহবাগের আত্মার সাথে বেঈমানি করেছেন। পরিণামে ক্রমশ জনশূন্য হয়ে উঠেছে শাহবাগ। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে এই নেতারা যোগ করেছেন হাতেগোনা গুটিকয়ের 'লাঠি মিছিলের' মতো হিংসাত্মক কর্মসূচি। তাঁরা প্রমাণ করে ফেলেছেন, তথাকথিত অহিংসা-নীতি তাঁদের জন্যেও মুখের বুলি মাত্র। তাঁদের মনের ভেতরেও সহিংসতার নীতি রয়ে গেছে স্ট্যান্ডবাই, সদাপ্রস্তুত। উস্কানির অপেক্ষা মাত্র।

শাহবাগের স্বাধীনতার জন্য, শাহবাগ-সমাবেশের জন্য, শাহবাগের স্বপ্নের জন্য এর চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা আর হয় না। মঞ্চ-মাইক-মুরুব্বি-মুখপাত্রবিহীন সত্যিকারের শাহবাগ-আন্দোলন নতুন করে, সত্যিকারের অহিংস পন্থায়, স্বাধীনতা-শীল-আনুভূমিক-বহুস্বরভিত্তিক সাংগঠনিক নীতি-প্রণালীতে পরিচালিত গণ-আন্দোলন কত তাড়াতাড়ি গড়ে উঠতে পারে তার ওপর নির্ভর করছে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-স্বপ্নের বাংলাদেশ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: রচনা: ৯-১৬ই মে ২০১৩। ঘষামাজা: নভেম্বর ২০১৩। লেখাটা রাজশাহীর দৈনিক *সোনার দেশ*-এ ও ঢাকার দৈনিক *বণিক বার্তায়* প্রকাশ পেয়েছিল দুই কিস্তিতে। ২০১৩-র মে-জুন মাসে। সোনার দেশে এর শিরোনাম ছিল 'কপট অহিংসা বনাম অকপট হিংসা'। বণিক বার্তায় শিরোনামটা ছিল 'হেফাজতিদের মিথ্যা অহিংসা, রাষ্ট্রযন্ত্রের সত্য সহিংসা'। দুটো ভাষ্যের মধ্যে শব্দসংখ্যারও হেরফের ছিল খানিক। এখন পাঠ দুটো মিলিয়ে দেখলাম। সামান্য ভাষাগত ঘষামাজাসমেত নতুন করে পেশ করলাম। ঘষামাজা করতে গিয়ে আদি বক্তব্য বিকল হয় নি বলে আমার ধারণা।

নির্বাচন ও গণতন্ত্র: আইন, ক্ষমতা আর সম্পত্তির লীলা

Pablo Picasso

> কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করাটা সত্যি বেদনাদায়ক; কিন্তু আরও বড় আহাম্মকি হচ্ছে কর্তা-নির্বাচন করতে যাওয়াটা। কর্তা বদল করে লাভ নেই — জীবন বদল করি চলো।
>
> প্যারিস ১৯৬৮-র দেয়াল-লিপি (কেন ন্যাব, ২০০৬)

২৪.১ গণতন্ত্র বনাম গুটিকয়তন্ত্র

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন চলছে। বড় বড় টাউনে-সিটিতে। মেয়র এবং কাউন্সিলর পদের নির্বাচন। রাজশাহী সিটির নির্বাচন নিয়ে এখানে কথা থাকবে। কিন্তু স্রেফ

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে এ রচনা নয়। সিটি কর্পোরেশনগুলো বলতে গেলে সবই বিভাগীয় শহরে। জেলা শহরগুলোতে সিটি কর্পোরেশন নাই বললেই চলে। জেলা-উপজেলা-গ্রামে আছে পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি। সেগুলোর গুরুত্ব কম। সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্ব বেশি। গ্রামের গুরুত্ব কম। শহরের গুরুত্ব বেশি – রাজধানী-শহরের গুরুত্ব আরো বেশি। গরিবের গুরুত্ব কম। বড়লোকের বেশি। সংখ্যাগুরুর গুরুত্ব কম। গুটিকয়ের বেশি। মেয়রের গুরুত্ব বেশি। কাউন্সিলরের গুরুত্ব কম। সাধারণ ব্যক্তি-মানুষের গুরুত্ব আরো কম। নাই-ই প্রায়। সে দিন এক রিকশাআলা বললেন, প্যান্টশার্ট-পরা লোক কর্পোরেশনে গেলে চেয়ারে বসতে দেয়। কথা শোনে। কথা বলে। কিন্তু লুঙ্গিপরা মানুষ খালিপায়ে সিটি কর্পোরেশনে গেলে ঘণ্টা-ঘণ্টা পার করে তার পর নেতা বলেন: 'এই, আজকে আর সময় হলো না গো, পরে আরেক বার এসো ভাই।' এইসব কমবেশিতন্ত্রই কি গণতন্ত্র? গণতন্ত্র তাহলে সমগুরুত্বতন্ত্র নয়! ভোটাভুটির গণতন্ত্র তাহলে কী বস্তু?

এই প্রশ্ন তোলা আজকের লেখার একটা প্রাথমিক উদ্দেশ্য বটে। এ রচনা আমাদের সার্বিক ভোটাভুটির গণতন্ত্র নিয়ে। রাজনৈতিক গণতন্ত্র নিয়ে। গণতন্ত্র মানে দাঁড়িয়েছে গুটিকয় হোমরাচোমরা-ভালোমন্দ ব্যক্তিকে পাঁচ বছর পর পর একদিন ভোট দিয়ে নির্বাচিত করা। তার জন্য হৈ-হট্টগোল-গুজব-টাকা-পয়সা-কানঝালাপালা। এরই কি নাম গণতন্ত্র? এ বস্তুই কি অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের 'গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল'? নির্বাচনের ছলে-বলে-কৌশলে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম-শহর-রাজধানীর সরকারগুলো কি 'জনগণের সরকার'? নাকি বিত্তশালী-বড়লোকদের সরকার? এগুলো কি 'জনগণের দ্বারা' পরিচালিত সরকার? নাকি ক্ষমতাশালী খোক্কসদেরদের দ্বারা পরিচালিত সরকার? এগুলো কি 'জনগণের জন্য' নিবেদিত সরকার? নাকি জনগণের নামে ধনিক-বণিক-মানিকদের সেবা করার সরকার? এই পঞ্চবার্ষিক প্রচারণা-প্রতারণাকে 'গণতন্ত্র' বললে গুটিকয়ের গুপ্তাতন্ত্র বলে কাকে? কতিপয়ের কোটিপতিতন্ত্র বলে কাকে?

২৪.২ সততা, দণ্ডবিধি, নীতিবোধ

এই 'প্রচারণা' শব্দটা নিয়ে কারো রাগ করার সুযোগ নাই। কিন্তু 'প্রতারণা' নিয়ে কেউ কেউ গোস্বা করবেন। কারণ তাঁরা সৎ মানুষ। আপত্তি করব না। সবাই অবশ্যই অসৎ নন। সৎ মানুষে দেশ ভর্তি বলেই দেশটা এখনও চলছে। এই কলি কালেও। কিন্তু 'সততা' তো যাঁর যাঁর নীতিনৈতিকতাবোধের স্বরচিত মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করে। আবার গুরুজন-রচিত দণ্ডবিধির সংজ্ঞার ওপরও নির্ভর করে বৈকি! পাঁচশ টাকা চুরি করে ধরা পড়লে ন্যায়দণ্ডধারী আলখাল্লা-ইউনিফর্ম-পরা আদালত তাঁকে

চোর বলতে বাধ্য। আইনত। দণ্ডত। সবাই তাই-ই বলেন। কিন্তু ফরাসি দেশের পিয়েরে জোসেফ প্রুধোঁ বলতেন, সম্পত্তি মাত্রেই চুরি[১]। গান্ধী বলতেন, যে নিজের শ্রমে উৎপাদন করে খায় না, সে চোর।[২] আমার মতো পুঁচকে-বড়লোক কিংবা হাজার কোটি টাকার বৃহৎ-বড়লোককে কেউ চোর বলেন না। দেখা যাচ্ছে: সমস্যাটা তাহলে দণ্ডবিধির নয়, নীতিবোধের। 'সততা' সম্পর্কে যাঁর যাঁর সংজ্ঞার।

নির্বাচনে 'ভালো' মানুষকে নির্বাচন করাই সবার লক্ষ্য। ঢাক পিটিয়ে বলা হচ্ছে। সবাই তা বিশ্বাসও করে আসছেন। যুগ যুগ ধরে। ভালোমন্দের নীতিবোধ কী

---

১ সবাই বলছেন, উইকিপিডিয়াও জানাচ্ছেন (https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudho; ও https://en.wikipedia.org/wiki/What_Is_Property%3F), 'প্রপার্টি ইজ থেফ্ট' কথাটা প্রুঁধো ব্যবহার করেছিলেন তাঁর 'সম্পত্তি কী?' নামের রচনায়। এখন কৌতূহলবশত মূল অনুবাদটা (পিয়েরে জোসেফ প্রুধোঁ, ১৮৪০) ঘেঁটে দেখা গেল, মোটে 'থেফ্ট' শব্দটাই নাই গোটা বইটাতে। যা আছে, অনেক বার আছে, তা হলো, 'প্রপার্টি ইজ রবারি' – সম্পত্তি মানে দস্যুতা। ইংরেজি 'রবারি' শব্দটা মূল ফরাসিতে কীভাবে আছে তা পরে খুঁজে দেখার অবকাশ থেকে গেল।

২ গান্ধীর নামে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এই কথাটা আমি পেয়েছিলাম কলিম খানের কোনো একটা বইয়ে। মেলা ঘাঁটাঘাঁটি করে অবশেষে গান্ধী-রচনাবলী থেকে জানা গেল: নিজ শ্রমে উৎপাদন না করে খাওয়া মানে যে চুরি করে খাওয়া সে চিন্তাটা গান্ধী পেয়েছিলেন 'রুটি-শ্রমের ধারণা' থেকে। রুটি-শ্রমের এই ধারণাটা তিনি পেয়েছিলেন কালজয়ী রুশ সাহিত্যিক তলস্তোয়ের কাছ থেকে। তলস্তোয়ের মতে, 'যে মানুষ শারীরিক শ্রম করে না সে আসলে চোর – সমাজ থেকে চুরি করে সে।' বিস্তারিত জানাচ্ছেন গান্ধী স্বয়ং:

> বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে অবশ্যই শ্রম করতে হবে – এই আইনের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে তলস্তোয়ের রুটি-শ্রম সম্পর্কিত লেখালিখি থেকে। ... ইংরেজি 'ব্রেড লেবার' কথাটার অনুবাদ হচ্ছে 'জাতমেহনত'। আক্ষরিক অর্থে, এর মানে হলো রুটির জন্য শ্রম। মানুষকে তার রুটি জোগাড় করতে হবে অবশ্যই তার নিজের হাতে পরিশ্রম করে – এই ঐশ্বরিক আইনের ওপর প্রথম গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তলস্তোয় নন, টি. এম. বোন্দর্ফ নামের এক অল্প-পরিচিত রুশ লেখক। তাঁর কাছ থেকে তলস্তোয় এটা নেন এবং কথাটাকে কবুল করার মাধ্যমে তিনি একে ব্যাপক পরিচিতি এনে দেন। আমার মতে, এই একই নীতি তুলে ধরা হয়েছে গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে। সেখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে, উৎসর্গ না করে যিনি খান তিনি চুরি-করা খাবার খান। উৎসর্গ বলতে এখানে স্রেফ রুটি-শ্রমকেই বোঝানো সম্ভব। (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩০: ৫৮)।

গীতার এই ব্যাপারটা গান্ধী পরে বুঝিয়ে বলছিলেন এভাবে: 'গীতা আমি যতদূর বুঝি, এতে অনেক ধরনের যজ্ঞের কথা আছে। সেসবের একটা হলো কায়িক শ্রম। পৃথিবীকে

বস্তু? ভালো কী? মন্দ কী? হল্যান্ডের আমস্টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-বিজ্ঞানী, বিশিষ্ট শ্রমিক-আন্দোলনকর্মী, মুক্তিপরায়ণ সমাজতান্ত্রিক পণ্ডিত প্রফেসর আন্টন পানেকুক কথাটা তুলেছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। প্রথম মহাযুদ্ধ, তার পরের বিভিষীকাময় মহামন্দা এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভেতর দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যে অমোচনীয় দেউলিয়াত্ব উন্মোচিত হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তুলেছিলেন প্রশ্নটা। তাঁর 'ওয়ার্কার্স কাউন্সিলস' নামের ধ্রুপদী গ্রন্থে। বইটা লেখা হয়েছিল ঐ ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মধ্যেই। লিখতে লিখতেই চাকরি গিয়েছিল তাঁর। জার্মান ফ্যাসিবাদী সৈন্যরা হল্যান্ড দখল করে নেওয়ার পর। তো সেই বইতে প্রফেসর পানেকুক দেখিয়েছেন:

> মানুষের ভালোমন্দের বোধ এবং ন্যায়বিচারের চেতনা কোনো আপতিক-আকস্মিক-আচমকা ঘটনা নয়। মানুষের মধ্যে প্রকৃতি-সূত্রেই এটা গড়ে ওঠে। অপ্রতিরোধ্যভাবে। জীবনধারণের মৌলিক সব শর্ত-পরিস্থিতি-অবস্থার অভিজ্ঞতা থেকেই গড়ে ওঠে এসব। সমাজকে তো বাঁচতে হয়। কাজেই মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক-সম্বন্ধগুলো এমনসব নিয়মের অধীনে পরিচালিত হতে হয়, যাতে করে জীবনধারণের জন্য আবশ্যক সব জিনিস-পত্রের উৎপাদন-ধারা বিঘ্নিত না হয়। যেসব জিনিস জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয়ভাবে ভালো এবং দরকারি – সেগুলোই ন্যায়সঙ্গত, সঠিক। শুধু এই মুহূর্তের উপযোগী হলেই হবে না। সাধারণ অর্থে প্রয়োজনীয় হতে হবে। শুধু কতিপয় একক-ব্যক্তির জীবনধারণের জন্য হলেই হবে না। বৃহত্তর জনসাধারণের জন্য হতে হবে। পুরো সমাজ-সম্প্রদায়ের জন্য হতে হবে। ব্যক্তিগত বা স্বল্পস্থায়ী স্বার্থের জন্য হলেই হবে না। সকলের জন্য এবং দীর্ঘকালের জন্য সুস্থ, সুন্দর, উন্নতিশীল হতে হবে। জীবনধারণের শর্ত-পরিস্থিতি-অবস্থা যদি বদলায়, উৎপাদন-ব্যবস্থা যদি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে, মানুষে-মানুষে সম্পর্ক তাহলে বদলায়। ভুল কী আর সঠিক কী সেই সম্পর্কিত বোধও এসবের সাথে সাথে বদলায়। তখন আইনও বদলাতে হয়। (আন্টন পানেকুক, ১৯৪৬-এর পার্ট ওয়ান, 'দ্য টাস্ক' অংশ)

এর পর অসাধারণ সহজ ভাষায় প্রফেসর পানেকুক দেখিয়েছেন, ভুল-ঠিক, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের নীতিবোধের সাথে আছে আইন-আদালত-পার্লামেন্ট-কর্তৃ-

---

টিকিয়ে রাখার জন্য যজ্ঞের মতো করে কায়িক শ্রম করা প্রতিটা বর্ণেরই কর্তব্য। কেউই এই যজ্ঞকে এড়াতে পারেন না। ... যিনি এই শ্রমযজ্ঞ পালন করেন না প্রকৃতই তিনি একজন চোর। কায়িক শ্রম শুধু শূদ্রের জন্য প্রযোজ্য – এ কথা থেকে ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়।' (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৩: ৪৩৪)

পক্ষ এবং পুঁজিবাদ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুগভীর অবলীলাময় সম্পর্ক। সে আলোচনায় না গেলে নির্বাচনী গণতন্ত্রের অন্দরমহলের রূপ বোঝা কঠিনই হবে মনে হয়। কিন্তু সে আলোচনা অন্য দিন।

আপাতত একটু শুধু জেনে রাখা দরকার: চিন্তার এই ধারা বিপ্লবী মার্কসবাদ থেকে শুরু করে অ্যানার্কি পর্যন্ত বিস্তৃত। বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম পলের 'রাষ্ট্র: এর উৎপত্তি ও কাজ' (১৯১৭) এবং ধ্রুপদী নৈরাজ্য-তৎপরতার অন্যতম পূর্বসূরী পিওতর ক্রপোৎকিনের 'রাষ্ট্র: এর ঐতিহাসিক ভূমিকা' (১৮৯৭) গ্রন্থ দুটিতে এ ধারারই ভিত্তি রচিত হয়েছে। ফ্রান্স ও জার্মানির 'কাউন্সিল কমিউনিজম' এর ধারা এ জিনিসেরই অভিপ্রকাশ। ইউরোপ-জোড়া 'মে ১৯৬৮' আন্দোলনের বিপুল প্রবাহে এরই পলি পড়েছে। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা রোজা লুক্সেমবার্গ আর ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি আন্তোনীয় গ্রামসির সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা এ থেকে দূরবর্তী নয়। আধুনিক জমানায় 'নৈরাজ্য' শব্দটির রাজনৈতিক প্রণেতা ফ্রান্সের প্রুধোঁর শিল্পকারখানাভিত্তিক সমাজ-সংগঠনের ধারণায় এরই অনুরণন। মার্কস আর বাকুনিন তো ছিলেনই।

বিপ্লবী মার্কসবাদ থেকে শুরু করে সমাজতান্ত্রিক নৈরাজ্য পর্যন্ত পুরো এই ধারাটিকে মার্কিন অরাজপথিক প্রফেসর নোম চমস্কি ডাকেন 'মুক্তিপরায়ণ সমাজতন্ত্র' বলে। এই নাম তাঁর রচনা নয়। ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলন এ এক পুরোনো ধারা মাত্র। শুধু তাই নয়, পুঁজিবাদবিরোধী এই মুক্তিপরায়ণ সমাজতান্ত্রিক ধারার বীজ আছে ইউরোপীয় রেনেসাঁ থেকে উৎসারিত 'ধ্রুপদী উদারনীতিবাদী' চিন্তাপ্রণালীতে। জার্মানির শিক্ষামন্ত্রী, ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের অন্যতম আদি দার্শনিক ও পণ্ডিত হমবোল্টের 'রাষ্ট্রকর্মের সীমা' তার একটা চিরায়ত দলিল। (দ্রষ্টব্য: নোম চমস্কি, ১৯৭০)

২৪.৩ পঞ্চবার্ষিক ভোট: বৃহত্তম সেকুলার রাষ্ট্রীয় উৎসব

নির্বাচন আমাদের পঞ্চবার্ষিক উৎসব বটে। বৃহত্তম সেকুলার রাষ্ট্রীয় উৎসব। ধর্ম-বর্ণ-জাতি-ভাষা-ধনী-গরিব নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণী-পেশার এবং পেশাহীন-বেকার মানুষজনের সর্বজনীন উৎসব এ। মিডিয়া কর্তৃক মহা-মহিমান্বিত, আইন কর্তৃক উদযাপিত এবং রাজনীতির রঙে অতিরঞ্জিত রাষ্ট্রীয় আতশবাজির মহোৎসব। কোটি টাকার জৌলুসে জমজমাট সম্পদ-ক্ষমতা-মর্যাদার পঞ্চবার্ষিক ভাগ্যনির্ণয়ের দিন। এর মাহাত্ম্য শবেবরাতের চেয়ে কম কীসে! (মাফ কোরো খোদা।) এই দিন দিবাগত রাত্রে ঘোষিত কে বা কারা গ্রাম-থানা-জেলা-সিটি-মেগাসিটি-দেশের পঞ্চবার্ষিক ইজারা পাবেন। ফ্রিস্টাইল ইজারা।

রাজনীতি হবে। উন্নয়ন হবে। রাস্তাঘাট হবে। অফিস-আদালত-বাজার হবে। ঠিকাদার পাবে। রাজনীতিবিদ পাবে। আমলারা পাবে। পেশাজীবীরা পাবে। এনজিও -ওয়ালারা তো পাবেই। কিন্তু আমজনতার এতে লাভ কীসে? কী পাবেন তাঁরা? তাঁদের কি অনাহার ঘুঁচবে? অশিক্ষা যাবে? বড় বড় রাস্তায় তাঁরা হাঁটতে ভয় পাবেন। ট্রাফিক পুলিশ দাবড়াবে। রিকশাচালক-অটোচালকরা তো বড় বড় জীপ-ট্রাক-পিকআপের কাছে ঘেঁষতেই পারবেন না।

তবু তাঁরাও পাবেন বৈকি। গণতন্ত্র বলে কথা! পাঁচটাকা-দশটাকা গুনতে গুনতে দিবস যাবে তাঁদের। কোনোদিন আল্লা চালাবেন। কোনোদিন নিজেরা চালাবেন– না খেয়ে অবশ্যই। মাস চালানোর টম-জেরি-টানাটানি আনন্দ দেবে। স্বপ্নে অভাবের দৈত্য আসবে। স্বপ্নে হিমালয় হাতছানি দেবে: একদিন আমরাও ... ওরকম সিনেমার মতো ... টিভির মতো ...। বিশাল শপিং মলের সামনে নিঃস্ব মানুষ গরিব মানুষ হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকবেন। এমনকি দশ টাকাও পেয়ে যাবেন। ভিক্ষা। সুখ হবে। সামন্ত রাজনীতি-ব্যবসা-পেশাদারির তালতো ভাই খালতো ভাইয়ের বংশলতিকার অতিসূক্ষ্ম সূত্র ধরে তাঁরা এমনকি তদ্বিরও করতে পারবেন। মেয়র-চেয়ারম্যান-কাউন্সিলের কাছে গিয়ে অভাব-অভিযোগ নিয়ে ঘ্যানঘ্যান-প্যানপ্যান -মিনমিন করতে পারবেন। গণতন্ত্রই যেহেতু বিদ্যমান, ভবিষ্যতের ভোটের দুঃস্বপ্নে নেতারা তাঁদের দেবেনও বৈকি। মফিজ আর আবুলের কাছে সর্বস্ব হারানো দুই লাখ টাকা জমা দিয়ে এর দ্বারে ওর দ্বারে ঘুরতে থাকবেন তাঁরা। চাকরির আশায়। আশা মহান। আশাই তো প্রাণ।

তবু তাঁরা ভোট দিতে যাবেন। নাগরিক দায়িত্ব বলে কথা। টিভিতে বলেছে। পেপারে লিখেছে। ভোটের দিন, ভোটের আগে নগদ নারায়ন, নগদ বিড়ি, নগদ পান, উপরন্তু নগদ মানসম্মানও জুটবে। এছাড়া, তাঁদের ভোটেই তো সবকিছু নির্ধারিত হবে। তাঁরাই তো সবকিছুর নির্ধারক। জনগণই তো সকল ক্ষমতার মালিক। সংবিধান বলেছে। গ্রামপিতা-নগরপিতা-জাতিপিতাদেরকে তো তাঁরাই বানান। তাঁরাই তো ইতিহাসের চালক। তাঁরাই তো সত্তরে ভোট দিয়ে বাংলাদেশ বানিয়েছে। জাতির পিতা বানিয়েছেন। তারপর থেকে পিতৃতন্ত্র। একচ্ছত্র। তার পর থেকে আব্বু-আম্মু-সমাচার। একেকটা নগরের লক্ষ লক্ষ মানুষের 'আব্বা' হবেন একজন মাত্র ব্যক্তি। সাথে তাঁরা পাবেন ৩০টা-৪০টা করে 'বাবাতো ভাই'। আমার ভাই, তোমার ভাই, নীল ভাই, লাল ভাই। উড়ছে বাদুড়, দিচ্ছে সুর, ডিম্ব যাবে অচিনপুর। বেচারা জনগণ। তাঁদের কেউ কেউ পিতামহ-প্রপিতামহ হয়েও নাবালক থেকে যাবেন। দেশ চালানোর অধিকার পাবেন না। ভোট দেওয়ার আখেরি অধিকার তো পাবেন।

২৪.৪ আগে ভোট দিন, পরে দেখা যাবে

শাহবাগ এসেছিল। বাংলা-বসন্তের আবাহন শোনা গিয়েছিল। মানুষের প্রাণের কোকিল ডাক দিয়েছিল। চলে গেছে। গেছে রাজনীতি আর ভোট-ক্ষমতার ক্যাল-কুলেশনে। মাঝখান থেকে রয়ে গেছে কবিতা: 'এখন থেকে আমাদের প্রত্যেককে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করতে হবে / এখন থেকে আমরা প্রত্যেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি'। থেকে গেছে অমর পংক্তি: 'আমি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ / তোমরা সংসদ থেকে চলে যাও / আমি গাইবান্ধার জলো বিল থেকে উঠে এসেছি– এই দ্যাখো আমার পায়ে কাদা'।[৩]

কবিতার পাশাপাশি থেকে গেছে গান। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের। কবীর সুমনের। কত শত তরুণের। কবীর সুমনের গান তো পত্রিকাগুলো আস্ত আস্ত ছাপিয়ে দিয়েছে। টিভিচ্যানেলগুলোতে সেসবের মিউজিক ভিডিও-ও সম্প্রচারিত হয়েছে: 'তিন মিনিটের জন্য শাহবাগ হলো দেশ'। তো, সেই সুমনের অন্য গানগুলোও কি ভোটের দিন বাজানো হবে নাকি? ভোটকেন্দ্রে? যেমন ধরুন এই গানটা:

ছোট্ট ছেলেটা তার টাকা আঁকে – রঙিন রঙিন নোট
এগুলোই হবে ব্যালট পেপার, বড়দের হলে ভোট
নোট নিয়ে খেলা ভোট নিয়ে খেলা ছোটতে বড়তে মিলে
জীবনের নোট নিয়ে গেছে ব্যাংক, ভোট নিয়ে গেছে চিলে

কিংবা ধরুন নিচের 'হাউজ দ্যাট' গানটার 'মিউজিক ভিডিও' বানিয়ে দেখানো হবে কি? টিভিতে? তাহলে আমাদের কষ্ট করে কল্পনা করতে হতো না, চোখের পর্দা খেয়ে টিভির পর্দায় দেখে নিতে পারতাম:

ছোট্ট রাজুর চোখ দুটো গেছে, হাউজ দ্যাট!
ভোটের সকালে লজ্জিত শুধু ক্রিকেট ব্যাট।
দেখুন, বড়রা, ঘাসও কতটা লজ্জা পান
লজ্জা কীসের? বোমাতন্ত্রটা চালিয়ে যান।
বাহবা সাবাস বড়দের দল এই তো চাই –
ছোটরা খেলবে, আসুন, আমরা বোমা বানাই

---

৩ দুটো পঙক্তিই কবি জাহিদ আকতারের। ফেসবুক থেকে নেওয়া। জাহিদ (https://www.facebook.com/zahid.akter.7) ঢাকার ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। এখন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ কলোরাডো বোল্ডারে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করছেন।

অথবা এই গানটার কথাও ভাবা যেতে পারে। কবীর সুমনের গান বলে কথা! ছাপানো হবে কি এ গান পত্রিকায় যেখানে তিনি নিজে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর নিজে গলায় গেয়েছিলেন:

আগে ভোট দিন, পরে দেখা যাবে
ভোট গণণার পর কে পাবে কী পাবে।
পুরসভা ভোট, ভোট পঞ্চায়েতে –
জল আসবে কি বোরো ধানের ক্ষেতে?
জলসেচে টান মানে ভাতে পড়ে টান
পেটে খিদে নিয়ে বলো, এ দেশ মহান॥
আগে ভোট দিন ...

প্রচলিত ও সীমাবদ্ধ মানদণ্ড দিয়ে মাপলেও আমাদের মিডিয়া রীতিমতো অগণতান্ত্রিক। তাঁদের নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের প্রক্রিয়া আমলাতান্ত্রিক, হুজুর-হুকুম-বাজার-নির্ভর। মজার কথা হলো, কর্মচারী-সাংবাদিক কিংবা পাঠক-দর্শক-গ্রাহকদের ভোটে কদাচ নির্বাচিত হন না টিভি-মিডিয়া-পত্রিকার মালিক-সম্পাদকরা। নগদ টংকাই তাঁদের নগদ ব্যালটপেপার। রাজনৈতিক দলের প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি-মহাসচিবরাও কর্মী-সদস্য-সমর্থকদের ভোটে নির্বাচিত হন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যবৃন্দ অথবা সেনাবাহিনীর জেনারেলগণ অথবা আদালতের বিচারপতিবৃন্দ কোনো প্রকারের ভোটে নির্বাচিত হন না। মজার ব্যাপার হলো এঁরা সকলেই ভোটের গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন। এঁরাই আমাদের ভোটপ্রথার বিশিষ্ট সব পালক-রক্ষক-প্রচারক। এঁদের প্রচারণা-দীক্ষায়ন-শিক্ষায়নের পাল্লায় পড়েই আমরা একটা গণবিরোধী কতিপয়তন্ত্রকে বলি গণতন্ত্র। হাততালি দিই। জিন্দাবাদ বলি। রাজনীতি, নির্বাচন, বুদ্ধিজীবিতা আর মিডিয়ার নিদারুণ এই দোস্তালির দীক্ষায়ন-প্রকৌশল নিয়ে আরেক দিন কথা তোলা যাবে। আপাতত আস্ সালাম!

রচনা: ৭ই জুন ২০১৩। প্রকাশ: দৈনিক *সোনার দেশ*, ৮ই জুন।

পঁচিশ

স্বৈরতান্ত্রিক শুভবোধ ও চিন্তাদাসত্বের রাষ্ট্রপ্রণালী

Brother of War. Shawn Mathews

২৫.১ সর্বদলীয় রাজতান্ত্রিক ইশতেহার

চিন্তাদাসত্বের গোলকধাঁধায় পড়েছে বাংলাদেশ। গোলকধাঁধাটা এত আন্তরিক কায়দায় বানানো হয়েছে যে গোলকত্বও বোঝা যায় না, ধাঁধাময়তাও বোঝা যায় না – দাসত্ব তো দেখাই যায় না। আন্তরিকতাই এখানে মুখ্য। মালিক আন্তরিক তো বটেই, দাসও আন্তরিক। আন্তরিক দাসপ্রথা। এ প্রথা অন্তরের। মগজের। চিন্তার। চিন্তাদাসত্বের নতুনতর রাষ্ট্রপ্রণালী বিকশিত হতে শুরু করেছে বাংলাদেশে। সংবিধানে আছে, জনগণই রাষ্ট্রের মালিক। কথাটা কথার কথা হিসেবেই আছে বটে সংবিধানে। কিন্তু খালি খালি এরকম একটা বিপজ্জনক কথা সংবিধানে যোগ করার দায় পড়েছিল কেন সংবিধান-প্রণেতাদের? দায় ছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের।

একাত্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিল রাষ্ট্রের ওপর জনগণের মালিকানা। এখন সেই একাত্তরের নাম ব্যবহার করে রাষ্ট্রকে বানানো হচ্ছে জনগণের মালিক। রাষ্ট্র এখন মালিক। জনগণ তার দাসত্ব করবে। যিনিই এই দাসত্বকে প্রশ্ন করবেন, তিনিই একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চান না বলে ধরে নেবেন রাষ্ট্র-ম্যানেজারবৃন্দ। তাঁর কপালে দুঃখ আছে। গভীর দুঃখ।

যেহেতু দেশে যুদ্ধাপরাধের বহুপ্রতিক্ষিত বিচার চলছে, এবং যেহেতু সেই বিচারের বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তৎপরতা চলছে প্রকাশ্যে, এবং যেহেতু পাকিস্তানী পার্লামেন্ট আইনত বলছে রাজাকার কাদের মোল্লা তাঁদের লোক, এবং যেহেতু বিএনপি-নেত্রী খালেদা জিয়া পাকিস্তান-পার্লামেন্টের এই প্রকাশ্য বাংলাদেশ-বিরোধিতার মুখেও সপ্তাখানেক থ মেরে বসে থেকে পরে বলছেন তিনি মর্মাহত, এবং যেহেতু এটা এখন চরম সুস্পষ্ট যে বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী আসলে পাকিস্তানভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দলের বাংলাদেশ শাখা মাত্র, এবং যেহেতু তা হওয়া সত্ত্বেও বিএনপি জামায়াতের কোল থেকে নামতে রাজি না, সেইহেতু আওয়ামী-বাম মহাজোট রাষ্ট্রের তরফে আপাতত সবকিছুই জায়েজ।

সেই হেতু বিনাভোটারের, বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতার, আগুনের, লাশের, বন্দুকতন্ত্রের নির্বাচনী তামাশাই এখনকার বৈধ রাষ্ট্রপ্রণালী। নির্বাহী বিভাগের তারছেঁড়া বিনা বাজিয়ে চলেছেন নির্লজ্জ নির্বাচন কমিশন। দাসত্বের পরাকাষ্ঠা ফুটে উঠছে কমিশনার -দের চেহারায়। মাঝখান থেকে এই গরিব দেশের মানুষজনের ট্যাক্সের কয়েক শ কোটি টাকার শ্রাদ্ধ। সংসদ, সংবিধান, সাংবিধানিক ধারাবিহকতা ইত্যাদি যে সর্বাত্মক ক্ষমতাধরদের পায়ের ফুটবল মাত্র সে কথা এখনও যাঁরা আত্মস্থ করেন নি তাঁদের জন্য আছে চলমান রাষ্ট্রীয় টিউটোরিয়াল। ফটকা পুঁজির নিওলিবারাল যুগের প্রশ্নাতীত প্রবর্তন ঘটাতে হাতে বন্দুক পায়ে বন্দুক নিয়ে এই টিউটোরিয়াল ক্লাসের সূচনা ঘটিয়েছিলেন এক-এগারোর কুশীলবগণ। তাঁদের পতাকা হাতে তুলে নিয়ে-ছেন আওয়ামী-বাম মহাজোটের সরকার।

নিওলিবারাল ক্যাপিটালিজম ওরফে কাছাখোলা-পুঁজিবাদ কী বস্তু? এ হলো পুঁজিবাদের নয়া উদারনৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মূল কথা হলো ঋণপ্রথা, আর সুদপ্রথা। রাষ্ট্রের উদারতা থাকবে শত কোটি টাকা ঋণগ্রহিতা বড়লোকের প্রতি। গরিবের গলায় থাকবে গামছা। কারখানা-উৎপাদন এই পুঁজিবাদের মূল কারবার নয়। শুধু উৎপাদনে মুনাফা অনন্ত হয় না। অনন্ত মুনাফার জন্য লাগে অনন্ত জলিল। তাই এই পুঁজিবাদের আসল ঘটনা হলো নিরাকার হিসাবনিকাশ। শুধু মাত্র হিসাবনিকাশের মারপ্যাঁচ দেখিয়ে টাকা যাবে রাক্ষস-বড়লোকের পেটে। সেই পেট পাহারা দেবে রাষ্ট্র-রাক্ষস। পাহারার উসিলা হিসেবে লাগবে শুধু শত্রু। রাষ্ট্রের শত্রু।

জনগণের শত্রু। স্বাধীনতার শত্রু। শত্রু বানাতে লাগে প্রচারযন্ত্র। কেননা কুত্তাটাকে মেরে ফেলার আগে সবাইকে জানিয়ে রাখতে হয় যে কুত্তাটা আসলে পাগলা কুত্তা। নিওলিবারাল পৃথিবীতে সব টিভিই বিটিভি। সুতরাং শত্রুর কোনো অভাব নাই। যুক্তরাষ্ট্রে আছে আল কায়দা, ভারতে মাওবাদ, বাংলাদেশে রাজাকার। শত্রু সুস্পষ্ট। শত্রু খতরনাক। সুতরাং গুলি চালাবে রাষ্ট্র। যার গায়ে লাগে লাগুক। সুতরাং বন্দি করবে রাষ্ট্র। জেলখানার পেট ভরলেই হলো। নিওলিবারাল পুঁজিবাদ মানেই তাই সদাচলমান জরুরি জমানা। সর্বত্র সর্বোচ্চ সতর্কতা। নিওলিবারাল পুঁজিবাদ মানে তাই সুশীলতা এবং সামরিকতা। সুশীল-সামরিক জরুরি জমানারই আরেকটা নাম তাই সুশীল-সামরিক জেল জমানা।

আদতে বাংলাদেশের সমাজ এখনও সামন্ত-সমাজ। জমিদারি সমাজ। জমিদার-তহশিলদার-নায়েব-গোমস্তা-উকিল-মোক্তার-পণ্ডিতে ভরপুর এই সমাজ। এ সমাজ এখনও মনে করে সব মানুষ সমান না। এখানে ট্রেনের টিকেট কাটার লাইনে পর্যন্ত কর্নেল আর কণ্ডাকটর সমমর্যাদার অধিকারী নন। এ সমাজ মনে করে সব মানুষই প্রকৃতপক্ষে সম্মানের অধিকারী নয়। আলাদা লোক আছেন। মানী লোক। মানী লোকের মান রক্ষার দায়িত্ব এখানে মানসম্মানহীন নালায়েক-নাবালক আমজনতার। নিজের মর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে নায়েব-নবাবদের পায়ে লুটিয়ে পড়ার জন্য এখানে মুখিয়ে থাকে মানুষ। জমিদার যেমন তাঁর জমিদারির সমস্ত পোকা-মাকড়ের (পড়ুন মনুষ্যসন্তানের) জীবনের মালিক, তেমনই এ রাষ্ট্রের অফিসার -প্রফেসর-জেনারেল-বিচারকরা সকলেই একেক জন জমিদার। জমিদারি প্রথা এ রাষ্ট্রের ছত্রে ছত্রে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এমন এক সমাজ এই সমান্ত-সমাজ নামের বস্তুটা যেখানে এখনও মা-বাবা সন্তানের নাম রাখেন রাজা-বাদশাহ-নবাব। গাছতলার আমজনতার সুফিসাধকও মৃত্যুর পরে এদেশে সুফিসম্রাট উপাধি পান। শাহ আব্দুল করিম পান বাউলসম্রাট উপাধি। রাজা-বাদশাহ-নবাব-সম্রাট-জমিদারদের সামন্ত খোঁয়ারি আমাদের দেশ থেকে যায় নি এক ফোঁটাও। হাসিনা-খালেদা-এরশাদেরা এদেশে একেক জন জমিদার-বাদশাহ হবেন তাতে আশ্চর্য কী!

আজকের নিওলিবারাল অর্থনীতি এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজনীতির বিষাক্ত যোগসূত্র আমাদের রাষ্ট্রকে করে তুলেছে আরো ভয়ঙ্কর। এমন একটা সামন্ত বাংলাদেশে নিওলিবারালিজম এসে ঢুকছে যেখানে কারখানা-পুঁজিবাদ গড়েই ওঠে নি কখনোই। এখানে পুঁজি মাত্রই ফটকা পুঁজি। একমাত্র সহায় রাষ্ট্র। গ্রামের ফকিন্নিও এখানে জানেন, এ দেশের সকল ধনসম্পত্তি-দুগ্ধদ্রব্য শুষে এনে জমা করা থাকে রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে। একবার কোনো রকমে রাষ্ট্রের কোনো একটা পাইপলাইনের সাথে কানেক্টেড হয়ে যেতে পারলেই হলো, দুগ্ধজাত চিক্কন দ্রব্যসকল আপনাতেই

চুঁইয়ে পড়তে থাকবে আপনার পেয়ালায়। অবিরাম। আপনাকে শুধু তৈল সহযোগে রক্ষা করতে হবে রাষ্ট্র-সংযোগটুকু। অবিরাম তৈল সহযোগে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের দুধ দোয়ানোর জন্য এখানে চাই তদ্বিরের গোয়ালা। সুতরাং তৈলতদ্বিরতন্ত্র এখানে একচ্ছত্র। বৃটিশ আমল থেকে। এমনকি সেন-বর্মণ-মুঘল আমল থেকে। এই তৈল-তদ্বিরের পদ্ধতি-প্রণালী এখানে রাজনীতি নামে বিখ্যাত। এ রাষ্ট্রের রাজনীতি আদতে তাই একদিকে জমিদারি-নীতি, অন্যদিকে চামচা-নীতি। এখানে রাজনীতি মানে স্রেফ রাজতন্ত্র। এখানে রাজনৈতিক দল মানে তাই জমিদারের লাঠিয়াল-বাহিনী। এখানে রাজনৈতিক দল মানে এখানে জ্ঞাতি-সম্পর্ক, বংশ-পরম্পরা। সর্বোপরি, এখানে রাষ্ট্র মানে প্রধানমন্ত্রীর জমিদারি, কিংবা রাষ্ট্রপতির বাদশাহী।

জমিদারি-বাদশাহী মানেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। আজকে আমি বাদশাহ-জমিদার, কালকে আমি পথের মানুষের মতো চলাফেরা করব – এ হতেই পারে না। সুতরাং বাদশাহ মানে চিরকালের বাদশাহ। জমিদার মানে চিরকালের জমিদার। রাজার ছেলে রাজা। ছেলে না থাকলে রাজার মেয়ে রাজা। মেয়ে না থাকলে রাজার বউ রাজা। বউও না থাকলে রাজার ভাই রাজা। সুতরাং যেকোনো উসিলাতেই হোক, জমিদারি চিরকাল থাকতে হবে আমার বংশের হাতে। যেকোনো উসিলাতেই হোক, আমার রাজত্বের শত্রুদের আমূল বিনাশ সাধন আমার 'রাজনৈতিক' কর্তব্য, 'রাষ্ট্রীয়' কর্মসূচি, 'ইতিহাসের দায়' হয়ে উঠতে বাধ্য। এই কর্তব্য-কর্মসূচী-দায় জেএমবি থেকে জনযুদ্ধ পর্যন্ত আমাদের যাবতীয় ডান-বাম রাজনৈতিক দলের একমাত্র রাজনৈতিক ইশতেহার। এই ইশতেহারের বাস্তবায়ন আমরা ঘটতে দেখছি গত ৪০ বছর ধরে।

২৫.২ রাজনীতির রাক্ষসতন্ত্র

এ উসিলায় সে উসিলায় রাষ্ট্র জিনিসটাকে রাক্ষস বানিয়ে তোলা কঠিন কাজ নয়। কঠিন হলো রাক্ষসটাকে পরে সামলানো। এ রাক্ষস শুধু খায় যে! তাজা মানুষের রক্ত খায়, মাংশ খায়। নইলে তার নেশা হয় না। মন ভালো লাগে না। বিষণ্ণ লাগে। পরে যখন এই রাক্ষস-স্রষ্টা ফ্রাংকেনস্টাইন মহোদয় বলবেন, 'ঠিক আছে ভাই রাক্ষস, এবার থামো', রাষ্ট্র-রাক্ষস তখন বলবেন, 'ঠিক আছে ভাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, আসুন এবার আপনাকে খাই। আপনি আমার খাওয়ার পথের বাধা হয়ে উঠেছেন।'

আমাদের রূপকথায় 'রাক্ষস'-এর পরিচয় কী? ও হচ্ছে অসীম ক্ষমতাধর। ওর হাঁ, দাঁত, নখ, পেশিশক্তি মারাত্মক – মানে মেরে ফেলার মতো। এক এক গ্রাসে সে দশ মণ মিষ্টি খায়। তাজা গোটা মানুষকে সে টপাটপ গিলে ফেল এক এক লোকমায়। রাজ্য সাফ হয়ে যায়। রাজ্যে হাটবাজার বন্ধ হয়ে যায়। চলাচল উচ্ছনে যায়। দুর্ভিক্ষ

নেমে আসে। নেমে আসে ভিক্ষার অভাব। রাত্রে কুকুর কাঁদে। বিড়ালেরও অন্ন জোটে না। এক এক রাত নেমে আসে আর এক এক করে শত শত লোক হাওয়া হয়ে যায়। যায় রাক্ষসের পেটে। এক-দুই রাক্ষস বা রাক্ষসীই লোপাট করে ফেলতে পারে আস্ত এক-দুইটা রাজ্যপাট। ভয়ংকর আক্রমণাত্মক সে। এবং ছলনাময়, অথবা ছলনাময়ী সে। বহুরূপ ধারণ করতে পারে। রাজা থাকে নামে মাত্র। রাক্ষস থাকে তার আড়ালে-আশ্রয়ে। দিনে ভালো মানুষের রূপটি ধরে ঘুরে বেড়ায়। রাতে দেখা যায় তার আসল চেহারা। রাক্ষসের চেহারা। সে চেহারা যে দেখে সে আর ফিরে আসে না। রাক্ষসের খাদ্য হয় সে। রাক্ষসের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য মানুষ। তাজা মানুষ।

কী বস্তু এই রাক্ষস? কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাতন্ত্রের চলমান রাষ্ট্রীয় টিউটোরিয়ালটি ইউটিউবে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে পারলে রাক্ষস কথাটার উপযুক্ত অর্থ-ইশারা ধরতে পারা যাবে (ইউটিউব = আপনার নিজস্ব পিকচার টিউব)। সাহায্য করবেন কলিম খান। সাহায্য করবে তাঁর আবিষ্কৃত 'ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি'। (দ্রষ্টব্য কলিম খান, ২০০১; এবং কলিম খান, ১৯৯৫।) কলিম খানের অন্তর্দৃষ্টি এবং বুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয়ের সুপ্রাচীন পদ্ধতি-প্রণালীর সাহায্যে নির্ধারণ করা যায় শব্দের প্রকৃত ও বিস্তৃততর সামাজিক অর্থ।

কলিম খান দেখিয়েছেন, পুরাণ ও রূপকথা প্রলাপমাত্র নয়। রাবণের মাথা ১০টা – এ কথা যেমন আদতে আজগুবি নয়, এ যেমন আসলে রাবণ-যন্ত্রের ১০টা দশমুখী ডিপার্টমেন্ট; আজকের রাষ্ট্রযন্ত্রের যেমন হাজারটা চোখ, আইনের হাত যেমন কবর পর্যন্ত পৌঁছায়; – সেরকমই – উদ্ভট কিছু নয় এই রাক্ষস বস্তুটিও। মানুষের মুখের প্রকৃত/প্রাকৃতিক ভাষাকে সুসংবদ্ধ প্রণালীতে সংস্কার করে প্রাচীন ভাষা-তাত্ত্বিকেরা যে সংস্কৃত ভাষাটা বানালেন তার লক্ষ্য ছিল সমজাতীয় প্রাকৃতিক-সামাজিক-মহাজাগতিক-দার্শনিক ধারণা ও ক্রিয়ারাজিকে একই শব্দে প্রকাশ করতে পারা। তাতে করে কম শব্দে বেশি কথা বলা যায়। সাধারণ সত্যকে সহজে উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং পক্ষী মানে যেখানে দুটো পক্ষ আছে। পাখি অথবা মামলার বাদী -বিবাদী পক্ষ। অজ মানে যার জন্ম নাই। আদিতম অজ পাড়া-গাঁ থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত। বেদ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত এবং রাক্ষস তাহলে আর আজগুবি-অবান্তর বিষয় থাকে না। রাক্ষসের বিস্তার এবং রাক্ষসকে মোকাবেলার করার প্রসঙ্গ হয় ওঠে আমাদের ভারতবর্ষীয় অঞ্চলের কৌম, কওমি এবং রাজতান্ত্রিক ইতিহাস।

পুরাণের শ্লোক উদ্ধার করে কলিম দেখিয়েছেন, রাক্ষস আর কিছু না – সমাজের উদ্বৃত্ত ধনসম্পদ রক্ষা করার দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরাই পরে, আস্তে-ধীরে রক্ষস্ -এ পরিণত হয়, চুপিসারে মেরে দিতে থাকে জনগণের যৌথ ধন, সমাজের সমূহ সম্পদ। রক্ষকের ভক্ষকে পরিণত হওয়ার গল্প তার মানে পৌরাণিক, সুপ্রাচীন। প্রথমে

মুখের শ্লোকে, শ্রুতিধরের মাধ্যমে, পরে লিখিত পুঁথিতে আশ্রয় পায় এই গল্প। রচিত হয় রূপকথা। সে কথায় সামাজিক-ঐতিহাসিক রূপ প্রকাশিত হয় বৈকি! রাজ্য-রাষ্ট্রের অস্তিত্বই আক্রান্ত হয় রাক্ষসের দন্তনখরে। প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকে রাক্ষসতন্ত্র। রাক্ষস-কবলিত হয়ে পড়ে রাষ্ট্র খোদ। রাষ্ট্র-রাক্ষসের দেখা পেতে শুরু করি আমরা। প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে মানুষ। রাষ্ট্র-রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচার লড়াইয়ের ইতিহাসই রূপকথার অন্যতম রূপ বটে। আজকের রাষ্ট্র-বাস্তবতায় পদ্মাসেতু-তহবিলের কয়েক শ কোটি টাকা এক গ্রাসে গিলে ফেলার ঘটনা যদি দেখেন, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব অনুসারে এক ২০১৩ সালের ৩৬৫ দিনের ভেতরে ৫০০-র বেশি তাজা মানুষের খুন হয়ে যাওয়ার ঘটনা যদি খেয়াল করেন তাহলে বুঝবেন 'রাক্ষস' নামের আজব এ বস্তুটি আসলে কী বস্তু। এ হলো কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র-ক্ষমতা-প্রণালী—তার হাজারটা ধাতব-বন্দুকীয় নখদন্ত-হুংকার।

বতিচেল্লি বুয়োনারঁতি ভিঞ্চি রুশো রাফায়েল ভলতেয়ার ভিক্তর হুগোদের মানুষ আকাশ থেকে পড়েন নি। রাজা-চার্চ-রাষ্ট্রের সর্বশক্তিমান কর্তৃত্বতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছে মানুষকে। চিন্তা-সমালোচনা-বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতার উদ্ধত-অবাধ্য -সার্বভৌম চিন্তাধারা স্বর্গ থেকে আসে নি। রাষ্ট্র-রাক্ষসের হাঁ থেকে ব্যক্তিমানুষের রক্ষাকবচ অর্জনের পৌরাণিক-আধুনিক অজস্র লড়াই ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছে মনুষ্য-স্বাধীনতার গাথা। সামন্ত-জমিদারী-রাজারাণীরাজপুত্রদের রাষ্ট্র -রাজ্যপাটের ঐশ্বরিক এবং সর্বগ্রাসী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-মানুষকে রক্ষা করার উপায়-পদ্ধতি আবিষ্কারের এবং প্রতিষ্ঠার লড়াইই মনুষ্য রেনেসাঁর পুরাণ রচনা করেছে। 'জেনারেল উইল'-এর নামে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক মহারাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের নামাবলীর আলখাল্লার আড়ালে হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে ক্ষুদ্র ব্যক্তি-মানুষ এবং তার চিন্তা-বিবেক-প্রকাশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে কীভাবে সুরক্ষিত-সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা যায় সেই চিন্তাই ছিল ফরাসী বিপ্লবের 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র চিন্তাধারা। রাষ্ট্রকে কেমন করে সংকীর্ণ 'রাষ্ট্রকর্মের সীমা'র মধ্যে আটকে রাখা যায় – যেন সে টপাটপ গিলে ফেলতে না পারে তাজা তাজা আস্ত প্রাণ – তার সাধনাই ছিল ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের সাধনা। সেই সাধনার পথ ধরেই আজকের গণতন্ত্রের বিকাশ।

আজকের ক্যাসিনো-কর্পোরেট-ক্যাপাটালিজমের রাষ্ট্র-রাক্ষসীয় কর্তৃত্বতন্ত্র নিজ অস্তিত্ব রক্ষার্থে ফ্যাসিবাদে ফিরে যেতেও আটকাবে না। সে লক্ষণ ফুটে উঠতে শুরু করেছে। এ শুধু বাংলাদেশের মামলা নয়। যুক্তরাষ্ট্রের 'টিপার্টি-আন্দোলনে'র মাথাচাড়া দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন নোম চমস্কি। জার্মান ফ্যাসিবাদের বিপুল জনসমর্থিত কার্যক্রম তাঁর স্মৃতিতে অম্লান। এ বিপদ আমাদেরকে বুঝতে হবে। আমাদেরকে ভাবতেই হবে: রাষ্ট্র তো যুদ্ধাপরাধ সামলাবে, রাষ্ট্র সামলাবে কে?

২৫.৩ রাষ্ট্রপ্রণালীর সপক্ষে গণবৈধতার দৃশ্যমান অভাবের বিপদ

নবতর রাষ্ট্রপ্রণালীতে গণতন্ত্র, জনপ্রতিনিধি-নির্বাচন, মিডিয়ার স্বাধীনতা, বিরোধী দলের এবং মতের সুরক্ষা ইত্যাদি ধারণা নতুন করে সংজ্ঞায়িত হতে শুরু করেছে বাংলাদেশে। পাঁচ বছরে এক দিন জনগনের ভোট দেওয়ার নামে-মাত্র যে অধিকার-টুকু অর্জন করতেই আমাদেরকে স্বাধীন বাংলাদেশের বলতে গেলে অর্ধেকটা সময় খরচ করতে হয়েছে, খরচ করতে হয়েছে শত-হাজার মানুষের জীবন, সেই ভোটাধিকারটুকু পর্যন্ত বর্তমান শাসকশ্রেণীর জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে – অসহনীয় মাত্রার বিপজ্জনক। সিটি কর্পোরেশনসমূহের নির্বাচনগুলোতে যে শাসক-জোট লজ্জাজনকভাবে হেরেছেন সেই শাসকজোটই বিনাভোটে-বিনাভোটারে নিজেদের রাষ্ট্রক্ষমতা নবায়ন করেছেন 'সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা' অব্যাহত রাখার নামে, 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর' করার প্রক্রিয়া কায়েম করার নামে। এ বড় বিপজ্জনক ঘটনা। সংবিধান আর গণতন্ত্রের এ সত্যি নতুন সংজ্ঞা – যদিও নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো নতুন এ নয়। এই দুর্ভাগা দেশে এর আগে সামরিক শাসকদের বুটের নিচে সংবিধান স্থগিত করার মধ্য দিয়ে সূচিত হয়েছিল তথাকথিত 'বহুদলীয় গণতন্ত্র'। যেকোনো মূল্যে সংবিধান সমুন্নত রাখার সাংবিধানিক শপথ গ্রহণকারী প্রধান বিচারপতি – সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি – বন্দুকের নলের সম্ভাব্য অনলের কথা চিন্তা করে 'আইনত' হয়ে উঠেছিলেন 'প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক'। সেই দুঃসময় পার হয়ে যায় নি দেখা যাচ্ছে। জমিদারির গণতন্ত্র ওরফে রাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আর্থরাজনৈতিক কড়ি-বরগা-রূপকাঠামোকে অক্ষুণ্ন রেখে, সুরক্ষিত রেখে, এমনকি সেটিকে আদৌ কোনো আলোচ্য হিসেবে গণ্য না করার গ্যারান্টি অব্যাহত রেখে এগিয়ে গেলে পশ্চাদমুখী অগ্রযাত্রাই নিশ্চিত হয়।

জনগণ ভোট দিতে পারেন নি; মোটেও তাঁদের ভোটের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন নি মহাক্ষমতাধর মহাজোট-বাহাদুর – এগুলো বড় কথা নয়। জনগণের ভোটে কারই বা কী এসেছে গেছে কবে? যাঁদের কালো টাকা আছে, কালো ক্ষমতা আছে, চিরকাল তাঁরাই জনগণের ঘাড়ে চেপে বসা 'জনপ্রতিনিধি' হিসেবে 'নির্বাচিত' ঘোষিত হয়েছেন। আজ যিনি শাদা-পার্টি কালই তিনি গাধা-পার্টি থেকে মনোনয়ন পেতেও তো জনগণের ভোট লাগে নি কোনো দিন। ভোট-ভোট-গণতন্ত্র যেটা আছে সেটা 'রাবার-স্ট্যাম্প-গণতন্ত্র' ছাড়া কিইবা এমন! মহাজোটের যেটা সাম্প্রতিক বৈশিষ্ট্য সেটা হলো: এই রাবার-স্ট্যাম্পটাও তাঁদের আর লাগছে না। আঞ্চলিক-আন্তর্জাতিক পরাশক্তি, জাতিসংঘ, সেনাবাহিনী ও মিডিয়াকে ম্যানেজ করাটাই ক্ষমতায় থাকার আসল যোগ্যতা ছিল এবং আছে – ভোট সেই নেপথ্য ম্যানেজ-

মেন্টের প্রকাশ্য প্রদর্শনী মাত্র। ঘটনা হলো: এসব ম্যানেজমেন্টে আওয়ামী লীগের মহাজোট একশতে নিরানব্বই-ই পেয়েছেন বলতে গেলে। সুতরাং তাঁরা ক্ষমতায় থেকে যেতে পেরেছেন – বিদ্যমান পাওয়ার-পলিটিক্সের সর্বদলীয় নীতিবোধ মোতাবেক এতে কোনো আপত্তি করার সুযোগ দেখি না। বাকি থাকে প্রকাশ্য ভোট-প্রদর্শনীটুকু। এতদিনকার সেই পঞ্চবার্ষিক প্রদর্শনীর বিকল্প হিসেবে নতুন যে এগ্‌জিবিশন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রায় সর্বদলীয়ভাবে (যথা বিরোধীপক্ষ কর্তৃক স্কুলঘর পোড়ানো, প্রিসাইডিং অফিসারকে মেরে ফেলা, হিন্দুদেরকে হিন্দুস্তানে হিজরত করার সশস্ত্র-সরক্ত-সধর্ষণ উপদেশ প্রকাশ করা ইত্যাদি প্রভৃতির বিপরীতে একক পুলিশ-বাহিনী আর বিডিআর-বিজিবি-র‍্যাব-সমৃদ্ধ যৌথবাহিনীর বুলেট-বন্দুক-বল-প্রয়োগের ব্যাপক এগ্‌জিবিশন), সেটাই বা কী এমন খারাপ হয়েছে!

হ্যাঁ, এগুলো বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে: সবাই মিলে ভোট দেওয়ার মধ্য দিয়ে যে একটা জনসম্মতি/গণবৈধতা অর্জিত হয় সেই জিনিসটাই খোয়া গেছে সবার অলক্ষ্যে। এতেই হয়েছে বাংলাদেশের আসল ক্ষতিটা। গণতন্ত্রের মঞ্চ-মাইক-মুরুব্বি-মুখপাত্র-মিডিয়াবৃন্দ এই জনসম্মতি/গণবৈধতার কথা আলাদা করে এলান করেন নাই কোনো দিন – সত্য, কিন্তু উক্ত জনসম্মতি নামক বস্তুটা কমবেশি ছিল বলেই আমাদের বিকলাঙ্গ গণতন্ত্রকেও দেখতে সুন্দর লাগত। এই সৌন্দর্য ছিল তার প্রকৃত শক্তি। সেই শক্তির বিকল্প হিসেবে কোনো এক-এগারো-এমার্জেন্সি কিংবা সেনাসমর্থিত সরকার কিংবা সামরিক শাসন জারির দরকার যে পড়ে নি সেটাও মহাজোট-সরকারের বিশেষ কৃতিত্ব বটে। এবার সেই শক্তিটাকে সরিয়ে তার জায়গায় বসেছে আইন-আদালত-সংবিধান আর অতিসশস্ত্র পুলিশ ফোর্স। পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে এই যে হাত থাকতে মুখে কথা হবে না। বন্দুক থাকতে লাঠালাঠি কীসের! দেশে থাকবেন সন্ত্রাসী, আর থাকবেন পুলিশ – অন্য কেউ থাকবেন না। অবস্থা এমন যে হয় তুমি সন্ত্রাসী নয় তুমি পুলিশ। হয় তুমি আমেরিকার পক্ষে, নয় তুমি আল কায়দার পক্ষে। মাঝখানে অন্য কোনো কোনো কায়দা থাকবে না। সক্কলেই থাকবেন বেকায়দায়। পাবলিকের স্পেস বলে কিছু থাকবে না। কারণ দেশে এখন লাগাতার জরুরি পরিস্থিতি। দেশের এই দুর্দিনে এখনও যারা বুদ্ধি-বিবেক হারিয়ে ফেলে নি, বরং নীতিবোধের অনাকাঙ্ক্ষিত আবদারের পাল্লায় পড়ে 'হয়-আমি-নয়-তুমি'র এপক্ষ-ওপক্ষ কোনো পক্ষকেই প্রাণ খুলে সমর্থন করতে পারছেন না, তারা সব গোল্লায় যাক! তারা সব ছদ্মবেশী দালাল! তারা সব চরম সুবিধাবাদী! মোনাফেক! এরাই আসল কালপ্রিট! এই হচ্ছে সুশীল-সামরিক-গণতন্ত্রের জন্য নিবেদিতপ্রাণ সর্বপক্ষের সর্বদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক শুভবোধ।

চাইলে আপনি একে যুদ্ধ-গণতন্ত্র, নামান্তরে জঙ্গি-গণতন্ত্র আকারেও উপলব্ধি

করতে পারেন। (জঙ্গি—>জঙ্গ—>যুদ্ধ—>সমর—>সামরিক। এই গণতন্ত্রের এক পক্ষ সামরিক, তো অপর পক্ষ জঙ্গি। পার্থক্য বলতে সামরিকতা মানে সরকারী বন্দুক, আর জঙ্গিবাদ মানে বেসরকারী বোমাবাজি। বেসরকারী বলতে সরকার হিসেবে অচিরেই আবির্ভূত হতে ইচ্ছুক যাঁরা।) আন্তর্জাতিক উদাহরণস্বরূপ এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রও তো এক প্রকার সদাসামরিক-গণতন্ত্রই বটে! কোথাও না কোথাও যুদ্ধ বাধানো ছাড়া তা বাঁচতে পারে না। এই যুক্তিপ্রণালীতে মার্কিন কর্পোরেট অর্থনীতি আসলে সদা-যুদ্ধ-অর্থনীতি। আগে বাড়ে বাণিজ্যজাহাজ, পিছে তাড়ে রণতরী। আগে আগে বাণিজ্যদূত, পিছে পিছে রাষ্ট্রদূত। এই মডেলে রাষ্ট্র-বাণিজ্য মানে যুদ্ধ-বাণিজ্য।

রাষ্ট্র-বাণিজ্যের যুদ্ধ-জঙ্গনামাসমৃদ্ধ এই প্রকার সদাসামরিক-গণতন্ত্রের সদাসঙ্গী আমাদের নিওলিবারাল (ওরফে কাছাখোলা) বণিক-কর্পোরেট-মিডিয়া-সঙ্ঘের 'লাব্বায়েক' আওয়াজও কি গরহাজির আছে? আক্কেলজ্ঞানওয়ালাদের জন্য অবশ্য নবসংজ্ঞায়িত মিডিয়া-স্বাধীনতার ইশারাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মিডিয়ার স্বাধীনতা তো থাকবেই। আমরা মিডিয়াকে সর্বোচ্চ স্বাধীনতা দিয়েছি। কিন্তু তাই বলে কি প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং টেলিভিশনের টকশো-স্বাধীনতার বাড়াবাড়ি নিয়ে কথা বলতে পারবেন না? তাঁরও তো বাকস্বাধীনতা আছে! সুতরাং দুই মিনিটের মধ্যে আমরা শাপলা-সমাবেশ নিয়ে বাড়াবাড়িকারী দুই টিভি-চ্যানেল সিলগালা করে দিতে পারি। আমার দেশ ইনকিলাবের বাড়াবাড়ি-করা ছাপাখানা সিলগালা করে দিতে পারি। এর জন্য 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' লাগে না আর। আমরা তো কোনো মিডিয়াকে 'নিষিদ্ধ' ঘোষণা করি নি। এই সরকার গণতান্ত্রিক সরকার। দেশের মঙ্গলের জন্য যা কিছু দরকার করবে এই সরকার। দরকার হলে সর্বোচ্চ কঠোরতা প্রদর্শন করবেন তাঁরা। মদদ জোগাবেন আমার দেশ। দেশের ক্রান্তিকালে কাবাঘরের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মের আলোকচিত্র নিয়ে ইয়ার্কি করতে পিছপা হবেন কেন তাঁরা? তাঁদের কি দেশপ্রেম নাই? নইলে বাংলাদেশ যে ভারত হয়ে যাবে! সরকারকে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করতে সাহায্য করবেন ইনকিলাব। ফটোশপ-জালিয়াতি করে ডাহা মিথ্যা 'গোপন সরকারি নথিপত্র' ছেপে সাতক্ষীরায় ইন্ডিয়ান আর্মি ঢুকিয়েই ছাড়বেন তাঁরা! নইলে তাঁদের ভারতবিদ্বেষী দেশপ্রেমের প্রেস্টিজ থাকে না। সুতরাং দেশের এই কঠিন অবস্থা মোকাবেলায় সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য কঠোরতম মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কঠোরতার আশ্রয় নেবেন তাঁরা। এই ধরণের পরাবাস্তব পরিস্থিতিতে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে সর্বসম্মত স্বৈরতন্ত্রের নবতর শুভবোধ।

এ স্বৈরতন্ত্র অবশ্যই সাংবিধানিক। স্বয়ং সুপ্রিম কোর্ট তার পরোক্ষ প্রমাণ! এ স্বৈরতন্ত্র আলবৎ গণতান্ত্রিক। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষশিবিরের গণইচ্ছার প্রতিফলনস্বরূপ

শাহবাগের 'গণজাগরণ মঞ্চ' তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ! (সর্বজনের শাহবাগ আর পঞ্চ ম-এর 'গণজাগরণ মঞ্চ'-কমিটি যে একদমই আলাদা পদার্থ সে কথা বলেছি অন্যত্র – ক-দিন আগে অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সাংস্কৃতিক উৎসবে – 'শাহবাগের স্বাধীনতাই শাহবাগের পথ' নামের রচনায়। আপাতত শুধু মনে রাখলেই চলবে যে সর্বজনের শাহবাগ মানে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সর্বজনীন ইনসাফ-অনুভূতি; আর 'পঞ্চ ম' বলতে মঞ্চ-মাইক-মিডিয়া-মুরুব্বি-মুখপাত্র।) এখনকার মতো আখেরি কথা হচ্ছে: এ স্বৈরতন্ত্র উজ্জীবিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়। যে ভোটাভুটি রাজাকার-আলবদর তথা বিএনপি-জামাতকে জয়ী করবে সেই ভোটাভুটি দিয়ে আমরা কী করব! অতএব আমরা একটা সদাপ্রস্তুত পুলিশী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হয়ে উঠছি। মহা-সরকার তার কাণ্ডারি, মশুপাকানো সরকারবিরোধীরা তার সুপ্রতিজ্ঞ সহায়তাকারী। বিএনপি -জামাতের আত্মঘাতী রণনীতিই সরকারকে মহা-সরকার হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে, উসিলা-অসিয়ত সরবরাহ করেছে। তাঁরা মনে রাখেন নি: জামাত-জেএমবি-জনযুদ্ধ-জঙ্গনামা আছে বলেই চিতা-কোবরা-র‍্যাব জাতীয় 'কিলিং-স্কোয়াড' (হিউম্যান রাইটস ওয়াচ) ওরফে যমদূত-বাহিনীর ('ওপরে রব নিচে র‍্যাব' – হুমায়ূন আহমেদ) বৈধতা আছে জনমনে। কিন্তু ওপরে যে আপামর জন-সম্মতি-গণবৈধতার কথা বললাম – আওয়ামী মহাজোটের বিনাভোট-বিনাভোটার নির্বাচন তার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। খোদ রাষ্ট্রের তলা থেকে সরে যেতে শুরু করেছে বিনির্মিত বৈধতার বালুরাশি। যে বিরাট জনগোষ্ঠী চেয়েছেন ছলে-বলে-কৌশলে আওয়ামী লীগের রামরাজত্ব রাবণ-বধ করুক তাঁরা তো মহাখুশি! কিন্তু যে বিপুল জনগোষ্ঠী মাত্র ক-মাস আগের ভোটার-ভর্তি সিটি-নির্বাচনগুলোতে এই মহা-সরকারের বিরুদ্ধে ব্যালট-জাজমেন্ট দিয়েছেন তাঁরা যাবেন কোথায়? তাঁদের অনুভূতি আহত হয়েছে। এই কোটি কোটি মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। চোদ্দ সালের চোদ্দ ধারার রাষ্ট্র-সরকার-প্রণালীতে এঁদের জায়গা কোথায়? এঁরা পরিণত হয়েছেন উন্মূল ইলেকটোরেটে। এই উন্মূলতা যে মহাবিপদের বার্তা টুকে রাখছে যুদ্ধ-জমানার দেয়ালে দেয়ালে আমরা তা পাঠ করতে সক্ষম নই বলেই তা কিন্তু অদৃশ্য হয়ে যাবে না। বিদ্যমান রাষ্ট্রপ্রণালীর দৃশ্যমান হতে পারার মতো জনসম্মতি/গণবৈধতা যদি উপায়হীন উন্মূলতার দিকে ধাবিত হতে থাকে আমাদের আর যাওয়ার জায়গা থাকবে না। সবার আগে উচ্ছন্নে যাবে বাংলাদেশ। নতুন করে ব্যর্থ হবে আমাদের ইতিহাসের সবচাইতে সুন্দর ঘটনাটা – একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।

রচনা: জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৪। প্রকাশ: দৈনিক বণিক বার্তা: ১১ই জানুয়ারি, ১৮ই জানুয়ারি ২০১৪, ১লা ফেব্রুয়ারি ২০১৪; দৈনিক সোনার দেশ: ১১ই জানুয়ারি, ১৮ই জানুয়ারি ২০১৪, ১লা ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

পঞ্চম ভাগ

মতাদর্শ নয়— পথ

স্বাধীনতা সহিষ্ণুতা সংগঠন

ব্লগার আসিফ মহিউদ্দিন

২৬.১ স্বাধীনতা দায়িত্বশীলতা প্রভুত্ব

মানুষ স্বাধীন প্রাণী হিসেবে জন্মেছে। স্বাধীনতা তার প্রকৃতিপ্রাপ্ত, অন্তর্জাত ও সহজাত, এবং আল্লাহপ্রদত্ত প্রজাতি-স্বভাব। প্রকৃতি-প্রবৃত্তি। মনুষ্যপ্রকৃতি এমন একটা সত্তা যা অনুসন্ধিৎসু, চিন্তাশীল, নিরীক্ষাপ্রবণ, সৃজনশীল, আত্মপ্রকাশ-পরায়ণ এবং যথাসাধ্য-সদাস্বাধীন একটা প্রাণসত্তা। স্বাধীনতা মানে কিন্তু স্রেফ জাতীয় পতাকা না। স্বাধীনতা মানে শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা মানে ব্যক্তির দৈহিক-আত্মিক স্বাধীনতা, নির্বিশেষে সকল মানুষের আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানে শুধু নিজের স্বাধীনতা নয়। অন্যেরও স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানে শুধু আমার মত প্রকাশের স্বাধীনতা নয়। ভিন্নমতেরও স্বাধীনতা। ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া স্বাধীনতা কথাটাই অর্থহীন। স্বাধীনতা মানে তাই সহিষ্ণুতাও বটে। পরমত-সহিষ্ণুতা। পরাচার-সহিষ্ণুতা। পরধর্ম-সহিষ্ণুতা। পরভাষা-সহিষ্ণুতা। পরজাতি-সহিষ্ণুতা।

অন্যের মতের প্রতি যিনি সহিষ্ণু নন তিনি নিজের স্বাধীনতার মূল্য বোঝেন না। তিনি বোঝেন না: অপরের স্বাধীনতাই আমার স্বাধীনতার গ্যারান্টি। অন্যের স্বাধীনতা

ক্ষুণ্ন হলে আমার স্বাধীনতাও বিপন্ন হবে। অন্যেরা প্রত্যেকেই যদি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ অর্থ উপলব্ধি ও আমল না করে তাহলে তাঁরা আমার স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তাও বুঝবে না। আক্রান্ত হবে আমার স্বাধীনতা।

দাস দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকলে স্বাধীনতা মূল্যহীন। অপরের শরীর থেকে শুষে নেওয়া শ্রমে ছাড়া যদি আমার গ্রাসাচ্ছাদনই সম্ভব না হয়, স্বাধীনতা তাহলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বিশেষাধিকার মাত্র। বিলাসিতা মাত্র। গুটিকয়ের প্রিভিলেজ-প্রথা মাত্র। ক্রীতদাস-ভূমিদাসদের যুগ পার হয়ে এখনও যদি মজুরিদাসত্বই করতে হয় মানুষকে, তাহলে বাস্তবে তাঁর কোনো স্বাধীনতাই নাই। স্বাধীনতা তাঁর জন্য মিষ্টি ও মূল্যহীন একটি ব্যঙ্গশব্দ-মাত্র। স্বাধীনতা মানে তাই শ্রমের স্বাধীনতা, অন্ন-বস্ত্র -বাসস্থান- শিক্ষা-চিকিৎসা ইত্যাদি সবকিছুর পূর্ণ অধিকার। স্বাধীনতা তাই বঞ্চনা বৈষম্য থেকে স্থায়ী মুক্তির সামাজিক বন্দোবস্তও বটে।

মানুষ তাই বলে স্রেফ উদরসর্বস্ব প্রাণী নয়। শুধু খাদ্যে বাঁচে না আশরাফুল মখলুকাত। সে বাঁচে তাঁর চিন্তায়-অনুধ্যানে-অনুসন্ধানে। সৃজনের নিত্যপ্রকাশে। মানুষ শুধু প্রজননে-পরিপাকে মানুষ নয়। আত্মায়ও মানুষ। স্বাধীনতা মানুষের আত্মার জ্বালানী। স্বাধীনতার আগুনে নফসের জ্বালাতনকে জ্বালাতে-জ্বালাতে পোড়াতে-পোড়াতে তবেই মানুষ হয়ে উঠতে থাকে মানুষ। পরিশুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে তাঁর আত্মা, আর আত্মবিকাশ। স্বাধীনতার সাধনা মানে তাই পবিত্র হয়ে উঠতে থাকার জীবনভর উপাসনা।

স্বাধীনতা মানে যাচ্ছেতাই করার প্রশ্নাতীত লাইসেন্স নয়। বরং 'স্বাধীন' শব্দটার ভেতরেই আছে 'স্ব-অধীনতা'র ধারণা। নিজেকে নিজে পরিচালনা করতে পারার ধারণা। সায়ত্বশাসিত-স্বপরিচালিত হওয়ার সক্ষমতার ধারণা। যিনি নিজের যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারেন না বলে আম্মু-আব্বুকে ডাকেন, হুজুর-মুরুব্বি-মতমোড়লকে ডাকেন, তিনি কী করে স্বাধীন মানুষ হবেন? স্বাধীনতা তাই নিজের দায়িত্ব নিজে নেওয়া। কিন্তু ব্যক্তি অসম্পূর্ণ। এবং সেজন্যেই তাঁর নিজেকে সতত-বিকশিত করে তোলার জীবনভর সাধনা আরাধনা ইবাদত। অসম্পূর্ণ বলেই আবার মানুষ পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল বটে। এই নির্ভরশীলতাই মানুষকে অন্যের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে।

স্বাধীনতা মানে তাই দায়িত্বশীলতাও। স্বাধীন ব্যক্তি-মানুষ তিনি যিনি তাঁর নিজের-পরিবারের-কওমের-কমিউনিটির-মাপ্রকৃতির সমস্যা-সম্ভাবনা দায়িত্ব নিয়ে বিচলিত ও কর্মতৎপর মানুষ। এই ব্যাপারে তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না। সমাজের শুভ-মঙ্গল-কল্যাণের প্রতি তিনি আত্মপ্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সমাজের সমস্যাকে তিনি ব্যক্তিগত সমস্যা মনে করেন। সমাজের আনন্দকে তিনি নিজের আনন্দ

হিসেবে ভাগাভাগি করে নেন।

নিজেকে শেয়ার না করলে, নিজের অনুভূতি-চিন্তা-উপলব্ধি অন্যের সাথে ভাগাভাগি করতে না পারলে মনে মনে মারা যায় মানুষ। স্বাধীনতার সদানন্দ মাঠে মারা যায়। সুতরাং শুধু পরনির্ভরশীলতার কারণেই নয়, পরস্পর-শেয়ারিঙের আকুলতাজনিত সহজাত মনুষ্য-প্রবৃত্তির জন্যেও এক মানুষ অন্য মানুষকে খোঁজে। একা থেকেও এক সাথে থাকে। অন্যের প্রতি আগ্রহী হয়। অন্যের প্রতি দায়বদ্ধ হয়। নিজের প্রতি দায়বদ্ধতাই তাকে অন্যের প্রতি দায়বদ্ধ করে। দায়বদ্ধ করে পরিবার ও প্রতিবেশীর প্রতি। কওম ও কমিউনিটির প্রতি। পরম ও প্রতিবেশের প্রতি। স্বাধীনতা-মাত্রই তাই দায়িত্বশীলতা। দায়িত্বশীল হওয়া ছাড়া স্বাধীন হওয়ার উপায় নেই।

পরাধীন মানুষই পারেন পরের প্রতি উদাসীন থাকতে। আত্মরতিতে মগ্ন থাকতে। কেননা নিজের প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা থাকে না পরাধীন লোকের। তিনি তো বাঁচেনই অন্যের অধীনে। অন্যের হুকুমে। অন্যের চিন্তায়। অন্যের ভাবাদর্শে। ফলে হয় তিনি আত্মবদ্ধ হন, নয়তো হন পালবদ্ধ। গা ভাসান গড্ডল-প্রবাহে। ভেঁড়ার পালের একজন হয়ে তিনি সুখী হন। পালের গোদার পথ ভুল হলে তিনিও বিপথী হন। বেপথু হন। কী করে মিশবেন তিনি অপরের সাথে? অপরকে তিনি ভয় করেন। তাঁর কাছে অপর মানেই ভুলের ভয়। ঠকার ভয়। নিজের ভুল নিজে করার সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেন তিনি। তিনি হয়ত ভাবেন না, ভাবলেও বুঝতে চান না বা পারেন না: ভুলহীন পথ মানে আগে থেকে শানবাঁধানো 'নির্ভুল' পথ। অন্যের পথ।

স্বাধীনতা মানে ভুল করারও স্বাধীনতা। ভুল করার ঝুঁকি ছাড়া অনুসন্ধান হয় না। নতুনের পথরেখা আঁকা যায় না। কৌতূহল কমে যেতে থাকে মানুষের। জিজ্ঞাসা আসে না। মানুষ হয়ে উঠতে থাকে মুখস্ত মানুষ। শাসকের-গুরুর-হুজুরের-মুরুব্বির-পুরোহিতের-যাজকের-শিক্ষকের-রাজনীতিকের-সম্রাটের রচিত দীক্ষায়ন-প্রকৌশলের মুখস্ত ম্যানুয়াল অনুসরণ করেন তিনি। মন থাকে জগদ্দল কাদা হয়ে। সেই কাদায় গড়ে ওঠে অন্যের আদল। অপরের প্রতিমা। শাসকের শাস্ত্রধর্ম।

ভুল করার স্বাধীনতা ছাড়া স্বাধীনতা একটা কথা মাত্র। স্বাধীন মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে ভুল করতে-করতে। আছাড় খেতে খেতেই হাঁটতে শেখে মানুষ। ঝুঁকি না নিলে হাঁটা শিখত না মানুষ। পা ভাঙার, কোমর ভাঙার, এমনকি প্রাণসংশয়ের ঝুঁকি। তাঁর শিক্ষা আসে ঠেকে শিখে। ট্রায়াল অ্যান্ড এররের পথেই আসে সৃজনশীলতা। কোনো ট্রেনিঙের মাধ্যমে নয়। আবোল-তাবোল ভাবতে-ভাবতেই চিন্তা করতে শেখে মানুষ। স্বাধীনতাই সৃজনশীলতার ধাত্রী। স্বাধীনতাই মানুষে-মানুষে সত্যিকারের মানবীয় সম্পর্কের – প্রেম-বন্ধুত্ব-আত্মীয়তার – সংহতি

সৃষ্টি করতে পারে।

স্বাধীনতা নামক এই বস্তুটির প্রতি অবহেলা ও অপ্রীতিই মানবসমাজে যত অশান্তির মূল। যত নষ্টের গোড়া। অথচ মানুষ মাত্রেরই মধ্যে স্বাধীনতার বীজানু থাকে। মানুষের ভাষার মধ্যেই থাকে সৃজনশীলতার সক্ষমতা। তাছাড়া মানুষ অন্তহীন কথা বলে যেতে পারত না। অদ্বিত-অনন্ত-আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা করতে পারত না। তাঁর নিজেরই ভেতরে আছে পরমের নূর। সদা-পবিত্র আলো। মানুষের অন্তর্জাত এই স্বাধীনতাবোধকে গলা টিপে ধরে কিছু কিছু মানুষ। শাসক-মানুষ।

আজকের বাংলাদেশে প্রকট হয়ে উঠেছে শাসকদের পরস্পরের গলা টিপে ধরার এই রাজনীতি। রগকাটা-গলাকাটা-গুলিবর্ষণের শাসনপ্রণালী। অথচ আল্লাহর রাজত্বে (অর্থাৎ, ভূপ্রকৃতিতে ও প্রাণপ্রকৃতিতে) 'শাসন'-এর কোনো ধারণাই নাই। অরণ্যে-পাহাড়ে-সাগরে কেউ কারো শাসক নয়। মহাকাশে গ্রহ-নক্ষত্র কেউ কারো প্রভু নয়। আল্লাহর রাজত্বে সকলে চলে আল্লাহর নিয়মে। সেই নিয়ম অনন্ত বৈচিত্র্যের ও স্ব-অধীনতার। পরস্পর-সহযোগিতা আর স্বাতন্ত্র্যের।

তারপরও, কিছু-কিছু মানুষ হয়ে ওঠেন প্রভু-মানুষ। তাঁরা ভুলে যান: জগতের সর্বকর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। আমাদের একমাত্র প্রভু তিনি। তাঁকে অস্বীকার করেই কেবল কিছু মানুষের পক্ষে 'প্রভু' হয়ে ওঠা সম্ভব আমাদের জীবনমৃত্যুর। মঙ্গলা-মঙ্গলের। এঁরা আল্লাহর সর্বময় প্রভুত্বের অংশীদারিত্ব দাবি করে বসে। এঁরা হয়ত খেয়ালই করেন না যে এর ভেতর দিয়ে তাঁরা নিজেরাই হয়ে উঠছেন আল্লাহবিরোধী। প্রকৃতির নিয়মবিরোধী। আল্লাহপ্রদত্ত মনুষ্য-স্বাধীনতার বিরোধী।

২৬.২ সর্বপ্রকার স্বাধীনতাবিরোধীদের তাণ্ডব

সর্বপ্রকার স্বাধীনতাবিরোধীদের তাণ্ডবই চলছে আজ বাংলাদেশে। আইন-আদালত-পুলিশ দিয়ে একদল চালাচ্ছেন রাষ্ট্রীয় তাণ্ডব। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে। রাজাকারনিধনের নামে। যেন গুটিকয় লোককে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে রাখলেই স্বর্গ হয়ে যাবে দেশ। সব মুশকিলের আসান হয়ে যাবে। আরেক দল তাণ্ডব চালাচ্ছেন ইট-পাটকেল-বোমা-ককটেল নিয়ে। যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর নামে। যেন যুদ্ধা-পরাধীদের ফাঁসি মানে খোদ আল্লাহ-ইসলাম-রাসুল (সাঃ) এর ফাঁসি। আরেক দল তাণ্ডব চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন নাস্তিক-ব্লগারদের নির্মূল করার নামে। যেন গুটিকয় বাচ্চা ছেলে মহানবী (সাঃ) এর নামে নিন্দা করলেই নবীজীর গায়ে কাদা লেগে যাবে। ইসলাম উচ্ছন্নে চলে যাবে। ইসলামের হেফাজত করার স্বনিয়োজিত দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন এঁরা। উদ্দেশ্য 'নাস্তিক' নামক তাজা মানুষের রক্ত দিয়ে নবীজীর ভাবমর্যাদাকে ধুয়েমুছে পূত-পবিত্র করা। উপায় আইন-আদালত-মৃত্যুদণ্ড। এবং

৩১৩ জনের শাহাদাত-স্কোয়াড। বদরের যুদ্ধের ৩১৩ জন যোদ্ধার কথা মনে পড়ে যায়। যাঁরা মহানবীর সপক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন।

সর্বপ্রকার মাইক-মঞ্চ-মুরুব্বিরা এসবেরই নাম দিয়েছেন রাজনীতি। এই রাজনীতির সর্বশেষ খেলায় বলির পাঁঠা হয়েছেন কয়েক জন ব্লগার। কথাকে কথা দিয়ে মোকাবেলার শক্তি এই রাষ্ট্রের নাই। লেখা দিয়ে লেখাকে মোকাবেলার শক্তি দেখছি প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ 'আল্লামা'দেরও নাই। এমনকি নিন্দা-ভর্ৎসনা দিয়েও না। ডেকে নিয়ে কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে হেদায়েত-নসিহত করা দিয়েও না।

সবাইকে নিয়ে বসে আলাপ-আলোচনা করার উদ্যোগ নেওয়ার মতো কেউ নাই। রাজনৈতিক দল তো নাই-ই, প্রধানমন্ত্রী নাই, বিরোধী দলের নেত্রী নাই, রাষ্ট্রপতি নাই। সমাজে সর্বজনমান্য কোনো মনুষ্যসন্তান নাই। কি কপাল আমাদের! সবাই মাথা বেচে দিয়ে বসে আছেন। দালালি করছেন ক্ষমতার। কোনো না কোনো কাশিমবাজার-কুঠির।

সকলেই দেখছি দমনপীড়ন-দণ্ডবিধি চান। মানুষের স্বাধীন বিবেকবুদ্ধির ওপর কারো আস্থা আছে বলে মনে হচ্ছে না। কেউ চান রাষ্ট্রকে দিয়ে যুদ্ধাপরাধীদেরকে ফাঁসি দিতে। কেউ চান ঐ একই রাষ্ট্রকে দিয়ে নাস্তিকদেরকে শুলে চড়াতে। কেউ চান খোদ রাষ্ট্রশক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে নিজেরা রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে। সকলেরই চোখ রাষ্ট্রের দিকে। রাষ্ট্রক্ষমতার দিকে। সকলেই এঁরা রাজনীতি করছেন। ক্ষমতার রাজনীতি। কেউ মুক্তিযুদ্ধের নামে। কেউ ইসলামের নামে। কেউ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের নামে। আর এই সুযোগে রাষ্ট্র হয়ে উঠছে আরো বর্বর। আরো বলপ্রয়োগকারী। আরো নিষ্ঠুর। আরো আইন-আদালত-দণ্ডবিধিনির্ভর। রাষ্ট্রক্ষমতা হয়ে উঠছে রাক্ষস। সর্বময় স্বৈরতন্ত্রী।

২৬.৩ চিন্তাপুলিশের ভূমিকায় রাষ্ট্র

সর্ব-ধারার গুটিকয় কিছু লোকের ক্ষমতা-লিপ্সার পরিণাম ভোগ করতে হচ্ছে গোটা সমাজকে। সর্বপ্রকার স্বাধীনতাবিরোধীদের কর্তৃত্বতান্ত্রিক হানাহানির কারণে খড়্গ নেমে আসছে খোদ স্বাধীনতার ওপরে। ব্যক্তির স্বাধীনতার ওপর। চিন্তা ও মত-প্রকাশের সামাজিক স্বাধীনতার ওপর। এমনকি খোদ রাষ্ট্রের স্বাধীনতার ওপরও। যে জাতি দীর্ঘকাল ধরে নিজেরা নিজেরা কট্টর হানাহানিতে লিপ্ত হয়, ক্রমশ তার রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অন্তঃসারশূন্য হয়ে উঠতে থাকে। এ কথা বোঝার জন্য বই পড়া লাগে না। মাস্টারি করা লাগে না। রাজনীতিবিদ হওয়া লাগে না। আল্লামাও হওয়া লাগে না।

সর্বশেষ চিন্তাপুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে রাষ্ট্র। কে কী বলবে, কে কী

লিখবে, সব কিছু মনিটরিং করবে রাষ্ট্র। অরওয়েলের ওশেনিয়া হয়ে উঠছে রাষ্ট্র। কেজিবি-কমিউনিস্টদের সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্রী রাশিয়া হয়ে উঠছে রাষ্ট্র। ভোগলিপ্সু সৌদি শেখদের রাজতন্ত্র হয়ে উঠছে রাষ্ট্র। 'ধর্মানুভূতি'তে আঘাতের নামে এই ব্লগ সেই ব্লগ, এই পত্রিকা সেই পত্রিকাকে নিষিদ্ধ করে চলার কাজে নেমেছে রাষ্ট্র। আইয়ামে জাহেলিয়ায় ফিরে যাচ্ছি আমরা। মন্দির ভাঙলে, প্রতিমা ভাঙলে, মসজিদে আগুন জ্বললে কারো ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে না বলে রাষ্ট্র মনে করে। আর শুধু কয়েক লাইন লিখলেই রাষ্ট্রের ধর্মানুভূতি সাত আসমানে উঠে যায়।

ধর্মানুভূতিই কি একমাত্র অনুভূতি মানুষের? আর কোনো অনুভূতি নাই? নারায়ণগঞ্জের 'মনের আলো' নিভিয়ে দেওয়া ত্বকী-হত্যাকাণ্ডের অণ্ডকোষ-থেঁতলে -দেওয়া খুনী-গডফাদারদেরকে দুধকলা দিয়ে পুষে রাখলে কারো সন্তান-অনুভূতিতে আঘাত লাগে না? বিজ্ঞাপনে-টিভিতে-সিনেমায়-পত্রিকায়-রাস্তায়-রেস্টুরেন্টে-কনসার্টে-ইভেন্ট-ম্যানেজমেন্টে বড়লোকের ভোগবিলাস ও প্রাচুর্য, আর অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক খাদ্য-অপচয়ের সার্বক্ষণিক ভার্চুয়াল ও রিয়াল প্রদর্শনীতে কোটি-কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধা-অনুভূতি আঘাত পায় না? সীমাহীন শানশওকত আর জৌলুষের নির্লজ্জ সীমাহীন সার্বক্ষণিক সম্প্রচারে অজস্র অভাবী মানুষের অভাব-অনুভূতি অসম্মানিত হয় না?

হিন্দুরা লংমার্চ করার ক্ষমতা রাখে না বলে রাষ্ট্র তার অনুভূতির প্রতি উদাসীন হতে পারে। খাদ্যের জন্য লংমার্চ নাই বলে ক্ষুধার্তদের অনুভূতিকে উপেক্ষা করতে পারে রাষ্ট্র। গরিবের জন্য আইন নাই। আদালত নাই। বিচার নাই। ট্রাইবুনাল নাই। লংমার্চ নাই। শাহবাগও নাই। কোটি মানুষ অন্নাভাবে থাকলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনষ্ট হয় না। ব্ল্যাসফেমি হয় না। গরিবের জন্য হযরতের (সাঃ) দরদের কথা স্মরণ করার মতো মানুষ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। খেতে না পাওয়া মানুষের ক্ষুধা-বঞ্চনা অভাব-অভিযোগের জন্য সামাজের, এমনকি সুশীল সমাজেরও, কোথাও কোনো দৃশ্যমান হাহাকার নাই।

ব্লগারদেরকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে সরকার শাহবাগের সাথে বেঈমানি করেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সরকারের জন্য ক্ষমতার খেলাধুলা মাত্র। ক্ষমতার জন্য যে কাউকে 'জবাই' করে দিতে কসুর করবে না সরকার। যে আসিফকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিব শিক্ষার্থীদের পক্ষে লেখার জন্য, আন্দোলনে সংগঠিত করার জন্য রাতে অন্ধকারে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ডিবি, যে আসিফকে এই সেদিন প্রায় খুন করে ফেলেছিল উন্মত্ত-মতান্ধরা, যে আসিফ 'গলায় চাপাতির কোপ' নিয়ে অসুস্থ পড়ে আছেন, ঘাড় পর্যন্ত ঘোরাতে পারেন না, সেই আসিফকে এবার সেই একই ডিবি তুলে নিয়ে গেল মতপ্রকাশের দায়ে। এখন দেখছি খুন হয়ে বেঁচে গেছেন রাজীব।

নইলে তাঁকে তুলে নিয়ে যেত ডিবি। রাজীবের আত্মার সাথে বেঈমানি করেছে এই সরকার। আসিফদেরকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে 'আল্লামা'দেরকেও ধাপ্পাবাজির গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা করছে এই সরকার।

২৬.৪ অজ্ঞতার সংঘাত এবং স্বাধীনতার তাড়না

মানুষের রক্ত দিয়ে হযরত মুহম্মদের (সাঃ) গৌরব বাড়াতে চান যাঁরা তাঁরা তাঁর উদারতা ও ইশক এবং মহব্বত ও মহত্বের ব্যাপারে পর্যাপ্ত ধারণা রাখেন কিনা সংশয় হয়। আমি নিজে নাস্তিক নই। নাস্তিকতাবিরোধীও, নই। তবে উগ্র নাস্তিকদের ঘোর সমালোচক বটে। কিন্তু একজন লোক স্রেফ নাস্তিক বলে তাঁকে তাঁর বিশ্বাসের জন্য মেরে ফেলতে হবে, তাও মানতে পারি না। এই বাচ্চা নাস্তিকদের নিন্দা-কটুক্তির আর দোষ কী? আমাদের খোদ সমাজপতি-রাজনীতিপতিদের-সাহিত্যসংস্কৃতিপতিদের কথায়-লেখায়-ভাষায় কী ধরনের যুক্তিবুদ্ধি, বিচারবিবেচনা আর বিবেকের পরিচয় পাই আমরা? বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া অন্দরমহল থেকে আদালত পর্যন্ত কোথাও কি কোনো অনুসরণীয়-কিছু আছে? আমাদের সমাজে কি বিজ্ঞান নিয়ে, কি ধর্ম নিয়ে, কোনো সুস্থ-সহিষ্ণু আলাপ-আলোচনার চর্চা আছে? এ সমাজে অবাধ, শান্তিপূর্ণ, দায়িত্বশীল জ্ঞানচর্চা, চিন্তাচর্চা, যুক্তিচর্চা হয় না বললেই চলে। তার জন্যই এত অজ্ঞতা। অজ্ঞতা মহানবীকে (সাঃ) নিয়ে। অজ্ঞতা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে নিয়ে। গৌতম বুদ্ধকে নিয়ে। অজ্ঞতা রাজনীতি-অর্থনীতি নিয়ে। কর্তৃত্বতন্ত্র নিয়ে। রাষ্ট্রশক্তির বিপরীতে সমাজশক্তি নিয়ে।

এই অজ্ঞতারই সংঘাত চলছে আজ দুনিয়াজোড়া। এক দিকে ঢালাও ইসলাম-নিন্দা। আরেক দিকে ঢালাও পশ্চিমাদের নিন্দা। এক দিকে সন্ত্রাসবিরোধী অনন্ত ক্রুসেডের ক্রূরতা। আরেক দিকে জেহাদের নামে জিঘাংসা। এই সব অজ্ঞতার বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেই কিছু তরুণ ভালো করে না জেনে না বুঝে আল্লাহ, মহানবী (সাঃ), ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের মহান ধর্মপ্রচারকদের নামে আকথা-কুকথা লিখেছে। তার জন্য তাঁদেরকে হাজারবার ধিক্কার দিতে রাজি। দিয়েছিও পত্রিকার পাতায় লিখিতভাবে। কিন্তু আমি তাঁদেরকে দৈহিকভাবে অত্যাচার করতে রাজি না। আমি তাঁদের লেখালেখির জায়গা নিষিদ্ধ করে দিতে রাজি না। আমি তোমার সাথে হাজার তর্ক করব। কিন্তু তোমার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করার চেষ্টা করব।

এইসব ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্লগারদের স্থূলরুচির, নিম্নরুচির 'জ্ঞানচর্চা'য় আমি মর্মাহত। এইসব কুৎসায় আমার অন্তরে রীতিমতো সুতীব্র আঘাত লেগেছে। এগুলো কোনো মতপ্রকাশের চর্চা হলো? মূঢ়তা ছাড়া এ জিনিস আর কী? তারপরও কিন্তু আমি এইসব তরুণদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসার সুপ্ত আকুতি দেখতে পাই। সর্বজীবের সর্ব

আচরণে আমি মঙ্গল খুঁজতে চাই। কেননা আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ্ যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন। এইসব তরুণের বিপজ্জনক মতপ্রকাশের প্রলোভনের মধ্যে মারাত্মক ঝুঁকি ছিল। প্রাণের বিপদ ছিল। তা তাঁরা জানতেনও খুব ভালো করেই। তাহলে কোন তাড়নায় তাঁরা এত বড় ঝুঁকি নিলেন? জীবন দিলেন?

এই তাড়নার নাম স্বাধীনতার তাড়না। আমি তাঁদের গর্হিত চিন্তাকে শতমুখে নিন্দা করি। কিন্তু তাঁদের স্বাধীনতা-স্পৃহাকে নয়। স্বাধীনতা-স্পৃহা ঈশ্বরপ্রদত্ত মনুষ্য-ধর্ম। হ্যাঁ, জ্ঞানের ভয়ঙ্কর অভাব ছিল এঁদের। জ্ঞানের অভাব আপনি দণ্ডবিধি দিয়ে, চিন্তাপুলিশ দিয়ে, কারাদণ্ড-প্রাণদণ্ড দিয়ে পূরণ করবেন? আমাদের জ্ঞানীগুণী-রাষ্ট্রনায়ক-ধর্মবেত্তারা সকলে মিলে কি আবার খ্রিস্টীয় মধ্যযুগের অন্ধকার চার্চতন্ত্র-যাজকতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে চান? মানুষকে নতুন করে চিন্তাদাসত্বে ফিরিয়ে নিতে চান? ধুলা-ময়লার ভয়ে জানালা-দরজা বন্ধ করে রাখলে যে আলো-বাতাসও ঘরে ঢুকবে না, সে কথা কি আমরা ভাববো না? কতিপয় তরুণ স্বাধীনতানীতির অধীনে ভুল করেছেন বলে খোদ স্বাধীনতানীতিকেই বিসর্জন দিলে আমরা অন্ধ অচলায়তনে আটকা পড়ব। মুক্তধারা যাবে শুকিয়ে।

মহানবী (সাঃ) বেঁচে থাকতেই কি কায়েমী ক্ষমতার অধিকারী, পুরোনো সামন্তশক্তির পূজারীরা, তাঁর নামে কুৎসা-কটুক্তি-কুকথা রচনা করেন নি? শারীরিক -ভাবে আঘাত, এমনকি হত্যাচেষ্টা, করেন নি? সেই দায়ে কি মহানবী (সাঃ) কাউকে সামান্য শাস্তিও দিয়েছিলেন? প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন? নাকি তাঁদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন?নিজে ক্ষমা করে দিয়েছেন? তাতে করে কি তাঁর মান-মর্যাদা ধুলায় লুটিয়ে গিয়েছিল? নাকি আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল? তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতেন যে বৃদ্ধা মহিলা, তিনি কি তাঁর প্রাণহরণ করেছিলেন? যিনি নিজের মান বোঝেন না, তিনিই অন্যের অপমানে আনন্দ পান। যাঁদের আত্মসম্মান-বোধের নিতান্ত অভাব, তাঁরাই অন্যের মানসম্মান ধরে টানাটানি করার মূঢ়তা দেখাতে পারেন।

২৬.৫ গরিবের ধর্ম, বঞ্চিতের রাষ্ট্রমর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা

খেজুরের চাটাইয়ে ঘুমানো আমাদের প্রাণের প্রিয় নবীজীর (সাঃ), আমাদের প্রিয়তম শিক্ষকের, আল্লাহর পেয়ারা হাবিবের মানসম্মান বাঁচানোর নামে যাঁরা আজ আপদের ওপর বিপদ হিসেবে আবির্ভূত হতে চাচ্ছেন, তাঁদেরকে আরেক বার ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। আল্লাহর ওয়াস্তে। নবীজীর (সাঃ) ওয়াস্তে। ধর্ম কায়েমের নাম করে যাঁরা আজ কোটি কোটি মানুষের জীবিকা-মর্যাদা-স্বাধীনতাকে জিম্মি করে 'সারাদেশে আগুন জ্বলবে'র হুমকির অধীনে নিয়ে আসছেন, তাঁদের নেতাদেরকে

দেখলাম (তাঁদের গরিব, মজলুম অনুসারীদেরকে নয়) অত্যন্ত দামী সিংহাসন-মার্কা চেয়ারে বসে বক্তৃতা করছেন। কওমী মাদ্রাসার লাখো লাখো গরিব শিক্ষার্থীদের কয় জনের বাসায় ওরকম একটা চেয়ার তো দূরে থাক, একটা সাধারণ চেয়ার-মোড়া-খাট-চৌকি আছে, জানতে ইচ্ছে করে। এই দুঃখেই বলি: সকলেই সিংহাসনপনন্থী। সকলেই 'আগুন জ্বলবে' পন্থার অনুসারী। সকলেই পুলিশপন্থী। সকলেই বল-প্রয়োগের ব্যাপারি।

একেবারে 'টুঁটি টিপে ধরা'র কথাই শোনা গেল হেফাজতে ইসলামের নেতাদের মুখে। ১৭ই মার্চের প্রথম আলোয় দেখছি, ঢাকায় লালবাগ মাদ্রাসায় বসে 'কমিটি গঠনের পর সভায় হেফাজতে ইসলামের আমির শাহ আহমদ শফী সম্পর্কে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নির্বাহী সভাপতি শাহরিয়ার কবির বিরূপ মন্তব্য করেছেন অভিযোগ করে তাঁর সমালোচনা করা হয়। ঢাকা মহানগর কমিটির নেতারা বলেন, জীবদ্দশায় ফজলুল হক আমিনীর বিরুদ্ধে শাহরিয়ার কবির মামলা করেছিলেন। এখন তিনি আহমদ শফীর বিরুদ্ধে কটূক্তি করছেন। এখনই এসব নাস্তিকের টুঁটি চেপে ধরতে হবে।' এ কি মহানবীর অনুসারী আল্লামাদের মুখের ভাষা!

একবার পত্রিকায় গা শিউরানো এক ছবিতে দেখেছিলাম মহা উদ্ধত এক পুলিশ অফিসার ঠাণ্ডা মাথায় টুঁটি টিপে ধরেছেন এক সাংবাদিকের। কি ভয়ংকর সেই দৃশ্য! ভোলা যায় না। ক্ষিদে পেলে বাঘ-ভাল্লুক-শেয়াল-সিংহরাও টুঁটি টিপেই ধরে। আমাদের প্রশাসন-মন্ত্রীমিনিস্টার-রাজনীতিবিদ-শিক্ষাবিদ-সমরবিদরা তো টুঁটি টিপে ধরছিলেনই। এবার আল্লামারাও সেই ভাষায় কথা বলছেন। তাঁদের আর দোষ কীসের? সঙ্গদোষে লোহাও ভাসে। কর্তৃত্বনীতিতে পরিচালিত আমাদের বলপ্রয়োগের সমাজে মহানবীর (সাঃ) প্রেমধর্মকে আরো অনেক ধৈর্য আর ত্যাগ-তিতিক্ষার সাধনা করতে হবে বোঝা যাচ্ছে।

এদিকে রাজাকারে আর নাস্তিকে ভরে গেছে দেশ। সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখছেন। সকলেই সকলের চোখে রাজাকার অথবা নাস্তিক হয়ে হয়ে উঠছেন আস্তে আস্তে। ইসলামের 'হেফাজতকারী' আল্লামাদের কথায় বুঝলাম, দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা এখন নাস্তিক সরকারের অধীনে। আর রাজাকাররা তো কদিন আগেই রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন ছিলেন। নাস্তিকে ভরে গেল দেশ। অথচ কোটি-কোটি আমজনতা মুসলমান চুপ করে ঘরে বসে আছেন। এটা তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এই কৃষক-নমশূদ্র-গরিব ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান পরিবারগুলোই স্বাধীনতা-সমতা-ইনসাফের ইসলামের বাতি জ্বালিয়ে রেখেছেন। সুফী-দরবেশদের কোলাকুলিতে এদেশে অভিসিক্ত হয়েছিল ইসলাম। নাস্তিক-মুরতাদ-মৃত্যুদণ্ড এদেশে ইসলামের কায়েমের তরিকা ছিল না। হুগো শ্যাভেজের মতো নাস্তিককে যে সম্মান দেখিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট তা

থেকে কি আমরা কিছু শিখব না। আমরা সবাই মিলে কি শুধু নির্মূলের রাজনীতি করব? ধর্মানুভূতিতে আঘাত অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিন্তু পুলিশের মতো 'পবিত্র' প্রতিষ্ঠান দিয়ে কি তা ঠেকানো যাবে?

কওমী মাদ্রাসার রাষ্ট্রপ্রসাদবঞ্চিত, রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, গরিব মানুষদের সম্প্রদায়টিকেই বা দোষ দিই কীভাবে? বড় বড় পাশ করা কপট ডক্টর-প্রফেসর-ব্যারিস্টারদের এই রাষ্ট্রে আমরা তাঁদের ঠাঁই দিই নি। মর্যাদা দিই নি। সমাজের বিরাট একটা অংশকে আমরা অমর্যাদা আর অভাবের গর্তে ফেলে রেখেছি হাজার হাজার বছর ধরে। কালান্তরের বঞ্চনার পরিণামে ঐ একই স্বাধীনতার স্পৃহা আজ প্রতিক্রিয়াশীলতার পোশাক পরে 'কিছু-একটা'র প্রতিবাদে নেমেছে। তাঁদেরও তো অধিকার আছে, আত্মমর্যাদার বোধ আছে, বিদ্যমান রাষ্ট্রক্ষমতায় হক আছে। এর সুরাহা না হলে দেশে শান্তি আসবে কী করে, কেউ বলতে পারেন?

আমরা পরস্পরকে বুঝতে চাই না। আমরা পরস্পরকে সম্মান করতে রাজি না। আমরা সবাই সবাইকে নির্মূল করতে চাই। মানবজাতির অন্যতম প্রিয় শিক্ষক স্বয়ং হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ঐশী উপলব্ধি মারফত জানালেন, প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্তার সৃজনসত্তার ইশারা আছে। তোমরা তা নিয়ে চিন্তা করো। সেখান থেকে তোমরা শেখো। তাকিয়ে দেখা গেল: অনন্ত জীববৈচিত্রই প্রকৃতির এক নম্বর আইন। বৈচিত্র্যে ব্যাঘাত ঘটলে সৃজনসত্তা ব্যাহত হয়। আমরাই সকলে ক্ষতিগ্রস্ত হই। অথচ আমরা শুধু মানুষের মধ্যকার চিন্তা-মত-ধর্ম-ভাষা-জাতীয়তার বৈচিত্র্যটুকুকেও ধারণ করতে রাজি নই। আজকের রাষ্ট্র-শাসকশ্রেণী-পুঁজিপ্রথা রাজি নয়।

রাত জুড়ে, প্রহরে প্রহরে, শেয়ালদের কানফাটানো চিৎকারে স্বস্তির ব্যাঘাত ঘটার অভিযোগে বাঘ-ভাল্লুক-সিংহ মিলে শেয়াল-নির্মূলে নামে না। আর আমরা ভিন্নমত দেখলে সন্দেহ করি। লাঠিহাতে তেড়ে আসি। ভর্ৎসনা করি। নিন্দা করি। নির্মূল চাই। নেতাকর্মী-লেনিনবাদী-লাদেনবাদী সকলেই তাই করেন। এখন দেখছি আল্লামারাও তা-ই করছেন। আল্লাহর কঠোরসত্তা ছাড়া দয়ামায়া-রহমত-ক্ষমা-শুভ-সত্য-সুন্দর-কল্যাণের সত্তার কি আমাদের পরিচয় ঘটবে না? আল্লাহকেও আমরা দেখছি একজন ব্যক্তি-প্রশাসক/ব্যক্তি-সম্রাট বানিয়েই ছাড়ছি। আর নিজেরা হচ্ছি তাঁর স্বঘোষিত অনুচর-গুপ্তচর-কনস্টেবল। আল্লাহপাকের নিরাকার সত্তার অজস্র অভিপ্রকাশের রূপবৈচিত্র্য গভীরভাবে অনুসন্ধান করার ধৈর্য অর্জন সবার জন্য সহজ নয় বলেই হয়ত।

২৬.৬ আসছে বসন্তের আগাম ব্যাকপ্যানেল:

আমাদের মুক্তির প্রকৃত পথ হলো স্বাধীনতা-সৃজনশীলতা-সংহতি-সহযোগিতার

পথ। শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা আমল করার বাস্তব উপায় কী? উপায় পাল্টাপাল্টি কমিটি -টমিটি গঠন না করে গণমানুষের গণপরিষদ গঠন করা। প্রত্যেক পরিবারের এক বা একাধিক প্রতিনিধি নিয়ে। প্রত্যেক শহরে। প্রত্যেক পাড়ায়। প্রত্যেক মহল্লায়। কিন্তু কোনো দলের প্রতিনিধি না। কোনো গোষ্ঠীর প্রতিনিধি না। কোনো মতবাদের প্রতিনিধি না। এঁরা প্রত্যেকে নিজেদের ক্ষুদ্রস্বার্থের-ক্ষমতাস্বার্থের বাইরে ভাবতে ব্যর্থ হয়েছেন। অসংখ্য মানুষের আকুল আন্তরিক চাওয়া সত্ত্বেও এঁরা নিজেরা একসাথে বসতে ব্যর্থ হয়েছেন। এখনও তাঁরা বিষাক্ত সাপলুডু খেলে চলেছেন মানুষের জান-মাল-সন্তান-পরিজনের ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমান নিয়ে। লাঠি হাতে নিয়ে। বোমা-বন্দুক-ককটেল নিয়ে। যাবতীয় রাজনৈতিক দল-মত-কার্যকলাপকে তাই প্রত্যাখ্যান করার দিন এসেছে।

যাঁরা দল করেন তাঁরাও আসবেন বৈকি গণমানুষের গণপরিষদে। আসবেন নিজ নিজ পরিবারের প্রতিনিধি হয়ে। আমরা কেউ কারো শত্রু না। সবাই মিলেই আমাদের সমাজ। সবার ওপর আমাদের সবার মঙ্গলের দায়িত্ব। সবাই আসুক। একসাথে বসুক। আলাপ-আলোচনা চলুক দিন জুড়ে। রাত ধরে। কথাবার্তা-তর্কবিতর্ক হোক সপ্তাহ জুড়ে। মাস ধরে। বছর ধরে। ধীরে ধীরে ঐকমত্য গড়ে উঠুক অন্তত ন্যূনতম রাষ্ট্র-সামাজিক প্রশ্নে: স্বাধীনতা আর আত্মকর্তৃত্বের প্রশ্নে।

সংগঠন বলতে যাঁরা স্রেফ হাকিম-হুকুমের আমলাতান্ত্রিক সংগঠন বোঝেন, তাঁরা আমার গণমানুষের গণপরিষদের ধারণায় হাসবেন। অবাস্তব বলে অবজ্ঞা করবেন। জানা কথা। অজানা হলো স্বাধীনতাশীল সংগঠন-প্রণালীর কথা। কর্তৃত্ব-পরায়ণ, উপরনিচের, আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের বাইরে সংগঠনের ধারণা চিরকাল ছিল এবং আজও আছে। বাংলা-বসন্তের প্রথম ইনিংস উঁকি দিয়ে গেল। সাফল্য-ব্যর্থতার আত্ম-অনুসন্ধানের কর্তব্য তো করতেই হবে। কিন্তু তা করতে হবে আসছে বসন্তের আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার জন্যই বটে।

সামাজিক আন্দোলনের খুব সুন্দর একটা ওয়েবসাইট বানানোর স্বরচিত তাগাদা-তীব্রতার একটা আন্তরিক আকুতি তৈরী করেছিলেন নির্দল তরুণেরা। কিন্তু দলবাজ রাজনীতিবাজ ধান্দাবাজরা এই দফায় মঞ্চ-মাইক-মুরুব্বি-মিডিয়ার কৃত্রিম কেন্দ্র বানিয়ে তরুণদের পথ আগলে বসে থাকলেন। এটা সম্ভব হলো তার প্রধানতম কারণ আমাদের ওয়েবসাইটের ব্যাকপ্যানেলটা স্বাধীনতার টেকসই নীতিতে তৈরী করা ছিল না। যা-ই হোক, রাষ্ট্র-মিডিয়া স্পন্সরশিপের সেই লীলা এখন শেষ পর্যায়ে। এবার নবজাগরণের নবতরঙ্গের স্লোগান উঠুক। বসন্ত এই বাংলায় আসার জন্য মুখিয়ে আছে। আসছে বসন্তের, আরেক ফাল্গুনের প্রস্তুতি নেওয়ার এখনই সময়।

সেই প্রস্তুতির প্রথম ঝলকটাই দেখা গেল রুমী স্কোয়াড গঠনের মধ্য দিয়ে।

আবার, রুমী স্কোয়াডের আমারণ অনশন নিয়েও দেখা গেল রাজনীতি। কেননা নিজেরা আমরণ অনশন না করে আমারণ অনশনে সংহতি জানানো যায় কেমন করে সেটা বোঝা সত্যিই কঠিন হয়ে গেল। বাচ্চারা সব মরতে বসেছে, আর বুড়োরা-চিন্তাবুড়োরা গোল হয়ে হাততালি দিচ্ছেন: 'মরাটা খুব সুন্দর হচ্ছে! চালিয়ে যাও! তোমরা মরে যাও, নো চিন্তা আমরা সংহতি জানাবো। ফুলের মালা দেব। কিন্তু তাই বলে আমরা তোমাদের মতো আমরণ অনশন করে মরতে পারব না।' অনশন-কারীদের লাশের জন্য অপেক্ষা করছিল রাজনীতির শকুন। অনশনকারীদের লাশ দিয়ে সরকারকে চাপে ফেলার কৌশল লাশের রাজনীতিরই নামান্তর।

'হয় বিপ্লব না হয় মৃত্যু'র সাথে 'মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী'র পার্থক্য কোথায়? বিশেষত তরুণদেরকে তাই সতর্ক হতে হবে বৈকি। যিনি জানেন না সামনের দিন-গুলোতে কী করে আন্দোলন-সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, যিনি জানেন না নতুন সমাজের জন্য লাগাতার অজস্রমুখী কাজ কীভাবে করতে হয়, যিনি জানেন না প্রচলিত রাজনৈতিক ভণ্ডামীর বিকল্প তৎপরতার ভিশন কী হতে পারে, তাঁরা মরার আবেগের রাজনীতি ছাড়া পথ দেখেন না। কিন্তু এখন আসলে মরার টাইম নাই। মরার জন্য বিপ্লব অনেক হয়েছে। সামনের দিনের বিপ্লব হবে বেঁচে থাকার বিপ্লব: 'এ রেভোলিউশন টু লিভ!'

রুমী স্কোয়াডের আবেগ নিঃসন্দেহে মহামূল্যবান। কেননা আবেগেই সৃজন-আন্দোলন-সংগঠনের প্রাণ। কিন্তু নবজাগরণের দ্বিতীয় তরঙ্গে এখন দরকার এই আবেগের উপযোগী নয়াসাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করানো। তার জন্য আমাদের লাগবে আত্মকর্তৃত্বের আত্মসংগঠন। আমাদেরকে শিখতে হবে অকুপাই থেকে। আরব-জাগরণ আর স্পেনীয় জাগরণ থেকে। 'মাইক-মঞ্চ-মুখপাত্রের' লেনিনীয়-লিবারাল-আমলাতান্ত্রিক ধ্যানধারণা নিয়ে এবার আমাদের ভাবা দরকার। পুনঃ-বির্বেচনা করা দরকার। মনে রাখা দরকার এইসব 'বালা-মুসিবত' ছাড়াও নতুন ধারার আন্দোলনের ব্যাকপ্যানেল বা সংগঠন-কাঠামো তৈরি করা সম্ভব।

তার জন্য চাই ছোট ছোট স্বাধীন-সার্বভৌম স্বতন্ত্র অজস্র দল-সংগঠন-পাঠচক্র-ফোরাম-সংস্থার সুবিস্তৃত নেটওয়ার্ক। এই জাতীয় স্বতন্ত্র-স্বাধীন গ্রুপসমূহের কোনো কমিটি থাকে না। রিক্রুটমেন্ট থাকে না। বহিষ্কার থাকে না। যোগাযোগ-মুখপাত্র থাকে। কিন্তু মুখপাত্র বদলায় যত ঘন ঘন সম্ভব। সিদ্ধান্ত হয় সর্বসম্মতির ভিত্তিতে। এই দলগুলোকে সেল (কোষ), ন্যাচারাল গ্রুপ (স্বাভাবিক দল), ব্লক ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। প্রতিটা কোষের আলাদা নাম থাকে। রক্তজবা পাঠচক্র, কালোগোলাপ চলচ্চিত্রসংসদ, কিউরিয়াস জর্জ ব্রিগেড, জাহানারা ইমাম ব্যারিকেড, শহীদ রুমী স্কোয়াড, ইত্যাদি প্রভৃতি যেকোনো নাম।

এই নেটওয়ার্কের ব্যাকপ্যানেলে প্রতিটা কোষই আলাদা স্বাধীন স্বশাসিত স্বতন্ত্র দল। কেউ তার ওপর মত চাপাতে পারে না। কোনো মেজরিটি না। মেজরিটি-মাইনরিটির কারবারই নাই এই প্রণালীতে। একইভাবে কোনো কোষ-সংগঠনও অন্যের ওপর, বা নিজেদের সদস্যদের ওপর, কোনো মতামত চাপাতে পারে না। এরকম অসংখ্য কোষ স্বেচ্ছায় পারস্পরিক সম্মতি এবং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়। গড়ে তোলে কোষতন্ত্রের নেটওয়ার্ক। এরকম নেটওয়ার্ক পুলিশ দিয়ে, হামলা দিয়ে দমন করা কঠিন।

নেটওয়ার্কের সিদ্ধান্ত হয় প্রত্যেকটা কোষের একজন করে প্রতিনিধিদের যৌথ সভায় – সেই সর্বসম্মতির ভিত্তিতে। এইরকম সভা বা সমন্বয়-সংস্থাকে বলে স্পোক (রিকশার স্পোকের মতোন) বা স্পোক-কাউন্সিল। সাইকেল-রিকশার স্পোকগুলো যেমন চাকাকে শক্তিশালী করে তোলে, চাকাকে জোরে-আস্তে ঘুরতে সাহায্য করে, তেমনি এই স্পোক-কাউন্সিলও তাই। স্পোক/প্রতিনিধিরা এই সমন্বয়-পরিষদে এসে কী বলবেন তা নিজেরা ঠিক করেন না। সেটা ঠিক করা হয় নিজের নিজের কোষ-সংগঠনে বসে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে। গৃহীত সেই সিদ্ধান্ত মুখপাত্র জ্ঞাপন করেন মাত্র। তিনি কোনো বিবৃতি দেন না। বক্তৃতা দেন না। নেটওয়ার্কের মূল নীতিগত কোনো সিদ্ধান্ত স্পোক-কাউন্সিল নিতে পারেন না। মূল নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পুরো নেটওয়ার্কের সকল সভ্যের সম্মিলিত সভায়। ঐ সর্বসম্মতির ভিত্তিতেই।

২৬.৭ আসন্ন ঘূর্ণিঝড়

পরিস্থিতি একই রকম থাকবে কত কাল? হয় এর উন্নতি হবে। নইলে অবনতি ঘটবে। একটা লণ্ডভণ্ড-ঘূর্ণিঝড় তার মানে আসন্ন। রাজনীতির রাক্ষসতন্ত্রকে প্রতিরোধের পথ বের করা ছাড়া আমাদের মুক্তি নেই। আমাদের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব এবার নিজেদেরই কাঁধে নিতে হবে। এতদিন ধরে বুদ্ধিমান রাজনৈতিক বানরবৃন্দ এসে আমাদের মাথায় বসে কাঁঠাল খেয়েছেন। এবার তাঁরা খেতে শুরু করেছেন মানুষের তাজা মাথা। পেটভরা-চর্বিজমা মানুষদের, ত্বকের চেয়ে দামি জামাকাপড় পরা মানুষদের, ক্ষমতালিপ্সার অন্তঃহীন রিপু-চর্চা বাংলাদেশকে নিয়ে যাচ্ছে দিশাহীন অন্ধকারের দিকে। আর সেই অন্ধকারের ছায়ায় বসে আমাদের দিকে নজর রাখছে 'আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও সামরিক প্রকল্প'। আমরা কি সব দিকে নজর রাখতে পারছি?

আদিপ্রকাশ: দৈনিক *সোনার দেশ*, রাজশাহী, ৫ই এপ্রিল ২০১৩। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত পাঠ: ফেসবুক-নোট, ৬ই এপ্রিল ২০১৩

স্বাধীনতা সবসময়

Art for Freedom: The Challenge of Liberty

২৭.১ পরাধীনতার পরাকাষ্ঠা

‘স্বাধীনতা প্রথমত। স্বাধীনতা দ্বিতীয়ত। স্বাধীনতা সবসময়। এর চেয়ে কমে আমি সন্তুষ্ট হব না।’ বলেছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ১৯২৩ সালে। কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ ত্যাগ করার সময়। পদত্যাগ করেইছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার রক্ষার দায়ে। পদত্যাগপত্র দিয়ে যে বক্তৃতাটা করেছিলেন, তাতেই বলেছিলেন কথাটা। বক্তৃতাটার ডাকনাম হয়ে গেছে ‘সবসময়-স্বাধীনতা’ -বক্তৃতা।

কী খারাপ এই উপাচার্য আশুতোষ, তাই না! আর কত ভালো আমাদের ঢাবি-রাবি-হাবি-জাবি-র ‘প্রথমত পরাধীনতা, দ্বিতীয়ত পরাধীনতা, তারপরও পরাধীনতা’র পরাকাষ্ঠ-উপাচার্যগণ! আমার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সহকর্মীদের চরণে নিবেদন করলাম আশুতোষের এ উদ্ধৃতি। উপাচার্যদের আর দোষ কী! শুরুতে তো তাঁরা গোবেচারা লেকচারারই থাকেন।

২৭.২ অসংবিধিবদ্ধ অসতর্কীকরণ

ব্যক্তি-উপাচার্যদের আমি নিন্দা করি না। করতে পারি না। তাঁরা হয়ত সবই বোঝেন।

মানুষের বাচ্চা বলে কথা।

২৭.৩ বাসদ = বামপন্থী সমস্ত দল

এ উদ্ধৃতির খসড়া পেয়েছিলাম বাসদ বা ছাত্রফ্রন্টের কোনো একটা শিক্ষাপুস্তিকার সম্ভবত পেছনের মলাটে।

বাসদের সদস্যরা অবশ্য 'তারপরও পরাধীনতা'র নীতিতেই চলেন দেখেছি। হাঁপিয়ে উঠলে পার্টি ছাড়েন, পার্টি ভাঙেন, বসে পড়েন। এখানে 'বাসদ' বলতে আমি বোঝাচ্ছি 'বামপন্থী সব দল'। প্রচলিত-অচলিত বামপন্থী। ডানপন্থী দলের বৈশিষ্ট্যও একই। মধ্যপন্থীদেরও। কিনারাপন্থীদেরও। কোনাকাঞ্চিপন্থীদেরও। রাজ-নৈতিক দলমাত্রেরই বৈশিষ্ট্য এ। আনুগত্য-নেতৃত্ব ছাড়া পার্টি হয় না।

২৭.৪ বলশেভিক পিতৃবৃন্দ

বামপন্থীরা তাই বলে রাগ করবেন না, প্লিজ! আমি নিজে ঘরে-বাইরে এই টাইপের বামপন্থী পরিবারেই সন্তান। জন্মসূত্রে। কর্মসূত্রে। তারুণ্য-যৌবন-সূত্রে। সূত্র মানে সুতা। একই সুতায় গাঁথা। পরে অবশ্য পারিবারিক বিধিনিষেধ-বিশ্বাস-অবিশ্বাসের গণ্ডি আমাকে অতিক্রম করতে হয়েছে। সত্যিকারের বামপন্থী হয়ে ওঠার জন্য। তার নাম অরাজপন্থা। অ্যানার্কি। তারপর তো অ্যানার্কিজমও অতিক্রম করতে হলো। সত্যিকারের অ্যানার্কির অনুশীলন করার জন্য। চলছে।

বলশেভিক বামপন্থাকে আমি 'ত্যাজ্য পিতা' ঘোষণা করি নি। পিতার কাছ থেকে শিখেছি। অনুরাগে। তারপর তাকে অতিক্রম করেছি। ভালোবেসে। আবারও, ঘরে এবং বাইরে। রক্তমাংশের পিতা এবং শিক্ষাদীক্ষা-মতাদর্শের পিতাদের কথা বলছি। (হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে না বললে আবার পিতারা বোঝে না সহজে।) আমার উভয় পিতাই আবার বলশেভিক। কী কপাল!

তো আমাদের বন্ধু বাধন অধিকারী আর পার্থ প্রতীম দাস তাঁদের একটা পুস্তিকা -রচনায়ও এটা ব্যবহার করেছিলেন। এক-এগারোর পর-পরই। রাবি'তে 'মিনি জরুরি অবস্থা' জারির প্রতিবাদে।

২৭.৫ আশুতোষের হদিস

হদিস খুঁজছিলাম আমি। কোথায় বললেন আশুতোষ এরকম একটা কথা! কেনই-বা বললেন! পেয়েছিলাম। অনেক ইলিমিলি-চেষ্টাচরিত্র করে। (তখনও নেটে বঙ্গদেশের কনটেন্ট কমই ছিল খানিক বোধ হয়।) আজ হঠাৎ কেন মনে পড়ল এসব কথা, মনে

করতে পারছি না। আবার নেট ঘেঁটে বের করলাম (হদিস নিচে)। আজ অবশ্য ইলিমিলি-ঝিলিমিলি করতে হয় নি। নেট এখন মায়ের মতো– আমার মা সব জানে।

(www.indiarightsonline.com/Sabrang/india6.nsf/38b852a8345861dd65256a980059289d/352b6bf9d77aa59ae5256f0a00369121?; www.vandemataram.com/biographies/patriots/mookerjeea.htm)

ফেসবুক-স্ট্যাটাস: ২১শে নভেম্বর ২০১৩

একুশের এক নম্বর কথা হচ্ছে আইন লঙ্ঘন করা

Joachim Romeo D'Costa. Traditional Alpona Design

সূচনাতথ্য: নাটোরে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র এবং স্থানীয় জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজিত একুশের বইমেলার আলোচনা সভায় প্রদত্ত বক্তব্যের অডিও-অনুলিপি এখানে পেশ করা হলো। অনুলিপিতে তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরকার শব্দগুলো পরে যোগ করা হয়েছে। প্রত্যেক অনুচ্ছেদের শেষের অংকগুলো অডিও ফাইলের সময়াংকসূচক।

২৮.১ ভিন্ন ধরনের জিনিসের দিকে মনোযোগ দেওয়া

আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি; মঞ্চে সবাই আমার অগ্রজ, খগেন দা, বিপ্লুদা, কামরান ভাই, রেজাউল ভাই – এঁদের সাথে আমার সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকতার না – সামনে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে আমার বন্ধুদেরকেও দেখতে পাচ্ছি, আমার সহপাঠীদেরকে দেখতে পাচ্ছি; নাটোরে দাঁড়িয়ে, নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে, এরকম একটা অনুষ্ঠানে আসার [এবং কথা বলার] সুযোগ তৈরি হওয়াটা সত্যি আনন্দের। [০১:৩৪]

এখানে এত বড় একটা আয়োজন হচ্ছে। চমৎকার একটা বইমেলা হচ্ছে। অনেক মানুষ এখানে এসেছেন। আজ কয়েক দিন ধরে এগুলো চলছে। অনেক বাচ্চাদেরকে দেখতে পাচ্ছি। তারা একুশের নাম শুনছে, বিভিন্ন রকম বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এখানে হচ্ছে। প্রতিযোগিতা হচ্ছে। সরকার বাহাদুর এই সমস্ত আয়োজনকে সমর্থন দিচ্ছেন, আয়োজনের সঙ্গে অংশীদার হচ্ছেন। এগুলি সবই খুবই আনন্দের বিষয়। [০২:২৪]

কিন্তু যখন আমরা ২১শে ফেব্রুয়ারির কথা বলি, যখন আমরা ১৯৪৮-১৯৫২-র দিনগুলোতে ফেরত যাই, তখন কতকগুলো ভিন্ন ধরনের জিনিসের দিকে মনোযোগ দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। [০২:৫৮]

২৮.২ একুশ কোনো সরকারি অমলাতান্ত্রিক অনুষ্ঠান ছিল না

খোদ একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটাতে, যখন সেই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার ছাত্র একটা বিস্ফোরক-সিদ্ধান্ত নেওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, ফুঁসছে, সেই দিনটাতে চলেন যাই আমরা। একটা কাঠের চেয়ার। হাতল ছাড়া। সেই চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে সেই বিস্ফোরক ছাত্রসভার সভাপতি সভাপতিত্ব করছিলেন – গাজীউল হক। এবং যাঁরা বক্তব্য রাখছিলেন, তাঁরা একে একে এসে এই কাঠের চেয়ারটার ওপরে দাঁড়াচ্ছিলেন, কথা বলে নেমে যাচ্ছিলেন। কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছিল না এরকম। এত বড় মঞ্চ, প্রচুর আলো, ফটোগ্রাফি, সরকারি আয়োজন, প্রচুর আনুষ্ঠানিকতা, আমলাতান্ত্রিক আয়োজন – এই ব্যাপারগুলোর সঙ্গে ২১শে ফেব্রুয়ারির খানিকটা দূরত্ব আছে, ঐতিহাসিক দিক থেকে। [০৪:২০]

২৮.৩ পার্টিগুলো নির্বাচনী হিসাবনিকাশে ব্যস্ত ছিল

কতকগুলো জিনিস বলতেই হয়, যেহেতু একুশ নিয়ে কথা বলতে হচ্ছেই – এখানে দাঁড়িয়ে। খেয়াল করেন, রাজনৈতিক দলগুলো আজকে যা করে – রাজনীতি করে, এবং দলীয় সুবিধা-অসুবিধা এবং দলীয় মঙ্গলের কথাই ভাবে সবার আগে –

সেদিনও তাঁরা তাই করছিলেন। রাজনৈতিক দলগুলো যা ভাবছিলেন, সেই দিনের ঢাকার ছাত্ররা – বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বিভিন্ন কলেজের, স্কুলের – তাঁরা যদি ঐ রাজনৈতিক দলগুলোর কথাই মেনে নিতেন, তাহলে অন্তত বাহান্নো সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখের যে একুশ, সেটা পেতাম না আমরা। তাঁরা নির্বাচনের কথা ভাবছিলেন। সামনে নির্বাচন ছিল। সেই নির্বাচনে ভোট পেতে হবে। জিততে হবে। সরকারকে ঘাঁটাঘাঁটি করলে নির্বাচন নাও হতে পারে, গোটা ব্যাপারটা ভেস্তে যেতে পারে – এই সমস্ত দুশ্চিন্তা রাজনৈতিক দলের নেতাদের মাথায় ছিল, সেই ফেব্রুয়ারি মাসে। তাঁরা চাইছিলেন যে একটা মোটের ওপর সভা, মিছিল, সেগুলো হোক।[১] কিন্তু গোটা বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের রক্তের মধ্যে, নাড়ির মধ্যে একটা কী যেন টান লেগেছিল। তাঁরা রাজনীতি করছিলেন না। তাঁরা তাঁদের সমাজ, তাঁরা তাঁদের কওম, কমিউনিটির ওপর আক্রমণকে ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করছিলেন; এবং তাঁরা যেকোনো রকমের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যই তৈরি হচ্ছিলেন। [০৬:২৫]

২৮.৪ আইন লঙ্ঘনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা

২১ তারিখে মিছিল করা হবে, এটা আগের থেকেই ঘোষণা করা ছিল, বাহান্নো সালের ফেব্রুয়ারিতে। আগের দিন সন্ধ্যা বেলায়ই সরকারের দিক থেকে মাইকিং করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে পরের দিন ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। ছাত্ররা, ছাত্র-ছাত্রীরা, ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নিলেন। এটা একটা বেআইনি সিদ্ধান্ত। আজকের বাংলাদেশে আমরা উঠতে বসতে যে 'আইনের শাসন' 'আইনের শাসন' আর 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা'র কথা শুনে থাকি সেই আইনের শাসন অনুসারেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু সেদিনের শিক্ষার্থীরা আইন লঙ্ঘন করে-

---

১ 'সেদিন ১৪৪ ধারা না ভাঙার পক্ষে যাঁরা মত দিয়েছিলেন, তাঁদের বক্তব্য ছিল, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ একটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং অনিয়মতান্ত্রিক বা বেআইনি কোনো কাজে তাঁরা যাবেন না। তাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙবেন না। কেননা ১৪৪ ধারা যদি ভাঙা হয়, তবে সরকার নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ পাবে। ফলে নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদে যেসব রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, তাঁদের কাছে রাষ্ট্রভাষার জন্য সংগ্রামের চেয়ে পরিষদের নির্বাচন অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল। আবার বলা যেতে পারে, তাঁরা ১৪৪ ধারা না ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাকে এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টিও তখন ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে ছিল না।' (গাজীউল হক, ২০১২)

ছিলেন। একুশের এক নম্বর কথা হচ্ছে আইন লঙ্ঘন করা।[২] [০৭:২৫]

একুশের আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আমি কেবলই বলে এসেছি: রাজনৈতিক দলের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখা। একুশ কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না কিন্তু। এটা একটা সামাজিক আন্দোলন ছিল। এটা একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল। একুশের আরো একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, বিদ্রোহ করা – না মেনে নেওয়া। [০৭:৫৫]

২৮.৫ বিদ্রোহকে অনুষ্ঠানে পর্যবসিত করা

আজকে ফেব্রুয়ারির ২৬ তারিখ। আমি জানি না আমাদের মনে আছে কিনা, অনেক বড় একটা বিদ্রোহের আজকে বার্ষিকী – গতকালকে এবং আজকে, ২৫ এবং ২৬। বছর তিনেক আগে আমাদের দেশে [এই বিদ্রোহ হয়।] স্মরণাতীত কালের মধ্যে এত বড় গণবিদ্রোহের চেহারা আমরা দেখি নি। একটা বিস্ফোরক গণবিদ্রোহ বাংলাদেশ রাইফেলসের জওয়ানরা ঘটিয়েছিলেন। আজকে তার তৃতীয় বার্ষিকী। [০৮:৪১]

আমরা বিদ্রোহকে অনুষ্ঠানের মধ্যে পর্যবসিত করতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করি, [কিন্তু] সত্যিকারের বিদ্রোহ যখন সংঘটিত হয়, তখন সেটা দেখলে আমাদের আইনের শাসন ঘাবড়ে যায়। একটা গণবিদ্রোহকে আমরা, আমাদের রাষ্ট্র, খুব বর্বর কায়দায় মোকাবেলা করেছি। সেই বিদ্রোহের মধ্যে বর্বরতা ছিল নিঃসন্দেহে। অপ্রয়োজনীয়, ভয়াবহ রকমের রক্তপাত ঘটানো হয়েছিল বিদ্রোহীদের দিক থেকে। এবং সেই অপ্রয়োজনীয় রক্তপাতই কৌশলগত দিক থেকে গোটা বিডিআর-বিদ্রোহকে ভেস্তে দেয়। বিডিআর-বিদ্রোহের প্রতি শুরুতেই গোটা দেশের মানুষের এবং মিডিয়ার যে আগ্রহ আমরা দেখেছিলাম, সেই ভয়াবহ রক্তপাতের মধ্য দিয়ে সে আগ্রহ ধুয়ে যায়। [০৯:৪৫]

বাহান্নোর ২১ তারিখে শিক্ষার্থীরা আইন লঙ্ঘন করেছিলেন। পুলিশকে তার 'রাষ্ট্রীয় কাজে' বাধা দিয়েছেলন তাঁরা। [পুলিশের লাঠিচার্জের বিনিময়ে] প্রচুর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়েছিল ছাত্রদের দিক থেকে। প্রচুর মানুষ আহত হয়েছিলেন। আজকে বাংলাদেশে যেকোনো রকমের সামাজিক আন্দোলনের যেই জিনিসগুলোকে আমাদের রাষ্ট্র উঠতে বসতে নিন্দা করে থাকে, সেই জিনিসগুলোর সূত্রপাত ঘটেছিল একুশে ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু যাঁরা সেই দিনে একুশের আন্দোলনের সংগঠক ছিলেন, তাঁদের একটা ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা বিবেচনা না করে পারাই যায় না। সেটা হলো, তাঁরা দশ জন দশ জন করে ভাগ হয়ে হয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙার একটা

২ 'পুরো বায়ান্ন সাল শেষ হয়েছিল নিয়মভাঙা ... আন্দোলনের মধ্য দিয়ে' (আহমদ রফিক, ২০১২)

পদ্ধতি বের করেছিলেন। রাষ্ট্রকে মোকাবেলা করার সময় – রাষ্ট্রের যে বলপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো, রাষ্ট্রের যে দাঁত এবং নখ, পেশী, থাবা, তার পুলিশবাহিনী, [এবং] তার আইনশৃঙ্খলা প্রয়োগ করার বাহিনীগুলোকে মোকাবেলা করার সময় – আমরা যদি অহেতুক রক্তপাতের মধ্য দিয়ে অজুহাত তৈরি করে দিই, তাহলে আমাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যই ভেস্তে যায়। বিডিআর-বিদ্রোহের সঙ্গে একুশের বিদ্রোহের এই হচ্ছে পার্থক্য। [১১:৫০]

কিন্তু একুশ নিয়ে যদি আমাদের গৌরব করতে হয়, তাহলে একুশে ফেব্রুয়ারিকে একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পর্যবসিত করলে খুব অন্যায় করা হয়। একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্রেফ একটা বন্দনা সভায় পরিণত করলে আর চোখ বন্ধ করে বাংলা ভাষার গৌরব বলে গেলে অন্যায় করা হয়। [১১:৫৮]

২৮.৬ একুশ ছিল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

দেখেন, কামরান ভাই বললেন, স্কুলের ছেলেমেয়েরা, স্কুলের, এইট নাইন-টেনের ছেলেমেয়েরা, আজকে থেকে ষাট বছর আগে আমাদের এই শহরে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল; সরাসরি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। আজকে তো আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে টিউশনিতে পাঠাতে গেলেও পাহারা দিয়ে নিয়ে যাই। আমরা কোনো প্রশ্ন করতে পারি না। আমরা প্রতি বছর বৈশাখে ঝড়ের বন্দনা করে গান গাই, এসো হে বৈশাখ, ঝড় এসো, উড়িয়ে নিয়ে যাও, আর সত্যিকারের ঝড় যখন আসে, কিংবা আকাশে কালো মেঘ জমে, আমরা ঘাবড়ে যাই। একুশের প্রতি যদি আমাদের কোনো শ্রদ্ধা থেকে থাকে, এই দিনটার যদি কোনো গুরুত্ব থেকে থাকে, তাহলে সেই গুরুত্বটা হচ্ছে এইটা যে প্রতিটা মুহূর্তে, প্রত্যেকটা দিন, আমাদের মুখস্ত জীবনটাকে প্রশ্ন করা, মেনে না নেওয়া। একুশ মানে তো মাথা নত না করা, চ্যালেঞ্জ করা, রুখে দাঁড়ানো, সমবেতভাবে। [১৩:১৩]

আজকের বাংলাদেশে আমরা রাজনীতির খপ্পরে পড়ে আছি। রাজনীতি মানেই হচ্ছে ক্ষমতার ব্যাপার। একটা সমাজে কারা কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার ব্যবস্থাটাতে পরিচালকের আসন গ্রহণ করবেন, কারা কেমন করে কাদের ওপরে কোন আইনবলে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন, এই সমস্ত বন্দোবস্তের নাম হচ্ছে রাজনীতি। এর সঙ্গে জন-মানুষের কোনো সম্পর্ক নাই। তার প্রমাণ একুশ। বলেছি আমি। [১৩:৫৫]

২৮.৭ একুশ মানে রাষ্ট্রের বিপরীতে সমাজ

আমরা আমাদের সমাজটাকে হারিয়ে ফেলেছি। বাহান্নো সালে নাটোরে যে ছেলে-মেয়েরা স্কুলে পড়া অবস্থায় এত বড় একটা বিদ্রোহে অংশ নিতে পেরেছিলেন, তাঁরা

এটা এজন্যেই পেরেছিলেন যে তার পেছনে তাঁদের সমাজ ছিল। তাঁদের পাড়া, তাঁদের মহল্লা, তাঁদের মা-বাবা, তাঁদের বয়োজ্যেষ্ঠরা – তাদের সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিল। আজকের বাংলাদেশে আমরা রাজনীতি করতে করতে, আমাদের শয়নকক্ষে, আমাদের পাড়া-মহল্লায়, আমাদের ক্লাবে, সর্বত্র এমনভাবে রাজনীতি, আর ক্ষমতার ভাগাভাগি ঢুকিয়ে দিয়েছি যে আমরা আমাদের সমাজটাকে হারিয়ে ফেলেছি। [১৪:৫৫]

একুশ নিয়ে মেলা কথা না বলে কেমন করে আমরা আমাদের এই সমাজটাকে ফেরত পেতে পারি, সেটা নিয়ে আমাদের ভাবা দরকার। সমাজকে ফেরত পাওয়ার পদ্ধতি কী? বুদ্ধি কী? মূল উপায়টা হচ্ছে, আমাদের যাবতীয় রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। বৃটিশ আমলে আমাদের এখানে সাহেবরা বন্দুক দিয়ে, পুলিশ দিয়ে আইনের নামে লুণ্ঠন-নিপীড়ন-অত্যাচার চালাতেন। সেই একই আমলা -তান্ত্রিক কাঠামো আমরা পাকিস্তানে-ভারতে-বাংলাদেশে আজকে বহন করছি। বাহান্নো সালে কয়জন মানুষ মারা গিয়েছিল? আজকে বাংলাদেশে প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে। আমাদের গায়ে লাগছে না। মাত্র কয়েকজন ছাত্র, মানুষ মারা যাওয়াতে সেই দিন গোটা দেশ যেভাবে ফুঁসে উঠেছিল, তার কানাকড়িও আজকে আমরা কোনো লাশ দেখলে, কোনো মৃতদেহ দেখলে [ফুঁসে উঠি না], সেই আবেগ অনুভব করি না। কারণ আমাদের সমাজটা নাই। আমরা এখন কেউ কারো না। আমরা সবাই নিজের নিজের ধান্দায় ব্যস্ত। কেমন করে টাকা আয় করব। কেমন করে বেচব। কেমন করে কিনব। সবকিছু বেচব। সবকিছু কিনব। এরই সুযোগ নেয় রাষ্ট্র। এরই সুযোগ নেয় রাজনৈতিক দলগুলি। আমরা নিজেদেরকেই হারিয়ে ফেলছি। [১৫:৩৬]

আমি আর কথা বাড়াব না। আমার মোদ্দা কথা বলা শেষ। এগুলোকে আরো বিস্তৃতভাবে, অনেকভাবে বলা যায়। আমরা বহুজাতিক পুঁজির পাল্লায় পড়েছি। আমাদের ভাষার দিনগুলো, আমাদের স্বাধীনতার দিনগুলো উদযাপন করে পেপসি, উদযাপন করে কোকাকোলা, উদযাপন করে বিভিন্ন মালিটন্যাশনাল মোবাইল কর্পো-রেশন, কোম্পানি। সরকারকে ছাড়া, রাষ্ট্রকে ছাড়া আমরা [এরকম] একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারি না। [নিজেদের সামাজিক উদ্যোগে যেভাবে আমরা] শহীদমিনার [বানাতাম] পাড়ায়-মহল্লায়, স্কুলে-স্কুলে – নিজেদের পয়সায়, নিজেদের চাঁদায়, নিজেদের কষ্টে; বাগান থেকে তুলে আনা ফুলে, চুরি করে তুলে আনা ফুলে, সেই উত্তেজনায়, আমরা যেভাবে উদযাপন করতাম, সেগুলো আর নাই। এখন শুধু অনুষ্ঠান। এখন শুধু মুখস্ত। ক্লাসরুমে মুখস্ত। মিডিয়াতে মুখস্ত। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সেই বৃটিশের আইনের মুখস্ত অনুলিপি, অনুকরণ। [১৭:৩৬]

যদি আমরা মানুষ হতে চাই, তাহলে আমাদের আত্মমর্যাদার বোধ, আমাদের

স্বাধীনতার স্পৃহা এগুলো হারালে চলে না। আত্মমর্যাদা এবং স্বাধীনতার বোধ হারালে মানুষ আর মানুষ থাকে না, দাসে পরিণত হয়। আমরা বিভিন্ন অভ্যাসের দাসত্ব করছি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দাসত্ব করছি। আমরা বন্দনায় অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। এই দিকগুলো নিয়ে চলেন আমরা একটু ভাবি; আমরা নিজেদের আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতা এবং সেই সূত্রে আত্মবিশ্বাস, আত্মকর্তৃত্ব ফিরে পাই। রাষ্ট্রের কাছে, রাজনীতির কাছে আমাদের সবকিছু সঁপে দিলে চলবে না। আমাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আমাদের সমাজটাকে বাঁচাতে হবে। সমাজ যদি না বাঁচে কোনো রাষ্ট্র, কোনো সামরিকবাহিনী, [কোনো আদালত,] কোনো পুলিশবাহিনী কোনো আমলা-তান্ত্রিক প্রশাসন আমাদেরকে, বাংলা ভাষাকে বাঁচাতে পারবে না। [১৮:৪৭]

একুশ বারবার ফিরে আসবে। এবং খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে, যাঁরা ২৪ ঘণ্টা আমরা গণবিরোধী কর্যকলাপে লিপ্ত থাকি, তাঁরা একুশের দিন অন্ততপক্ষে বিদ্রোহকে স্বীকৃতি দেব, এবং সেই সুযোগে সামনের দিনগুলোতে আরো অনেক সামাজিক বিদ্রোহ আমাদের দেশে তৈরি হবে, আমরা বারবার আইন লঙ্ঘন করব। আইন লঙ্ঘনের মধ্যেই, রাজনীতিকে লঙ্ঘনের মধ্যেই, রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করার মধ্যেই আমাদের মুক্তি। [১৯:২২]

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। [১৯:২৫]

আলোচনা: ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০১২। অডিও-অনুলিপি: ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০১২।
ফেসবুক-নোট: ২৭শে ফেব্রুয়ারি ২০১২

সাম্রাজ্য স্বাধীনতা ইন্টারনেট

২৯.১ প্রাইভেসি, সিক্রেসি, ট্রান্সপারেন্সি, ট্রাস্ট

নিজেকে আমরা কার সামনে কতটুকু উন্মুক্ত করব, কতটুকু উলঙ্গ করব, সেটা আমাদের যার যার নিজস্ব ব্যাপার। এই নিজস্বতাটুকুর নাম প্রাইভেসি। উলঙ্গ হতে কি কেউ চায়? সদর রাস্তায়? প্রাইভেসি মানে তাই আব্রু। ব্যক্তিগত আব্রু। ব্যক্তির আব্রু। প্রাইভেসিকে সাধারণত 'গোপনীয়তা'র সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়। 'গোপন' শব্দটার সাথে প্রাইভেসির ধারণা মেলে না। 'গোপন' কথাটার মধ্যে কেমন জানি লুকানো লুকানো একটা ব্যাপার আছে। যেন কিছু একটা অকাজ-অপরাধ করে লুকাতে চাওয়া হচ্ছে। কেমন এক ধরনের চোর চোর ভাব। প্রাইভেসি জিনিসটা মোটেও তা নয়। একদমই না।

প্রাইভেসির প্রকৃত অর্থ আসলে 'আব্রু'। প্রাইভেসি হলো এমন একটা অবস্থা যেখানে একটা মানুষকে অন্যরা পর্যবেক্ষণ করে না, বিরক্ত করে না (অক্সফোর্ড

ডিকশনারিজ ডট কম)। এটা একটা মানুষের একা থাকার অবস্থা (কেম্ব্রিজ ডিকশনারিজ অনলাইন: ডিকশনারি ডট কেম্ব্রিজ ডট অর্গ)। এটা এমন একটা অবস্থা যেখানে একটা মানুষ একা থাকতে সক্ষম হয়। অন্যে তাকে দেখে না। তার কথা শোনে না। গণমনোযোগের হাত থেকে মুক্ত এরকম একটা অবস্থার নাম প্রাইভেসি (লংম্যান ডিকশনারি অফ কনটেম্পোরারি ইংলিশ: এলডিওসিই অনলাইন ডট কম।) প্রাইভেসি হলো স্বাধীনতা। অন্য লোকের নজরদারির বাইরে, জানার বাইরে, কাজকর্ম করার স্বাধীনতা। (ম্যাকমিলান ডিকশনারি ডট কম)

কথা প্রসঙ্গে ট্রান্সপারেন্সি বা স্বচ্ছতার কথাও আসতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে যাবতীয় কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা আবশ্যক। প্রতিষ্ঠান বলতে এখানে এমনসব রাষ্ট্রীয়-আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝতে হবে যাদের সিদ্ধান্তে-কর্মকাণ্ডে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ তথা জনসাধারণ লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কর্তৃত্বতান্ত্রিক এসব প্রতিষ্ঠান অন্যদের ওপর, অন্তত নিজেদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর, শাস্তি-পুরস্কার ইত্যাদি চাপানোর ক্ষমতাও রাখে। যেমন রাষ্ট্র, নানান রাষ্ট্রীয় সংস্থা-সংগঠন-প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, বৃহৎ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া ইত্যাদি। এইসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা জরুরি।

পরিবারও একটা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পরিবারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অর্থ আলাদা। এখানে স্বচ্ছতা মানে সবার সামনে উদোম হওয়া না। বেআব্রু হওয়া না। ব্যক্তির বেলায়ও তাই। ব্যক্তির স্বচ্ছতা বলতে সদর সড়কে উলঙ্গ হয়ে হাঁটা বোঝায় না। তবে হ্যাঁ, প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানগত কর্মকাণ্ডসমূহের স্বচ্ছতা আবশ্যক তো বটেই বটে। সেটা আদতে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতারই প্রশ্ন।

তার মানে, স্বচ্ছতা দরকার প্রতিষ্ঠানের। আর ব্যক্তির দরকার ট্রান্সপারেন্সি নয়, ট্রাস্ট। বিশ্বস্ততা। নিজের প্রতি বিশ্বস্ততা। অন্যের প্রতি বিশ্বস্ততা। বিশ্বস্ততা হলো পারস্পরিক বোঝাপড়া। পারস্পরিক স্বাধীনতা। পারস্পরিক স্বরাজ। প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রাইভেসির প্রশ্ন নাই। প্রতিষ্ঠানের দরকার জবাবদিহিতা। ব্যক্তি-মানুষের কোনো ট্রান্সপারেন্সির প্রশ্ন নাই। ব্যক্তি-মানুষের দরকার প্রাইভেসি। ব্যক্তিগত আব্রু।

ইন্টারনেটের স্বাধীনতা রক্ষায় তৎপর মানুষজনকে ধন্যবাদ দিতে হয়। কেননা তাঁরা 'সিক্রেসি'র সাথে 'প্রাইভেসি'র পার্থক্য বিবেচনায় নিয়েছেন। প্রাইভেসি হলো আব্রু। প্রাইভেসি তাঁদেরই দরকার, যাঁরা বেআব্রু হতে চান না। আর গোপনীয়তা দরকার ক্রিমিন্যাল কর্মকাণ্ডের জন্য। গোপনীয়তা দরকার অপরাধীচক্রের। ক্রিমিন্যাল লোকজনের। যারা অন্যের ক্ষতি করে করতে চায়। সবাই জেনে গেলে তাদের কর্মকাণ্ড চালানো অসম্ভব। এই গোপনীয়তাই হলো 'সিক্রেসি'। প্রাইভেসিকে যাঁরা গোপনীয়তা বলেন তাঁরা আসলে সিক্রেসির সাথে প্রাইভেসির পার্থক্য খেয়াল করেন

না। কিংবা করতে চান না। না করলে তাঁদের সুবিধা হয়।

গোপনীয়তার সাথে নিতান্ত যদি মেলাতেই হয়, প্রাইভেসিকে তাহলে বড়জোর 'ব্যক্তিগত গোপনীয়তা' বলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সিক্রেসি হলো প্রাতিষ্ঠানিক গোপনীয়তা। গোপনীয়তা ছাড়া প্রতিষ্ঠান বাঁচে না। কোকাকোলার ফর্মুলা মাত্রেই গোপন। প্রতিটা প্রতিষ্ঠান গোপনীয় সিদ্ধান্ত, আচরণ, তথ্যের আস্ত একেকটা স্তূপ।

সুতরাং সর্বপ্রথম, গোপনীয়তা দরকার রাষ্ট্রের। সরকারের। রাষ্ট্র-প্রধান, সরকার -প্রধান আর মন্ত্রী-বাহাদুরদের তাই 'গোপনীয়তার শপথ'ই নিতে হয়। সাংবিধানিকভাবে। সরকারের কর্মকর্তাদেরকেও নিতে হয় গোপনীয়তার এই শপথ। অনেক সময় গোপন চুক্তিও করতে হয় সরকারকে। রাষ্ট্রীয়ভাবে। সরকার এমন আরো অনেক কাজ করে, যা সবাই জানলে ঐসব কাজ করা মুশকিল হয়ে যাবে। অসম্ভব হয়ে যাবে। জানাজানি হয়ে গেলে মানুষ বাধা দেবে। করতে দেবে না ঐসব কাজ। বিক্ষোভ হবে। প্রতিবাদ হবে। নানা কিছু হবে। সরকার অচল হয়ে যাবে। তাই তাদেরকে কাজ করতে হয় গোপনে। গোপনীয়তা দরকার তাই সরকারের।

একই কারণে গোপনীয়তা দরকার রাজনৈতিক দলগুলোর। সেনাবাহিনীর। বিশ্ববিদ্যালয়-সিন্ডিকেটের। রাষ্ট্রের মতোই, যেকোনো আমলাতন্ত্রের মতোই, তারা তাদের সিদ্ধান্তগ্রহণপ্রক্রিয়া ও বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্ত গোপন রাখে। হ্যাঁ, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েরও একটা 'গোপনীয় শাখা' আছে। এবং এভাবে গোপনীয়তা দরকার কর্পোরেট বাণিজ্যগোষ্ঠীগুলোর। বড় বড় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলোর। এসবের মধ্যে মিডিয়াও পড়ে। গোপনীয়তা দরকার মিডিয়ারও। রাষ্ট্র-পার্টি-কর্পোরেট ও মিডিয়া কী প্রকাশ করে তার চেয়ে জরুরি হলো এরা কী গোপন রাখে। কী এরা প্রকাশ করে না। অন্যের কিছু না কিছু ক্ষতি না করে এরা নিজেদের মঙ্গল সাধন করতে পারে না।

গোপনীয়তা আমাদের দরকার নাই। আমরা যারা সাধারণ মানুষ। নাগরিক মাত্র। আমরা অপরাধী নই। ক্রিমিন্যাল নই। অন্যের ক্ষতি করার কাজে আমরা নিয়োজিত নই। আমাদের গোপন করার কিছুই নাই। আমাদের লুকানোর কিছু নাই। কিন্তু আমাদের আড়ালের দরকার আছে। কখনও কখনও। কম অথবা বেশি। যার যার বিবেচনা মতো। সবার সামনে আমরা আমাদের জামাকাপড় ছাড়ি না। সবার সামনে আমরা মলত্যাগ করে আরাম পাই না। সবার সামনে আমরা সঙ্গম করি না। এসব কাজ ষড়যন্ত্রমূলক নয়। অপরাধমূলক নয়। বৈধ। স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক। তবু এগুলোর জন্য আমাদের একটু আড়াল দরকার হয়। ব্যক্তির এই আড়ালটুকুর নাম আব্রু। আমরা একটু আড়াল চাই। আব্রু চাই। প্রাইভেসি চাই। সবাই।

আব্রু একটা পুরাতন ব্যাপার। স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক, চিরন্তন ঘটনা। প্রাইভেসি বা আব্রু বলতে বোঝায় মর্যাদা, মানসম্ভ্রম, সম্মান, ইজ্জত, আবরণ, পর্দা, অন্তরাল,

এবং আড়াল[১]। আব্রুই প্রাইভেসি। প্রাইভেসি হচ্ছে একটা মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত আড়াল। ইন্টারনেট-পরিসরের জন্য প্রাইভেসি যা, অন্যান্য পরিসরের জন্যও তাই।

দোকান থেকে আলু-পটল-ডিম-কনডম-অন্তর্বাস কিনে আমরা বাসায় নিয়ে আসি ব্যাগে করে। প্যাকেটে করে। ব্যাগে আমরা বোমা-অস্ত্র-মাদ্রকদ্রব্য বহন করছি, তা কিন্তু নয়। তবু ব্যাগটা ব্যবহার করি কেন? কারণ আমরা আব্রু চাই। স্বভাবত। আমরা প্রাইভেসি চাই। নিজ নিজ বিবেচনা মতো। কেন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ব্যাগে করে বহন করি, এই অভিযোগে কি রাষ্ট্র আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে? আমাদেরকে আটক করতে পারে? অপরাধী বানাতে পারে? পারে না। কারণ প্রাইভেসি চিরবৈধ একটা ঘটনা। ব্যাগটা আর প্যাকেটটা আমাদের আড়ালের নিশ্চয়তা দেয়। প্রাইভেসির নিশ্চয়তা দেয়। এই নিশ্চয়তাটুকু আমাদের স্বাভাবিক অধিকার।

২৯.২ অনলাইন প্রাইভেসি এবং ক্রিপ্টোগ্রাফি

সনাতন ডাকযোগাযোগের বেলায় ব্যক্তিগত আব্রুর এই নিশ্চয়তাটুকু অক্ষুণ্ন ছিল। এখনও আছে। ডাকঘরের মাধ্যমে যোগাযোগ করার সময় এতকাল ধরে আমরা খাম ব্যবহার করেছি কেন? শুধুমাত্র পোস্টকার্ড ব্যবহার করি নি কেন? সব সময় করি না কেন? কারণ আমরা চাই না আমাদের চিঠি সবাই পড়ুক। আমরা চাই না আমাদের কথা যেকেউ তাদের খেয়ালখুশি মতো জানুক। আমরা নিজেদের আব্রু চাই। প্রাইভেসি চাই। আমরা তাই আমাদের চিঠিটাকে একটা খামের মধ্যে ভরে পাঠাই। তার মানে এই না যে আমাদের ঐ সব চিঠির মধ্যে মারাত্মক সব অপরাধের পরিকল্পনা লেখা ছিল। ইন্টারনেট-পরিসরে তাহলে কেন আমি আমার ইমেইল ন্যাংটা করে পাঠাতে বাধ্য হবো?

প্রশ্ন হলো: ইন্টারনেট-পরিসরে আমার ইমেইলটাকে আমি একটা খামে বা এনভেলপে ঢোকাবো কীভাবে? আমার চিঠির এবং যাবতীয় যোগাযোগের প্রাইভেসির ব্যবস্থা করব কীভাবে? উত্তর হলো: ক্রিপ্টোগ্রাফির মাধ্যমে। ক্রিপ্টোগ্রাফি কথা এসেছে গ্রীক থেকে। গ্রীক ভাষায় 'ক্রিপ্টো' মানে লুকানো, গুপ্ত। আর 'গ্রাফি' অর্থ লিখন। তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে দুজন ব্যক্তির মধ্যে নিরাপদ যোগাযোগের কলাকৌশল নিশ্চিত করার বিদ্যার নাম ক্রিপ্টোগ্রাফি।

কম্পিউটার-প্রযুক্তির যুগে ক্রিপ্টোগ্রাফি আবির্ভূত হয়েছে সফটওয়ার হিসেবে।

---

১ দ্রষ্টব্য: বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, সুবলচন্দ্র মিত্রের 'সরল বাঙ্গালা অভিধান; হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-খ: ১৯০৭।

পিজিপি, টর, পিজিন, ওটিআর অরবট, গিবারবট, বিটকয়েন ইত্যাদি প্রভৃতি সফট -ওয়ারের সামনে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা নজরদারি প্রতিষ্ঠানগুলো রীতিমতো অসহায় বোধ করছে। এইসব সফটওয়ার নিজেরা কিন্তু কোনো গুপ্তলিপি নয়। এগুলো সব ওপেনসোর্স সফটওয়ার। এদের নিজেদের পূর্ণাঙ্গ সফটওয়ার-কোড বা সংকেতলিপি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে।

এইসব সফটওয়ার রচনা করেছে সাইফারপাঙ্কস-আন্দোলনের সফটওয়ার-রচনাকারীরা। এবং তাঁরা এগুলো বিতরণ করেছে বিনামূল্যে। ইন্টারনেট-পরিসরে। সাইফারপাঙ্কস-আন্দোলনের জন্ম খোদ ইন্টারনেটের জন্মের যুগে। ১৯৮০-র দশকের শুরুতে। ইন্টারনেটের তখন সূচনা ঘটছে মাত্র। ইন্টারনেট তখন সামরিকবাহিনীর এবং তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একচেটিয়া প্রযুক্তি। ঠিক তখনই জন্ম নেয় সাইফারপাঙ্কস। নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলতে শুরু করে ইন্টারনেট-যোগাযোগ। শুরুতে নিজস্ব ইমেইল-লিস্টের মাধ্যমে। সেই ইমেইল-যোগাযোগ শুরু থেকেই ছিল ক্রিপ্টোগ্রাফিক সফটওয়ারকে ভিত্তি করে আত্মসংগঠনে গড়ে ওঠা।

সাইফারপাঙ্কসদের আন্দোলন আদতে ক্যালিফোর্নিয়া-কেন্দ্রিক লিবার্টারিয়ান অ্যানার্কির একটা ধারা। মধ্য-আশিতে প্রকাশিত হয় এঁদের 'ক্রিপ্টোঅ্যানার্কিস্ট ম্যানিফেস্টো' (টিমোথি মে, 'ক্রিপ্টোঅ্যানার্কিস্ট ম্যানিফেস্টো',– পিটার লাডলো, ২০০১)। সাইফারপাঙ্কস-আন্দোলন মনে করে, অপ্রতিরোধ্য ক্রিপ্টোগ্রাফিক সফটওয়ার রচনা এবং ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের আগ্রাসনকে প্রতিহত করা সম্ভব। সম্ভব ব্যক্তির প্রাইভেসি ও স্বাধীনতার সীমাকে বাড়িয়ে দেওয়া। সম্ভব ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে মৌলিকভাবে বদলে দেওয়া।

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে মৌলিকভাবে বদলে দেওয়ার কথাটাই অনেক বেশি গুরুত্বের সাথে তুলেছিলেন জার্মান নৈরাজ্যপথিক গুস্তাভ ল্যানডাওয়া[২]। গুস্তাভ দেখিয়েছিলেন, রাষ্ট্র কোনো চেয়ারটেবিল-স্থাপনা নয় যে একে ভেঙে ফেলা যাবে। রাষ্ট্র হচ্ছে একটা সম্পর্ক। বিশেষ ধরনের সম্পর্ক। রাষ্ট্রকে আমরা বদলাতে পারি, যদি আমরা রাষ্ট্র-সম্পর্কের বাইরে অন্য ধরনের (আন্তঃব্যক্তিক-সামাজিক) সম্পর্ক-প্রণালীতে পরস্পরের সাথে লিপ্ত হতে পারি। জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ যখন ২০০৬ সালে তার আইকিউ ডট অর্গ নামের ব্লগ লিখছিলেন, তখন তাঁর ব্লগে সবার ওপরে, নিজের ছবিটার নিচে, ছিল গুস্তাভের এ বিষয়ক উদ্ধৃতি:

---

২ গুস্তাভ ল্যানডাওয়া'র বই *রেভোল্যুশন অ্যান্ড আদার রাইটিংস* (গুস্তাভ ল্যান্ডাওয়া, ২০১০)-এর অন্যতম প্রবন্ধ 'উইক স্টেটসমেন, উইকার পিপল'-এ এই সংক্রান্ত আলোচনার অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ ঈঙ্গিত আছে।

> The State is a condition, a certain relationship between human beings, a mode of behavior; we destroy it by contracting other relationships, by behaving differently toward one another. ... We are the state, and we shall continue to be the state until we have created the institutions that form a real community and society of men.

আমি যতটা দেখতে পাই, আজকের সাইফারপাঙ্কস-আন্দোলনের মূলমন্ত্র এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই। এবং তাঁরা হাতেকলমে দেখাচ্ছেন। কেমন করে বদলে দিতে হয় রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্ক, পুরো আর্থসামাজিক সম্পর্কপ্রণালী।

২৯.৩ রাষ্ট্র-কর্পোরেট নজরদারি বনাম ব্যক্তি-মানুষের প্রতিরোধ

ক্রিপ্টোগ্রাফিক সফটওয়ার আপনি-আমি ব্যবহার করব কেন? আমাদের সবার ভালো করে জানাও নেই, এনভেলপের চিঠির সাথে তুলনীয় সামান্য কোনো নিশ্চয়তাও ইন্টারনেটে নাই। স্মার্টফোনে নাই। ইয়াহু জিমেইল হটমেইল ওয়াই মেইল গুগল মেইল — এগুলো সবই একেবারে ন্যাংটা। একদম উলঙ্গ ইমেইল সার্ভিস এগুলো। স্কাইপ ফেসবুক টুইটার গুগল প্লাস — এসব সার্ভিসে আমাদের ইমেইল চ্যাট মেসেজ ছবি তথ্য — যাবতীয় কিছু ঠিক যেন খোলা পোস্টকার্ডের মতো। যেকেউ চাইলে আমাদের সমস্ত ইমেইল ইত্যাদি পড়ে ফেলতে পারেন। ব্যক্তিগত সব কিছু জেনে ফেলতে পারেন। তাঁর শুধু সামান্য একটু কারিগরি জ্ঞান থাকলেই হলো। গুগল এবং গ্রামীণ ফোন এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এবং অন্যসব কর্পোরেট-প্রতিষ্ঠানের আইন-অনুগত ও বাণিজ্য-অনুগত পার্টনার মাত্র। আমাদের যাবতীয় ব্যক্তিগত তথ্য যাচ্ছে রাষ্ট্রের গোয়েন্দাদের হাতে। বিজ্ঞাপনী-বিপণনী প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে। শুধু ইমেইল চ্যাট এবং এসএমএস-ই নয়, আমাদের সমস্ত ধরনের অনলাইন-কর্মকাণ্ড এবং স্মার্টফোন-তৎপরতা তৃতীয় পক্ষের কাছে উদোম হয়ে থাকছে সার্বক্ষণিকভাবে। এবং সেগুলো নির্বিশেষে রেকর্ড করে রাখা হচ্ছে। পাইকারি হারে। গণহারে।

এখন আমাকে-আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনি কি আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপমুক্ত এবং স্বাধীন (স্ব+অধীন) ইন্টারনেট চান? নাকি সিকিউরিটি-নজরদারি-নিষেধাজ্ঞার ইলেকট্রনিক দাসপ্রথা চান? সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সময় নাই। ভয়ংকর প্রত্যক্ষ হামলা শুরু হয়ে গেছে। আপনার যাবতীয় ইলেকট্রনিক যোগাযোগের চ্যানেলগুলোতে গোপন চোখ বসানো হচ্ছে। দৃশ্যমান সিসি-ক্যামেরা অথবা অদৃশ্যমান সফটওয়ার-চোখ। স্মার্টফোন ইমেইল চ্যাটিং নেট-ব্রাউজিং

রাস্তাঘাট স্টেডিয়াম – কোনো জায়গায় আপনার-আমার কোনো প্রাইভেসি নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ইউরোপে। সর্বত্র। মাইক্রোসফট ইয়াহু গুগল ফেসবুক ইউটিউব অ্যামেরিকান অনলাইন (এ.ও.ল.) অ্যাপল – কোথাও আপনার কোনো আব্রু নাই।

গুগল আমাদের প্রত্যেকটা ক্লিক রেকর্ড করে। চাহিবা-মাত্র সরকারকে, সরকারি এজেন্সিকে দিয়ে দেয়। সিএআইএ-প্রধানের জিমেইল অ্যাকাউন্টও এফবিআইয়ের কাছে উলঙ্গ করে দেওয়ার ব্যবস্থা গুগলে আছে। (এ ঘটনাও ঘটেছে সাম্প্রতিক কালে।) বাকিদেরও একই অবস্থা। প্রচলিত ব্রাউজারগুলো সবই ন্যাংটা। সেখানে কোন তথ্য কোন পিসি থেকে, কোন ল্যাপটপ থেকে, কোন স্মার্টফোন থেকে, কোন সাইবার-ক্যাফে থেকে কোন আইপি-ঠিকানা হয়ে কোন দিক দিয়ে কোন পথ হয়ে কোথায় গেল সবই ফকফকা পরিষ্কার পদ্ধতিতে নথিভুক্ত থাকে। এমনকি ছদ্মনামেও যদি আপনি কোনো মতপ্রকাশ করেন, যোগাযোগ করেন— নিস্তার নাই। আপনি কোমলমতি প্রেমিক হতে পারেন, সৎ ও আন্তরিক সমাজকর্মী হতে পারেন, কঠিন মনের রাজনৈতিক পরিবর্তনকামী যোদ্ধা হতে পারেন, ব্লগার হতে পারেন, অনলাইন -অ্যাকটিভিস্ট হতে পারেন, বুয়েটের বা জাহাঙ্গীরনগরের কোনো আবেগপ্রবণ শিক্ষক হতে পারেন, সেনাবাহিনীর সদস্য হতে পারেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের বিচারক হতে পারেন — রেহাই নাই আপনার। উপযুক্ত ধরনের কোনো ক্ষমতাশালী মহলের একটুখানি নেকনজর আপনার প্রতি পড়লেই হলো। আপনার ঘাড়ের ওপর পড়তে থাকবে পুলিশী নিঃশ্বাস। গ্রেপ্তার। রিম্যান্ড। কারাগার।

এটুকুই সব নয়। বিপদ আসলে অকল্পনীয় মাত্রায় ভয়াবহ। উদোম পোস্টকার্ডের সাথে উদোম ইন্টারনেটের পার্থক্য বিপুল। পার্থক্য মারাত্মক। পোস্টকার্ড অ্যানালগ। পোস্টকার্ডের আমলে বিশালতম কোনো গোয়েন্দা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও প্রত্যেকটা পোস্টকার্ডের বক্তব্য পড়া সম্ভব ছিল না। দরকারও ছিল না। সনাতন গোয়েন্দাগিরি ছিল নির্দিষ্ট নজরদারির কাল। ছিপ ফেলে মাছ ধরার মতো। নির্দিষ্ট কোনো 'সন্দেহভাজন' ব্যক্তিকে, বা তার সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্যকে, বড়শিতে আটকাতে পারলেই কাজ হাসিল হতো। এখন চলছে পাইকারি নজরদারির যুগ।

এখন পাইকারি হারে, যেন 'কারেন্ট জাল' দিয়ে, সমস্ত মাছ আটক করার প্রচলন ঘটেছে কম্পিউটার-প্রযুক্তির কল্যাণে। এখন আর বিশেষ কোনো সন্দেহ-ভাজনকেই যে খুঁজতে হবে তা নয়। এখন সবাই সম্ভাব্য সন্দেহভাজন। সবাই এখন সম্ভাব্য আলকায়দা। সবাই এখন মনে মনে মাওবাদী। আইনের চোখে এখন সকলেই হতে-পারে-অপরাধী। সুতরাং সবার সম্পর্কে তথ্য চাই। সম্ভব-অসম্ভব সব কিছু হাতে থাকা চাই। কখন কাকে লাগে ঠিক নাই। কখন কোনটা লাগে ঠিক নাই। কাজেই পাইকারিভাবে তথ্যসংরক্ষণ করা চাই। চাই গণনজরদারি। আজ থেকে ১৫

বছর পরে কাউকে বিশেষ সন্দেভাজন মনে হলে তার বিগত ১৫ বছরের অনলাইন-স্মার্টফোন-কর্মকাণ্ডের সুবিস্তারিত রেকর্ড চেক করা চাই। চেক করে দেবে সফটওয়ার। চোখের পলকে। এই হলো গণনজরদারির আদত কথা। (দ্রষ্টব্য: জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ, ২০১২)

ইঙ্গমার্কিন রাষ্ট্র এবং তাদের তাঁবেদার সরকারগুলো নানারকম আইন-কানুন-ফন্দিফিকির করে ইন্টারনেটকে উলঙ্গ করে ফেলার পথে নিয়ে এসেছে বলতে গেলে। ইন্টারনেটের সেবাদানকারী কর্পোরেট সংস্থাগুলো পরিণত হয়েছে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা-প্রতিষ্ঠানে। সর্বগ্রাসী নজরদারির রাষ্ট্রীয় প্রকল্প তো আছেই। সাথে আছে সরকার-নিয়োজিত প্রাইভেট গোয়েন্দা কর্পোরেট-সংস্থাসমূহ। অরওয়েলের সেই কিংবদন্তীর সতর্কবাণী এখন ইন্টারনেটের জন্য ডালভাত। বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ইউ। এভরিহোয়ার। এভরি মোমেন্ট।

কিন্তু বিগ ব্রাদারের ভয়ে দাসের জীবন যাপন করতে পারে না মানুষ। শেকল-বাঁধা ক্রীতদাসও নিজেকে মুক্ত করার জন্য ঝুঁকি নেয়। আজকের যুগে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, চাকরি-পরিবার-প্রেম হারানোর ঝুঁকি নিয়ে, পাইকারি নেট-নজরদারির আশঙ্কা ও দাবির সত্যতার সাক্ষাৎ প্রমাণ দিয়েছেন তরুণ মার্কিন কম্পিউটার-বিশ্লেষক এডওয়ার্ড স্নোডেন। সেটা তিনি করেছেন ক্রিপ্টোগ্রাফিক-যোগাযোগের মাধ্যমেই বটে। সিআইএর সাথে চুক্তির ভিত্তিতে কর্মরত এই ৩০ বছরের তরুণ যা জানিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে: এক ডজনের বেশি দেশের এক বিলিয়ন মতো গ্রাহকের তথ্য সংগ্রহে লিপ্ত আছে মার্কিন সংস্থাগুলো। কোন কোন আইনের অধীনে, কী কী প্রকল্পের অধীনে, কোন কোন সফটওয়ারের মাধ্যমে এই পাইকারি গোয়েন্দা নজরদারি চলছে তার বিস্তারিত বিবরণ স্নোডেনের দেওয়া তথ্য মোতাবেক মাস খানেক ধরে ছেপেছে বৃটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকা। (দ্রষ্টব্য উইকিপিডিয়া: এডওয়ার্ড স্নোডেন।) অ্যাসাঞ্জ স্বয়ং জানিয়েছেন, স্নোডেনের কাছে আছে অনেক মহাজরুরি তথ্য, যার প্রকাশ অচিরেই ঘটবে। আটকাতে পারবে না কেউ।

এভাবে এক দিকে চলছে সর্বগ্রাসী নজরদারি। রাষ্ট্র-কর্পোরেট-সেনাবাহিনীর দিক থেকে। গোটা ইন্টারনেট স্বাধীনতা ও ভবিষ্যত হয়ে পড়ছে বিপন্ন। অন্য দিকে চলছে, প্রাইভেসি রক্ষার লক্ষ্যে অজস্রমুখী সামাজিক নড়াচড়া। নানামুখি আন্দোলন। অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টদের গণডিজিটাল দস্তখতের চাপে এ পর্যন্ত থমকে গেছে বেশ কয়টা মারাত্মক মার্কিন আইন। প্রাইভেসিবিরোধী, স্বাধীনতাবিরোধী আইন। পাশাপাশি চলছে সাইফারপাঙ্কস-আন্দোলনের ক্রিপ্টোগ্রাফিক সফটওয়ার লেখার অপ্রতিরোধ্য বাস্তব তৎপরতা। এমন সব সফটওয়ার, যা ইন্টারনেট-প্রাইভেসিকে রীতিমতো অপ্রতিরোধ্য করে তুলছে দিনকে দিন।

কেন আমি খামে ভরে চিঠি পাঠাচ্ছি, এই অভিযোগ রাষ্ট্র কখনও আমার বিরুদ্ধে তোলে নি। তুলতে পারে নি। তোলাটা নিতান্তই অবান্তর বটে। এ নিয়ে যুক্তিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু আমার ইমেইলকে ক্রিপ্টোগ্রাফিক সফটওয়ার দিয়ে খামের মতো করে আড়াল করার প্রাইভেসি-প্রচেষ্টার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে রাষ্ট্র। প্রাইভেসি রক্ষার জন্য নিবেদিত এসব ওপেনসোর্স-সফটওয়ারকে অবৈধ, অপরাধমূলক বলে প্রতিপন্ন করার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তারা। সফল হচ্ছে কখনো, কখনো-বা ব্যর্থও হয়েছে। সেসবের বিস্তারিত কাহিনী এখন নয়।

আজ শুধু এটুকুই বলার যে: ক্রিপ্টোগ্রাফিক সফটওয়ারের ব্যবহারই পারে ইন্টারনেট-পরিসরে আমাদের প্রাইভেসিকে রক্ষা করতে। এইসব সফটওয়ার ব্যবহারের বিপুল বিস্তৃতি ঘটানোর মধ্য দিয়ে আমরাই পারি ইন্টারনেটের স্বাধীনতা এবং আমাদের প্রাইভেসি নিশ্চিত করতে। ভয়ংকর নিপীড়নমূলক এবং গণনজর-দারিমূলক রাষ্ট্র-কর্পোরেট-গোষ্ঠীকে মোকাবেলা করতে। ব্যক্তির ও সমাজের স্বাধীনতার সীমাকে অপ্রতিরোধ্যভাবে বিস্তৃত করতে।

২৯.৪ লাভাবিট এবং সাইলেন্ট মেইল বন্ধের ঘটনা

সবগ্রাসী রাষ্ট্রকর্পোরেট-নজরদারি তো আছেই। এবার, আস্ত একটা ইমেইল সার্ভিস 'লাভাবিট' বন্ধ করে দিতে বাধ্য করেছে মার্কিন সরকার। অভিযোগ: মস্কোর শেরেমেতেভো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটকে-পড়া অবস্থায় এডওয়ার্ড স্নোডেন একটি লাভাবিট-অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ইমেইল করেছিলেন মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা আইনজীবী ও কর্মীদের কাছে। ইমেইল করেছিলেন তাঁর সংবাদ-সম্মেলনে আসার জন্য। এই ইএমইলের অভিযোগে দশ বছরের পুরানো, চার লক্ষাধিক গ্রাহকের একটা বৈধ, মার্কিন কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেল ভয়াবহ রাষ্ট্রীয় চাপে।

লাভাবিট গড়ে ওঠে ২০০৪ সালে। ১০ বছর ধরে লাভাবিট ছিল একটা জনপ্রিয় ইমেইল সার্ভিস। ২০১৩ সালে এর গ্রাহক ছিল ৪,১০,০০০। এঁরা ফ্রি সার্ভিস দিতেন। ১২৮ মেগাবাইট পর্যন্ত। আবার পেইড সার্ভিসও দিতেন। ৮ গিগা-বাইট পর্যন্ত। টেক্সাসের সফটওয়ার-প্রোগামাররা এটা গড়ে তুলেছিলেন। জিমেইল গুগল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের তথ্য গোপনে ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন এবং মার্কেটিং ডাটা প্রস্তুত করে থাকে। গ্রাহকদের কোনো প্রাইভেসি থাকে না। প্রাইভেসির ব্যাপারটা নিয়ে এই উদ্বেগের কারণে লাভাবিট বানান তাঁরা। এতে তাঁরা গ্রাহকদের প্রাইভেসির পূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে পেরেছিলেন 'অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশন' তথা 'পাবলিক কী ক্রিপ্টোগ্রাফি'র দুর্ভেদ্যতা দিয়ে। কোনো নিরাপত্তা এজেন্সির পক্ষেই

লাভাবিটের প্রাইভেসি-প্রতিরক্ষা ভাঙা সম্ভব ছিল না। দশটা বছর ধরে তিল তিল করে নিজের হাতে গড়া এই লাভাবিটের মালিক ল্যাডার লেভিসন গত ৮ই আগস্ট লাভাবিটের হোমপেজে লিখেছেন:

> আমাকে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হয়েছে। হয় আমাকে মার্কিন জনসাধারণের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে হবে, না হয় আমাকে প্রায় ১০ বছরের কঠোর পরিশ্রমে গড়ে তোলা লাভাবিট বন্ধ করে চলে যেতে হবে। বিপুল পরিমাণে আত্ম-অনুসন্ধানের পরে আমি এটা আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তই নিয়েছি।
>
> যা আমাকে এই সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দিল আইনসম্মতভাবে তা যদি আমি আপনাদের জানাতে পারতাম! আমি পারছি না। কী ঘটে চলেছে তা আপনাদের জানা দরকার বলে আমার মনে হয়। [মার্কিন সংবিধানের] প্রথম সংশোধনীর দিক থেকে এই ধরনের পরিস্থিতিতে মুখ খোলার স্বাধীনতার গ্যারান্টি মনে হয় আমার পাওয়ার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কংগ্রেস এমন সব আইন পাশ করেছে যা অন্য কথা বলে।
>
> এখন অবস্থা যা, আমার গত ছয় সপ্তাহের অভিজ্ঞতা আমি জানাতে পারছি না, যদিও আমি দুই-দুইবার যথাযথভাবে অনুরোধ জানিয়েছি মুখ-খোলার অনুমতি পাওয়ার জন্য।
>
> এখন কী ঘটতে যাচ্ছে? ফোর্থ সার্কিট আপিল আদালতে সংবিধানের পক্ষে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মতো কাগজপত্র আমরা তৈরি করতে শুরু করেছি। মার্কিন কোম্পানি হিসেবে লাভাবিটকে পুনরুজ্জীবিত করতে আমাকে অনুমোদন দিতে পারে এই আদালতের অনুকুল একটা সিদ্ধান্ত।
>
> এই অভিজ্ঞতা আমাকে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছে। ... আমি খুব শক্তভাবে বলে রাখতে চাই। বিশ্বস্ততার গ্যারান্টিসহকারে ব্যক্তিগত তথ্য গচ্ছিত রাখার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত কোনো কোম্পানিকে কেউ যেন বিশ্বাস না করে।

লাভাবিট একটা ছোট-কিন্তু-স্বনামধন্য কোম্পানি। এর মালিক লেভিসন একা-হাতে এই প্রতিষ্ঠানটা চালান। একজন মাত্র পূর্ণকালীন কর্মচারি আছেন তাঁর, যিনি ইউরোপের একজন গ্রাজুয়েট-ছাত্র। বার্ষিক কমবেশি এক লক্ষ ডলারের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল একটা মানুষের। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। মার্কিন মিডিয়া হাফিংটন পোস্টের সাথে একটা ভিডিও-সাক্ষাৎকারে লেভিসন বলেছেন: 'তোমার সমস্ত টাকাপয়সা এবং স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা [মার্কিন] সরকারের আছে।' মনের দুঃখে লাডার লেভিসন নিজের ইমেইল-অ্যাকাউন্টটা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়ে বলেছেন:

‘আমি আর ইমেইল ব্যবহার করছি না। ইমেইল সম্পর্কে আমি যা জানি, তা যদি আপনিও জানতেন তাহলে আপনিও ইমেইল ব্যবহার করতেন না।’

যে পদ্ধতিতে লাভাবিট বন্ধ করে দিল মার্কিন সরকার তা অকল্পনীয় ধরনের বিপজ্জনক। সরকার নিজে ঘোষণা দিয়ে এটা বন্ধ করে দেয় নি। মালিককে বাধ্য করেছে বন্ধ করে দিতে। এবং মালিক লেভিসন যেন এ ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা কাউকে না জানান সে ব্যাপারে তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে মহান আদালত। কী সেই নিষেধাজ্ঞা, তার শর্তাবলী কী, সেগুলো বলার অনুমোদনটুকুও লেভিসনের নাই। গণতান্ত্রিক দেশ বটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

তবে ‘গার্ডিয়ান’ পত্রিকার রিপোর্টার স্পেন্সার অ্যাকারম্যান তাঁর ৯ই আগস্টের (২০১৩) রিপোর্টে একটা ধারণা দিয়েছেন। সেটা হলো: গোপন মার্কিন আদালত লাভাবিটকে হুকুম দিয়েছিল যেন তাঁরা তাঁদের গ্রাহকদেরকে রাষ্ট্রীয় নজরদারির আওতায় আনার ব্যাপারে মার্কিন সরকারের সাথে সহযোগিতা করে। কিন্তু সরকারি নজরদারিতে অংশ নিতে রাজি হয় নি লাভাবিট। গ্রাহকদের প্রাইভেসির ব্যাপারে তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংবিধানবিরোধী হুকুম তামিল করে ব্যবসা করতে চান না তাঁরা। রাষ্ট্রীয় নজরদারির প্রকল্পে দালালি করার হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর কৌশল হিসেবে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের লাভাবিট বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

লাভাবিটের পর আরো একটা নিরাপদ ইমেইল কোম্পানি ‘সাইলেন্ট সার্কেল’ও মার্কিন নজরদারি প্রতিষ্ঠান এনএসএ-এর ভয়ে বন্ধ করে দিয়েছে নিজেদের ইমেইল সার্ভিস ‘সাইলেন্ট মেইল’। সাইলেন্ট সার্কেলের অন্যতম মালিক ‘ইন্টারনেট সিকিউরিটি গুরু’ ফিল জিমারম্যান। ‘পিজিপি’ (প্রেটি গুড প্রাইভেসি) নামের দুর্দান্ত সিকিউরিটি-প্রাইভেসি সফটওয়ারের উদ্ভাবক তিনি। ওপেনসোর্স এই সফট-ওয়ার উদ্ভাবন এবং সেটা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রায় জেলে যেতে বসেছিলেন তিনি। জিমআরম্যানরা বলেছেন, তাঁরা কোনো সরকারি আদেশ পান নি বটে, কিন্তু ‘দেওয়ালেই তো সব লেখা আছে’। গোপন আদালতের গোপন আদেশ আসার আগেই, লাভাবিট বন্ধের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই, তাড়াহুড়া করে তাঁরা তাই তাঁদের সাইলেন্ট মেইল সার্ভিস বন্ধ করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়। তাঁরা তাঁদের সার্ভার থেকে গ্রাহকদের যাবতীয় তথ্য মুছে ফেলেছেন। জিমারম্যান বলেছেন, লাভাবিটের লেভিসনের মতো তিনিও এখন ইমেইল কম ব্যবহার করছেন। এর আরু-নিরাপত্তা কম। তিনি বরং এনক্রিপ্টেড মোবাইল মেসেজিঙের ওপর নির্ভর করেন বেশি। সাইলেন্ট সার্কেলের মোবাইল সার্ভিস ‘সাইলেন্ট ফোন’ এবং ‘সাইলেন্ট টেক্সট’ অবশ্য পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে চালু আছে। এই সার্ভিস দুটো বন্ধ না করার কারণ আছে। এগুলোর গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে ঢোকার পাসওয়ার্ড গ্রাহকদের কাছেই

থাকে। সাইলেন্ট সার্কেলের কাছে থাকে না। কাজেই আদালত হুকুম করলেও তারা গ্রাহকদের কোনো তথ্য আদালত বা সরকারকে দিতে সক্ষম নন। ইমেইলের বেলায় ব্যাপারটা এরকম করা সম্ভব হয় না। সেখানে বিশাল বিশাল পাসফ্রেজ গ্রাহকরা সার্ভারেই গচ্ছিত রাখেন। সেই পাসফ্রেজটা জানার জন্য তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত অন্য একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করেন। ফলে সার্ভারের মালিককে চাপ দিয়ে গোট সার্ভার-সফটওয়ারটাকে কমবেশি বদলে ফেলার সুযোগ বা গ্রাহকদের সম্পর্কে তথ্য জানার সুযোগ আদালতের বা রাষ্ট্রের থাকে।

২৯.৫ ফিসা-আদালত, এনএসএ এবং এডওয়ার্ড স্নোডেন

সংগুপ্ত 'ফিসা'-আদালতের আদেশ একবার এসে গেলে আপনি তা তামিল করতে বাধ্য। কী আদেশ এসেছে তা নিয়ে আপনি কাউকে কিছু বলতেও পারবেন না। এই হচ্ছে ফিসা-আইন বা ফরেন ইন্টেলিজেন্স সারভেইল্যান্স আক্টের মাহাত্ম্য। এই আদালতের গোপন হুকুমে এনএসএ-এফবিআই এখন প্রায় যাবতীয় ইলেকট্রনিক যোগাযোগ কোম্পানির সার্ভারে সরাসরি ঢুকতে পারে। পাইকারি হারে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। কোম্পানি গররাজি হতে তো করতে পারবেই না, কাউকে কিছু জানাতেও পারবে না। এই মুহূর্তে, এনএসএ-এফবিআই প্রতিদিন ২০ টেরাবাইট করে গ্রাহক-ডাটা সংগ্রহ করে। গোপনে।

'গোপন কথা সব গোপনই ছিল'। কিন্তু এনএসএ এবং সিআইএর এক স্বাধীনতাপিপাসু কম্পিউটার-বিশ্লেষক এডওয়ার্ড স্নোডেন লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছেন সাম্রাজ্যের সাধ। কাছাখোলা, পাইকারি, রাষ্ট্রীয় নজরদারির বেশ কয়েকটা ভয়ংকর নথি তিনি তুলে দিয়েছেন বৃটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকার সাংবাদিক গ্লেন গ্রিনওয়াল্ডের হাতে। এসব নথি খোদ এনএসএর 'টপ সিক্রেট' নথি।

গার্ডিয়ান তা পরীক্ষানিরীক্ষা করে একের পর এক ধারাক্রমিক রিপোর্ট ছেপেছে গত জুন মাসে। সেসব রিপোর্ট যদি আপনি পড়ে থাকেন তাহলে এরই মধ্যে নিশ্চয়ই আপনার 'দ্য হেড মুভস রাউন্ড দ্য সান' অবস্থা। ইউরোপ-আমেরিকা জুড়ে হৈচৈ লেগে গেছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাখ্যা চেয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। একাধিক জার্মান মন্ত্রী বলেছেন, ব্যক্তিগত আক্রু যাঁরা চান, তাঁরা যেন কেউ কোনো মার্কিন সার্ভারের সার্ভিস গ্রহন না করেন। সাইলেন্ট সার্কেলও তাঁদের সার্ভার সুইজারল্যান্ডে স্থানান্তর করার পরিকল্পনা করছে। এবং এরই মধ্যে গ্রাহকদের সচেতনতার কারণে মার্কিন ইন্টারনেট কোম্পানিগুলোর ব্যবসায় মারাত্মক ধ্বস নামতে শুরু করেছে। মার্কিন সার্ভারগুলোকে কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না।

উল্লেখ্য, এইসব মার্কিন সার্ভারের মূল সফটওয়ারের ভেতরে এনএসএ-এফবিআই এখন বসিয়ে দিচ্ছে চোরা সফটওয়ার। ফিসা-আইনের বদৌলতে। সিকিউরিটি-ভাষ্যকাররা বলছেন, লাভাবিটকেও এই একই আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা সেটা তামিল করার বদলে খোদ কোম্পানিটাই বন্ধ করে দিয়েছেন, যেন তাঁদেরকে গ্রাহকদের সাথে বেঈমানি করতে না হয়। স্বভাবতই লাভাবিটকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। স্নোডেন বলেছেন, অন্যসব বড় বড় কোম্পানিও লাভাবিটের পথ অনুসরণ করছে না কেন?

২৯.৬ গোপন আদালতের গণতন্ত্র

লাভাবিট বন্ধ হয়ে যাওয়া বিষয়ক একটা রিপোর্টে বিশেষ জরুরি একটা কথা মনে করিয়ে দিয়েছে গার্ডিয়ান পত্রিকা। লাভাবিটই প্রথম কোম্পানি যাঁরা সরকারি নজরদারির অংশীদার না হয়ে নিজেদের কোম্পানি নিজেরা বন্ধ করে দিলেন। তাহলে এরকম কোম্পানি নিশ্চয়ই আরো আছে, যারা কোম্পানির ব্যবসা বাঁচানোর স্বার্থে গ্রাহকদের প্রাইভেসি উদোম করে দিয়েছে 'এনএসএ'র কাছে? গ্রাহকদের আব্রু যায় যাক, কোম্পানির ডলার বাঁচুক।

হ্যাঁ, এরকম কোম্পানি আছে। এক গাদা আছে। আপনার-আমার প্রিয় এবং বিশ্বস্ত সব খ্যাতিমান কোম্পানি। এঁরা হলেন: ফেসবুক ইয়াহু জিমেইল হটমেইল লাইভ আউটলুক ইউটিউব স্কাইপ মাইক্রোসফট অ্যাপল এবং গুগল এবং ইত্যাদি এবং প্রভৃতি। পাইকারি নজরদারি প্রকল্পের তাঁরা আইনসঙ্গত রাষ্ট্রীয় পার্টনার। নোম চমস্কির 'দ্য স্টেট-কর্পোরেট কমপ্লেক্স'-এরই এ আরেক রূপ বটে।

এইসব নামজাদা কোম্পানি আপনার-আমার যাবতীয় একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য দৈনিক-ভিত্তিতে কাছা খুলে তুলে দেয় 'মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা এজেন্সি' বা এনএসএ-র কাছে। সুতরাং ল্যাডার লেভিসনের কথা সিরিয়াসলি আমলে না নেওয়া অসম্ভব। কেউ যেন ফেসবুক ইয়াহু জিমেইল হটমেইল লাইভ আউটলুক ইউটিউব স্কাইপ মাইক্রোসফট অ্যাপল এবং গুগলকে সামান্য বিশ্বাসও না করেন।

এই হলো মার্কিনী 'গোপন আদালতের গণতন্ত্র'। ফিল জিমারম্যান ঠিকই বলেছেন, এই আদালতের আদেশ আর খামে করে পাঠাতে হয় না। দেওয়ালে দেওয়ালে মুদ্রিত থাকে তা। নিতান্ত অন্ধ না হলে পড়তে সমস্যা হয় না। এগুলো সব 'আইনী প্রক্রিয়া'! আইনের শাসন। যুক্তরাষ্ট্রের 'গোপন আদালতের গণতন্ত্র' এই হাল করেছে বিশ্ববন্দিত আইনের শাসনের। এ যেন সত্যিকারের হরর সিনেমা। জর্জ অরওয়েলের '১৯৮৪' উপন্যাসের বিগ ব্রাদারের সর্বগ্রাসী নজরদারি-সাম্রাজ্যের

কল্পনাকেও হার মানাতে যাচ্ছে আজকের ওয়াশিংটনের সাইন্স ফিকশন হরর মুভি।

২৯.৭ সেনা রাষ্ট্র-কর্পোরেট নজরদারি ঠেকানোর পথ কী?

এখানে উপস্থাপিত সার্বিক আলাপ-আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে এবং সমাজ-সচেতন প্রাণী হিসেবে আমাদের নিজেদের কর্তব্যের প্রশ্নটাও এসে যায়। প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, আলোচ্য প্রসঙ্গ সম্পর্কে যথাসম্ভব পড়াশোনা করা, জানা -বোঝার চেষ্টা করা, এগুলো নিয়ে বন্ধু-বান্ধব-সহকর্মী-সাথী-পরিবারের সাথে শেয়ার করা। এইসব কথাবার্তা আপনি নামজাদা-খ্যাতিবাহাদুর অধিপতি মিডিয়ায় পাবেন না। যদিও বা পান, পাবেন টুকরা-টাকরা-বিক্ষিপ্ত-এলোমেলো সংবাদ-কণিকা, যা থেকে সার্বিক কোনো ধারণা পাওয়ার সামান্য উপায়ও নেই। সুতরাং আমাদের নিজেদের দিক থেকে জ্ঞান-কর্ম-সক্রিয়তার কোনো বিকল্প নেই। অন্যরা কী করছেন না করছেন সেদিকে তাকিয়ে বসে থাকার অবকাশও নেই। হাতে সময় নেই একেবারেই।

যে বিপদের কথা এখানে আলোচিত হচ্ছে তা কিন্তু স্রেফ ইউরোমার্কিন বিপদ নয়। এ বিপদ রওনা দিয়েছে আমাদের ধনলুণ্ঠিত তৃতীয় বিশ্বের দিকেও। বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম আশু টার্গেট। ইঙ্গমার্কিন সামরিক এস্টাবলিশমেন্টের কাছে বাংলাদেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আমাদের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে। তথাকথিত মৌলবাদ-সন্ত্রাসবাদ এবং আফগানিস্তান-ইরাক-পাকিস্তান-সিরিয়ার কথা মনে রাখলে এই বিপদের গন্ধ সুনিশ্চিভাবে আপনার সুনিদ্রা ব্যাহত করবে। উইকিলিকসের উন্মোচনসমূহের মধ্যে যদি আপনি ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের গোপন দলিলপত্র নাড়াচাড়া করে দেখেন তাহলে শিউরে উঠবেন। বাংলাদেশের যাবতীয় সামরিক সংস্থা এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-প্রণালীর ওপরে মার্কিন প্রভাবের যে ইশারা সেগুলোতে আছে তা নিয়ে আমাদের রাষ্ট্র-সরকার-সংসদ ও সামরিক বাহিনী -সমূহের সম্যক আন্দাজ আছে কিনা আমি জানি না। আমার সংশয় আছে।

সম্প্রতি, বিডিআর-বিদ্রোহ নিয়ে আমার বইটার (‘বিদ্রোহের সপ্তস্ব: বিডিআর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়) বিস্তারিত-পরিমার্জিত-পরিলিখিত দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ করতে গিয়ে ঐসব দলিলপত্র আমাকে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই কথাগুলো তোলা। এখানে আপাত বড়ো পরিসরের আলাপে ঢোকার অবকাশ নাই। শুধু মনে রাখলেই চলে যে মূলত ‘আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ’ দমনের নামে বাংলাদেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানারকম গোপন চুক্তি চলছে যা আমরা জানি না। এসব চুক্তির বিষয়বস্তু কী তাও আমরা জানি না। উপরোক্ত মার্কিন

দলিলগুলোতে দেখেছি বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন আগ্রহের প্রধান জায়গা হচ্ছে নিরাপত্তা আর কর্পোরেট ব্যবসা।

সুতরাং নিরাপত্তা চুক্তির নামে যে বাংলাদেশকে মার্কিন এনএসএ-নজরদারি-প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা যুক্তরাষ্ট্র করবে তা ধারণা করাটা অমূলক নয়। জানি না এতদিনে এ কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে কিনা। সুতরাং এ ইন্টারনেটের স্বাধীনতা এবং নজরদারিমুক্ত নাগরিক-স্বাধীনতার প্রসঙ্গগুলো জানা এবং প্রচার করার কর্তব্য আমাদের থাকে। আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য, আমার ধারণা, মার্কিন নজরদারির পার্টনার-কর্পোরেট সংস্থাগুলোকে নীতিগত কারণে যথাসম্ভব পরিত্যাগ করা এবং বিকল্প-স্বাধীনতার পথে ইন্টারনেট ব্যবহার করার অভ্যাস করা। দ্বিতীয় এই দিকটা নিয়ে এখানে অতি সামান্য দুই-একটা উপায়ের কথা বলে রাখার অবকাশ আছে। নিজের ক্ষেত্রে আমি বহুল ব্যবহৃত সার্চইঞ্জিন 'গুগল' বিদায় দিয়েছি। গ্রহণ করেছি নতুন, দুর্দান্ত একটা সার্চইঞ্জিন 'ডাকডাকগো'। এটা অতি অ-সাধারণ একটা সার্চ ইঞ্জিন। অধিকন্তু, এটা একটা প্রাইভেসি- সার্চইঞ্জিন। এই ইঞ্জিন আপনার ব্যক্তিগত তথ্য-পরিচয়-স্থান ইত্যাদি অনুসরণ করে না। রেকর্ড করে রাখে না। বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বেচে না। রাষ্ট্রীয় এজেন্সিকে দেয় না। এদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য চাইলে কয়েকটা লিংকে ঢুকে দেখা যাতে পারে। গুগল কীভাবে আপনার বারোটা বাজায়, 'ডাকডাকগো' কীভাবে বাজায় না সে সম্পর্কে জানার জন্য দ্রষ্টব্য: http://donttrack.us/। বাবল প্রযুক্তি কীভাবে টিকটিকিগিরি করে আমাদের ব্রাউজারে, সে সম্পর্কে জানার জন্য দ্রষ্টব্য: http://dont bubble.us/। আপনার ব্রাউজারের প্রাইভেসির জন্য দারুণ কিছু টিপস পাওয়া যাবে এখানে: http://fixtracking.com/। 'ডাকডাকগো' নিয়ে একটা ছোট অ্যানিমেশন দেখা যাবে এখানে: https://duckduckgo.com/about।

এখানে যে লিংকগুলো দিয়েছি সেগুলোতে কয়েকটা প্রাইভেসি- অ্যাডঅন আছে। সেগুলো ইন্সটল করলে হাতেনাতে ফল পাবেন। হাতেনাতে দেখতে পাবেন। নিজের চোখে। দেখবেন কারা আপনাকে ট্র্যাক/ফলো করছে। এবং তাদের কীভাবে থামানো হচ্ছে। রাষ্ট্র- কর্পোরেট নজরদারি তো মানি না মানব না দিয়ে থামানো যাবে না। আপনাকে আপনার নিজের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। আপনার-আমার অভ্যাস বদলাতে হবে। সফটওয়ার বদলাতে হবে। গুগল ছাড়তে হবে। ফেসবুক ছাড়তে হবে। তবেই এই রাষ্ট্র-কর্পোরেট সিস্টেমের আক্কেল হবে। সুতরাং নিজেকে তৈরি করুন। প্রস্তুত হোন। রাষ্ট্র-কর্পোরেট সফটওয়ার ব্যবহারের চিরঅভ্যাসের চিন্তাদাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন।

তথ্যচোর, প্রাইভেসি-চোর গুগল তো ছেড়ে দিয়েছি। এবার ফেসবুকের

বন্ধুদেরকে ফেসবুকের বিপদআপদগুলো বলা দরকার। এবং ফেসবুকের তাদেরকে ডায়াস্পোরে আসার দাওয়াত দেওয়াও দরকার। এটা নিতান্ত আমার-আপনার নিতান্ত ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার না। এমন কোনো আকামকুকাম আমি-আমরা করি না যে, আমাকে-আমাদেরকে মুখোশ পরে লুকিয়ে ঘুরতে হবে। আসলে এটা একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত। কী ধরনের রাষ্ট্র আমি চাই? যে রাষ্ট্র ৩৬৫ দিন ২৪ ঘণ্টা আমাকে অপরাধী জ্ঞান করে নজরদারি করতে থাকবে? কেমন ইন্টারনেট চাই আমি? যে ইন্টারনেট হাজারটা গোয়েন্দা নজরদারিতে আমার প্রত্যেকটা ক্লিক রেকর্ড করবে? গোটা ইন্টারনেটের সমস্ত মানুষ সন্দেহভাজন মারাত্মক অপরাধী, আর রাষ্ট্র-কর্পোরেট-আমলা-গোয়েন্দারা সব ফেরেশতা? তামাশার সত্যি সীমা আছে।

ফেসবুকে আপনি সম্পূর্ণ বেআব্রু। এখানে প্রাইভেসি বলতে কিছু নাই। ফেসবুক আপনার যাবতীয় তথ্য বিক্রি করে। চাওয়া মাত্র সরকারকে দিয়ে দেয়। সারা দুনিয়ার গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আপনাকে নজরদারি করে। প্রত্যেকটা ক্লিক এখানে রেকর্ডেড থাকে চিরদিনের জন্য। ফেসবুক রাষ্ট্র-বাণিজ্য-কর্পোরেটের কাছে আমার 'প্রাইভেট পার্টস' চুরি কোরে বেচে দেয়, আমাকে নাঙ্গা করে দেয়।

এছাড়া, ফেসবুক-কর্তৃপক্ষের বানানো স্বৈরতন্ত্রী কিছু নিয়ম মেনে চলতে ফেসবুকে আপনাকে বাধ্য করা হয়। আপনি অন্যের বানানো নিয়মের দাস মাত্র। পুতুল মাত্র। শুধু তা-ই নয়, ফেসবুক বিজ্ঞাপনে ভরা। বিরাট এক বাজার। এখানে সামাজিক সম্পর্ক বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করা হয়। ফেসবুক তাহলে কীভাবে 'সামাজিক' নেটওয়ার্ক হলো? এটা আসলে বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক। আপনাকে বিক্রি করে ফেসবুক।

একটা প্রশ্ন ওঠার সুযোগ থাকে। এই আমি ফেসবুকে বসেই ফেসবুকের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছি, নীতিগত দিক থেকে সেটা কতটা গ্রহণযোগ্য? আমার বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। পরিবারের মধ্যে থেকেই কি আমরা পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে কথা বলি না? নতুন ধারার পরিবার গঠনের কথা বলি না? এ ছাড়া উপায় কী? পরিবারের বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে কি তাহলে আমাকে পরিবারের বাইরে জন্মগ্রহণ করতে হবে? তা তো সম্ভব না? তাহলে কি পরিবার যা তা-ই আমাকে বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নিতে হবে? তাজ্জব কিসিমের যুক্তি বটে। আমি তো একটা রাষ্ট্রের মধ্যে জন্মেছি। বসবাসও করি রাষ্ট্রেরই মধ্যে। আমার জীবন-মরণের মালিক আইনত রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের সংবিধান-আইনকানুন মানতে আমি আইনত বাধ্য। তাই বলে কি আমি আমার রাষ্ট্র-সংবিধান-আইনকানুনের ভালোমন্দ নিয়ে কথা বলতে পারব না? রাষ্ট্রের অন্যায় আচরণের বিরোধিতা করতে পারব না? তার জন্য কি আমাকে রাষ্ট্রের বাইরে গিয়ে অবস্থান করতে হবে। রাষ্ট্রের বাইরে তো

পৃথিবীতে কোনো জায়গায় নাই। তার মানে কি সমালোচনা পর্যালোনা বিরোধিতা-প্রতিবাদ-রূপান্তর অসম্ভব? এ হলো বিদ্যমান অচলায়তনকে প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নেওয়ার যুক্তি। রাষ্ট্রের-পরিবারের-বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাডিক্যাল রূপান্তরের কথা আমরা বলতে পারি। আইনে বাধে না। নীতিতে বাধে না।

কিন্তু ফেসবুক তো আর আমার কথায় রূপান্তরিত হবে না। উল্টো ফেসবুকই আমার বিরুদ্ধে বহিষ্কারমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার এখতিয়ার রাখে। এটাই ফেসবুকের আইন। তাদের ইন্সট্রাকশানের বাইরে যাওয়ার উপায় আমাদের নাই। আমরা তো আর ফেসবুকের মালিক না। ফেসবুকের মালিক একচ্ছত্র জাকারবার্গ। এখানে মালিকের সাথে ফেস-টু-ফেস হওয়ার কোনো উপায়ই নাই বলা চলে। তাঁর এবং তাঁর পছন্দের লোকজনের তৈরি করা যেকোনো 'আইন' আমাকে মেনে চলতে হবে। বাধ্যতামূলকভাবে। এর বিরুদ্ধে কিছুই করার থাকবে না কারো। আমরা ফেসবুকের গোলাম। একেই সম্ভবত একনায়কতন্ত্র বলে।

ফেসবুক একটা একনায়কতন্ত্রী সামাজিক নেটওয়ার্ক। যা 'একনায়কতান্ত্রিক' তা আবার 'সামাজিক' হয় কীভাবে? সোনার পাথর-বাটির মতো অবস্থা। যে ফেসবুক আমাকে এবং আমার মতো কোটি গ্রাহকের প্রাইভেসি বিক্রি করে বিলিয়ন ডলার কামাচ্ছে, তার নীতিবোধই বা কোথায় থাকে। সুতরাং ফেসবুক ব্যবহার করে ডায়াস্পোরার প্রচার করার মধ্যে আমি কোনো সমস্যা দেখি না। এই ধরনের সমস্যায় যারা ভোগেন বা ভুগতে আগ্রহী, একনায়কপ্রীতি, কর্তৃত্ববান্ধব দাসমনোবৃত্তি, অতিরিক্ত ফেসবুক-আসক্তি এবং পরিবর্তন-বিমুখতার চিরপুরাতন ব্যাধিই তাদের আদি অসুখ কিনা তা ভেবে দেখতে প্রলোভন জাগে। যেকোনো প্রলোভনই অবশ্য পরিত্যাজ্য বটে।

ডায়াস্পোরা ট্রাই করে দেখা যেতে পারে। একটা সত্যিকারের সামাজিক নেটওয়ার্ক। এটা বিজ্ঞাপনমুক্ত। অবাণিজ্যিক। ব্যবহারকারীরাই ডায়াস্পোরা নেটওয়ার্কের আইনানুগ মালিক। ভাবতে পারেন? এটা করা হয়েছে এইজন্য যেন কর্পোরেট পুঁজি একে কোনোদিন কিনে ফেলতে না পারেন। অসাধারণ। 'ডায়াস্পোরা'য় আপনার প্রাইভেসি সম্পূর্ণ গ্যারান্টিড। ডায়াস্পোরা আপনার কোনো ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করতে চায় না। জানতেই চায় না। নিজের সম্পর্কে কতটুকু তথ্য আপনি দেবেন, না দেবেন সেটা পুরোপুরি আপনার ব্যাপার। ডায়াস্পোরা থেকে আপনার একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য চাইলেও গোয়েন্দারা পাবেন না। ডায়াস্পোরার সফটওয়ার আপনার কোনো ব্যক্তিগত তথ্য জমাই রাখে না। গোয়েন্দারা পাবে কীভাবে? এই সফটওয়ারটা ওপেনসোর্স। কারিগরি জ্ঞান থাকা সাপেক্ষে চাইলে আপনি নিজেই পরীক্ষা দেখতে পারেন এইসব দাবি সত্য কিনা, এবং

এটা কীভাবে কাজ করে।

ডায়াস্পোরা আপনার প্রকৃত নাম-জন্ম-দেশ-লিঙ্গ-পরিচয় কিছুই জানতে চায় না। স্রেফ আপনার ইমেইল ঠিকানা, ছদ্মনাম আর পাসওয়ার্ড দিলেই আপনার অ্যাকাউন্ট খুলে যাবে। আপনার ইমেইল ঠিকানাটা সঠিক কিনা এবং আপনি নিজেই সেটা স্বেচ্ছায় ডায়াস্পোরায় দিয়েছেন কিনা সেটাও পরীক্ষা করে দেখে না ডায়াস্পোরা। অথচ ফেসবুকে আইনত আপনার যাবতীয় প্রকৃত তথ্য দিতে আপনি বাধ্য। যারা সেখানে নিক নেম দিয়ে আছেন, আইনত তারা অপরাধী। শুধু এই কারণেই আপনার শাস্তি হতে পারে। ডায়াস্পোরা নিক নামকেই উৎসাহিত করে।

আপনি নিজে একজন ব্যবহারকারী হিসেবে কী পদ্ধতিতে নিজেকে চালনা করবেন তা ডায়াস্পোরার মাথাব্যথার বিষয়ই না। তার মানে, কীভাবে আপনি ডায়াস্পোরা ব্যবহার করবেন সেটা আপনার নিজের ব্যাপার। এ ব্যাপারে ডায়াস্পোরা আপনার ওপর ফেসবুকের মতো করে কোনো প্রকার আইনকানুন-নিয়মনীতি চাপিয়ে দেয় না। আপনার বিবেকবুদ্ধি-চিন্তাভাবনা যুক্তিবোধের ওপরই তার আস্থা। ডায়াস্পোরার প্রণয়ন করা একটা 'কমিউনিট গাইডলাইন' আছে বটে। কিন্তু মেনে চলা বা না চলাটা আপনার ইচ্ছা। এটা বাধ্যতামূলক কিছু না। নীতিমালা ভাঙার দায়ে আপনাকে ডায়াস্পোরা থেকে বের করে দেওয়ার মতো কোনো 'কর্তৃপক্ষ' ডায়াস্পোরায় নেই। এটা কর্তৃত্বতন্ত্রমুক্ত একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

ডায়াস্পোরায় ফেসবুকের মতো 'স্ট্যাটাস' বলা হয় না, 'কনভার্সেশন' বা 'আলাপ' বলা হয়। সুন্দর আইডিয়া। স্ট্যাটাস শব্দটা অনেক বেশি অন্তর্মুখীন, নিষ্ক্রিয়, আত্মকেন্দ্রিক। আলাপ তা নয়। আলাপ সক্রিয়, নিজের গুরুত্বের হানি না ঘটিয়েও অপরের সাথে যোগাযোগে আগ্রহী। উপরন্তু, ডায়াস্পোরা'র 'স্ট্রিম' পাতায় ফেসবুকের হোমপেজের মতো আবর্জনা জঙ্গল হয়ে থাকে না। এখানে আপনি যা দেখতে চান শুধু সেই বিষয়ের জিনিসপত্রই আপনার 'স্ট্রিম' পাতায় দেখায়। সেটা আপনিই নির্ধারণ করবেন। করবেন নতুন নতুন হ্যাশট্যাগ যোগ করে করে। যেমন #art বা #assange ইত্যাদি। এই সব ট্যাগওয়ালা পোস্টই আপনার 'স্ট্রিম' পাতায় দেখায় ডায়াস্পোরা। ফলে ডায়াস্পোরার সামাজিক আলাপ অনেক বেশি ফোকাসড্ বা নির্দিষ্ট আগ্রহকেন্দ্রিক। আর অ্যানোনিমিটিই যেহেতু ডায়াস্পোরার মূল ধারা, তাই ফেসবুকের মতো এটা 'আমাকে দেখো' টাইপের মঞ্চ মঞ্চ খেলার মাঠ প্রস্তুত করে না। নির্দিষ্ট ব্যক্তির কারিশমার চেয়ে এখানে বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক সামাজিক আলাপ-আলোচনা ডিসকোর্সই মূল ঘটনা হয়ে ওঠে। আবার, ডায়াস্পোরায় সামাজিকতা বজায় থাকে পূর্ণ প্রাইভেসি-আব্রু-ইজ্জত সহকারেই। সুতরাং ডায়াস্পোরায় আসুন। সেখানে আমরা 'মুক্তধারা' নামে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করি। এটা একটা

খোলা নেটওয়ার্ক। মুক্তধারা নেটওয়ার্ক। আপনিও আসুন। আমাদের যোগাযোগ হোক। তখন আরো শেয়ার করা যাবে। পরস্পরের থেকে শেখা যাবে।

ডায়াস্পোরা প্রকৃতপক্ষে ফেসবুকের মুনাফাগন্ধী বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কের কোনো বিকল্প না। ডায়াস্পোরা আমূল পৃথক ধারার সামাজিক নেটওয়ার্ক। 'সামাজিক' শব্দটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এটা রাষ্ট্রের পার্টনার না। এটা কর্পোরেট হাউস না। ডায়াস্পোরা স্বতন্ত্র একটা ধারা, বা পরিপ্রেক্ষিত, বা দৃষ্টিকোণ বা প্যারাডাইম বটে। ফেসবুকের ধরণ-ধারণ থেকে এ এক বিরাট বাঁকবদল। নেট-সমাজকে দেখার-বোঝায়-মিথস্ক্রিয়ার একেবারে আলাদা একটা মনোভঙ্গি বা অ্যাপ্রোচ। সমাজবিজ্ঞানে এই ধরনের ঘটনাকে প্যারাডাইম শিফট বলা হয়ে থাকে।

ডাকডাকগো কিংবা ডায়াস্পোরা ছাড়াও ইতোপূর্বে উল্লিখিত পিজিপি, টর, পিজিন, ওটিআর অরবট, গিবারবট, বিটকয়েন প্রভৃতি সফটওয়ারগুলো আমাদের আয়ত্ত করা দরকার। এই সফটওয়ারগুলো প্রাইভেসি বা স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। একই সাথে এগুলো ব্যবহারকারীর অনলাইন অ্যানোনিমিটির দিকটাও নিশ্চিত করে। প্রাইভেসি, স্বাধীনতা আর অ্যানোনিমিটির বিষয়গুলো ঘনিষ্টভাবে পরস্পর বিজড়িত প্রসঙ্গ যে সে কথা বলা বাহুল্য বটে।

২৯.৮ অনলাইন অ্যানোনিমিটি অথবা পরিচয়ের রাজনীতি

আমাদের আজকের নিওলিবারাল পৃথিবীতে ব্যক্তি-মানুষ এবং তার পরিবার-বন্ধুবান্ধব-গোষ্ঠী-পাড়া-গ্রাম-সমাজের ওপরে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির দাপট এমনই বেড়েছে যে রাষ্ট্রীয় আইনের অভ্যাসের বাইরে আমরা নিজেদের মতো করে চিন্তা করতেই ভুলে গেছি। আমরা যেন রাষ্ট্র এবং তার পার্টনার-প্রতিষ্ঠানগুলোর আইনের অবৈতনিক দালাল। হুকুমের গোলাম। সবাই আমরা এখন ইউরো-আমেরিকান পোষা কুকুর। গলায় পরিচয়ের বেল্ট ঝুলিয়ে নিজের অস্তিত্বের প্রামাণিকতা জাহির করতে হবে।

আমি বেঁচে আছি অথবা মরে গেছি – এর যেকোনোটা প্রমাণ করতে চাইলে আমাকে আদালতে যেতে হবে। উকিল ধরতে হবে। কাগজ লাগবে। টাকা লাগবে। মানুষের চেয়ে কাগজ বড়। মানুষের চেয়ে আইন বড়। দারোগা বড়। রাষ্ট্র বড়। রাষ্ট্র মাত্রেই এখন 'হীরক রাজার দেশ': 'যার নাম নেই, তার কথার কোনো দাম নেই'। অথচ পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ চিরকালই, নমস্য হাসান আজিজুল হকের ভাষায়, 'নামহীন গোত্রহীন' ছিল।

আজ পরিবার-স্কুল-মিডিয়া-রাষ্ট্র সবাই মিলে আমাদেরকে এবং তাদের নিজে-দেরকেও তোতা পাখির বিদ্যা মুখস্ত করিয়ে শেষ করেছে। যা খবরের কাগজে লেখে

না, তা চিন্তা করাও কঠিন। যা টিভিতে দেখায় না, এ জগতে তার অস্তিত্বই নাই। নাম-পরিচয়ের রাষ্ট্রচিন্তাই আজ আমাদের ব্যক্তি-চিন্তা। এখন আমরা অ্যানোনিমিটির কথা শুনলে আঁতকে উঠি। অনেকে জিজ্ঞেস করেন, আমি তো অপরাধী নই, আমার তো লুকানোর কিছু নেই, তাহলে আমি মিথ্যা-মিথ্যা 'দুই-নম্বরি' একটা নিক নাম গ্রহণ করতে যাব কেন? অপরাধচিন্তাই একমাত্র চিন্তা আমাদের। হয় তুমি অপরাধী, নয় তুমি পুলিশ। আমারা আমাদের সমাজকে অপরাধীদের সমাজে পর্যবসিত করেছি। এখানে সকলেই অপরাধী বা সম্ভাব্য অপরাধী।

অ্যানোনিমিটি জিনিসটা প্রাইভেসিরই বিশেষ একটা রূপ। 'অ্যানোনিমিটি' কথাটার গোড়ায় আছে গ্রীক শব্দ 'অ্যানোনিমিয়া', যার অর্থ 'নামহীন', তথা 'নামহীনতা'। যেকোনো যোগাযোগ-পরিস্থিতিতে অ্যানোনিমিটি বা 'নামহীনতা' বলতে বোঝায় যোগাযোগকারীর নাম অপ্রদর্শিত থাকা। সফটওয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে নামহীনতার প্রয়োগ এমনভাবেও করা হতে পারে যাতে করে বার্তার উৎস-ব্যক্তিকে শনাক্ত অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব হয়ে ওঠে। নামহীনতার বিশেষ একটা রূপ হচ্ছে ছদ্মনাম গ্রহণ। এক বা একাধিক ছদ্মনাম গ্রহণ করার রেওয়াজ কবি-সাহিত্যিক আর বিপ্লবী লেখকদের মধ্যে বহু পুরোনো। অনেকের একাধিক ছদ্মনাম থাকতে পারে। একেক ধরনের যোগাযোগের জন্য একেকটা ছদ্মনাম ব্যবহৃত হতে পারে। সম্প্রতি মাইক্রোসফটের ইমেইল সার্ভিস আউটলুক বা হটমেইল গ্রাহকদেরকে অনেকগুলো করে ছদ্মনাম গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। একই ইমেইল অ্যাকাউন্ট আমি ব্যবহার করছি। কিন্তু একক জনের কাছে আমার ইমেইল ঠিকানাটা একেক নামে প্রদর্শিত হচ্ছে। এখনই আমি 'মিনাজেল-উসিটেরন অ্যাট হটমেইল ডট কম'। আবার এখনই আমি 'সেলিমরেজানিউটন অ্যাট হটমেইল ডট কম'। আবার এখনই 'ইটইজফরবিডেনটুফরবিড অ্যাট হটমেইল ডট কম'।

এভাবে অনলাইন অ্যানোনিমিটির ক্রমবর্ধমান সামাজিক দাবি নীতিগতভাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে মাইক্রোসফট। মাইক্রোসফটের এই অ্যানোনিমিটি অবশ্য লোকদেখানো-লোকঠকানো টাইপের দুধভাত-অ্যানোনিমিটি। কারণ, কম্পিউটার-কারিগরির দিক থেকে এই ধরনের ছদ্মনাম মোটেও কোনো নামহীনতার নিশ্চয়তা দেয় না। আপনার প্রকৃত পরিচয় এক্ষেত্রে কারিগরিভাবে শনাক্ত করাটা ডালভাত মাত্র। সত্যিকারের নামহীনতার জন্য দরকার টর, পিজিন, ওটিআর জ্যাবার, কে-মেইল, এপিজি প্রভৃতি সফটওয়ার। তাহলেও তারপরও মাইক্রোসফটের এই সেবা বলে দিচ্ছে, নামহীনতার দাবিকে অগ্রাহ্য করাটা দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে।

নীতিবোধগত-শ্রেয়োবোধগত বিচারে অ্যানোনিমিটি আদৌ কোনো অপরাধকর্ম নয়। নামহীনতার ধারণা ইন্টারনেটের আবিষ্কৃত কোনো ধারণা নয়। এ বস্তু বহু

পুরাতন বস্তু। যেমন মহাভারত-রামায়ন-বেদ-পুরাণ-উপনিষদ কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের লেখা তা তাঁরা জানিয়ে যান নি। সাহিত্যিক 'উইলিয়াম শেক্সপিয়ার'ও সম্ভবত কোনো ছদ্মনাম। এ ব্যক্তির আসল নাম কী তা আজ আর জানার উপায় নেই (people.dsv.su.se/~jpalme/society/anonymity.html)। সমাজে-রাষ্ট্রে বহুকাল ধরে পরিচয়ের-অপরিচয়ের অনুশীলন স্বীকৃত। মানে নিজের পরিচয় নিজের বিবেচনাবোধ ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক জানানোর বা না জানানোর অধিকার। এই অধিকার-অনুশীলন-দাবির বিরাট রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে।

নামহীনতার ব্যবহার ঘটতে পারে অনেক ধরনের প্রয়োজন পূরণের জন্য। সুপরিজ্ঞাত কোনো ব্যক্তি ছদ্মনামে বার্তা পাঠানোর প্রয়োজন বোধ করতে পারেন। তিনি হয়ত চান না যে ঐ বার্তা আগে থাকতেই তার নাম নিয়ে চাউর হোক। তাতে করে জনমনে নানা রকম ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে। আমি যদি শিবিরকর্মী হই তাহলে ছাত্রলীগের ডেরায় গিয়ে বলি না যে আমি শিবিরের একনিষ্ঠ কর্মী। আমার পরিচয় এখানে জীবনের নিরাপত্তার সাথে জড়িত। রাবি'র নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক, বন্ধু বখতিয়ার আহমদ, পাহাড়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছে অনেক পাহাড়ী সম্প্রদায় বাংলাদেশ, বার্মা, ভারত রাষ্ট্রসমূহের নানান সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীসমূহের হয়রানির হাত থেকে বাঁচতে এবং নিজেদের জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে একাধারে বাংলাদেশী, ভারতীয় ও বর্মী পরিচয় বহন করে। যেখানে যেটা প্রয়োজন সেখানে সেটা ব্যবহার করে। সমাজবিজ্ঞানীরা বা ব্যবসায়িক-বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠান-সমূহ বা সরকার বা এনজিওরা যখন সামাজিক জরিপ পরিচালনা করেন তখন তাঁরা উত্তরদাতাদের নাম-পরিচয় অজ্ঞাত রাখার সুযোগ দেন অবারিতভাবে। এই নামহীনতা বা অ্যানোনিমিটি ছাড়া তাদের জরিপের উদ্দেশ্য বৃথা যাওয়ার সম্ভাবনা। এ ছাড়া সাংবাদিকদেরকে বা পুলিশকে স্বেচ্ছায় গোপন তথ্য-সূত্র-ইশারা প্রদানকারী অনেক মানুষ নিজেরা নামহীন বা অ্যানোনিমাস থাকতে চান। পুলিশ এবং সাংবাদিকদেরকে সেটা মেনে নিতে হয় তো বটেই, সেই নামহীনতাকে রক্ষা করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হয়।

ডাক্তার-উকিল-বিচারক-ধর্মযাজকদেরকে অনেক মানুষের অনেক ব্যক্তিগত তথ্য ও নাম-পরিচয় গোপন রাখতে হয় পেশাগত সততার স্বার্থেই। অনেক দেশেই এইসব তথ্য-পরিচয় গোপন রাখাটা আইনের চোখে আবশ্যক শর্ত। অনেক চার্চে যাজকের সামনে ব্যক্তির 'পাপের স্বীকারোক্তি' বা কনফেশনের জন্য আলাদা বুথ বা কাউন্টার থাকে। সেখানে যাজক ব্যক্তিটিকে সরাসরি দেখতে পান না। এও তো নামহীনতাই বটে। আর সংবাদপত্রে বক্তিগত বিজ্ঞাপনের কলামে বা এমনকি চিঠিপত্রে বা এমনকি সম্পাদকীয় নিবন্ধে বা এমনকি খোদ সম্পাদকীয়তে নাম-

হীনতার চর্চা অথবা ছদ্মনামের চর্চা তো রীতিমতো পুরোনো প্রথা।

আবার আমাদের সুমহান সংসদীয় গণতন্ত্রেও ভোটাররা ভোট দেন নিজেদেরকে নামহীন রেখেই। এই নামহীনতা তাদের মতের নির্ভিক ও নিরাপদ প্রকাশের নিশ্চয়তা দেয়। অন্য দিকে, সুপ্রাচীন কাল থেকে যারা দানখয়রাত-পরোপকার করে আসছেন, সেইসব হিতৈষী ব্যক্তিরা প্রায়শই নামহীনতার নিশ্চয়তা চান। পবিত্র ধর্মগ্রন্থেও আছে: 'ডান হাত দান করলে যেন বাম হাত জানতে না পারে'। অ্যানোনিমিটি এসব ক্ষেত্রে অনিবার্য শর্ত প্রায়। বড় কোনো প্রতিষ্ঠানের বা মাফিয়াদের বা রাষ্ট্রের বা সামরিক বাহিনীর বা কোনো কর্পোরেট-গোষ্ঠীর গুরুতর দুর্নীতির কথা উন্মোচন করে দিতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই নামহীনতার আশ্রয় নিতে হয়। হুইসল ব্লোয়ারদের জন্য অ্যানোনিমিটি তাই অপরিহার্য। এজন্যই উইকিলিকস তাদের সংবাদ-সূত্রদের অ্যানোনিমিটির পূর্ণাঙ্গ নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করেছে এনক্রিপ্টেড সফটওয়ারের সাহায্যে। কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই কোনো ক্ষমতাহীন ব্যক্তির পক্ষে সবসময় স্বনামে সমালোচনা করা সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে নামহীনতার প্রযুক্তির কোনো বিকল্পই নেই।

অনেক দেশ আছে যেখানে বাকস্বাধীনতা নেই। মতপ্রকাশের নিরাপত্তা নেই। সত্য প্রকাশের অধিকার নেই। সেই সব দেশের বিবেকবান মানুষদেরকে মতপ্রকাশ, সত্যপ্রকাশ, বাকপ্রকাশের কারণে নিগৃহীত হতে হয়। কারাগারে যেতে হয়। চাকরি হারাতে হয়। নির্বাসিত হতে হয়। এমনকি মৃত্যুবরণও করতে হয়। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইরান, ইসরায়েল, বাংলাদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্র। এসব রাষ্ট্রে আত্ম-প্রকাশের ক্ষেত্রে নামহীনতার গুরুত্ব অপরিসীম।

নামহীনতা বা প্রাইভেসির ব্যাপারগুলো এসব ক্ষেত্রে লজ্জাজনক গোপনীয়তা লুকানোর আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটায় না। নামহীনতার ধারণা এখানে সবসময়ই মতামতের মুক্তপ্রকাশ এবং অধিকতর গণতন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার হিসেবে বিবেচিত হয়। একইভাবে অনেক দেশের মানবাধিকার কর্মীদেরকে, বার্মার ভিন্ন-মতাবলম্বী গেরিলাদেরকে, অথবা ভারতের আদিবাসী মাওবাদী গেরিলাদেরকে, কিংবা মেক্সিকোর জাপাতিস্তা-আন্দোলনের কর্মীদেরকে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয় পুরোপুরি নামহীন প্রযুক্তিসমূহের সাহায্যে। এ ছাড়া অত্যাচার-বিভীষিকার হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই।

নামহীনতার নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত, ডায়াস্পোরার মতো, অনলাইন সামাজিক ফোরামে মানুষ অনেক বেশি মন খুলে নিজের মত প্রকাশ করতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে আলোচনাকারী সহজেই এক ধরনের পারস্পরিক সমতা অনুভব করতে পারে। নামহীন বার্তার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূল্যায়নকারীকে অনেক স্বচ্ছন্দে থাকতে

দেখা যায়। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের ব্যাপারটিও এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। পরীক্ষার খাতায় শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রকৃত নাম লিখতে পারেন না। খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীনতা বজায় রাখার জন্য এখানে অ্যানোনিমিটি বা নামহীনতার ব্যবহার।

কাউকে উপদেশ দেওয়া আমার খাসলতের মধ্যে পড়ে না। সকলেই নিজের নিজের কাজ বোঝেন। কিন্তু আমি নিজে নিজে ভাবি। আমার মনে হয়, টর ব্রাউজারের সাহায্যে ডায়াস্পোরা জাতীয় সামাজিক নেটওয়ার্কে সত্যিকারের অ্যানোনিমিটির সাহায্যে মতপ্রকাশ করলে রাজীব হায়দার, আসিফ মহিউদ্দিন, মশিউর রহমান বিপ্লব, রাসেল পারভেজ, সুব্রত অধিকারী শুভ এবং শফিউর রহমান ফারাবীদের মতো তরুণ ব্লগারদেরকে হয়ত রাষ্ট্রীয়-বিরাষ্ট্রীয় হত্যা-জেল-জুলুম-নিপীড়নের স্বীকার হতে হতো না।

এঁরা কে কোন পক্ষের মতাদর্শ অনুসরণ করেন, না করেন। তা এখানে আমার বিবেচ্য না। আমার কাছে মতাদর্শের চেয়ে মানুষ বড়। এঁরা ব্লগে ভালো কথা লিখেছেন, না খারাপ কথা লিখেছেন, সেগুলোর সাথে আমি একমত, নাকি একমত নই, তা অবশ্য এখানে আলোচ্য নয়। তা নিয়ে আমি অন্যত্র[৩] লিখেছি। আমার কাছে প্রধান প্রশ্নটা হলো, মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে অবাধ ও নিরাপদ করার ক্ষেত্রে অ্যানোনিমিটির কোনো শক্তিশালী ভূমিকা আছে কিনা তা বিবেচনা করা।

এই ধরনের ক্ষেত্রে নামহীনতার অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই। ইতোমধ্যে যে নিপীড়নধর্মী, মতপ্রকাশের স্বাধীনতাবিরোধী তথ্য-প্রযুক্তি-আইন সরকার পাশ করতে যাচ্ছে তা পার পেয়ে গেলে আমাদের অনেককেই নামহীনতার আশ্রয় নিতে হবে যে তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

নামহীনতা ব্যক্তিমানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত তো করেই। এ ছাড়াও তা সার্বক্ষণিক রাষ্ট্রীয়-প্রাতিষ্ঠানিক নজরদারির হাত থেকে নাগরিকদেরকে রক্ষা করতে পারে। আবার ইন্টারনেটে ব্যবহারীকারীদের আচার ব্যবহার প্রয়োজন অপ্রয়োজন ইত্যাদি প্রভৃতিকে মনিটর করতে থাকে বাণিজ্যিক ও বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠানগুলো। এদের হাত থেকে সুরক্ষা পাওয়ারও একটা অ্যানোনিমিটি বৈকি।

মোট কথা হলো: গুলি-বন্দুক-ছুরি-ফরসেপ-বটি-কাঁচি-ক্ষুরের মতো, কিংবা রাসায়নিক দ্রব্যাদির মতো, এবং এমনকি ওষুধপত্রের মতো অ্যানোনিমিটি বা নামহীনতারও সুপ্রয়োগ এবং অপপ্রয়োগ থাকতে পারে। সেটা যার যার বিবেচনার ব্যাপার। তার জন্য তো খোদ ডাক্তারিবিদ্যা-ছুরি-ফরসেপ-বটি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ওষুধপত্র, অথবা খোদ নামহীনতার ধারণাকে দোষারোপ করার বা অবৈধ প্রতিপন্ন

৩ এই বইয়ের 'স্বাধীনতা সহিষ্ণুতা সংগঠন' নামের ২৬-সংখ্যক রচনার কথা বলা হচ্ছে।

করার বা অপরাধকর্মে পর্যবসিত করার কোনো সুযোগ নেই।

প্রাইভেসি এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা একেবারে প্রাথমিক বা মৌলিক মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে। যাবতীয় প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চুক্তি ও মুসাবিদায় এইসব অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা'র আর্টিকেল ১২ এবং আর্টিকেল ১৯ এর কথা। বলা যায় ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস' এর ১৭ এবং ১৯ নম্বর আর্টিকেলের কথা। এ ছাড়া, 'ইউরোপিয়ান কনভেনশন অন হিউম্যান রাইটস' এর ৮ম ও ১০ম অনুচ্ছেদের কথাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। (দ্রষ্টব্য: ইয়ামান অ্যাকডেনিজ, 'অ্যানোনিমিটি, ডেমোক্রেসি অ্যান্ড সাইবারস্পেস', *সোশ্যাল রিসার্চ*, খণ্ড ৬৯, সংখ্যা ১, বসন্ত ২০০২।)

এক দিক থেকে দেখলে, নামহীনতা সবসময়ই যোগাযোগের ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ তৈরি করে। আবার নামহীনতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে যোগাযোগ-বার্তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আইনের দ্বারা অনলাই নামহীনতাকে নিষিদ্ধ করে দেওয়াটা এই মুশকিলের ভালো সমাধান হতে পারে না। এই সমস্যার সমাধানে এরই মধ্যে 'অনলাইন রেপুটেশন' নামে একটি ধারণা গড়ে উঠেছে। অনলাইন রেপুটেশন কোনো একটি ছদ্মনামের বিশ্বস্ততা পরিমাপের একটি পদ্ধতি। এর জন্য নানারকম সফটওয়ার-প্রযুক্তির অবতারণাও ঘটছে। (নামহীনতার প্রয়োজনের ও বিপদের দিক নিয়ে, এবং প্রাইভেসি ও নামহীনতা সংক্রান্ত মৌলিক মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনকানুন নিয়ে, বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: ইয়ামান অ্যাকডেনিজ, 'অ্যানোনিমিটি, ডেমোক্রেসি অ্যান্ড সাইবারস্পেস', *সোশ্যাল রিসার্চ*, খণ্ড ৬৯, সংখ্যা ১, বসন্ত ২০০২।)

নামহীনতা ব্যাপারটা আসলে আর কিছু না। বাধ্যতামূলক পরিচয় প্রকাশের রাষ্ট্রীয়-কর্তৃত্বতান্ত্রিক বন্দোবস্তকে মোক্ষমভাবে চ্যালেঞ্জ করে বসে এই ধারণাটা। এটাই আসলে কর্তৃত্বতন্ত্রের চোখে 'নামহীনতা' নামক ধারণাটিকে বিপজ্জনক করে তুলেছে। মহাকেন্দ্রীভূত, অতি-শক্তিশালী রাষ্ট্র-কর্পোরেট ক্ষমতাকাঠামোর মুখে ব্যক্তিমানুষকে নিতান্তই বিপন্ন করে তুলতে পারে বাধ্যতামূলক পরিচয় প্রকাশের এই রাষ্ট্র-কর্পোরেট বন্দোবস্ত ।

প্রসঙ্গত, প্রাইভেসি বা অ্যানোনিমিটি মানে কিন্তু শুধু অপ্রকাশের স্বাধীনতাই নয়। প্রকাশের স্বাধীনতাও বটে। প্রাইভেসি বা অ্যানোনিমিটি মানে আমার সম্পর্কে আমি নিজে কতটা প্রকাশ করতে চাই, এবং কতটা প্রকাশ না করতে চাই, সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা। খোদ স্বাধীনতা মানে কিছু করার স্বাধীনতা তো বটেই, চাইলে কিছু না করারও স্বাধীনতা। সুতরাং কোথায় কতটা আমি আমার পরিচয়

প্রকাশ করব অথবা করব না, তাকে নিতান্তই আমার নিজের এখতিয়ারভূক্ত ব্যাপার বলে ভাবার গুরুত্ব আছে।

২৯.৯ মার্কিন সাম্রাজের পতনের শব্দ

ফিসা-আদালতের আদেশের কপি ছাড়াই যেমন তা দেওয়ালে পড়তে পারা যাচ্ছে বলে জিমারম্যান জানালেন, তেমনি আরও একটা ভবিষ্যতলিপি স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। সে লিপি ফুটে উঠছে ইতিহাসের দেওয়ালে। সেখানে লেখা আছে: যুক্তরাষ্ট্রকে বন্দি করছে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই। বলশেভিক রাশিয়ার মতো আত্ম-অবরুদ্ধ দেশ হয়ে পড়ছে আজকের যুক্তরাষ্ট্র। এটা আরেকটা উত্তর কোরিয়া, আরেকটা চীনে পরিণত হচ্ছে। নিজের নাগরিকদেরকেই নজরবন্দি করতে হচ্ছে তাকে। নাগরিকদের জামাকাপড়-অন্তর্বাস-মোজা খুলে তল্লাশি করতে হচ্ছে তাদেরকে। নিজের দেশের প্রতিটা নাগরিকই সাম্রাজ্যের সম্ভাব্য শত্রু আজ। নিজ দেশের হুইসলব্লোয়ারদের ভয়ে প্রকারান্তরে সংকুচিত হয়ে পড়ছে মার্কিন এস্টাবলিশমেন্টের অভ্যন্তরিন যোগাযোগ-পরিধি, কর্তৃত্ব প্রয়োগের সক্ষমতা।

মনে পড়ছে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের ২০০৬ সালে লেখা 'কন্সপিরেসি অ্যাজ গভর্ন্যান্স' নামের ছয় পাতার প্রফেটিক থিসিস। সেখানে তিনি নেটওয়ার্ক-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন, হুইসল ব্লোয়ারদের সম্ভাব্য 'উন্মোচন'গুলো কীভাবে আতঙ্কিত করে ফেলবে সাম্রাজ্যের শাসকদেরকে। 'লিক' বা উন্মোচনের ভয়ে কমে যাবে তাদের যোগাযোগের পরিসীমা, সেই সাথে কর্মপরিধি। ক্রমাগত অক্ষম হয়ে পড়তে থাকবে সাম্রাজ্য। মাত্র সাত বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হতে চলেছে অ্যাসাঞ্জের সেই প্রফেটিক থিসিস। ফুরিয়ে আসছে সাম্রাজ্যের অবাধ, অসীম সক্ষমতা। ফুরিয়ে আসছে সাম্রাজ্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের দিন। এসব তারই লক্ষণ।

আরো মনে পড়ছে, তাঁর নিজের ব্লগে ('আইকিউ ডট অর্গ') সম্ভবত ঐ বছরই জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ লিখেছিলেন ছোট্ট একটা নোট: 'ইউনাইটেড স্টেটস অফ হোয়াট?' মার্কিন বাণিজ্য-কর্পোরেটগুলোর সাথে বলশেভিক রাশিয়ার বেশ কিছু তাক লাগানোর মতো সাদৃশ্য নির্দেশ করে সেখানে তিনি বলেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-কর্পোরেটগুলো আসলে একেকটা ছোট ছোট বলশেভিক-সোভিয়েত। 'ইউএসএ' নামটার অর্থ তাই 'ইউনাইটেড সোভিয়েটস অফ আমেরিকা'। এখন এই ২০১৩ সালে এসে বোঝা যাচ্ছে, জার- বলশেভিক রাশিয়ার পরিণতিই বরণ করতে চলেছে ইউএসএ।

২৯.১০ সাম্রাজ্য নয়, স্বাধীনতা

সার্বিক পরিস্থিতি আতঙ্কজনক। লাভাবিট, সাইলেন্ট সার্কেল এনএসএ, এবং এডওয়ার্ডের স্নোডেনের ঘটনাক্রম এক মারাত্মক হুঁশিয়ারি-সংকেত। ইন্টারনেটের ওপর নেমে আসছে ভয়ংকর প্রত্যক্ষ আঘাত। কেউ রেহাই পাবেন না। কোনো প্রকার ভিন্নমত সহ্য করবে রাষ্ট্রকর্পোরেট সাম্রাজ্য। কেননা ইন্টারনেট বাঁচলে এবং স্বাধীন থাকলে রাষ্ট্র, কর্পোরেশন, আইন- আদালত, আমলাতন্ত্র, আর্মি— তথা খোদ 'এম্পায়ার' বর্তমান কাঠামোকে মৌলিকভাবে সংস্কার না করে কিছুতেই টিকে থাকতে পারবে না। স্বাধীন ইন্টারনেট থাকলে সাম্রাজ্য থাকবে না। টিকবে না বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামো। সুতরাং ইন্টারনেটকে তারা নজরবন্দি করবে। খোঁয়াড়ে ঢোকাবে। যেভাবে সম্ভব।

সাম্রাজ্যিক শাসকরা আতঙ্কিত। অন্যের রক্ত চুষে আরামে বসে ভোগবিলাসের দিন তাদের বিগতপ্রায়। এটা তারা টের পাচ্ছেন হাড়ে হাড়ে। তাই তারা ইন্টারনেটকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনের দোহাই দিয়ে কোটি কোটি মানুষের জ্ঞান-প্রাইভেসি-প্রকাশ- সৃজন-যোগাযোগের সহজাত স্বাধীন স্পৃহাকে ধ্বংস করে দেওয়া যায় না। এটা জ্ঞান-বিজ্ঞান-অভিজ্ঞতা-অভিজ্ঞান-উপলব্ধি-প্রকাশ ও শেয়ারিং থেকে বঞ্চিত করবে গোটা মানবজাতিকে। এ হবে আত্মিক-সাংস্কৃতিক-আধ্যাত্মিক গণআত্মহত্যার শামিল। সেক্ষেত্রে ইন্টারনেট হবে ডিজিটাল দাসদের জন্য আইনসঙ্গতভাবে নির্ধারিত একটা সংকীর্ণ খোঁয়ার। কর্পোরেট-বাজারের খোঁয়ার। রাষ্ট্রীয় আমলাদের কাছে বাধ্যতামূলক বশ্যতার খোঁয়ার। থাকবে না আপনার যোগাযোগের স্বাধীনতা। থাকবে না পছন্দের স্বাধীনতা। থাকবে না নিজের মতো করে নিজেকে প্রকাশের বা অপ্রকাশের স্বাধীনতা।

তাই ইন্টারনেটের স্বাধীনতাকে, যোগাযোগের স্বাধীনতাকে বাঁচাতে না পারলে দমে যাবে কোটি মানুষের আত্মকর্তৃত্বের জায়মান চাকা। আমরা একটা নিখুঁত টাইপের ডিজিটাল দাসপ্রথায় প্রবেশ করতে শুরু করব। ধীরে ধীরে। অবধারিত-ভাবে। আমরা অনেকে আমাদের স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়ে নিরাপদ এবং অনিশ্চয়তাহীন সামাজিক দাসত্বকে ভালোবেসে মেনে নিতে পারি বৈকি। তবে, সবাই তাতে রাজি হবে না। ফেসবুক ইয়াহু জিমেইল হটমেইল লাইভ আউটলুক ইউটিউব স্কাইপ মাইক্রোসফট অ্যাপল এবং গুগল মেনে নিয়েছে গোপন আদালতের আদেশ। কিন্তু লাভাবিট মানে নি। সাইলেন্ট সার্কেল মানে নি। আরো অনেকেই মানবে না।

ইতোমধ্যে ফুটে উঠছে খোদ মার্কিন জনসাধারণের গণপ্রতিরোধের সুনির্দিষ্ট সব লক্ষণ। ফিসা-আদালতের বিরুদ্ধে লাভাবিট লড়তে যাচ্ছে ফোর্থ সার্কিট আপিল

আদালতে। অত্যন্ত শক্তিশালী এই ফেডালের কোর্ট ১৩টা মার্কিন আপিল আদালতের মধ্যে অন্যতম। আদালতে লড়াইয়ের জন্য লাভাবিটের আইনী তহবিলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মার্কিন জনসাধারণ জমা দিয়েছেন ৯০,০০০ মার্কিন ডলার। লাভাবিট জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। লাভাবিট জয়ী হলে সেটা হবে যোগাযোগের স্বাধীনতার জয়।

একের পর এক নিরাপদ ইমেইল সার্ভিস বন্ধ করে দিয়ে শেষ রক্ষা করতে পারবে না সাম্রাজ্য। রাষ্ট্র-ডেভিলের রক্তচক্ষুকে কলা দেখিয়ে নিরাপদ যোগাযোগের পথ আছে আরো। আছে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ, ফিল জিমারম্যানদের টিমোথি মে, এড-ওয়ার্ড পি. বার্লোদের গড়ে তোলা 'সাইফারপাঙ্কস'দের পথ – ক্রিপ্টো অ্যানার্কির পথ (ক্রিপ্টো অ্যানার্কি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য: পিটার লাডলো, ২০০১)। সাইলেন্ট মেইলবন্ধ করে দেওয়ার পর সিকিউরিটি-গুরু ফিল জিমারম্যান বলেছেন, ভবিষ্যতের তাঁরা গ্রাহকদের জন্য আরো সফিস্টিকেটেড সার্ভিস নিয়ে আসবেন। নতুন নতুন পথ বেরুবে। বোঝা যাচ্ছে।

ইন্টারনেটের কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ নাই। এটা কোনো রাষ্ট্রের সম্পত্তি না। এটা কোনো বাদশাহর সাম্রাজ্য না। এটা চলে স্বাধীনতা, স্বনিয়ন্ত্রণ এবং পরস্পর-সহযোগিতার নীতিতে। সাম্রাজ্যিক আমলাদের মুসাবিদা করা আইনের হুকুমে ইন্টার-নেট চলতে পারে না। ইন্টারনেট মানবজাতির সম্পদ। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বারের মতো এটা মানবজ্ঞানের অসীম ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। দেশ-রাষ্ট্র-জাতি-ধর্ম-ভাষা ও কালের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে ছাড়িয়ে এই প্রথম স্বাধীন বিশ্বমানব হয়ে উঠছে হোমো স্যাপিয়েন্স। তার আর কোনো মোল্লা-মোড়ল-মুরুব্বি দরকার নাই। ভবিষ্যত সাম্রাজ্যের নয়, মনুষ্য-স্বাধীনতার।

রচনা: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৩। প্রকাশনা: 'অঞ্জলি', ঢাকা মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি, শারদীয়া ১৪২০। বামপন্থা ডট কম: ১৪ই নভেম্বর ২০১৩। রচনাটির আলাদা আলাদা টুকরা বিভিন্ন নামে ছাপা হয়েছিল দৈনিক *সোনার দেশ* এবং দৈনিক *বণিক বার্তা* পত্রিকায় ২০১৩ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে।

আমার লিনাক্স, আমার স্বাধীনতা

Berlin Wall: A Perfect Canvas to paint Freedom

৩০.১ জানালা মানে জেলেরই জানালা

ডেস্কটপ-কম্পিউটারে তো কাজ করছিলামই। বছর ষোলো ধরে। শুরুতে আইবিএমের ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম (ডস্), তারপর আপেলের ম্যাকিন্টোশ, তারপর ঘর-বন্ধ-করে-রাখা 'জানালা'র কারিগরি। কত কিছুই তো শিখে ফেলে-ছিলাম। হাতে কোনোকিছু লেখাই বাদ দিয়েছি প্রায়। এমনকি কবিতাও একেবারে কম্পিউটারে। কম্পিউটারের মৌলিক কারিগরি কিছুই জানি না, কিন্তু চিঠিপত্র-প্রবন্ধনিবন্ধ-বইপুস্তক-মলাটকার্ড সরাসরি সব মেশিনে বানিয়ে ঝাড়পোছ-সাজগোজ শেষে ছাপা পর্যন্ত কাজ তো সব ডালভাতই হয়ে গিয়েছিল ওখানে। এখন এই মাঝবয়েসে এসে অজানা সমুদ্রে ভাসা কোন সাহসে? কীসের দুঃখে?

হ্যাঁ, অভাব ছিল বটে সাহসের। সাহস দিল মানুষ- লক্ষ মানুষের বিনা পয়সার সাধনায় তৈরী লিনাক্স। দুঃখও তো ছিলই। ঘর-বন্ধ-করে-রাখা জানালা আর ব্যক্তি-মালিকানাধীন বাগানের আপেলে সারাক্ষণ একটা চোর-চোর ভাব। সারাক্ষণ শুধু বাজার বাজার গন্ধ। যেন ওঁদের পৈতৃক সম্পত্তি আমি না বলে নিয়ে এসেছি। এনে

টাকা শোধ করি নি। তবু ওঁরা কিছু বলছেন না। দয়া করে। কারণ ওনারা উদার জমিদার। আড়ালে দাদনের খাতায় ঠিকই সব লিখে রাখছেন কর্পোরেট তহশীলদার সাহেব। সময়মতো পেয়াদা এসে শুধু বেঁধে নেওয়ার অপেক্ষা। বাজারের ভাইরাসের কথা বাদই দিলাম। আমার চেয়ে বড় চোর ওনারা। পুলিশের রাজত্বে চোর তো থাকবেই। পুলিশ থাকবে আর চোর থাকবে না, তা কখনও হয় না। আর ক-দিন আগেই মাত্র জানলাম উইন্ডোজের ভেতরে সমাহিত আছে সংগুপ্ত সফটওয়্যার-মার্কিন গোয়েন্দাদের। ব্যবহারকারী সম্পর্কে তথ্য পাচার করা সেই সফটওয়্যারের কাজ। তবু, সব কিছুর পরও ভেবেছিলাম, পরের ধনে পোদ্দারির এই জগতে চুরি-বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা। গোলামের গেরিলা-জ্ঞানের ভরসায়, সুতরাং জানালাই সই করে নিয়েছিলাম।

কিন্তু যতটা মধুর-ই মনে হোক, জেলের জানালা সে তো জেলেরই জানালা। জেলের জানালার সাথে বাজারের জানালার ফারাক সত্যি কতটা? সেই জানালায় টাকা দিলে টিকেট মেলে, দাসত্ব দিলে দয়া মেলে। আমার তো চাই অবাধ আকাশ-মুক্ত পাখির। লেনদেন-বেচাকেনা দরকারি, সন্দেহ নাই। তাই বলে সব কিছু নিয়েই বেচাকেনা? টাকা না পেলে চিকিৎসা করব না, মানুষ মরে মরুক। পয়সা না পেলে জ্ঞানবুদ্ধিও শেয়ার করব না। প্রবন্ধ লিখে জাল-বাজারে যাব! না কিনলে পড়তে দেব না। অক্ষর কি আমার বাপের আবিষ্কার? আমার হাড়ের মালিকও কি আমি? আমি বানিয়েছি? চক্ষু-চর্ম-মগজ-মনন কি আমার পেটেন্ট করা? 'টাকা যার বিদ্যা তার' মানে তো মানুষকে নতুন করে বেদ পড়তে না দেওয়া। গরিব তাহলে নিরক্ষরই থাকবে? কম্পিউটার-গরিবও? তাঁর কাছে কম্পিউটার এক নতুন দেবতা হয়েই থাকবে? আর ঐ দেবতার বোতাম টেপাটেপি করে মানুষই মানুষকে পরাধীন (দাস) বানিয়ে রাখবে? স্বাধীনতা শুঁকে শুঁকে তাই এসে ঢুকে পড়লাম লিনাক্স-উবুন্টুর মুক্ত দুনিয়ায়। 'লিনাক্স ফোরাম'-এর ব্যানারের মতো আমিও আজ বলি: 'আমার লিনাক্স, আমার স্বাধীনতা'। এখানে বিদ্যার বেচাকেনা নাই। পুলিশও নাই, চোরও নাই – বলতে গেলে একেবারেই ভাইরাস-ফ্রি একটা অপারেটিং সিস্টেম।

৩০.২ মনুষ্যগুণাবলীর পুনর্জাগরণ ঘটাচ্ছে লিনাক্স

অকৃতজ্ঞ নই। একটা কথা ভুলে যেতে পারি না কখনও। হোক না চোরের মতো, তবু আদৌ যে আজ পিসি ব্যবহার করতে পারছি, তা তো এই ব্যক্তি-বাগানের আপেল আর বাজারের জানালার সুবাদেই। কেউ তাই ভুল বুঝবেন না যেন। জানালার বিরুদ্ধে কুৎসা গাইতে আমি বসি নি এখানে। জানালা তার ঐতিহাসিক ভূমিকা

পালন করেছে। জানালার যুগ এখন শেষ। আমি শুধু দরজাগুলো খুলতে চাইছি। আজকে আমার স্বাধীনতার সীমা বাড়িয়ে দিচ্ছে উবুন্টু ১০.৪। এই 'লিনাক্স ফোরাম'-এ আসার আগে 'উবুন্টু-বাংলাদেশ'-এর মেইলিং লিস্টের সমস্যা-সমাধানের আলোচনায় পারস্পরিক ভালোবাসা আর সহযোগিতার দুর্দান্ত নমুনা দেখেছি আমি। বিনা পয়সায় লোককে শেখানোর দীনেশচন্দ্র সেনদেরকে দেখেছি সেখানে। ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাধি ছাড়া মানুষ নিরুদ্যম, প্রতিযোগিতাহীন, সৃজন -শীলতাহীন হয়ে পড়ে – এই তত্ত্ব আজ অচল। উবুন্টুর ফোরামে দেখলাম রীতিমতো প্রতিযোগিতা: কে কত শেখাতে পারেন। বিনা পয়সায়। রীতিমতো সৃজনশীলতার জোয়ার – কে কত সহজে শেখাতে পারেন। কে কত ভালো করে শেখাতে পারেন।

আমাদের মধ্যে গান্ধী অন্তত জানতেন, 'রাষ্ট্র হচ্ছে সহিংসতার ঘনীভূত ও সংগঠিত রূপের প্রতিনিধি। ব্যক্তির তো আত্মা আছে, কিন্তু রাষ্ট্র একটা আত্মাহীন মেশিন। সহিংসতা থেকে তা কোনোদিনই মুক্ত হতে পারবে না, কেননা এর অস্তিত্বই টিকে আছে সহিংসতার ওপর' (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-ক: ৩১৮)। হিংসার একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রশাসিত বাজারের বর্বরতা মানুষের অবিনশ্বর আত্মাকে দূষিত করে চলেছে গত কয়েক হাজার বছর ধরে। তার জন্যই সমাজে এত গণ্ডগোল, হিংসা, রেষারেষি। এসবের বিপরীতে মানুষের স্বাভাবিক প্রজাতি-গুণাবলীর (স্বাধীনতা এবং সহযোগিতা-সংহতি-সৃজনশীলতা) নবায়ন-পুনর্জাগরণ ঘটানোর কাজ করছে লিনাক্স, আমার বিশ্বাস, তার নিজের মতো করে।

৩০.৩ স্বাধীনতা মানে আনন্দ, স্বাধীনতা মানে সৃজনশীলতা।

স্বাধীনতার জন্যই আমি। আমি মানে আমার স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানে নিজের মনের আনন্দে কাজ করা। মানে সৃজনশীলতা। স্বাধীনতা মানে আরো সব স্বাধীন মানুষের সাথে মিলে মনুষ্য-স্বাধীনতার পরিসর বাড়ানোর কাজ করে যাওয়া। কিন্তু কাজ করব কীভাবে, যদি কাজ না জানি? আফ্রিকা থেকে যেমন 'উবুন্টু' বা 'অপরের হাত ধরে মানবতা'র ধারণা শিখলাম, আফ্রিকা থেকেই তেমনি শিখেছিলাম 'জ্ঞানই মুক্তির চাবিকাঠি'। সেখানকার নৈরাজ্যবাদী কমিউনিস্টদের কাছ থেকে। সত্যি, অজ্ঞানতা পরাধীনতার প্রসূতি, আর স্বাধীনতা সৃজনশীলতার ধাত্রী। তাই, জ্ঞানচর্চার জন্য, জানার জন্য, শেখার জন্য, স্বাধীনতার জন্য আমি এখন লিনাক্সে। আর স্বাধীনতা-সৃজনশীলতা-সংহতির জন্য শুধু লিনাক্সে কেন, সাইবেরিয়া যেতেও আমি রাজি।

কিন্তু নিবন্ধনের পাতা থেকে 'আমি রাজী আছি' বোতাম টিপে এখানে এই 'লিনাক্স ফোরাম'-এ এসে ঢুকলাম ঠিকই, আসলে কিন্তু আমি পুরোটা রাজী নই। কেননা 'আমরা অন্যান্য ফোরামের মত এই ফোরামের ব্যবহারকারীদের উপর শর্তের বোঝা চাপিয়ে দিতে চাইনা। আমরা চাই এই ফোরাম যেকোনো আলোচনার জন্য উন্মুক্ত হোক।' এই চমৎকার কথা বলার পরও যেসব শর্ত মানতে রাজি হয়ে এখানে আমাকে ঢুকতে হলো ('পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য), সেসবের অনেকগুলোরই অপব্যবহার করা সম্ভব। কিন্তু অনুমানটা হচ্ছে, 'কর্তৃপক্ষ' তা করবেন না। আরো একটি অনুমান হচ্ছে, যাঁরা এখানে ঢুকছেন, তাঁরা 'ঝামেলা' করতে পারেন। সেই ঝামেলা দূর করার জন্য তো এতসব শর্তের দরকার পড়ে না। স্বাধীনতা মানে স্বাধীনতাই। স্বাধীনতা আর শর্ত এক সাথে চলে না। প্রত্যেক মানুষেরই ইনবিল্ট আক্কেল আছে। যদি কেউ বেআক্কেলী করেন, তাঁর জন্য আছেন সবাই। সকলে বললেই উনি লজ্জা পাবেন, শুধরে নেবেন। লজ্জার ওপরে কী আছে? তারপরও যদি কেউ ক্রমাগতভাবে নির্লজ্জ বেআক্কেলী করতেই থাকেন, তার জন্যও সবাই-ই আছেন। বেশিরভাগ মানুষের মতামতের ভিত্তিতে তাঁকে আমরা বিদায় জানাতে পারি, তাই না? 'সদস্য নিষিদ্ধকরণ'-এর মতো মারাত্মক কাজের দায়িত্ব শুধু কর্তৃপক্ষের কাঁধে না চাপিয়ে গোটা ফোরাম সম্মিলিতভাবেই তা পালন করুক না। কাউকে শুধরানোর জন্য কর্তৃপক্ষ লাগবে কেন? আর কাউকে শুধরানো আদৌ দরকার কিনা সেটাই বা নির্ধারণ করবেন কে? কর্তৃপক্ষ? সেই জ্ঞান কি শুধু কর্তৃপক্ষেরই আছে? কর্তৃপক্ষ কোনো ভুল করলে তাঁদেরকে শুধরাবেন কে?

আসলে আমি বলতে চাইছি, অন্যের স্বাধীনতাই তো আমার স্বাধীনতার গ্যারান্টি। আর কী লাগে? অপরের স্বাধীনতা না থাকলে আমার স্বাধীনতাও যে বিপন্ন হয়ে পড়বে! আমাদের কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজে ছোটবেলা থেকেই আমরা অপরের ইন্সট্রাকশানের অধীনে চলাফেরা করতে শিখি: 'এটা কোরো, ওটা কোরো না; এটা ভালো, ওটা মন্দ।' নিজস্ব বিচারবিবেচনাবোধ আর আমাদের গড়ে ওঠে না। এর থেকে বেরুনোর একটাই পথ। বিপুল ধৈর্যসহকারে স্বাধীনতাচর্চা করা। ভুল-ত্রুটি করার (এবং আনুষ্ঠানিক শাস্তির বিড়ম্বনা ব্যতিরেকে সেগুলো শুধরে নেওয়ার) সুযোগ না থাকলে স্বাধীনতার চর্চাই মুশকিল হয়ে পড়বে।

অবশেষে আমার পরিচয়।[১] পরিচয়: মানুষ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাচ্চা-মানুষদেরকে পড়াই। ১৯৯৪ সাল থেকে। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে। শুরু থেকেই পড়াই 'বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতি' এবং 'যোগাযোগ ও সমাজ' বিষয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে লিনাক্স-সচেতনতা বাড়ানোর কাজটা তো থাকলই, মুক্ত-

১ লিনাক্স ফোরামের শর্ত হিসেবে নবাগতকে নিজের পরিচয় দিতে বলা হয়েছিল।

শিক্ষকতার উপযুক্ত অবাধ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার চেষ্টা করা আমার এখনকার কাজ। আরো একটা কাজ আছে। বাংলা অঞ্চলের সমাজ-রাষ্ট্র-সংসারে স্বাধীনতা-শীল সমাজতন্ত্রের ধারণা পরিগঠন করা এবং তা অনুশীলনের দিশা অনুসন্ধান করা।

ফেসবুক-নোট, ৩১শে আগস্ট ২০১০

প্রবন্ধ-পরিশিষ্ট: 'লিনাক্স ফোরাম – নিবন্ধন'[২]

লিনাক্স ফোরাম ব্যবহার করার জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম নীতিগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে। আমরা অন্যান্য ফোরামের মত এই ফোরামের ব্যবহারকারীদের উপর শর্তের বোঝা চাপিয়ে দিতে চাইনা। আমরা চাই এই ফোরাম যেকোনো আলোচনার জন্য উন্মুক্ত হোক। তবুও ফোরামে সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য নিম্নলিখিত নীতিমালা অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

১। শুধুমাত্র সঠিক বিভাগেই আপনার পোস্ট/টপিক লিখুন যাতে করে আলোচনাগুলো সুন্দর ভাবে সাজানো থাকে এবং পরবর্তীতে খুঁজে পেতে সুবিধা হয়।

২। সদস্যের যে কোনো লেখা এডমিন বা মডারেটর প্রয়োজনবোধে যে কোনো কারণ দেখিয়ে বা কোন কারণ না দেখিয়েই অন্যকোন বিভাগে সরিয়ে নিতে পারেন। এমন কি, এডমিন বা মডারেটরগণ প্রয়োজনে বিনা নোটিশে যে কোন লেখা মুছে দেওয়ার অধিকারও সংরক্ষণ করেন।

৩। একজন সদস্য একাধিক ইউজারনেম নিতে পারবেন না। ইউজারনেম অবশ্যই সুন্দর ও সহজ পাঠ্য হতে হবে। ফোরাম কর্তৃপক্ষ সদস্যদের বাংলা ইউজারনেম ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করে। ইউজারনেম ব্যবহার করার সময় নিচের বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকুনঃ

ক। ফোরামের প্রশাসন, মডারেটর বা কর্তৃপক্ষের সাথে সংশ্লিষ্টতা বোঝাতে পারে এমন কোন ইউজারনেম নেয়া। যেমনঃ এডমিন, admin, মডারেটর, moderator, রুট, root ইত্যাদি।

খ। ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে বা করতে পারে এরকম নাম নেয়া। যেমনঃ আল্লাহ, ফেরেশতা, শয়তান, ভগবান, ঈশ্বর ইত্যাদি।

গ। বিখ্যাত ব্যক্তিদের নাম দিয়ে নিবন্ধন করা। (তবে বাস্তবেই যদি ব্যবহারকারীর নামের সাথে বিখ্যাত ব্যক্তির নামের মিল থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনা করা হতে পারে।)

ঘ। কাউকে ব্যঙ্গ বা কটাক্ষ করে কোন নাম নেয়া।

ঙ। অশ্লীল নাম অথবা অশ্লীল অর্থ বহন করে অথবা অশ্লীল কিছু ইঙ্গিত করে –

---

২ http://forum.linux.org.bd/ucp.php?mode=register

এরকম কোনো নাম নেয়া।

৪। ব্যবহারকারীর ছবি বা অ্যাভাটারের ক্ষেত্রেও ইউজারনেমের নিয়মগুলো প্রযোজ্য হবে।

৫। অশ্লীল বা অশালীন কোনো লেখা, ছবি, লিংক বা এ জাতীয় অন্য কোনো কিছু পোস্ট করা থেকে বিরত থাকুন। অশ্লীলতার সংজ্ঞা নিরূপণে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৬। সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এমন কোনো উপাদান পোস্ট থেকে বিরত থাকুন। সকল পোস্ট ও টপিক অবশ্যই সববয়সীদের পড়ার জন্য উপযোগী হতে হবে।

৭। বিশেষ কোনো ব্যক্তি, জাতি বা গোষ্ঠিকে আঘাত করে অথবা উস্কানীমূলক, বিদ্বেষ, কোন্দল বা হিংসাত্মক কিছু লেখা যাবে না।

৮। ফোরামে লেখার সকল দায়-দ্বায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখকের/সদস্যের। ফোরাম কর্তৃপক্ষ, মডারেটরগণ বা ফোরাম সংশ্লিষ্ট অন্য কেউ এ জন্য কোনো দায়-দ্বায়িত্ব বহন করবে না।

৯। কপিরাইট/কপিলেফট আইনের প্রতি যত্নবান হবেন। কপিরাইট/কপিলেফট লঙ্ঘন করে, এমন কোন উপাদান অথবা উপাদানের লিংক লিনাক্স ফোরাম ধারণ করতে সম্মত নয়। বিনা অনুমতিতে বা বিনা রেফারেন্সে কারও লেখা বা কর্ম প্রকাশ করা যাবেনা।

১০। লিনাক্স ফোরামের বাইরে অন্য সাইটের লিংক দিতে অনুৎসাহিত করা হচ্ছে। কারণ বাইরের লিংকে উল্লেখ করা কমান্ড ব্যবহার করে কোনো সদস্য কোনো ধরনের সমস্যায় পড়ুক সেটা মোটেই আমাদের কাম্য নয়! আর এ বিষয়ে লিনাক্স ফোরাম কোনরকম দায় দায়িত্ব বহন করবেনা।

১১। লিনাক্স ফোরামে ... বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপণ প্রচার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

১২। আমরা প্রত্যেক সদস্যের কাছ থেকেই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ আশা করি। আমরা এও আশা করি যে ফোরামের সদস্যগণ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্তা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় যত্নবান হবেন।

১৩। ফোরাম কর্তৃপক্ষ এবং/অথবা মডারেটরগণ তাৎক্ষণিকভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে এই নীতিমালা প্রয়োগ করতে পারেন এবং সদস্য নিষিদ্ধকরণসহ যেকোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

ফোরামে পোস্ট/যোগদানের করার পূর্বে সকলকে এই বিষয়টি ভালোভাবে পড়ে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।লিনাক্স ফোরামের সদস্য হওয়ার মাধ্যমে আপনি নিশ্চিত করছেন যে ফোরাম থেকে বিভিন্ন ইমেইল, ঘোষনা ইত্যাদি পেতে আপনার আপত্তি নেই। লিনাক্স ফোরাম আপনার ইমেইল একাউন্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের সাথে শেয়ার করবে না।

সম্পর্ক স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথ*

African American Black Art Freedom Dance Oil Painting

মুখস্ত সম্পর্কে ছিলাম না কোনো দিন। মুখস্তের মুখ চোখে পড়া মাত্র মুখ ফিরিয়েছি। শিরোনামের 'সম্পর্ক'টাও আমার অজানা সম্পর্ক বটে। সম্পর্ক মাত্রই আমার কাছে প্রেম। প্রেমে পড়েছি তাঁর। এ রচনা লিখতে বসে তাঁর সাথে আমার প্রেমের দাগ-গুলোকে শনাক্ত করার চেষ্টা করছি মাত্র। খেয়াল করছি, বিশ্বপ্রকৃতিতে অবস্থিত ব্যক্তি-মানুষের 'স্বাধীনতার নিয়ম'গুলোকে ক্রম-আত্মস্থ করার সূত্র ধরেই সম্পর্ক আমার তাঁর সাথে। রবীন্দ্রনাথের সাথে। যুক্তি আর মুক্তিকে কেন্দ্র করেই আমার

* পত্রিকায় প্রকাশের সময় রচনাটা আমি উৎসর্গ করেছি আমার বন্ধু 'চিহ্ন-সম্পাদক প্রফেসর শহীদ ইকবালের প্রীতিকমলে'। ইকবালদের পত্রিকা চিহ্ন-র সাম্প্রতিক কোনো একটা রবীন্দ্রবিষয়ক সংখ্যার জন্য তিনি আমাকে 'আমার রবীন্দ্রনাথ' নামে একটা লেখার জন্য বলেছিলেন। এটাই সেই রচনা। কিন্তু একটুর জন্য এটা আমি তাঁর হাতে সময়মতো পৌঁছাতে পারি নি বলে চিহ্ন-তে এটা ছাপা হয় নি। এখানেও রইল এটা প্রফেসর ইকবালের প্রীতিকমলে।

রবীন্দ্রনাথ। যুক্ত তিনি সকলের সাথে। সর্বময় যুক্ততার সর্বজনীন উপলব্ধিই তাঁর মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার সারসত্তা। যাবতীয় বদ্ধতাকে মুক্ত করার সাধনাই তাঁর সাধনা। 'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ' তাঁর মূলমন্ত্র।[১] আবিশ্ব যুক্ততার 'বিশ্বধর্ম' তাঁর একান্ত উপলব্ধি। যুক্ততার যুক্তি তাই বন্ধন হয়ে ওঠে না তাঁর জন্য। বিশ্বধর্ম হয়ে ওঠে বিশ্বজনীন মুক্তিধর্ম। 'বিশ্বধর্মের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকে মেলাতে পারলেই আমরা বস্তুত স্বাধীন হই। স্বাধীনতার নিয়মই তাই।'[২]

আমার যুক্তিবোধ কোনো গুরুজনের কাছ থেকে আয়ত্ত-বস্তু নয়। বই পড়েও শেখা নয়। আগুনের সাথে কয়লার সংযুক্তির শিখায়ই কেবল শিক্ষা করা যায় এ যুক্তিবোধ। নিছক মনুষ্যস্বভাবে। নিতান্তই জন্মসূত্রে। কোনোকিছু সহকারে যা জন্মায়, তা-ই সহজ। আমার যুক্তিবোধ আমার সাথেই জন্মেছে। তাই আমার যুক্তিবোধ সহজ। সহজাত। সহজ যুক্তি এই যে: যুক্তি কোনো তর্কযুক্তি নয়। মত-বিরোধের যুক্তিও নয়। ওসব নিছক গালাগালির যুক্তি। (স্মর্তব্য: 'মতবিরোধ নিয়ে তোমরা যাকে যুক্তি বলো আমরা তাকে বলি গাল'।[৩])। গালাগালির যুক্তির কথা এখানে হচ্ছে না। লজিকবিদ্যার যুক্তির কথাও নয়। আমার যুক্তিবোধ সম্পর্কের। ভালোবাসার। প্রেমের। এবং অবশ্য-অবশ্যই মুক্তির আর স্বাধীনতার।

যুক্তি বলতে যুক্ততা বোঝায়। আমার যুক্তিবোধ হলো যুক্ততার বোধ। একটা কিছু অন্য কিছুর সাথে যেভাবে সম্পর্কিত, যেভাবে যুক্ত, যেভাবে পার্থক্যযুক্ত, সেটাই তাদের মধ্যকার যুক্তি। ঐ যুক্তিতেই তারা পরস্পর-সম্পর্কিত। এই অর্থে যুক্তিবোধ লজিকবিদ্যা-বিবর্জিত কিছুও নয়। সম্পর্কই যুক্তি – যুক্ততা। আর প্রেমও এক প্রকার সম্পর্ক। যুক্তিই তাহলে প্রেম। যুক্তিবোধই প্রেমবোধ। যুক্তির অনুভূতি তথা যুক্ততার অনুভূতিই তাহলে প্রেমের অনুভূতি। উপরন্তু প্রেম স্রেফ এক প্রকার সম্পর্কই নয় – সর্ব প্রকার সম্পর্কই প্রেম। যাবতীয় সম্পর্কই একেক ধরনের প্রেম। প্রেম তাহলে নিছকই সম্পর্ক। টান। কীভাবে একে অন্যকে টানে, টানাটানি হয়, সেটাই তাদের মধ্যকার যুক্ততা, সম্পর্ক, প্রেম। প্রেম তাই টানাপোড়েনমুক্ত হয় না। হতে পারে না।

---

১ রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, পূজাপর্ব, ১১১ সংখ্যক গান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাষা-প্রযুক্তি-গবেষণা পরিষদ পরিবেশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ডট এনএলটিআর ডট অর্গ। এর পর থেকে শুধু 'রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ' হিসেবে উল্লেখিত।

২ রবীন্দ্রনাথ, 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের ১ম পর্বের 'ত্যাগ' নামাঙ্কিত অংশ, রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ।

৩ রবীন্দ্রনাথ, 'সংগীতচিন্তা' বইয়ের 'সংযোজন' অংশে 'কল্যাণীয় ধূর্জটি'প্রসাদকে লেখা চিঠি, রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ।

টানাটানিতে অন্তর পোড়ে। না পুড়লে প্রেম হয় না। আলো হয় না। সম্পর্ক হয় না। যে সম্পর্ক এমনকি নষ্ট হয়ে যায় বলে মনে হয়, সেও এক প্রকার সম্পর্কই। তাতে দূরত্ব বেশি। টান কম। তাই টানাটানি কম। দহনও কম। তবু সেটা সম্পর্ক। দুর্বল সম্পর্ক। দুর্বল সম্পর্ক মানেই খারাপ সম্পর্ক না। প্রবল সম্পর্কও খারাপ হতে পারে। টানাপোড়েন তাহলে সমস্যা না। টানাপোড়েনই সম্পর্ক বরং। কোনো না কোনো প্রকার টানাপোড়েন। টান ছাড়া সচলতা নাই। আর এই মহাবিশ্বে কিছুই স্থির নয়। অনড় নয়। সচল। সম্পর্ক তাই অনড় নয়। সদাপরিবর্তমান। 'পাল্টায় মন, পাল্টায় চারপাশ, রাস্তায় আসে নতুন রুটের বাস; পাল্টায় চেনা মুখের দেখন-হাসি, পাল্টাও তুমি তোমায় দেখতে আসি' (কবীর সুমনের গান)।

অনেকেই এই অপরিহার্য পরিবর্তন মানতে চান না। নিজেরা বদলান। কিন্তু বদলটাকে খেয়াল করতে চান না। স্বীকার করেন না। যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁদেরকে উল্টো বলেন পাল্টি-খাওয়া লোক। পাল্টে যাওয়া প্রেমিকের মুখ দেখতে চান না কেউ। মান্না দের মতো তাঁদের অন্যতম 'সিগনেচার সং' হয়: 'তুমি কি সেই আগের মতোই আছো? নাকি অনেকখানি বদলে গেছ? খুব জানতে ইচ্ছে করে।' জানতে আসলে ইচ্ছা করে 'তুমি' বদলাও নি। কেউ বদলাবে না। সব আগের মতো থাকবে।

কৃষি-কেন্দ্রিক, ভূমি-মালিকানাভিত্তিক এই সামন্ত মনন ভারতবর্ষকে ভাষায় গাছের মতো অনড় করে রেখেছিল সহস্র বছর (কার্ল মার্ক্স, 'ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যত ফলাফল')। আমাদের মন এখনও সেই অচলায়তনে স্থির হয়ে থাকতে চায়। একেবারে কালোপাহাড়ি আইকনোক্লাস্টের মতো করে সেই 'অচলায়তন'কে আক্রমণ করেন রবীন্দ্রনাথ। বাঁধ ভেঙে 'মুক্তধারা' বওয়ানোর সাধনায় অনির্লিপ্ত থাকেন জীবনভর।

জীবন তো আর থেমে থাকে না। 'রাস্তার নাম পাল্টায় একদিন, ধারা পাল্টায় মাও সে তুং-এর চীন; প্রেম পাল্টায়, শরীরও পাল্টে যায়, ডাকছে জীবন: আয় পাল্টাবি আয়' – এ ডাক কবীর সুমনের নয় আসলে। এ ডাক শুষ্ক-সজল জীবনের। এ ডাকে সাড়া দেয়া সহজ নয়। তার জন্য নিজেকে সহজ করে তুলতে হয়। স্বরচিত মুখোশের আড়ালে, আর কল্পখোলসের ভেতরে নিজেকে বন্দি করে রাখলে চলে না। নিজের দায়িত্বটুকু অন্তত নিতে হয়। নিজের অধীন হতে হয়। স্বাধীন হতে হয়। তবেই জীবনপ্রবাহের গতিধর্ম-স্থিতিধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। পরিবর্তনকে ভয় লাগে না। অনেকে সেটা মানতে পারেন না। অনড় স্থিরতা চান তাঁরা। ধ্রুব প্রেম চান। তাঁদের প্রেমও পাল্টায় না। শরীরও পাল্টায় না। ওগুলো পাল্টালেও মনটা পাল্টায় না। রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন হৃদয়' পর্যন্ত 'পুলকে দুলিয়া' ওঠে অথচ আমাদের নতুন হৃদয় ভদ্রলোকেরা সুস্থির, গৃহপালিত, গেরস্থালি প্রেম চান।

সম্পর্কের স্থিরতা চাওয়া কেন? ভয়ে। পরিবর্তনের ভয়। নতুনের ভয়। তাছাড়া, সম্পর্ক সুস্থির হলে, তাকে নিজের দরকার মতো ব্যবহার করতে সুবিধা হয়। সুস্থির সম্পর্ক হলো কেজো সম্পর্ক। প্রয়োজন পূরণের সম্পর্ক। দরকারের সম্পর্ক। উদ্দেশ্য হাসিলের সম্পর্ক। উদ্দেশ্য: নিজের স্থূল কামনা বাসনা প্রলোভনকে চরিতার্থ করা। এ হলো স্থূল সম্পর্ক। স্থূল সম্পর্ক কামপরায়ণ। স্থূল প্রেমিক আসলে প্রেমিকই নন। সম্পর্ক-সন্ধানী তিনি – সুযোগসন্ধানী। ধান্দাবাজ। কামুক তিনি। তিনি শুধু নিজের ইন্দ্রিয়বাসনা চরিতার্থ করতে চান। ষড়রিপুর কাছে নিজেকে সঁপে দেন তিনি। রিপু আর ইন্দ্রিয়ই তার সুখ। নিজেকে সুখী করতে চান তিনি। কিন্তু তাঁর আনন্দ হয় না। কেননা কামনা কোনোদিন পরিতৃপ্ত হয় না। এই অপরিতৃপ্তি তাঁকে ব্যর্থতার অনুভব দেয়। ব্যর্থতা তাঁর কাছে অসহনীয়। তিনি চান সফলতা। সফলতার তাড়না থামতে দেয় না। 'আরো চাই, আরো চাই' স্পৃহা কেড়ে নেয় স্বাধ-আহ্লাদ-সাধনার স্বাদ। প্রয়োজনের সম্পর্ক তাই আনন্দহীন। কেননা তা উদ্দেশ্যপরায়ণ।

প্রেম অবসরের ঘটনা। প্রেম কোনো ব্যস্ত কাহিনী নয়। ব্যস্ততা অফিসের প্রসঙ্গ। বাণিজ্যের প্রসঙ্গ। অবকাশ নিজেই প্রেম। উদ্দেশ্যহীন অবকাশ। এর সম্পর্ক রিক্ততার সাথে। রবীন্দ্রনাথের দেখা সেই রিক্ত একটা ঘরের মধ্যে এর বাস:

> ঘরের মধ্যে একেবারে কোনো আসবাব নেই। একটি দেয়ালে একখানি ছবি ঝুলছে। ওই ছবি আমার সমস্ত চোখ একা অধিকার করে; চারি পাশে কোথাও চিত্তবিক্ষেপ করবার মতো কিছুই নেই। রিক্ততার আকাশে তার সমস্ত অর্থটি জ্যোতির্ময় হয়ে প্রকাশ পায়। ঘরে যদি নানা জিনিস ভিড় করত তবে তাদের মধ্যে এই ছবি থাকত একটি আসবাবমাত্র হয়ে, তার ছবির মাহাত্ম্য ম্লান হত, সে আপনার সব কথা বলতে পারত না।
>
> কাব্য সংগীত প্রভৃতি অন্য-সমস্ত রসসৃষ্টিও এইরকম বস্তুবাহুল্যবিরল রিক্ততার অপেক্ষা রাখে। তাদের চারিদিকে যদি অবকাশ না থাকে তা হলে সম্পূর্ণ মূর্তিতে তাদের দেখা যায় না। আজকালকার দিনে সেই অবকাশ নেই, তাই এখনকার লোকে সাহিত্য বা কলাসৃষ্টির সম্পূর্ণতা থেকে বঞ্চিত। তারা রস চায় না, মদ চায়; আনন্দ চায় না, আমোদ চায়। চিত্তের জাগরণটা তাদের কাছে শূন্য, তারা চায় চমকলাগা। (রবীন্দ্রনাথ, 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি', রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ।)

চিত্তের এ জাগরণই প্রেম। আত্মজাগরণ। হেনরি ম্যাকে'র 'নৈরাজ্য' কবিতার মতো 'যখন প্রত্যেকে জেগে উঠবে নিদেনপক্ষে নিজের নিকটে' তখন আমরা প্রেমময় সমাজ পাব। আত্মজাগরণই আত্মবিকাশ। আত্ম-পরিচয়। আত্ম-

অধীনতা। স্ব অধীনতা। স্বরাজ। এ বস্তুর নামই প্রেম। প্রেম ছাড়া স্বাধীনতা নাই। আত্ম-পরিচয়ের বিকাশ যার মধ্যে ঘটে নি, যার আত্মা এখনও সুপ্তিকাতর, প্রেম তার কাছে অনুষ্ঠান। নায়কনায়িকার হাত-ধরাধরি করে সিনেমা দেখতে যাওয়ার অনুষ্ঠান। মিডিয়া-ম্যানুয়ালে সূচিবদ্ধ অনুষ্ঠান। প্রেম কোনো ভিড়ের গল্প নয়—

> ভিড়ের ঠেলাঠেলির মধ্যে অন্যমনস্কের মন যদি কাব্যকে গানকে পেতে হয় তা হলে তার খুব আড়ম্বরের ঘটা করা দরকার। কিন্তু সে-আড়ম্বরে শ্রোতার কানটাকেই পাওয়া যায় মাত্র, ভিতরের রসের কথাটা আরো বেশি করে ঢাকাই পড়ে। কারণ, সরলতা স্বচ্ছতা আর্টের যথার্থ আভরণ। যেখানে কোলাহল বেশি, ভিড় বৃহৎ, মন নানা কিছুতে বিক্ষিপ্ত, আর্ট সেখানে কসরত দেখাবার প্রলোভনে মজে, আপনাকে দেখাতে ভুলে যায়। আড়ম্বর জিনিসটা একটা চিৎকার; যেখানে গোলমালের অন্ত নেই সেখানে তাকে গোচর হয়ে ওঠবার জন্যে চীৎকার করতে হয়; সেই চীৎকারটাকেই ভিড়ের লোক শক্তির লক্ষণ জেনে পুলকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আর্ট তো চীৎকার নয়, তার গভীরতম পরিচয়ে হচ্ছে তার আত্মসংবরণে। আর্ট বরঞ্চ ঠেলা খেয়ে চুপ করে যেতে রাজি আছে, কিন্তু ঠেলা মেরে পালোয়ানি করার মতো লজ্জা তার আর নেই। হায় রে লোকের মন, তোমাকে খুশি করবার জন্যে রামচন্দ্র একদিন সীতাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন...। (রবীন্দ্রনাথ, 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি', রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ।)

দেশ-দশ-সমাজের বাইরে নয় প্রেম। যে নিজেকে চেনে, পরিবেষ্টনী-প্রকৃতি-পুঞ্জকে সহকারেই নিজেকে চেনে সে। যে নিজেকে ভালোবাসে, সে ভালোবাসে সবাইকে। কিন্তু তাই বলে প্রেম চীৎকার নয়। আড়ম্বর নয়। কোলাহল নয়। গোলমাল নয়। ক্রমাগত ভিড় ঠেলাঠেলি করে সিনেমা হলের টিকেট কাউন্টার থেকে টিকেট জোটানোর সফলতা নয়। প্রেম অপ্রয়োজনের। অকারণের। অকারণই তো কাব্য, কলা, সাহিত্য, গান, আর্ট। অকারণেই আনন্দ। তাসের দেশের 'বসন্তে যারা ঝাঁকে ঝাঁকে চলেছে হিমালয়ের দিকে', সেই হাঁসের দলের অকারণ আনন্দের মতো। রবীন্দ্রনাথ জানেন: 'ওড়বার আনন্দ, অকারণের আনন্দ'।

বৃথা ওড়ার আনন্দের নাম প্রেম। বৃথা-সম্পর্কের নাম প্রেম। উদ্দেশ্যহীন, কামনা-হীন, প্রত্যাশাহীন সম্পর্কের নাম প্রেম। প্রেম শুধু প্রেমকেই চায়। প্রেমের কোনো পূর্ব-নির্ধারিত উদ্দেশ্য নাই। পূরণ করার মতো বিশেষ কোনো ধান্দা নাই। সম্পর্কিত সত্তাকে সুখী করার সাধনার নাম প্রেম। সম্পর্কিত সত্তা সুখী হলেই প্রেমিকের সুখ। এ হলো কামনা মোচনের সাধনা। রিপু, ইন্দ্রিয়, আর কামনাকে অতিক্রম করে প্রেম।

নিষ্কাম কর্মযোগের নাম প্রেম। প্রেমে তাই সবই পাওয়া যায়। কোনো অভাবই থাকে না প্রেমে। মন মলিন হয় না। ভাব থাকে শুধু। আনন্দ থাকে। মিলনের আনন্দ। রক্ত-ক্ষরণের আনন্দ। পোড়ার আনন্দ। আলোর আনন্দ। অকারণ আনন্দ।

প্রেম এতই অকারণ যে এমনকি দায়িত্বহীনও বটে। কর্তব্যবোধতাড়িত সম্পর্কের নাম প্রেম নয়। চুক্তি। বিবাহ। তার সম্পর্ক দায়-দায়িত্ব-অধিকারের সাথে। প্রেমের সাথে সাথে নয়। আনন্দের সাথে নয়। আনন্দ তো বন্ধুকে সুখী করাতেই। কিন্তু তা কর্তব্য নয়। কর্তব্য সংবিধানের অংশ। প্রেম বেআইনী। আইন-অতিক্রমী। সংবিধান-বহির্ভূত। তার আইন তার নিজের রচিত। তা সে বদলায়ও নিজে। প্রেম এক্ষেত্রে আর্টের মতোই। 'তার মধ্যে কোনো দায়ই নেই, কর্তব্যের দায়ও না।' রবীন্দ্রনাথের কাছে শিখি উপনিষদের গল্প:

> উপনিষদে লিখছে, এক ডালে দুই পাখি আছে, তার মধ্যে এক পাখি খায় আর এক পাখি দেখে। যে পাখি দেখছে তারই আনন্দ বড়ো আনন্দ। কেননা তার সে বিশুদ্ধ আনন্দ, মুক্ত আনন্দ। মানুষের নিজের মধ্যেই এই দুই পাখি আছে। এক পাখির প্রয়োজন আছে, আর-এক পাখির প্রয়োজন নেই। এক পাখি ভোগ করে, আর-এক পাখি দেখে। যে পাখি ভোগ করে সে নির্মাণ করে, যে পাখি দেখে সে সৃষ্টি করে। নির্মাণ করা মানে মাপে তৈরি করা, অর্থাৎ যেটা তৈরি হচ্ছে সেইটেই চরম নয়, সেইটেকে অন্য কিছুর মাপে তৈরি করা – নিজের প্রয়োজনের মাপে বা অন্যের প্রয়োজনের মাপে। আর সৃষ্টি করা অন্য কোনো-কিছুর মাপের অপেক্ষা করে না, সে হচ্ছে নিজেকে সৃজন করা, নিজেকেই প্রকাশ করা। এইজন্য ভোগী পাখি যে সমস্ত উপকরণ নিয়ে কাজ করছে তা প্রধানত বাইরের উপকরণ, আর দ্রষ্টা পাখির উপকরণ হচ্ছে আমি-পদার্থ। এই আমির প্রকাশই সাহিত্য, আর্ট। তার মধ্যে কোনো দায়ই নেই, কর্তব্যের দায়ও না। (রবীন্দ্রনাথ, 'জাপানযাত্রী', দ্বিতীয় অংশ, রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ।)

এই আমির প্রকাশই সত্তার প্রকাশ। সর্বসত্তার। এই আমির প্রকাশই ব্যক্তি-মানুষের স্বাধীনতার সম্ভাব্য চূড়ান্ত বাস্তব রূপ। কেননা স্বাধীনতা সীমাহীন নয়। আমার প্রকাশের সীমাই আমার স্বাধীনতার সীমা। তাই বলে কোনো দায়িত্ব-কর্তব্য-আইন-কানুন-আদালত আমার প্রকাশের সীমা নির্ধারণ করতে পারে না। এই সীমা নির্ধারণ করতে পারি শুধু আমি। তা আমি নির্ধারণ করি আমার প্রকাশের সীমা অনুভব করার মধ্য দিয়ে। এ সীমাবদ্ধতা আরোপিত নয়, অন্তর্জাত নয়, অন্তঃ-নিবিষ্ট। আমার ভেতরের এ সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রমও করতে পারি আমি। নবরূপ

নবপ্রকাশের কর্তব্য-ঊর্ধ্ব আনন্দে। আবার, রূপ সৃষ্টির এ স্বাধীনতা যেহেতু আমার, এ তাই বন্ধুরও (সবার)। তাঁর স্বাধীনতাই তো আমার স্বাধীনতার মানদণ্ড। বব মার্লের গানের মতো: বন্ধু তো সে যে তোমাকে পেতে দেয় পূর্ণ স্বাধীনতা যেন তুমি হয়ে ওঠো তুমিই নিজে।' প্রেম তাই স্বাধীন। সেজন্যই সীমাহীন।

ধ্রুব প্রেম বলে কিছু নাই। প্রেমকে যাঁরা নিটোল, গতিহীন সত্তা বলে চাউর করে চলেছেন হাজার বছর ধরে, তাঁরা প্রেমের নিজস্ব যুক্তির দিকে তাকান না। তাঁরা যুক্তিবোধহীন। আর সেকারণেই তাঁরা আবেগবোধবর্জিত। প্রেমের চাইতে প্রবল আবেগ কী আছে? অন্যের সাথে যুক্ত হতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষা আর কী আছে? এ জন্যই যুক্তিবোধহীন যিনি, তিনি আবেগবোধহীনও বটে। (দেখার বিষয়: যুক্তিহীন বলি নি, আবেগহীন বলি নি।) যুক্তি তাহলে আবেগই বটে। যুক্তি আর আবেগ পরস্পর-বিপরীত কিছু নয়। এরা একই জিনিসের দুই নাম। একই জিনিসকে দুইভাবে দেখার জন্য দুইটা নাম মাত্র।

জ্ঞান-ইন্ডাস্ট্রি যে বস্তুকে যুক্তি বলে চালায় তা আসলে অস্ত্র। হাতিয়ার। অন্যকে ঘায়েল করার হাতিয়ার। এই যুক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায়। করা হয়ে থাকে। এই যুক্তি হলো ব্যক্তির অন্ধ বাসনার শার্টের হাতায় লুকানো ছুরি। চক্ষুহীন কামনার আঁচলে লুকানো বল্লমের ফালা। আমার বাসনা পূরণে যা-কিছু প্রবল বাধা, এ দিয়ে সেসবকে বধ করা যায়। বিচারবুদ্ধিহীন কামনা বাসনা পূরণের পথ পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহার্য কাস্তে এই প্রচলিত যুক্তি। এর সাথে প্রেম নেই। সম্পর্ক নেই। আছে জোরাজুরি। আছে জবরদস্তি। অর্থাৎ বলপ্রয়োগ।

যুক্তির এই অর্থে বলপ্রয়োগ আর যুক্তিপ্রয়োগ একই কথা। এ যুক্তি তাই প্রেমের নয়। প্রভুত্বের। এ যুক্তি মালিকের যুক্তি। মালিকানার যুক্তি। অন্যকে নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-কামনা বাসনা অনুসারে পরিচালিত করার যুক্তি। 'যদি দেখি যে মনের মতো ফল হচ্ছে না তাহলে জবরদস্তি করতে ইচ্ছা করে, তখন, নিজের শক্তি ও অধিকারকে নয়, অন্যেরই বুদ্ধি ও স্বভাবকে ধিক্কার দিতে প্রবৃত্তি জন্মে।'[৪] জবরদস্তির যুক্তিবোধ রবীন্দ্রনাথের নয়। তাঁর যুক্তি 'স্বাভাবিক' যুক্তি। ছন্দের লয় যেমন স্বাভাবিক, সেরকম স্বাভাবিক এ যুক্তিবোধ। এ যুক্তিতে জবরদস্তি নিতান্তই অচল। 'আমাদের প্রাণের, আমাদের হৃদয়ের ছন্দের একটা স্বাভাবিক লয় আছে; তার উপরে দ্রুত প্রয়োজনের জবরদস্তি খাটে না'।[৫]

জবরদস্তির প্রবৃত্তি-যুক্তির সাথে প্রেম-ভালোবাসার কোনো সম্পর্ক নেই। এ

৪ রবীন্দ্রনাথ, 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বের 'সঞ্চয়তৃষ্ণা' অংশ, রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ।

৫ রবীন্দ্রনাথ, 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি', রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ।

হলো ভালোবাসার নামে, প্রেমের নামে, পিতৃত্বের নামে, মাতৃত্বের নামে, ধর্মের নামে, অন্যকে দিয়ে নিজের দাসত্ব করানোর যুক্তি। এ যুক্তি রবীন্দ্রনাথের না। রবীন্দ্রনাথ জানেন, মানুষ নিজেই নিজের প্রভু হতে চায়। 'সমস্ত প্রলোভনসত্ত্বেও দাসত্ব তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নয়'; কেননা 'সে জানে তাহার (নিজেরই) মধ্যে প্রভুত্বের একটি স্বাধীন সম্পদ আছে'; 'স্বভাবতই সে প্রভু; সে বলে আমি নিজের আনন্দে চলিব, আমার নিজের কাজের বেতন আমার নিজেরই মধ্যে—বাহিরের স্তুতি বা লাভ, বা প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার মধ্যে নহে। যেখানে সে প্রভু যেখানে সে আপনার আনন্দে আপনি বিরাজমান, সেইখানেই সে আপনাকে দেখিতে চায়; সেজন্য সে দুঃখ কষ্ট ত্যাগ মৃত্যুকেও স্বীকার করিতে পারে। সেজন্য রাজপুত্র রাজ্য ছাড়িয়া বনে যায়—পণ্ডিত আপনার ন্যায়শাস্ত্রের বোঝা ফেলিয়া দিয়া শিশুর মতো সরল হইয়া পথে পথে নৃত্য করিয়া বেড়ায়।' আর 'এই জন্যই মানুষ এই একটি আশ্চর্য কথা বলে, আমি মুক্তি চাই।' (রবীন্দ্রনাথ, 'ধর্মের অর্থ', প্রবন্ধ-সংকলন: 'সঞ্চয়', রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ।) মুক্তি ছাড়া তাই যুক্তি নাই। মুক্তি-যুক্তির সম্পর্ককে আবিষ্কার করাই আমার রবীন্দ্রনাথকে দেখার আনন্দ।

সম্পর্ক ঘরে থাকে। সম্পর্ক থাকে বাইরেও। ঘর আর পথ শেষ পর্যন্ত আলাদা কিছু নয়। মুসাফির-রাস্তাই তো ঢোকে ঘরে। আবার, ঘর থেকেই পথে বেরোয় মানুষ। ঘর যাঁর নাই কিংবা ছিল না, পথ নামক বস্তুটার কোনো ধারণাও তাঁর নাই। ঘরে ছিলেন বলেই তিনি পথে নেমেছেন। ঘর মানে যেকোনো আশ্রয়। সকল আশ্রয়ই অস্থায়ী আশ্রয়। সম্পর্ক তাই সরাইখানা বটে। সরে সরে যায় সে সারাক্ষণ। তার ওপরকার সামিয়ানা কখনও দূরের আকাশ। কখনও তা কাছের ছাউনি, গাছতলা, ছাদ, চাতাল। সম্পর্ক তাহলে যেমন আশ্রয়ের— বিশ্রামের, সম্পর্ক তেমনই আবার অবিশ্রাম পথচলারও। কেননা পথই ঘর অনেকের। উপরন্তু, অনেকের জন্য এমনও হতে পারে: ঘরই পথ তাঁদের। ঘটনা তাহলে পথ কিংবা ঘর নয়। ঘটনা হচ্ছে হাঁটা।

সম্পর্ক হচ্ছে আত্মার আশ্রয়। আশ্রয় দরকার তার। কেননা তা হাঁটে। পথ চলে। হাঁটে, অনুসন্ধান করে, আস্বাদন করে। আস্বাদন করে একাধারে অমৃত এবং গরল। যখন সে অবিরাম হাঁটে, তখনও কিন্তু শান্ত নিষ্ঠার সাথে অস্তিত্বে একাগ্র থাকে তার আত্মা। আবার, আশ্রয় তাঁর ঘরও। কেননা সে থামেও। থামে, অনুসন্ধান করে, আস্বাদন করে। আস্বাদন করে একাধারে অমৃত এবং গরলের মধ্যবর্তী আনকা নহর। যখন সে থেমে থাকে, তখনও কিন্তু অশান্ত পরিভ্রমণে বহু অগ্রে রত থাকে আত্মা তাহার। গৃহক্লান্ত-গৃহত্যক্ত মানুষের কাছে পথই অবিকল্প আশ্রয়। পথ হচ্ছে ঘরের সাথে তার সম্পর্ক অনুধাবনের অবসর। আবার, মরুপথে দিশাহারা মুসাফিরের আশ্রয় হচ্ছে মরুদ্যান – এক চিলতে ঘর। মরুদ্যানই মরুভূমির

সাথে তার সম্পর্ক উপলব্ধি করার অবকাশ।

রবীন্দ্রনাথ আমার অবসর। আলো আনন্দ আর গানের এই অবসরটুকু আছে বলেই হাঁটতে পারি আমি। হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পাই: 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে; আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে।' আমার নশ্বর দেহ তখন আর জৈবযান্ত্রিক সায়েন্স-সম্মত জড়দেহমাত্র নয়, সদামুক্ত অবিনশ্বর আত্মার সশরীর সামাজিক অস্তিত্ব। 'শরীরকে হত্যা করিলেও ইনি নিহত হন না' (*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক ২০)। আমি তখন উপলব্ধি করতে পারি সমুদয় প্রপঞ্চের সাথে আমার সমুচয় সম্পর্কের মুক্ততার সারসত্তা। অনুধাবন করতে পারি অন্তহীন সম্পর্করাশির পারস্পরিক মুক্ততার নিত্যস্বভাবটাকে। টের পাই: অনতিক্রম্য যুক্ততার স্বরূপ উপলব্ধি করার মধ্যেই আছে মুক্তির অভিজ্ঞান। টের পাই অস্তিত্বজোড়া অবিণাশী মুক্ত সম্পর্কের স্বাদ। পারস্পরিক দাসত্বের অচলায়তনে জবুথবু আমাদের প্রেম-পরিবার-রাষ্ট্রের আজ্ঞাবহ আইনী সম্পর্কের সীমা তখন অনন্ত স্বাধীন সম্পর্কের অভিসারী হয়ে ওঠে।

আরো অনেক কিছুর মতো, রবীন্দ্রনাথ আমার অবকাশ। নিরাকার আঁধার আর বিশেষণ-অযোগ্য বিষণ্নতার এই অবকাশটুকু আছে বলেই আমি অনুধাবন করতে পারি এ মহাবিশ্বের সাথে আমার বন্ধনহীন যুক্ততার স্বরূপ। টের পাই বাঁচার যুক্তি। এই যুক্তিবোধ আমাকে মুক্তি দেয় যুক্তিহীন সম্পর্কের গতিহীন গ্লানি থেকে। বদ্ধ ও বাধ্যতামূলক সম্পর্করাজির যাবতীয় রাষ্ট্র-সামাজিক জবরদস্তি থেকে।

রচনা: রাবি, জুলাই-আগস্ট ২০১৩। প্রকাশ: দৈনিক বণিক বার্তা, ২১শে সেপ্টেম্বর ২০১৩।

বত্রিশ

কর্তৃত্বতন্ত্র শিল্পবোধ স্বাধীনতা: সিনেমা, সমাজ ও সম্পর্ক নিয়ে কিছু কথা

www.royalalbertamuseum.ca/virtualexhibit/arpillera/photos/H89.24.12.jpg

শিল্প মারা গেছে – তার মৃতদেহ গিলো নাকো আর
প্যারিস-বসন্ত, ১৯৬৮-র দেয়াল-লিপি (কেন ন্যাব, ২০০৬)

৩২.১ শ্রদ্ধেয় সিনেমাশিল্পী আবু সাইয়ীদ

বছর খানেক আগের কথা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন শ্রদ্ধেয় সিনেমাশিল্পী আবু সাইয়ীদ। এখানে সিনেমা নিয়ে একটা ছোটকাগজ নিয়মিতই বেরুচ্ছে। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে। নাম *ম্যাজিক লণ্ঠন*। সম্পাদক

আমাদের অনুজ সহকর্মী কাজী মামুন হায়দার। মূলত শিক্ষার্থীদের লেখা নিয়েই বের হয় কাগজটা। সিনেমা নিয়ে লেখেন তাঁরা। প্রচুর সিনেমা নিয়ে প্রচুর লেখা। তাছাড়া, সপ্তাহের একটা দিনে তাঁরা বিভাগের একটা শ্রেণীকক্ষে নিত্যনতুন সিনেমা দেখেন। তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। মামুন হায়দারের চেম্বারে বসে পাঠচক্র চালান তাঁরা প্রতিদিন। রাজ্যের কাজ করেন। দুর্দান্ত ব্যাপার।

দুর্দান্ত আরেকটা কাজ *ম্যাজিক লণ্ঠন* করে থাকে। কয় মাস পর পর তাঁরা সিনেমা বিষয়ে বিশিষ্ট একেক জন মানুষকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। তিনি উপস্থাপন করেন 'ম্যাজিক লণ্ঠন কথামালা'। গত বছর ডিসেম্বরে এসেছিলেন জনাব আবু সাইয়ীদ। বলেছিলেন 'চলচ্চিত্রের দর্শকপ্রিয়তায় নির্মাতার দায়' নিয়ে।

দর্শকসারিতে বসে তাঁর মনোমুগ্ধকর কথা শুনছিলাম তন্ময় হয়ে। পরে শুরু হলো প্রশ্নোত্তর পর্ব। শিক্ষার্থীরা একের পর এক প্রশ্ন করছিলেন। সাইয়ীদ ভাই উত্তর দিচ্ছিলেন। কীভাবে কখন জানি উস্কানিপ্রাপ্ত হয়ে আমারও কিছু কথা বলা হলো। দর্শকসারিতে বসেই। দ্বিধা নিয়ে। অস্বস্তি নিয়ে। কারণ, ফিল্ম নিয়ে আমার জানা-শোনা নাই।

ম্যাজিক লণ্ঠন-এর জানুয়ারি ২০১৩ সংখ্যায় সেই 'কথামালা'র সমস্ত কিছুর বিস্তারিত ট্রান্সক্রিপ্ট ছাপা হয়। আমার কথাবার্তাও তার মধ্যে ছিল। স্বাভাবিক-ভাবেই। কৌতূহলবশত পড়তে গিয়ে দেখলাম ঠিক বোঝা যায় না আমি কী বলেছিলাম। বাক্যের অর্থ বোঝা যায় না। অনেক আচমকা-শব্দের আবির্ভাব হকচকিয়ে দেয়। বিমূঢ় হতে হয়। অডিওর সাথে পরে মিলিয়ে দেখলাম। মুশকিলটা হয়েছে ট্রান্সক্রিপশনের কাজে। অনুলিপি প্রণয়নের সময়ই ঘটেছে টুকটাক বিচ্যুতি-গুলো। নিতান্তই টুকটাক। কিন্তু পরিণাম হয়েছে মারাত্মক। শব্দধারণ যন্ত্রের, এবং কে জানে হয়ত আমার উচ্চারণ-দোষেরও, অবদান আছে।

তো, কর্তব্য দাঁড়ায় পরিমার্জনার। এবং তা করতে গিয়ে আলাদা একটা লেখাই দাঁড়িয়ে যায় প্রায়। সেটাই এখানে পেশ করছি। সেদিনের আলোচনার সীমা অবশ্য অতিক্রম করে যায় নি এ লেখা। মানে, নতুন কোনো প্রসঙ্গ যোগ করি নি। কিছু জিনিস ভেঙে বলেছি স্রেফ। কয়টা কথা বেড়েছে। আর গোছগাছ তো করেছিই একটু আধটু। বইপত্রের হদিসও যোগ করেছি পরে। যা-ই হোক, উপলক্ষ সিনেমাই বটে। কিন্তু আমার খাসলত দৌড়েছে নানান দিকে।

এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখি সাইয়ীদ ভাইয়ের কাছে। আমার বাচালতা সেদিন তিনি সহ্য করেছেন অদ্ভুত সুন্দর বন্ধুত্ববোধের আশ্রয়ে। বুঝতেই দেন নি কতটা বকলম-বাহাদুর সিনেমা নিয়ে আমি এই লোক। কৃতজ্ঞতা জানাই ম্যাজিক লণ্ঠনের সম্পাদক আর শিক্ষার্থী-কর্মীদের কাছে। অনুষ্ঠানের ডিজিটাল অডিও তাঁরা

বলা মাত্র দিয়ে দিয়েছেন আমাকে। *ম্যাজিক লণ্ঠন*-এ মুদ্রিত অনুলিপির সফট কপিও দিতে দ্বিধা করেন নি তাঁরা। এঁদের সকলের সুবাদেই কিছু-একটা দাঁড়ালো হয়ত আমার তরফে। আদিতে কয়েকটা কিস্তিতে ছাপা হয়েছিল এটা রাজশাহীর সোনার দেশে, আর ঢাকার বণিক বার্তার 'অষ্টপ্রহর' ম্যাগাজিনে। তাঁদের কাছেও শুকরিয়া। এ রচনা উৎসর্গ করছি শ্রদ্ধেয় সিনেমাশিল্পী আবু সাইয়িদের করকমলে।

৩২.২ মানুষ কি শিল্পবোধহীন হয়?

মুখোমুখি দুইটা ক্যাটেগরি আমাদের সামনে এসে হাজির হয়। বার বার। ঘুরে ফিরে। একদিকে 'শিল্প'। আরেক দিকে 'অ-শিল্প'। আমার প্রশ্ন: মানুষ কি শিল্পবোধহীন হয়? এমন যদি হয়, কিছু লোক থাকে শিল্পবোধসম্পন্ন, আর কিছু লোক হয় শিল্পবোধহীন – তাহলে ধরে নিতে হয় কিছু লোক 'উন্নত', আর কিছু লোক 'অনুন্নত'। তাহলে কিন্তু খোদ ফ্যাসিবাদ জায়েজ হয়। অনুন্নত লোকদের বেঁচে থাকার দরকার কী? মানুষের কোনো কাজে আসে না। তাদেরকে এমনকি মেরে ফেলারও যুক্তি দাঁড় করানো যায়।

'শিল্প' নামের পদার্থটা তাহলে ঠিক কী? এই প্রশ্ন আসে। রবীন্দ্রনাথকে দেখি। দেখি উনি 'কাজ' আর 'আনন্দ' নামের দুইটা ধারণা দিয়ে সাহিত্যকে বুঝতে চান। বোঝাতে চান। মনের আনন্দে মানুষ যা করে, তা পড়ে শিল্প-সাহিত্যের এলাকায়। তা সে করে নিছক ভালো লাগা থেকে। কিছু পাওয়ার আশায় নয়। উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নয়। শিল্প-সাহিত্য-আর্ট হচ্ছে অকারণ আনন্দের বৃথা যজ্ঞ। বৃথা কর্ম। এর কোনো প্রত্যক্ষ উপযোগিতা নেই। বাজার-মূল্য নেই। এ দিয়ে সংসার চলে না। ক্যারিয়ার হয় না। আর যা করতেই হবে, যা মানুষের ওপরে কর্তব্য আকারে বর্তায়, যা না করলে নিজেকে মুশকিলে পড়তে হয়, অন্যদের সমস্যা হয়, অভিযোগ হয়, নালিশ হয়, শাস্তি পর্যন্ত আসতে পারে– সেটা মানুষের কাজের এলাকা। কাজ মানুষ করে দায়ে পড়ে। ঠেকায় পড়ে। বাধ্য হয়ে। দায় হতে পারে কর্তব্যের। দায় হতে পারে জীবিকার। দায় হতে পারে ধান্দার। কাজে তাই মানুষ আনন্দ পায় না। কাজ মানেই চাপ। অবশ্য যে কাজ আমার নিজের, তার কথা আলাদা। সেটা আনন্দের। এ কাজ করব বলে আমি নিজেই ঠিক করি। অন্য কেউ ঠিক করে দেয় না। চাপায় না। এ কাজের জন্য অন্য কারো কাছে আমাকে জবাবদিহিতা করতে হয় না। এ কাজে শাস্তির ভয় নাই। পুরস্কারের লোভ নাই। এ কাজে সফলতায়ও পরিতৃপ্তি আসে না। তৃষ্ণা অতৃপ্ত থাকে। আরো ভালো করে করার আকাঙ্ক্ষা আরো বাড়ে। অকারণে। এ কাজে ব্যর্থ হলেও আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথের কাজের এই ধারণাকে আমি মেলাই পুঁজি-তাড়িত শিল্প,

কলকারখানা আর ইন্ডাস্ট্রির সাথে। এসবও শিল্পই বটে। আদিতে অন্তত তা-ই ছিল। মসলিন বানানোটা শুধু জীবিকা ছিল না। আনন্দেরও ব্যাপার ছিল। সুখ ছিল তাতে। চৌকাঠ জানলা আর খাট বানাতে গিয়ে মানুষ ছবি এঁকেছে কাঠ-খোদাই করে। অকারণে। ও জিনিস ছাড়াও জানলা হতো, দরজা হতো, শোয়ার খাট হতো। তবুও আর্ট করেছে মানুষ।

সেটা ছিল প্রয়োজনের ওপর প্রতিভার আধিপত্যের কাল। সেটা ছিল কাজের ওপরে আনন্দের আভা ছড়ানোর যুগ। শিল্পের যুগ। কল-কারখানার কাজও ছিল তাই শিল্প। কুটীর-শিল্প। তারপর যখন মানুষের ওপর পুঁজির আধিপত্যের কাল এলো, মনুষ্যসত্তা পর্যবসিত হলো কারখানার নাটবল্টুতে। এলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল 'কাজ' এর ধারণা। বিচ্ছিন্ন হলো মানুষ তার কাজ থেকে। কাজ পরিণত হলো হুকুম তামিল করার কাজে। মালিকের হুকুম। পুঁজির প্রত্যাদেশ। আজকের পুঁজিতন্ত্রে 'কাজ' নামক ধারণাটাই একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ধারণা মাত্র।

শিল্প তাহলে অকারণ। শিল্প হচ্ছে অকারণ কৌতূহলের কাজ। কৌতূহল, প্রশ্ন, সন্ধিৎসা, অনুসন্ধিৎসা– এগুলো মানুষের মনের মধ্যে আসে হুদাই। এ হলো জন্মসূত্রে পাওয়া মনুষ্য-স্বভাব। মানুষের প্রজাতিসত্তা। এগুলোর সঙ্গেই, আমার ধারণা, শিল্পের যোগাযোগ। আনন্দের যোগাযোগ। অকারণ অনুসন্ধিৎসায়ই মানুষের আনন্দ। তার সৃজনশীলতা। প্রজাতিসত্তাই তাই মানুষের যাবতীয় শিল্পবোধের উৎস। মানুষ, তার মানে, শিল্পবোধহীন নয়। তা সে হতে পারে না। বাধ্যতামূলক কাজের তাড়না তাকে শিল্প-আস্বাদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। বঞ্চিত হয় সে বাধ্যতামূলকভাবে।

৩২.৩ শিল্প-সাহিত্য-আর্ট সংক্রান্ত পুঁজিবাদী, বলশেভিক ও নৈরাজ্যিক ধারণা

শিল্প-সাহিত্য-আর্টের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। উপযোগিতা থাকে না। কারণ থাকে না। শিল্প শুধু শিল্পেরই জন্য। 'শিল্পের জন্য শিল্প' একটা পুরনো ধারণা। শিল্পের স্বাধীনতার স্লোগানে পরিণত হয়েছে তা। স্লোগানটা ভয় পাইয়ে দেয় আমাদের অনেককে। বলা হয়: এটা পুঁজিবাদের ধারণা। এটাকে অনেকে লিবারাল একটা অ্যাপ্রোচ মনে করে। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা অ্যানার্কিক অ্যাপ্রোচ। নৈরাজ্যিক মনোভঙ্গি। এটা অষ্টাদশ শতকের আইরিশ কবি অস্কার ওয়াইল্ডের বানানো একটা বাক্য: 'আর্ট ফর আর্টস সেইক'। শিল্প তার নিজের জন্যই ঘটে। যেমন প্রেম চায় শুধু

নিজেকেই। যেমন ফুল তার নিজের জন্যই ফোটে।[১] আর ফুল ফুটলে মানুষ টের পায়। অকারণ আনন্দ হয় তার। ফুলের গন্ধের প্রতি আগ্রহই মানুষের শিল্পবোধ। ফুলের রঙের প্রতি আগ্রহই মানুষের শিল্পবোধ। মানুষ, তার মানে, শিল্পবোধহীন নয়। যেমন প্রেমবোধহীন কোনো মানুষ নাই। হয় না।

শিল্প-সাহিত্য-আর্ট সম্পর্কে পুঁজিবাদের ধারণা কী সে কথায় একটু পরেই আসছি। তার আগে বলা দরকার: আধুনিক পুঁজিবাদ মানেই কিন্তু রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। রাষ্ট্রের সামরিক পাহারায়ই আধুনিক পুঁজিবাদের জন্ম ও বিকাশ। আজকের যুগেও তা পরিচালিত এবং বিকশিত হয় রাষ্ট্রীয় ভর্তুকিতে। ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যিক প্রচারযন্ত্র যাকে 'অবাধ প্রতিযোগিতা', 'মুক্ত বাজার', 'অবাধ পুঁজিবাদ' বলে চালাতে চায় তা আসলে ব্যক্তি-মানুষের পুঁজিবাদ নয়। ব্যক্তি-মালিকের পুঁজিবাদ নয়। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। মুক্ত প্রতিযোগিতা তার আরাধ্য নয়। ব্যক্তি-মালিকের ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবাধ বিকাশ তার আরাধ্য নয়। ব্যক্তি-উদ্যোক্তাদের সদাসৃজনশীল ক্ষুদ্র পুঁজিকে সে জবাই করে। জবাই করে কর্পোরেট-দানবের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে। এ শুধু ইউরো-মার্কিন পুঁজিবাদের বেলায়ই সত্য নয়। সত্য তা রুশ-বলশেভিক রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের বেলায়ও। বলশেভিক বামপন্থার সাম্রাজ্যিক প্রচারযন্ত্র রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকেই প্রচার করেছে 'সমাজতন্ত্র' নামে। সর্বব্যাপী সেই প্রচারে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম। ঠকেছিলাম। বলশেভিক সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদও ব্যক্তি-মানুষের উদ্যোগের ও উত্থানের স্বাধীনতাকে খুন করেছিল। খুন করেছিল পার্টি-কর্পোরেট-রাষ্ট্রপুঁজির স্বার্থে। বলশেভিক সমাজতন্ত্র পরিণত হয়েছিল জেল সমাজতন্ত্রে। দুই সাম্রাজ্যের শীতল যুদ্ধে বিভ্রান্ত হয়েছিলাম আমরা। ভুলে গিয়েছিলাম: স্বাধীনতা ছাড়া সমাজতন্ত্র দাসত্ব; আর সমতা ছাড়া স্বাধীনতা মানে পুঁজিবাদী প্রিভিলেজ।

তো আর্ট সম্পর্কে এইসব রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ যে ধারণা পোষণ করে একেবারেই আলাদা তা। 'শিল্পের জন্য শিল্প' তা নয়। শিল্পের জন্য শিল্পের ধারণা তো আনন্দের ধারণা। স্বাধীনতার ধারণা। লিবারালবাদ, লাদেনবাদ, লেনিনবাদ – সর্বপ্রকার কর্তৃত্বপন্থার জন্যই বিপজ্জনক তা। আসলে শিল্পের কোনো ধারণাই থাকে না পুঁজিবাদের। তার কাছে শিল্প মানে কল-কারখানা শিল্প। শিল্পের ধারণা তার কাছে কাজের ধারণা মাত্র। শ্রম আর মুনাফার ধারণা। শিল্পকে সে কাজে লাগায় মুনাফা-গন্ধী সমাজ টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। বৈষম্য টিকিয়ে রাখার স্বার্থে।

---

১ 'সৃষ্টির উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, নির্মাণের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। ফুল কেন ফোটে তাহা কাহার সাধ্য অনুমান করে, কিন্তু ইটের পাঁজা কেন পোড়ে, সুরকির কল কেন চলে, তাহা সকলেই জানে। সাহিত্য সেইরূপ সৃজনধর্মী; দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি নির্মাণধর্মী। সৃষ্টির ন্যায়, সাহিত্যই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য', *সাহিত্য*।

সর্বসাধারণের ওপর গুটিকয়ের কেন্দ্রীভূত, একচ্ছত্র এবং সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্রী শাসন-কর্তৃত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনে। লিবারাল এবং মার্কসীয় ধারার রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ তাই শিল্পের ঘাড়ে দায়িত্বের বোঝা চাপায়। কাজ চাপায়। শিল্পকে পরিণত করে কারখানায়। সংস্কৃতি পরিণত হয় ইন্ডাস্ট্রিতে। এভাবে ধারণা জন্মায়: শিল্পকে এবং শিল্পীকে কিছু 'সামাজিক' দায়িত্ব পালন করতে হবে। সমাজের প্রতি তাকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে। নিছক আনন্দে রাধা নাচবে না। এবং এ দাবি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নয়। শাসক-মতাদর্শের। নিছক আনন্দে পুঁজিপতিদের পক্ষে সমাজ-নিয়ন্ত্রণ করা চলে না। সুতরাং আনন্দকেও কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। শাসকের মতাদর্শ প্রচারের কাজ করতে হবে তাকে।

৩২.৪ সমাজে শিল্প-সাহিত্য-আর্টের অভিঘাত

মনে রাখা দরকার: যে 'কাজ' এর কথা বলছি সেটা স্রেফ মতাদর্শিক কাজ নয় কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজন মেটানোর কাজও বটে। ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল বাজারের চাহিদা মেটানোর কাজ। ইন্ডাস্ট্রি বলতে বলছি মূলত 'কালচার ইন্ড্রাস্ট্রি'র কথা। উপরন্তু, কর্পোরেট পুঁজিবাদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো: এখানে লিপস্টিক যারা বানায়, তারাই আবার ওষুধ বানায়। এমনকি উড়োজাহাজ এবং মিজাইলও তারাই বানায়। আবার তারাই কিন্তু প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা করে। নির্বাচন প্রভাবিত করে। সর্বোপরি, তারাই আবার রাষ্ট্র-ইন্ডাস্ট্রির কাণ্ড-কারখানাকে যথাসম্ভব প্রভাবিত করে।

সুতরাং দাঁড়াচ্ছে: যাহা কালচার ইন্ডাস্ট্রি, সার্বিক অর্থে তাহাই রাষ্ট্র-কর্পোরেট পুঁজিবাদী বন্দোবস্ত। আজকের যুগে এই রাষ্ট্র- কর্পোরেট দেবতারই প্রধানতম বাহন হচ্ছেন বাজার। রাজনৈতিক বাজার। আর্থিক বাজার। উন্নয়ন-বাজার। বাণিজ্যিক বাজার। সুশীল-এনজিও-সমাজের বাজার। আর ইন্ড্রাস্ট্রির বাজার তো বটেই। এই বাজারি অ্যাপ্রোচের কথা মাথায় রেখেই এখানে আমি শিল্প-সাহিত্য-আর্টের বহুলকথিত দাসত্ব দায়িত্ব কর্তব্য কাজ কমিটমেন্টের কথা নিয়ে আলাপ করছি।

তো এখন শিল্প বা যেকোনো যোগাযোগের ঘাড়ে যদি আমরা 'কাজ' চাপাই, তখন কী ঘটে। তখন তার কাছ থেকে আমরা কিছু ফল আশা করি। ধরে নিই: এর ফলে এই ঘটবে। অমুক কাজের ফলে তমুক ঘটবে। আমরা যা কিছু করব, হাতেনাতে তার কিছু না কিছু ফল পাব। যোগাযোগ-শাস্ত্রের ভাষায় বললে, প্রতিটা কাজের কিছু একটা 'ইমপ্যাক্ট' ঘটবে। নগদ 'ইফেক্ট' পড়বে।

আমাদের তথাকথিত 'সামাজিক বিজ্ঞান' এর গণযোগাযোগ-শাখায়, গণ-যোগাযোগ-গবেষণায়, এই 'ইমপ্যাক্ট' নামক পদার্থটা নিয়ে ম্যালা প্যাচাল-ক্যাচাল

আছে। বড় বড় গবেষণা হয়েছে অনেক। ১৯২০-র দশক থেকে শুরু করে এ যাবত ম্যাস কমিউনিকেইশন রিসার্চে মোদ্দা কথা যা বোঝা গেছে তা হলো: আমরা কখনই, কোনো রিসার্চের মাধ্যমেই, ইমপ্যাক্ট মেজার করতে পারি না। মাপতে পারি না কী ইমপ্যাক্ট পড়ছে। (সামাজিক জরিপের, বিশেষ করে বাজার-জরিপের, কথা এখানে হচ্ছে না। এসব জরিপ কিছু ধারণা পাওয়া যায় বৈকি। সে কথা এখানে হচ্ছে না।) কমন সেন্সও এটা বলে। ইমপ্যাক্ট আমরা মাপতে পারি না। পুরনো লোকেরা এটা আজকে না, অনেক আগেই জেনেছেন। জেনেছেন আমাদের তথাকথিত সোশ্যাল সাইন্টিফিক কোনো অ্যাপ্রোচ ছাড়াই। যেমন ধরুন 'গীতা'র কর্মযোগ যে: কাজ হলো যে কাজ করে যাওয়া। করে যাওয়াটাই মূল ব্যাপার। যেটা নিজের কাজ বলে মনে হয়, সেটা করে যাওয়া। এর ফল কী ঘটবে সেটা নিয়ে কোনো আশা না করা। প্রত্যাশা না করা। যা ফল ঘটার সেটা তো ঘটবেই। সেটা যে আমরা বুঝে ফেলতে পারব, মাপ করতে পারব, পরিমাপ করে জানতে পারব– তা কখনই হয় না। গীতা অবশ্য সরাসরি বলে নি বটে যে: কর্মফল পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু গীতার কর্মযোগের এ এক বিশেষ উপলব্ধি তো বটেই।

সতর্কভাবে একটা কথা এখানে বলে রাখাটা বিশেষ দরকার। সমাজে মিডিয়ার প্রভাব থাকা না থাকা এক কথা, আর সেই প্রভাবটুকু পরিমাপ করতে পারার ব্যাপারটা আলাদা কথা। সমাজে প্রকৃতপক্ষে মিডিয়ার প্রভাব বিপুল, বহু-বিচিত্র, পরিব্যাপ্ত। এ নিয়ে কোনো সন্দেহই নাই। মিডিয়া-পণ্ডিতেরা এতদূর পর্যন্ত বলতে থামেন না যে: সমাজের ওপর মিডিয়ার প্রভাব আছে কিনা সেই প্রশ্ন তোলা আর শিশুর ওপর মায়ের প্রভাব আছে কিনা সেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার মতোই বাহুল্য (স্ট্যানলি ব্যারান প্রমুখ, ১৯৮৪: ২৫২)।

এর পরেও সন্দেহ ওঠে। সন্দেহ ওঠে মিডিয়ার নীতিনির্ধারণী মহলে। সন্দেহ ওঠে শিক্ষায়তনিক পরিসরে। এবং সেই সন্দেহের রাজনীতি দুর্বোধ্য নয় বৈকি। সমাজের ওপর মিডিয়ার প্রভাব যে সর্বপ্লাবী, সে কথা স্বীকার করতে গেলে অধিপতি মিডিয়ার ওপর দায় আসে। সমাজে সংঘটিত অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবণতার দায়, অন্তত আংশিক দায়, চাপে মিডিয়ার ঘাড়ে। নিষ্কৃতি মেলে না। এই দায় ঘোঁচানোর দায়িত্ব চড়ে বসে অধিপতি শিক্ষায়তনিক মহলের কলমের ডগায়। তাঁরা প্রায় প্রমাণ করেই ছাড়েন: সমাজে যা কিছু ঘটছে তার দায় নানান সামাজিক প্রতিষ্ঠানেরই বটে। মিডিয়া সেখানে সাইড লাইনের মাইনর প্লেয়ার মাত্র। সমাজে মিডিয়ার 'নাই-প্রভাব' তত্ত্ব জেঁকে বসে শিক্ষায়তনিক পাঠ্যপুস্তকে। সামাজিক গবেষণার পদ্ধতিতত্ত্বের দোহাই দিয়ে বলা হয় 'বৈজ্ঞানিক'ভাবে মিডিয়ার প্রভাব নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। তার মানে প্রভাবই নাই। আসলে তা নয় মোটেও। এ কথা সত্য যে মিডিয়া আমাদের আচরণ

বা মনোভাব বদলাতে পারে, এই মর্মে কোনো গবেষণা-প্রমাণ পাওয়া যায় না বললেই চলে; কিন্তু এমন ধরনের গবেষণা-প্রমাণ আছে অঢেল যা থেকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় যে মিডিয়া আমাদের বিদ্যমান মনোভাবসমূহকে আরো পাকাপোক্ত করে তুলতে পারে, সেগুলোর বৈধতা দিতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যে মানুষ কখনো সহিংস আচরণ করে নি বা সহিংস আচরণ করার প্রবণতা যার মধ্যে কখনোই ছিল না স্রেফ মিডিয়ার প্রভাবে তার মধ্যে সহিংসতার প্রবণতা তৈরি হচ্ছে এমনটার প্রমাণ গবেষনায় পাওয়া যায় না; কিন্তু সহিংসতার মনোভাব যার মধ্যে সামাজিক-পারিবারিক কারণে ইতোমধ্যেই আছে, মিডিয়ার প্রভাবের কারণে সেই মনোভাব আরো পাকাপোক্ত হয়, বৈধ বলে প্রতিপন্ন হয়। বৈধতা প্রদানের এই ঘটনা, তথা বিদ্যমান মনোভাবকে আরো পাকাপোক্ত করে তুলতে পারার এই ক্ষমতা, মিডিয়াকে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী করে তোলে বৈকি। এবং সেই ক্ষমতা বিদ্যমান কপট গণতন্ত্রকে সত্যিকারের গণতন্ত্র বলে প্রতিপন্ন করে তুলতে পারে মিডিয়া-গ্রাহকদের মনে। তার মানে, মিডিয়ার সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি-ক্ষমতা রীতিমতো সুদূর-প্রসারী বটে। (এ নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: সেলিম রেজা নিউটন, ২০০৮।)

এখানে আমি যখন বলছি: মিডিয়ার প্রভাব সুনির্দিষ্টভাবে বা পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে নির্ধারণ করার উপায়ের 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতি নাই, তখন বোঝাতে চাইছি যে মিডিয়ার সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বোঝার উপায় হচ্ছে বিচার-বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা। বিচার-বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা করে কোনো কিছু বোঝা মানে অনুভব থেকে বোঝা। কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে বোঝা। চারপাশে তাকিয়ে যুক্তিবুদ্ধি-বিচারবুদ্ধি দিয়ে বোঝা।

৩২.৫ সমাজে-সিনেমায়-সর্বত্র নতুনত্বের দাবি

আরেকটা বিষয় প্রায়ই আসে – 'নতুন চলচ্চিত্র', 'নতুন ধারার চলচ্চিত্র'। নতুনত্বের এই সার্বক্ষণিক দাবি সমাজের অন্য সব ক্ষেত্রেও আসে বৈকি। যেমন নতুন ধারার রাজনীতি। নতুন ধারার সাহিত্য। নতুন ধারার মিডিয়া। নতুন ধারার সংগঠন। ইত্যাদি। প্রভৃতি। ধারণাটা এমন: সবসময়ই একটা নতুন কিছু আসতে হবে। এই ধারণাটাও খেয়াল করি আমি যে এটা আমাদের কালচারাল ইন্ডাস্ট্রি এবং অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল মার্কেটের ডিম্যান্ড। কালচার-ইন্ডাস্ট্রির চালচলন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে থিওডর অ্যাডোর্নো এবং ম্যাক্স হোর্খেইমার (১৯৪৪) এই সদানতুনত্বের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। কথিত এই সদানতুনত্ব আসলে মিথ্যানতুনত্ব, ছদ্মনতুনত্ব, ছদ্মস্বাতন্ত্র্য। যদিও পাইকারি-সংস্কৃতি বা ঢালাও সংস্কৃতির বা ম্যাস কালচারের ইন্ডাস্ট্রি সারাক্ষণই

দাবি করতে থাকে যে তাদের উৎপাদিত প্রতিটা পণ্যই অনন্য, স্বতন্ত্র, নতুন – কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে 'কালচার এখন প্রত্যেকটা জিনিসের ওপর এঁকে দিচ্ছে একই সিলমোহর। ফিল্ম, রেডিও আর ম্যাগাজিনগুলো মিলে এমন একটা সিস্টেম গড়ে তুলেছে যেটা সমগ্রের দিক থেকে সমরূপ, অংশগুলোর দিক দিয়েও সমরূপ'। (অ্যাডোর্নো এবং হোর্খেইমার, ১৯৪৪: ৯৪)। তো, নতুনত্বের এই সার্বক্ষণিক দাবি ছাড়া কৃত্রিম চাহিদাভিত্তিক বাজার-ব্যবস্থা টিকতে পারে না। একই প্রোডাক্ট একই মার্কেটে বেশিদিন চলে না। মানুষ ক্লান্ত হয়ে যায়। প্রতিটা ব্র্যান্ডের প্রতিটা প্রোডাক্টকে কোনো না কোনোভাবে নতুন নতুন ধরনের কিছু-একটা ব্যাপার কি যেন দিতে হয়। এ নতুন আসলে কৃত্রিম নতুন। সত্যিকারের নতুন কিছু নয়। যা চিরপুরাতন তা-ই তো চিরনতুন। তথাকথিত নতুনত্বের এই সার্বক্ষণিক দাবি থেকে বোঝা যায়: সমাজে এই মুহূর্তে যা-কিছু চলছে, সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা আর নাই।

প্রশ্নটা প্রকৃতপক্ষে নতুনত্বের নয়। প্রশ্নটা আসলে পরিবর্তনের। আমরা সবাই-ই আসলে চাই এই জরামরা রাষ্ট্র-সামাজিক বন্দোবস্তের পরিবর্তন ঘটুক। উন্নত একটা আর্থ-সামাজিক বন্দোবস্ত আমাদের প্রাপ্য। কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের পরিষ্কার একটা রূপরেখা আমাদের মাথায় থাকে না। এই সুযোগে, আমাদের সর্বজনীন পরিবর্তন-আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে ব্যবসা করে কর্পোরেট বাণিজ্য-সঙ্ঘ। প্যাকেট পরিবর্তন করে তারা বলতে চায়, এই নাও পরিবর্তন। ভাব-ভঙ্গি-কায়দা-কারিগরি-কেরামতির পরিবর্তনকেই তারা প্রকৃত পরিবর্তন হিসেবে চালাতে চায়। নতুন বলে চালাতে চায়। এদের কাছে নতুন মানে নতুন প্যাকেট। নতুন মানে নতুন বুলিবচন-সম্ভাষণ। এইজন্য সর্বত্র একদিকে নতুনত্বের আকাঙ্ক্ষা, এক দিকে নিজেকে নতুন বলে সদা-সর্বদা দাবি করতে থাকা, অন্য দিকে সেই পুরাতন চিন্তাবদ্ধতার পাঁকে খাবি খেতে থাকা – এই হচ্ছে আমাদের পরিস্থিতি।

এত এত নতুনের কেতন ওড়ার পরও, আমাদের এই পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটে না। পুঁজির হাতে সিনেমা বন্দি। টাকা না থাকলে বই পাওয়া যায় না। অকল্পনীয় বৈষম্য। আর গুটিকয়ের হাতে সর্বসাধারণের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পণ। আত্মশক্তি, ব্যক্তির স্বরাজ, সমাজর সর্বক্ষেত্রে সামাজিক স্বনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রশক্তির বদলে ব্যক্তি-শক্তি ও সমাজশক্তিকে বিকশিত করে তোলা – এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে কথা না বলে নতুনত্বের কথা, পরিবর্তনের কথা স্পষ্ট করে ভাবতে পারা যায় না। আসলে আমাদের নতুনত্ব-চিন্তা কখনোই স্বাধীনতার সাথে সম্পর্ক পাতায় নি। ফলে আমাদের নতুনত্বের ধারণাও সমাজের নানা শ্রেণীর অনুশীলিত দীক্ষায়ন-প্রকৌশলের প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত। দীক্ষিত। মুখস্ত। পরিবর্তন বলতে ক-দলের জায়গায় খ-দলের চেয়ে বেশি কিছু আমরা ভাবতে পারি বলে দেখা যায় না। এর

চেয়ে বেশি বিপ্লবী হলে ভবিষ্যতের কাছে আমরা একটা সর্বমঙ্গলময় গ-দলের প্রত্যাশা করতে থাকি। তৃতীয় ধারা। তৃতীয় শক্তি। এই তৃতীয় শক্তিটা আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠলে বা ক্ষমতায় গেলে যে আর তৃতীয় শক্তি থাকবে না, প্রথম শক্তি বা দ্বিতীয় শক্তিতে পরিণত হবে, তখন কী হবে? আরেক ধরনের, 'নতুন ধরনের' ক-দল বা খ-দলের মতোই একটা দল হবে না সেটা? আসলে, বিদ্যমান ব্যবস্থার আরো একটু উন্নতির বাইরে আমাদের পরিবর্তনের ধারণা পৌঁছায় না। খারাপ নেতার বদলে ভালো নেতা, অসৎ কর্মকতা-আমলার পরিবর্তে সৎ ও যোগ্য আমলার জন্য প্রতীক্ষা করাই আমাদের পরিবর্তনের সাধনা।

এসব প্রশ্ন বিবেচনায় না নিয়ে নতুন ধারার সাহিত্য বা নতুন ধারার রাজনীতি বা নতুন ধারার চলচ্চিত্র হবে বলে মনে হয় না। বিদ্যমান সিস্টেমটাকেই আমরা নবায়িত করতে থাকব। উৎপাদিত-পুনরুৎপাদিত করতে থাকবে তথাকথিত 'বিদ্যমান বাস্তবতা'কেই। এ প্রশ্ন বিবেচনায় না নিয়ে আমাদের শিল্প- সাহিত্য-আর্ট-সিনেমা স্বপ্ন দেখতে পারবে না। 'বাস্তবতা'র গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে থাকবে।

৩২.৬ সিনেমায় যৌনতা, অশ্লীলতা ও অপরাধ

সিনেমায় অশ্লীলতা প্রশ্ন, 'পতিতা' প্রশ্ন, নারীর প্রশ্ন – বিশেষ করে হিন্দি সিনেমায় নাচে নায়িকাদের ব্যবহার করার প্রশ্ন, এবং হিন্দি সিনেমার জুনিয়র পার্টনার বা হিন্দি সিনেমার মাইনর পার্টনার হিসেবে বাংলা সিনেমায়ও নায়িকা নাচানোর প্রশ্ন – এসব প্রশ্নে সাইয়ীদ ভাইয়ের সাথে মতভিন্নতা আছে আমার (দ্রষ্টব্য: আবু সাইয়ীদ, ২০১৩)।

এগুলো আমাদের বহুল আলোচিত প্রশ্ন। এবং সর্বময় আলোচনার সিদ্ধান্তও সবার জানা। কারো কোনো ভিন্নমত আছে বলে মনে হয় না। ভিন্নমতহীন সমাজ আমাদের। সিনেমায় নারীঘটিত অশ্লীলতা এবং সহিংসতার প্রশ্নে আমাদের বিদ্বৎ-সমাজ সর্বসম্মত ধিক্কার উচ্চারণের বেশি কোনো ব্যাখ্যা হাজির করতে পারে না। এগুলোকে অ-শিল্প, অপসংস্কৃতি, শিল্পবিরোধী ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করে তার বিপরীতে স্থাপন করা হয় শিল্পকে।

এই জায়গাটাতে খটকায় পড়তে হয়। মাদক, পর্নো, মাস্তানি এগুলোর বিপরীত দিক থেকে শিল্পকে দেখা, সংজ্ঞায়িত করার উদ্যোগে আমার খটকা লাগে। অশ্লীলতা মাদক পর্নো মাস্তানি ক্রাইম 'পতিতা' ইত্যাদির বিপরীতে শ্লীলতা সুশীলতা উচ্চতার বা উচ্চে-অবস্থিতার ধারণা – এই ধারণাগুলো খুব বাইনারি ধারণা। 'সাদা বনাম কালো', 'ইয়েস বনাম নো', 'ভালো বনাম মন্দ'র মতো বাইনারি ধারণা এগুলো।

বাস্তব এ-রকম না। কম্পিউটারের মতো 'জিরো বনাম ওয়ান' দিয়ে আমাদের বাস্তবতা রচিত না।

আর আমি প্রচুর দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। আমি যখন একটু অল্প বয়সেই হিন্দি সিনেমার নাচের, বাংলা সিনেমার নায়িকাদের, হংকং-এর সিনেমার যৌনদৃশ্যের পাল্লায় পড়ে গিয়েছিলাম, তখন থেকে আমি খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে আছি। এই সিনেমার দৃশ্যগুলো – এরা কী বলতে চায়? এসব দৃশ্যের অর্থ কী? এটা নিশ্চয়ই আলাদা একটা ভাষা, আমি যার অর্থ বুঝি না। এরা নিশ্চয়ই কিছু বলতে চায়। নিশ্চয়ই এরা কিছু বলছে। বলে চলেছে। আমরা তা না বুঝে এগুলোকে ঢালাও নিন্দা করেই আমাদের কর্তব্য সমাধা করছি। আমার কাছে এরকম মনে হয়।

তামিল-হিন্দি সিনেমার নাচ ইগনোর করা কঠিন। এটা এতো পাওয়ারফুলি প্রেজেন্টেড, এতো পাওয়ারফুলি যে এই পাওয়ারফুলনেসের একটা ব্যাখ্যা-অর্থ-তরজমায় পৌঁছানোর চেষ্টা করাটা খুব জরুরি। এই তাড়না কিছুতেই আমাকে ছাড়লো না। এবং এখনও যে আমি এর সঠিক উত্তর জানি তা-ও না। কিন্তু একটা দিক আমার অন্তত খুব পরিষ্কার লাগে। সেটা হলো আমরা অনেক কিছু খেয়াল করি না। অথচ সব আমাদের আশেপাশেই আছে।

যৌনতাকে ইদানীং আমি দেখি তন্ত্রের আলোকে। স্বাধীনতার আলোকে। আমাদের তন্ত্র-সাহিত্য ভারতবর্ষের সবচেয়ে পুরনো সাহিত্য। এমনকি বেদের চাইতে পুরনো। দাবিটা আমার কাছে ন্যায্যই মনে হয়, কেননা আমি শুধু লিখিত সাহিত্য বলছি না। তন্ত্রের উপাচার, চিহ্ন, মৌখিক ভাষা সবই তন্ত্র-সাহিত্যের মধ্যে পড়ে। সব সাহিত্যের বেলায়ই তাই। এখন সেগুলো নিয়ে কথা বলার সুযোগ নাই।

তন্ত্র-সাহিত্য সেই প্রাচীনতম কাল থেকেই খেয়াল করছে যে: যৌনতাকে শাসক-শাস্ত্র-মতাদর্শ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রেখেছে। সমাজে নরনারীর মেলামেশার ক্ষেত্রে, আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার যৌন প্রসঙ্গ নিষিদ্ধ। সর্বপ্রকার যৌন এক্সপ্রেশন নিষিদ্ধ। পাপ। শাস্ত্রধর্ম বলে নারী নরকের দ্বার।

শাস্ত্রধর্ম[২] মানে শাসক-শ্রেণীর ধর্ম। যাজকদের ধর্ম। ধর্ম আদিতে মানুষের ধর্ম। আল্লাহর ধর্ম। ধর্ম আদিতে যাজকদের না। শাস্ত্রের না। শাসকদের না। কিন্তু পরে এটা শাসকদের এবং যাজকদের পাল্লায় পড়ে। চার্চ মোল্লা ঠাকুর পুরোহিত ব্রাহ্মণ এবং রাজাদের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয় শাস্ত্রধর্ম। আসে বিধান। আসে আইনকানুন। আসে জাগতিক শাস্তি। শাস্তির একমাত্র মালিক সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌম ক্ষমতা কেড়ে নিতে চায় শাস্ত্রধর্ম। অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে একেই আমরা সত্যিকারের ধর্ম বলে চিনি। কিন্তু ওটা আসলে শাস্ত্রীয় ধর্ম, মানে শাস্ত্রধর্ম।

---

২ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বললে 'শাস্ত্রধর্ম' হচ্ছে 'ধর্মতন্ত্র'।

তো যাবতীয় শাস্ত্রধর্ম নারীকে নরকের দ্বার হিসেবে দেখে এসেছে। যৌনতাকে আদি পাপ হিসেবে একদম দ্বিধাদ্বন্দ্বহীনভাবে চিহ্নিত করেছে। কয়েক হাজার বছরের এই সার্বক্ষণিক মতাদর্শিক প্রশিক্ষণ আমাদের মনের মধ্যে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে। খুব শক্ত ধরনের সামাজিক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আমরা বেড়ে উঠি। খুব ভয়ঙ্কর মাত্রার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং অবদমনের মধ্য দিয়ে আমরা বড়ো হয়ে উঠি। যৌনতাকে পাপ বলে মনে করতে থাকি আমরা স্বভাবতই। যেন এটাই স্বাভাবিক।

তন্ত্র মনে করে (আমিও মনে করি, নিজের আক্কেল থেকে মনে করি আগে, পরে তন্ত্রের সঙ্গে মিলাই): যৌনতা আসলে আমাদের জননের সঙ্গে জড়িত। জন্মের সঙ্গে জড়িত। এটা প্রজননের সঙ্গে জড়িত। সমস্ত প্রজাতির ক্ষেত্রে বংশবিস্তার, পৃথিবীতে টিকে থাকা, অস্তিত্বমান থাকার সঙ্গে যৌনতা জড়িত। এতো ভাইটাল এটা। যৌনশক্তিকেই তন্ত্র ভাইটাল এনার্জি মনে করে। প্রাণশক্তি বলে মনে করে। প্রজনন-শক্তিকেই তন্ত্র বলে প্রাণশক্তি। ক্ষেত্রশক্তি। বীজশক্তি।

তো যৌনতার মতো এরকম একটা ভাইটাল ঘটনাকে কয়েক হাজার বছর ধরে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে। কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। এর কারণ কী আসলে? কারণটা হলো: যৌনতা এমনই একটা ব্যাপার যাকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে কিছুই টেকে না। ব্যক্তিমালিকানা না। পুরুষতন্ত্র না। বর্ণ-শ্রেণী-জাতি না। এগুলোর কিছুরই আভিজাত্য থাকে না আর। যত রকমের সামাজিক অসমতা কৃত্রিমভাবে তৈরী করে রেখেছে শাসকশ্রেণী, তার কোনোটাই টিকিয়ে রাখা যায় না নারীকে-পুরুষকে-যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ না করে। এইসব অসমতা হাজার হাজার বছর ধরে টিকে আছে বলে এগুলোকে স্বাভাবিক মনে হয়। প্রাকৃতিক মনে হয়।

আদিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি জিনিসটাই (সম্ভবত) পিতৃতান্ত্রিক। আর যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করেই কেবল জন্মগত/পৈত্রিক উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা যায়। এটা নিশ্চিত করা না গেলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যক্তিগত উত্তরাধিকার বলে কিছু থাকে না। সম্পত্তির উত্তরাধিকারই যদি না থাকে, তো এত কষ্ট করে সম্পত্তি তৈরি করে কী লাভ? আর সেই সম্পত্তির পাহারার জন্য সেনাবাহিনী-রাষ্ট্র-আমলাতন্ত্র ইত্যাদি প্রভৃতি এত কিছু পুষেই বা কী লাভ?

আর-সব কিছুর কথা বাদই থাক, শুধু ব্যক্তিমালিকানা না থাকলেই শাসন-শোষণ-নিয়ন্ত্রণ, অসমতা, এবং গুটিকয়ের বিশেষাধিকার থাকে না। এগুলো সমাজের পক্ষে আর দরকার পড়ে না। সমাজ দিব্যি স্বনিয়ম-স্বরাজ-সহযোগিতার ভিত্তিতে, সত্যম- শিবম-সুন্দরমের নীতিতে চলতে তাহলে আর কোনো কৃত্রিম বাধা থাকে না। চিরটা কাল, মানে লাখ বিশেক বছর ধরে মানব-সমাজ এভাবেই চলেছে।

ব্যক্তিগত মালিকানা আসলে আদি পাপ মানুষের। মালিকানা প্রথমত জ্ঞানের

ওপর। ক্রমশ সম্পদের ওপর। ব্যক্তিগত মালিকানার এই দুই লক্ষণ। পুঁজি, আর কর্তৃত্ব। এক দিকে এটা হাজার হাজার মানুষের সমবায়ে নির্মিত, প্রণালীবদ্ধ এবং পরিচালিত শিল্প-কল-কারখানার ওপর ব্যক্তির (গুটিকয়ের) মালিকানা। মালিকানা -তন্ত্র। পুঁজিতন্ত্র। অন্য দিকে এটা সম্মিলিত শ্রমের ওপর এবং সমবেত শ্রমে-কর্মে-আনন্দে অর্জিত জ্ঞানের ওপর ব্যক্তির বা গুটিকয়ের কর্তৃত্ব। কর্তৃত্বতন্ত্র।

'পুঁজি' শব্দটা বাংলায় খুবই মজার। এটা 'পুঁজ' থেকে এসেছে। পুঁজ মানে বাড়তি জিনিস। যেটা উদ্বৃত্ত। অবশিষ্ট। পড়ে থাকে। ফেলে দিতে হয়। পুঁজটা শরীরের উদ্বৃত্ত। অ্যাবসেস। অ্যাবসেস মানেও অবশিষ্ট বটে। কলিম খান দেখিয়ে-ছেন। 'মৌল বিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে' নামের দুর্দান্ত বইয়ে। মার্কসও দেখিয়েছেন যা থেকে উদ্বৃত্ত আসে না, তা পুঁজি না। সম্মিলিত শ্রম যখন ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাৎযোগ্য উদ্বৃত্ত তৈরীর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তখনই জন্মলাভ করে পুঁজি।

মার্কসের কাছেই শিখলাম, পুঁজি হলো মৃত শ্রম। শত হাজার লক্ষ বছরের সঞ্চিত সম্পদ এবং জ্ঞান। টেকনোলজি এবং সম্পত্তি। টেকনোলোজি মানে মুলত 'নো-হাউ'। নলেজ। কোনো কিছু বিশেষভাবে সম্পাদন করার উপায়গত জ্ঞান। প্রকৃষ্ট যুক্তিবোধ: প্রযুক্তি। ভুলে যাওয়ার উপায় নাই, পুঁজিতন্ত্রে জ্ঞানও ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন। আইনত। আদতে 'পুঁজি' নিজে কিন্তু সমস্যা না। মানে সামজিকভাবে আয়োজিত-উদ্ভাবিত-কর্ষিত জমি বা কারখানা কোনো সমস্যা না। মনুষ্যজীবন উৎপাদন-পুনরুৎপাদনের জন্য এগুলো অপরিহার্য বিষয়। সমস্যা হচ্ছে এসবের ওপরকার ব্যক্তিগত অথবা গুটিকয়ের মালিকানার বোধ। একইভাবে, কর্তৃত্ব জিনিসটাও নিজে কোনো সমস্যা না। ব্যক্তির নিজস্ব কর্তাসত্তা অতীব জরুরি একটা প্রজাতি-গুণ মানুষের। ব্যক্তিসত্তা মানেই তো আসলে কর্তাসত্তা। স্রেফ প্রজাতি-নিয়মে, স্বয়ংক্রিয় প্রাকৃতিক নিয়মে, পাল-বাঁধা গতে জীবন চালানোটা ব্যক্তি-মানুষের জীবন নয়। তার চাই স্বাতন্ত্র্য। নিজস্ব প্রকাশ। অনন্য অভিব্যক্তি। ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করে কথায় এবং কাজে। (অবশ্য, কথা বলাটা নিজেই একটা কাজ। এবং 'কাজ' নিজে একটা কথাও বটে।) ব্যক্তির প্রকাশের জন্যই চাই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য। নিজের একটা সিস্টেম। স্ব-তন্ত্র। উইলিয়াম ব্লেক যেমনটা লিখেছিলেন, 'আমাকে নিজেই বানাতে হবে নিজের সিস্টেম, তা না হলে দাসত্ব করতে হবে অন্যের বানানো সিস্টেমের', তেমনই আসলে: ব্যক্তির ব্যক্তিগত কর্তাসত্তাই তার স্বাতন্ত্র্যের নিয়ামক। একই জিনিসের দুই অঙ্গ এরা। পুঁজি আর কর্তৃত্বতন্ত্র।

এমনকি এই সেদিনও, খাজুরাহোতে, নিষিদ্ধ ছিল না যৌনতা। কামসূত্রে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। পুরনো অনেক কিছুতেই এটা নিষিদ্ধ ছিল না। বিগত কয়েক হাজার বছরের (যৌন-)নিয়ন্ত্রিত সমাজ আসলে সনাতন-সদাতন-চিরন্তন সমাজনীতির

প্রতিনিধিত্ব করে না। যৌন-নিয়ন্ত্রণের মামলাটা তার মানে স্রেফ যৌন মামলা নয়। এটা সন্তান ও সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার মামলা। ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রণের মামলা। সমাজ-নিয়ন্ত্রণের মামলা। তার মানে স্বাধীনতার প্রশ্ন এটা। মানুষের স্বাধীনতা। ব্যক্তির আর সমাজের স্বাধীনতা। জরুরি প্রশ্নই বটে। এবং প্রসঙ্গত, তন্ত্র আর কিছু না, স্বাভাবিক স্বরাজ-তন্ত্র। ব্যক্তি-স্বাধীনতাশীল সমাজ-তন্ত্র। তন্ত্র হচ্ছে আদিতম অ্যানার্কির অন্যতম অভিপ্রকাশ। তন্ত্র হচ্ছে প্রাকৃতিক- অ্যানার্কিক স্বাধীনতা। স্বনিয়ম, স্বশাসন আর সহযোগিতার চিরপুরাতন ধারণা। তন্ত্র আমাদের স্বাধীনতা-পুরাণ। স্বাধীনতা-সংহিতা।

তো যৌনতার মতো এরকম একটা জিনিসকে, তথা প্রাণশক্তিকে -প্রাণসত্তাকে, কি একেবারে নিষিদ্ধ করা যায় আসলে? 'পাপ' বলে ঘোষণা করলেই কি এটাকে থামানো যায়? যায় না। এটা কা-জ্ঞান। তন্ত্রজ্ঞানও বটে। যৌনতা আত্মপ্রকাশ করেই। করবেই। আত্মপ্রকাশ করে হাসিতে। কণ্ঠস্বরে। চোখের জ্যোতিতে। এমনকি চোখের ঠুলিতে। আবরণেও। এ জিনিস আসলে নিজের নিয়মে চলে। চলে প্রাণের সদাবিকাশের নীতিতে। সংবিধান কিংবা দণ্ডনীতি অনুযায়ী চলে না যৌনতা।

যৌনতা এতটাই শক্তিশালী যে কাউকে ছাড়ে না। আমাকে না। আপনাকে না। সেনাপতি-বিচারপতি-রাষ্ট্রপতিকে না। কোনো পতিই ছাড় পান না এর হাত থেকে। কোনো পত্নী কিংবা বিপত্নীক পান না। সবচেয়ে বড়ো হুজুর, সব চেয়ে বড় পুরুত ঠাকুরকেও জায়গামতো কাত করে ফেলে এ জিনিস। এমনকি ৩০ বছর, ৪০ বছর ধরে যোগসাধনা করার পরেও যৌনতার সামান্য কাদায় পিছলা খায় যোগী। মাথা ফেটে যায়। মাথা নষ্ট হয় সন্ন্যাসীর। অ্যাতো পাওয়ারফুল এ জিনিস। ঘটা করে আত্মপ্রকাশই বা করবে কী, ও জিনিস তো আছেই। ইট ইজ অলঅয়েজ দেয়ার। অ্যান্ড হিয়ার। আত্মপ্রকাশের যখন আপনি কোনো 'আইনসম্মত' পথ রাখেন না, তখন তা ঘটনা ঘটায় দুই নম্বরি রাস্তা দিয়ে। চিপাচাপা দিয়ে। যেটাকে আমি 'দুই নম্বরি' এবং 'চিপাচাপা' বললাম, সেটা আসলে এক ধরনের সাবভারসিভ অ্যাক্টিভিটি। গেরিলা অ্যাক্টিভিটি। রাষ্ট্রীয় অন্তর্ঘাতী তৎপরতা। এক প্রকার বিদ্রোহ।

বিদ্রোহ জিনিসটা কারো জন্যই খুব সুখকর না। কিন্তু বাধ্যতামূলক। প্রাকৃতিক-ভাবে বাধ্যতামূলক বিদ্রোহ। স্বাধীনতার মতো স্বাভাবিক। কর্তৃত্বতন্ত্রের কাছে নিয়ন্ত্রণ যেমন স্বাভাবিক, স্বাধীন মানুষের কাছে বিদ্রোহ তেমনি স্বাভাবিক। বিদ্রোহ আর কিছু না, স্বাধীনতার এক প্রকার ঘোষণা মাত্র। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ঘোষণা। এ স্রেফ নিজের স্বাধীনতাকে অ্যাসার্ট করা। নিশ্চিত করা। কর্মসূচি দিয়ে নয়। ম্যানিফেস্টো দিয়ে নয়। নিছক কৃতকর্ম দিয়ে। মেনিফেস্টো মেনে চলে না বিদ্রোহ। খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি পাঠায় না। তবু গোপন থাকে না আসলে বিদ্রোহ। সবাই জানে। কেউ

দেখে। কেউ দেখে না। অভ্যস্ত চোখ, বুদ্ধি-দাসের চোখ বিদ্রোহকে সুন্দর দেখে না। কর্তৃত্বের নজরে বিদ্রোহ সদা-অসুন্দর। অশ্লীল। অপরাধ।

এই হলো যৌনতার সাথে অশ্লীলতা আর অপরাধের আসল সম্পর্ক। যৌনতাকে ক্রিমিনালাইজ করেছে কর্তৃত্বতন্ত্র। পর্যবসিত করেছে দণ্ডবিধির আওতাভুক্ত ফৌজদারি অপরাধে। দেহাত্মার সর্বোচ্চ সুখকে ক্রিমিনাল অফেন্স হিসেবে বিবেচনা করে কর্তৃত্বতন্ত্র। এই জন্যই যৌনতা অশ্লীল। দেহ অশ্লীল। অশ্লীলতার ধারণা এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দণ্ডবিধি। পিতৃতন্ত্র।

এমনিতে মিডিয়ার মালিক তো পিতৃতন্ত্র। সিনেমায়ও সে নারীকে অধীনস্ত করে রাখে। নারী-কর্তৃত্ব অদৃশ্য হতে থাকে। নিষ্ক্রিয় দেখানোর চেষ্টা করে নারীকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে অ্যাবসলিউট হতে দেয় না মা-প্রকৃতি, আমাদের প্রজাতিসত্তা। পিতৃতন্ত্রের মিডিয়া, পিতৃতন্ত্রের পুঁজি নিজেকে বাঁচানোর জন্য, (যৌন) নিয়ন্ত্রণের বিকাশের স্বার্থে যৌনতারই আশ্রয় নিতে হয় বাধ্য। সে ভাবে, সে মিথ্যা যৌনতা দেখাচ্ছে। সে ভুলে যায় যে 'মিথ্যা' আর কিছু নয়, সত্যেরই এক কিসিমের বিবৃতি মাত্র। সুতরাং আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন যৌনতা স্বয়ং। তাকে আর লুকিয়ে রাখা যায় না। নিয়ন্ত্রণে রাখা মুশকিল হয়ে পড়তে থাকে। ভেঙে পড়তে থাকে অবদমনের ঘের। পিতৃতন্ত্র ভাবে, নারীকে যৌনবস্তু হিসেবেই দেখাতে থাকবে, কিন্তু প্রকারান্তরে হাজির হতে থাকে নারীই। টের না পেয়ে উপায় থাকে না: যৌনবস্তুসত্তা থেকে নারীর মুক্তির সাথেই মিশে আছে পুরুষের মুক্তি। নারীমুক্তির ওপরই নির্ভর করছে সর্বমানুষের মুক্তি।

তো আমি হিন্দি ছবিকে, মিডিয়াবাহিত-মিডিয়ানির্মিত যৌনতার যাবতীয় অভি-প্রকাশকে, এইরকম একটা জায়গা থেকে দেখি। একমাত্র এই জায়গা থেকে দেখি তা না। তবে এটা একটা মূল জায়গা বটে। আরও নিশ্চয় অনেক ব্যাপার আছে এর মধ্যে। সেগুলো আমি জানি না। জানার দাবি করি না। (আমাদের মনে থাকে না যে আমরা প্রায় কোনো কিছু সম্পর্কেই খুব বেশি কিছু জানি না। 'জানি না' বলতে, 'জানি না' ভাবতে আমাদের অহংকারে লাগে। গরিমায় লাগে।)

আমার মনে প্রচুর প্রশ্ন। উত্তর জানা দরকার। মস্তিষ্ক চলে কীভাবে? আমাদের এই মুহূর্তে কী চাই? আমরা খুব ভালো করে জানি না আসলে। 'শিল্পবোধহীন' 'সাধারণ' মানুষ কি সত্যিই পর্নো পছন্দ করে? ভালোবাসে? নাকি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায়? মানুষেরা কি সদা-সর্বদা ছোট পোশাকধারী? তারা কি ছোট পোশাকের নায়ক নায়িকা দেখতেই পছন্দ করে? ভালোবাসে? নাকি খালি চোখে দেহ নিষিদ্ধ বলে, ক্যামেরার চোখে বেশি বেশি দেহ খোলার চেষ্টা? অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা নয়ত এ জিনিস? কর্তৃত্বতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়ত? এই যে মিডিয়া-রুচির দায় গণহারে

গণরুচির ঘাড়ে চাপাচ্ছি, তথা 'সাধারণ' মানুষের ওপর চাপাচ্ছি, এটা কেমন ব্যাপার আসলে? সাধারণ মানুষের ধারণাটাকে অতিসাধারণীকরণ করে ফেলছি না তো? সাধারণত যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় সেই 'গণরুচি' জিনিসটা স্রেফ কল্পিত কিছু নয়ত? ব্যাপারটা কি 'রুচি'র আদৌ? নাকি স্বাভাবিক গণআকাঙ্ক্ষার? বিশেষত যৌনতা সম্পর্কে? কিংবা তথাকথিত সাধারণ মানুষ কি ভায়োলেন্স পছন্দ করে? খুনখারাবি, প্রচুর রক্ত পছন্দ করে? না। একেবারেই না। ছোটবেলা থেকেই দেখছি, রক্ত দেখলে সুস্থ মানুষেরও মাথা ঘোরে। হ্যাঁ, শক্তিশালী লোকেরও মাথায় চাপ হয়। কারো মাথা ফেটে গেলে সে-ঘাবড়ে যায়। আপসেট হয়ে যায়। এটাকে পছন্দ করে না। কিন্তু সিনেমার বেলায় মানুষ এটা গিলছে। পুঁজি বা মৃত শ্রম যখন জীবিত শ্রমের ওপর আধিপত্য করে, কর্তৃত্ব ফলায়, তার নাম হয় পুঁজিবাদ। কর্তৃত্বতন্ত্র। সমাজদেহেও তখন পুঁজ জমে। খুনখারাবি-রাহাজানি দেখা দেয়। ধর্ষণ দেখা দেয়। বলপ্রয়োগ 'বৈধ' হয়ে ওঠে। খোদ আইনের ভিত্তি হয়ে ওঠে বলপ্রয়োগের মতো চির-অবৈধ একটা ঘটনা।

৩২.৭ আদিতম সামাজিক আইন: বলপ্রয়োগহীন নিয়মকানুন-বিধিবিধান

আদিতে কিন্তু কোনো প্রকার বলপ্রয়োগই সনাতন-আবহমান নিয়ম-নীতি-আইন-কানুনের ভিত্তি ছিল না। আইন বলতে আজকে আমরা বুঝি লিখিত আইন। লিখিত আইন নিতান্তই অর্বাচীন। অল্পদিনের। চিরকালীন সুপ্রাচীন পৃথিবী চলেছে চিরকালই চলেছে অলিখিত আইনের ভিত্তিতে। প্রচলিত সামাজিক বিধিব্যবস্থা, নিয়মকানুন, রীতিনীতি, যার যার সম্প্রদায়ের প্রথা-বিশ্বাস-ঐতিহ্য, আচার-ব্যবহার-অভ্যাস, রেওয়াজ-দস্তুর-চল, ও সংস্কার-ধর্মাচার ইত্যাদিই ছিল মানুষে-মানুষে লেনদেনের, মিলেমিশে থাকার অলিখিত ভিত্তি। ব্যক্তি ও সমাজকে টিকিয়ে রাখার এবং নিরাপদে ক্রমবিকশিত করে তোলার প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছিল এইসব অলিখিত আইন। অযুত-নিযুত বছর ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিল এইসব অলিখিত সামাজিক নিয়ম-কানুন-বন্দোবস্ত। এগুলোর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালনের জন্য কোনো কেন্দ্রীভূত কর্তৃপক্ষ ছিল না মোটেও। আর পিতৃতন্ত্রের উৎপত্তিরও অনেক আগেই এইসব জিনিসের সর্ব-সামগ্রিক একটা সিস্টেম গড়ে উঠেছিল। এখনও দুনিয়ার বিপুল সংখ্যক মানুষের নানা ধরনের আদিবাসী সমাজ চলে এইসব অলিখিত সামাজিক আইনে। এমনকি আমাদের অক্ষর-সভ্য দুনিয়ার মানবসমাজেও এইসব সুপ্রাচীন নিয়মকানুনের সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষত ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক নানা রকমের আচার-অভ্যাস ও উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে। (আইনকানুন-কর্তৃপক্ষের উৎপত্তি

নিয়ে এই ধারার আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: পিওতর ক্রপোৎকিন, ১৮৮৬। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্য দ্রষ্টব্য: পিওতর ক্রপোৎকিন, ১৮৯৭।)

আমার বিশ্বাস: বাংলায় 'নিয়ম-কানুন-বিধি-বিধান' কথাগুলো লক্ষ করলেও আমরা এই ধারণার সত্যতা সম্পর্কে ধারণা পাব। এ শব্দগুলোকে আজকের অর্বাচীন রাষ্ট্র নাগরিকেরা রাষ্ট্রীয় আইনের ধারণার আলোয় বুঝে থাকেন। তারা ভাবেন এগুলো রাষ্ট্র-লিখিত 'আইন'-এর প্রতিশব্দ মাত্র। আসলে তা নয়। 'নিয়ম', 'কানুন', 'বিধি' ও 'বিধান' এর সাথে – আদিতে – রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষীয় লিখিত আইনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এইসব শব্দের মধ্যে আছে আদিতম বিকেন্দ্রায়িত ও স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক বন্দোবস্তের ইশারা। মানুষ যে আদিতে কোনো কর্তৃপক্ষ-লিখিত বা কর্তা-নির্ধারিত আইনের অধীনে বাধ্যতামূলকভাবে সামাজিক জীবন যাপন করত না, তা আমরা বুঝতে করতে পারি এই শব্দগুলোর আদি অর্থের দিকে তাকালে। কলিম খানের সুবাদে আমরা জানি (কলিম খান ১৯৯৫; কলিম খান, ২০০১) যে এই কাজে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬)।

বঙ্গীয় শব্দকোষ থেকে জানা আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে যে 'নিয়ম' জিনিসটার গোড়ায় আছে সংযম, সংকল্প, অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞার ধারণা। তার মানে নিজেকে নিজে সামলানোর ধারণা। আরো আছে ব্রতচর্যা, নিত্যকর্ম, মন্ত্রণা, ও ব্যবস্থার ধারণা। বেদান্তসার অনুসারে: নিয়ম হচ্ছে শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, এবং ঈশ্বর-প্রণিধান। মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে: নিয়ম হলো অক্রোধ, গুরুশুশ্রূষা, শৌচ, আহারলাঘব, ও স্বাধ্যায়। অত্রি সংহিতা বলছে: নিয়ম হচ্ছে তপঃ, দান, ব্রত, শৌচ, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, উপস্থনিগ্রহ, মৌন, উপবাস, আর স্নান। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা মোতাবেক নিয়ম হলো শৌচাদি, সপ্ত গুরুসেবা, অক্রোধ, ও অপ্রমাদ। সর্বোপরি, মীমাংসা-শাস্ত্র সুস্পষ্ট করে জানাচ্ছে: নিয়ম হলো 'যাহা জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিপ্রাপ্ত ... তাদৃশ বিধি বিশেষ'। (দ্রষ্টব্য: হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-ক: ১২১২)

এখানে অক্রোধ, আহারলাঘব, ব্রত, মৌন, উপবাস, উপস্থনিগ্রহ (কাম-ইন্দ্রিয় সংযম) ইত্যাদি থেকে সংযম, স্বনিয়ন্ত্রণ আর স্বপরিচালনার পরিষ্কার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। নিয়ম তাহলে নিজেকে নিজে বা নিজেদেরকে নিজেরা চালানো। আবার, নিত্যকর্ম, শৌচাদি, তপস্যা, দান, গুরুসেবা ইত্যাদি বলছে প্রচলিত রীতি মোতাবেক চলা এবং সৎকর্ম ও শুভকাজ সাধন করাই নিয়ম। অন্য দিকে, বিশেষ করে অপ্রমাদ থেকে বোঝা যায়: ভুল না করা বা সঠিক পথে নিজেকে চালানোই নিয়ম। আর মীমাংসা যা বলল, জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সাথে মানানসই বিধি-বিধানই নিয়ম। এর সাথে আজকের রাষ্ট্রের লিখিত আইনের সম্পর্ক কোথায়?

এবার আসি নিয়মকানুনের কানুনে। 'কানুন' শব্দটা আমাদের এখানে এসেছে আরবি শব্দ কানূন[৩] থেকে (হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-ক: ৫৯৮)। এর আদি উৎপত্তি গ্রিক শব্দ 'কানা'[৪] থেকে। অনলাইন 'উইকশানারি' অভিধান অনুসারে, 'কানা' শব্দটার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটা অর্থ হলো 'নিয়ম, প্রথা, ও সাধারণ নীতির সাহায্যে কোনো কিছুকে বিচার করে দেখা'।[৫] 'নিয়ম' এখানে ইংরেজি 'রুল' নামের যে কথাটা আছে তা নিয়ে একটু পরে আসছি। আপাতত, তার আগে 'বিধিবিধান'-এর অর্থ তালাশ করা যাক।

বঙ্গীয় শব্দকোষে 'বিধি' কথাটার অর্থ 'করণ' 'সম্পাদন' 'প্রবর্ত্তন' 'অনুষ্ঠান' 'সৎকার' 'প্রয়োগ' 'স্রষ্টা' 'কাল' 'সময়' 'দৈব' 'নিয়তি' 'অদৃষ্ট' 'উপায়' 'সংস্কার' ইত্যাদি (হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-খ: ১৫৪৪)। অন্য দিকে, 'বিধান' কথাটার অর্থ 'বিধি'র মতোই। 'করণ' 'অনুষ্ঠান' 'নির্ম্মাণ' 'সাধন' 'সম্পাদন' 'উপায়' 'কর্ম্ম' 'বিহিত' 'সংস্কার' 'নিত্যকর্ম্ম' ইত্যাদি (হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-খ: ১৫৪৪)। বিধিবিধানের এইসব আদি অর্থের মধ্যে কতিপয়ের লেখা বা সংকলিত করা কোনো আইনের ধারণার লেশ মাত্র যে নাই, তা শাদা চোখেই দেখা যায়। কর্তৃত্বতন্ত্রের উৎপত্তির পরে শাস্ত্র এবং শাস্ত্রবিধি জাতীয় ধারণার উৎপত্তি ঘটে। মনে করিয়ে দিয়ে রাখি, 'মহাভারত' মোতাবেক আদিতম শাস্ত্রবিধির নাম হলো দণ্ডবিধি এবং এর উদ্ভব বহু পরের ঘটনা। (আদিতম সমাজে রাজা, দণ্ডবিধি, ও কর্তৃত্বতন্ত্রের আদি উৎপত্তি নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩-গ)।

আইন ব্যাপারটা আদিতে যে বহুকালব্যাপী প্রচলিত সামাজিক সংস্কার-রীতিনীতি-বিধিবিধান ও প্রথাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল, তা এমনকি ইংরেজি ভাষার 'রুল' এবং 'ল' শব্দগুলোর দিকে তাকালেও বোঝা যায়। (এখানে ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দগুলোর অর্থ অনলাইন বহুভাষিক অভিধান 'উইকশানারি' থেকে নেওয়া হয়েছে (en.wiktionary.org)। ইংরেজি rule শব্দের অর্থ 'স্বাভাবিক অবস্থা বা সার্বিক পরিস্থিতি'[৬]। এর আরো একটা অর্থ হচ্ছে: 'সর্বজনীন বা সাধারণ সম্মতির ভিত্তিতে, বা প্রচলিত আচার-অনুশীলনের ভিত্তিতে [কোনো কিছু] নির্ধারণ করা'[৭]।

---

৩ قانون

৪ κάννα

৫ something to judge by rule, norm, general principle (https://en.wiktionary.org/wiki/κανών)

৬ A normal condition or state of affairs (https://en.wiktionary.org/wiki/rule).

৭ to fix by universal or general consent, or by common practice

উইকশানারি বলছে, অধিকতর সর্বজনীন অর্থের দিক থেকে 'ল জিনিসটা সাধারণত প্রচলিত রীতিনীতি-ঐতিহ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট।'[৮] প্রচলিত রীতিনীতি-ঐতিহ্য বলতে ইংরেজিতে যাকে বলে 'মোর্স' আর কি। উইকশানারিতে 'মোর্স' কথাটার মানে হলো 'নীতি-নৈতিকতাগত এমন এক গুচ্ছ প্রথা বা প্রচলিত যার উৎপত্তি ঘটে সাধারণ-ভাবে স্বীকৃত আচার-অনুশীলন থেকে – লিখিত আইন থেকে নয়।'[৯] আমাদের জন্য মোক্ষম একটা দৃষ্টান্ত-বাক্য পেশ করে তাঁরা জানাচ্ছেন যে 'অনুসরণ করার মতো ভালো একটা আইন হলো: 'অন্যের সাথে সেই আচরণই করো যে আচরণ তোমার সাথে অন্যেরা করুক বলে তুমি চাও'।[১০]

সার্বিক-কিন্তু-সংক্ষিপ্ত এই পর্যালোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোই যায় যে সনাতন কাল থেকে আচরিত, অনুসৃত ও অনুশীলিত সামাজিক নিয়ম-কানুন-বিধি-বিধান-আইনের সাধারণ পাটাতন ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, শলাপরামর্শ ও সমঝোতা, প্রচলিত আচার-অনুশীলন ও রীতিনীতি, এবং সমাজ-সংহতির অনুভূতি। বঙ্গীয় শব্দকোষে যেমনটা দেখলাম, নিয়ম জিনিসটার একটা অর্থ যে 'মন্ত্রণা', তা থেকেও কিন্তু এই ধারণাই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি, দণ্ডবিধি, বা কর্তা-কর্তৃপক্ষের কোনো কারবারই নাই। মানুষ নিজের গরজেই নিয়ম মতো জীবনযাপন করে এসেছে। এখানে সর্বসাধারণের ওপর গুটিকয়ের মাতব্বরি-পোদ্দারির কোনো কাহিনী নাই।

এমনকি আধুনিক রাষ্ট্রের লিগ্যাল সিস্টেমও কিন্তু গোড়ায় প্রচলিত রীতিনীতি তথা ক্যানন-কাস্টমকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। এ ছাড়া উপায় কী! যাবতীয় আইনকানুন বলতে তো ঐসব জিনিসই ছিল। শূন্য থেকে তো আর একটা জিনিস গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং আধুনিক ইঙ্গ-ইউরোপীয় রাষ্ট্রের আইনব্যবস্থার শুরুতেই আসে 'কাস্টোমারি ল'। যাবতীয় আধুনিক আইনের গোড়া এই প্রচলিত নিয়মকানুন। প্রচলিত নিয়মকানুনগুলোকে কর্তৃত্বতন্ত্র কীভাবে সুকৌশলে বেছে বেছে, নিজেদের মতো করে সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখিত আইনের ভিত্তি স্থাপন করেছে তা পিওতর ক্রপোৎকিনের উপরোক্ত রচনা দুটিতে পাওয়া যাবে। তো, এই হলো আধুনিক আইনকানুন-রাষ্ট্রের উৎপত্তির মোদ্দা কেচ্ছা। আর এই কেচ্ছার একচ্ছত্র

(https://en.wiktionary.org/wiki/rule).

৮ Laws are usually associated with mores (https://en.wiktionary.org/wiki/law).

৯ A set of moral norms or customs derived from generally accepted practices rather than written laws (https://en.wiktionary. org/wiki/mores).

১০ Do unto others as you wish them to do unto you' is a good law to follow (https://en.wiktionary.org/wiki/mores).

একাধিপতি একনায়ক হচ্ছেন জনাব দণ্ড ওরফে ডান্ডা। যবে থেকে জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসূত্রে প্রাপ্ত রীতিনীতির ওপর জেলজুলুমের ডাণ্ডা ঘোরাতে শুরু করেছে কর্তৃত্বতন্ত্র, তবে থেকেই মনুষ্যসমাজ অধঃপতিত হতে শুরু করেছে দণ্ডসমাজে (আদিতম সমাজে রাজা, দণ্ডবিধি, ও কর্তৃত্বতন্ত্রের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩-ঙ)।

বোঝাই যাচ্ছে: বলপ্রয়োগের মতো চির-অবৈধ একটা ঘটনা যখন খোদ আইনের প্রধানতম ভিত্তি হয়ে ওঠে, তখন থেকেই বদলে যেতে থাকে চিরকালের মানুষের সমাজ-সভ্যতা-আচরণ। জোর যার মুল্লুক তার নীতিকে অনুসরণ করে উৎপত্তি লাভ করতে থাকে পাইক-পেয়াদা, রাজা-উজির, থানা পুলিশ, আইন-আদালত, হাজত-কয়েদ আর শুলে চড়ানোর ব্যবস্থা। স্বাভাবিক হয়ে ওঠে বল-প্রয়োগ আর বলাৎকারের সিস্টেম। (বলপ্রয়োগ আর বলাৎকার বিষয়ে দ্রষ্টব্য: সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩-ক।)

সুতরাং বলাৎকার ঘটে সমাজে। বলাৎকার ঘটে সিনেমায়। ছোট-বড়-মাঝারি পর্দায়। শাস্ত্র-সাহিত্য-মিডিয়া আমাদেরকে খুনের দৃশ্য দেখায় প্রতি ঘণ্টায়, প্রতিটা অধ্যায়ে। মানে দাঁড়ায় ব্যক্তিগতভাবে কেউ কাউকে খুন করার আগেই ভার্চুয়ালি খুন করতে শেখা। হিংসা করতে শেখা। হিংসা মানে কিন্তু হনন করার ইচ্ছা। এবং এই ইচ্ছার উপর দাঁড়িয়ে আছে আজকের রাষ্ট্র। এসব রাষ্ট্র সবই সামরিক রাষ্ট্র। সশস্ত্র রাষ্ট্র। প্রয়োজনে নিজ নাগরিকদেরকে মারধোর-বন্দি করার, এমনকি হত্যা করার, আইনি লাইসেন্স ছাড়া এইসব রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। আমাদের মনে থাকে না: 'সহিংসতার ঘনীভূত ও সুসংহত রূপের প্রতিনিধিত্ব করে রাষ্ট্র। ব্যক্তির আত্মা থাকে, কিন্তু রাষ্ট্র যেহেতু আত্মাবিহীন একটা মেশিন, সেহেতু তা কখনোই সহিংসতা থেকে মুক্ত হতে পারবে না – কেননা এর খোদ অস্তিত্বটাই তো সহিংসতার কাছে ঋণী।' (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-ক: ৩১৮; উদ্ধৃত: সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩-খ: ১৬৮-১৬৯।)

তো এভাবে এক দিকে চড়-থাপ্পড়-জেল-জুলুম, অন্য দিকে বলপ্রয়োগকে ভিত্তি করে হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা পুঁজিতন্ত্র-কর্তৃত্বতন্ত্রের কৃত্রিম আইনী 'বৈধতা'র হাজারো অবৈধ অনুশীলন জনমানুষের মননকে দূষিত করে ফেলতে থাকে। বৃটিশ রাজনীতিবিদ-লেখক-ইতিহাসবেত্তা লর্ড অ্যাক্টন (১৯০৭) বলে-ছিলেন, 'পাওয়ার টেন্ডস টু করাপ্ট, অ্যান্ড অ্যাবসলিউট পাওয়ার করাপ্টস অ্যাব-সলিউটলি'। বিশপ ম্যান্ডেল ক্রেইগটনের কাছে ১৮৮৭ সালে লেখা এক চিঠিতে এই মন্তব্য করার জন্য খ্যাত হয়ে আছেন লর্ড অ্যাক্টন (দ্রষ্টব্য: ফিগিস ও লরেন্স, ১৯০৭)। কতিপয়ের কর্তৃত্বতন্ত্র বা কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা-সংস্কৃতি দূষিত করতে থাকে

আমাদের মেধা-মনন, চিন্তা-ভাবনা, করণ-কারণ সবকিছু।

সবকিছু দূষিত হলে সিনেমার আর দোষ কী? দর্শকেরই বা দোষ কী? পপুলার সিনেমার ভায়োলেন্স আর দর্শকের খুনপিপাসা নিয়ে অক্ষম নালিশ আমরা তুলি। আধুনিক রাষ্ট্রের আইনকানুন- পুলিশ-পার্লামেন্ট-প্রশাসনের সর্বজনীন খুনপিপাসার কথা তুলি না। মনেও রাখিনা। যদি রাখতাম, তাহলে আমাদেরকে সিনেমা হলের অন্ধকারে আন্দাগুন্দা কালো ভিলেন খুঁজতে হতো না।

৩২.৮ দীক্ষায়ন-প্রকৌশল ও প্রশিক্ষিত শিল্পবোধ

তাহলে দেখা গেল: বলপ্রয়োগ আমাদের তথাকথিত আইনের শাসনের আদি ভিত্তি। আমাদের যাবতীয় 'ন্যায়পরায়ণতা'র আইনগত ভিত্তি হচ্ছে প্রতিশোধপরায়ণতা। তুমি জনাব খ-কে খুন করেছ, এটা যদি প্রমাণ করা যায়, তাহলে আইনত তোমাকে খুন করার অধিকার জন্মে আদালতের, মানে রাষ্ট্রের। যে খুন তুমি করলে অপরাধ, সেই খুন রাষ্ট্র করবে তোমার ঐ অপরাধ মোচনের জন্য। এ বড় সহজ কথা নয় বৈকি। এ জিনিসকে জলপানির মতো সহজ দ্রব্য হিসেবে গিলে ফেলে বিনা প্রশ্নে হজম করার যে আশ্চর্য শক্তি আমাদের জন্মেছে, সেই শক্তি কিন্তু কেবল দণ্ডনীতির বা বলপ্রয়োগের জোরে জন্মে না। এর জন্য লাগে প্রশিক্ষণ। অতি সূক্ষ্ম, সর্ব-ব্যাপক, প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণ জিনিসটাকেই আমরা আদর করে 'শিক্ষাদীক্ষা' নামে ডাকি। বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষায়িত এবং বিশেষ দীক্ষায় দীক্ষায়িত করে তোলার এই পদ্ধতিকে বাংলায় আমি 'দীক্ষায়ন প্রকৌশল' বলে থাকি। (এ সংক্রান্ত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: কামরুল হাসান মঞ্জু কর্তৃক সম্পাদিত 'জনপরিসরে গণমাধ্যম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' প্রকাশিত সেলিম রেজা নিউটনের প্রবন্ধ 'বাজারের যুগে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার আম্মু-আব্বু-সমাচার অথবা বাংলাদেশে বিদ্যমান মহাজনী মুদ্রণের পলিটিক্যাল ইকোনমি', ঢাকা: ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার, ২০০৩।) আর একেই 'ইনডকট্রিনেইশন সিস্টেম' বলে আখ্যায়িত করেন নোম চমস্কি। শিক্ষা তাঁর কাছে যুব-সমাজকে ইনডকট্রিনেইট বা দীক্ষায়িত করার একটা সিস্টেম যেখানে তরুণযুবারা 'ইতি আপনার একান্ত বাধ্যানুগত ছাত্র' হিসেবে গড়ে ওঠার বিস্তারিত প্রশিক্ষণ পায় (নোম চমস্কি, ১৯৮৯)। এ কথা এখানে না বললেও হয়ত চলে ইনডকট্রিনেইশন বা দীক্ষায়ন বলতে চমস্কি বোঝেন মানুষের 'কিন্ডারগার্টেন থেকে পেশাগত জীবন পর্যন্ত' পুরোটা কালপর্বকে (নোম চমস্কি, ২০০০)। এটা কী বস্তু তা উপলব্ধি করা অথবা একে শনাক্ত করা পর্যন্ত আমাদের জন্য দায় হয়ে ওঠে। কেননা আইন-আদালত অশ্লীলতা ব্যভিচার মাদকাসক্তি সহিংসতা কিংবা শিল্পবোধ সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব

ধ্যানধারণা- চিন্তাভাবনা কতটা আসলেই আমাদের নিজস্ব মস্তিষ্কপ্রসূত, আর কতটা দীক্ষায়ন-প্রকৌশলের প্রশিক্ষণ-রসে জারিত তা খেয়াল করার অবকাশ আমাদের সামান্যই ঘটে।

যেমন ধরা যাক, সাইয়ীদ ভাই বলেছেন চমৎকারভাবে, কবি-সাহিত্যিকরা যখন লেখেন তখন তাদের উপর কী যেন একটা ভর করে। উনি একটু নরম করে ভদ্র ভাষায় বললেন 'মেটাফিজিক্যাল' একটা কোনো ব্যাপার-ট্যাপার ঘটে হয়ত। (আবু সাইয়ীদ, ২০১৩।) এই দ্বিধাটাকে বোঝা একটু কঠিন। যেভাবেই হোক, মানুষ তো মেটাফিজিক্যাল প্রাণীই। মানুষ কবিতা লেখার সময় মেটাফিজিক্যাল। মানুষ সঙ্গম করার সময়ও কিন্তু মেটাফিজিক্যালই। মানুষ প্রাণীটাই আসলে স্পিরিচুয়াল একটা প্রাণী। মেটাফিজিক্যাল প্রাণী। মানুষ স্রেফ ফিজিক্যাল না। এর ফিজিক্যাল অ্যাসপেক্টগুলো খুবই স্থূল, এবং তারপরও, এর ফিজিক্যাল অ্যাসপেক্টগুলো পর্যন্ত আমাদের অত্যন্ত অজানা। আর মেটাফিজিক্যাল দিকগুলো তো রীতিমতো দুর্বোধ্যই বটে। তো এই মেটাফিজিক্যাল ব্যাপারগুলোকে সাহসের সাথে, দ্বিধাহীনভাবে, কবুল করে নিয়ে তার সামনে দাঁড়াতে পারার যে মুহূর্ত, মানে নিজের সামনে নিজে দাঁড়ানোর একান্ত নির্জন যে মুহূর্ত, ওটাই হলো শিল্পের মুহূর্ত, ওটাই শিল্প-সৃজনের প্রাক-মুহূর্ত। এভাবে দেখলে তাহলে 'শিল্পবোধ' নিয়ে গর্ব করার কিছু থাকে না। যেটাকে আমরা 'শিল্পবোধ' বলি সেটা আসলে এটা একটা গণ ক্যাটেগরি। এ দিয়ে তেমন অর্থপূর্ণ কিছু একটা বোঝানো কঠিন। শিল্পবোধ মানে আসলে ট্রেনিং। এ ছাড়া আর কী? ধরেন সিনেমার বেলায়, আপনাকে কতোগুলো পরিচালকের নাম জানতে হবে, টেকনিক্যাল ল্যাংগুয়েজ জানতে হবে, জারগন জানতে হবে। সিনেমার টেকনিক্যাল ভাষায় যদি আপনি কথা বলতে পারেন, তাহলে এটা সহজেই বোঝা যাবে যে আপনি চলচ্চিত্রবিষয়ক শিল্পবোধসম্পন্ন একটা মানুষ। কবিতার বেলাতেও এই কথা প্রযোজ্য। কতোগুলো টার্ম, কতোগুলো নাম, জানতে হবে। এখন কথা হলো, টেকনিক্যালিটিজ তো প্রশিক্ষণের বিষয়! এর সাথে শিল্পের সম্পর্ক কী? শিল্পবোধ তো প্রশিক্ষণের বিষয় নয় আদৌ। এটা একান্তই আসমানি ঘটনা। নিতান্তই গায়েবি, নিতান্তই মেটাফিজিক্যাল, নিতান্তই অজানা ঘটনা। একান্তই নিজের মতো করে একেবারে একা নিজেকে এবং নিজের আশপাশকে আবিষ্কার করার একটা ব্যাপার। এ কথাই কিন্তু সাইয়ীদ ভাইয়ের আলোচনা আগাগোড়া জুড়ে ফুটে উঠেছে। সিনেমা বানানোর মানুষ হিসেবে তাঁর সারা জীবনের যে অভিজ্ঞতা, তাতে এটাই মূলভাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তো, এই যে নির্জনতা, নিজের শৈল্পিক একাকিত্ব, পাহাড়ের গুহার মধ্যে বছরের পর বছর পার করে দেওয়া, এটা কিন্তু সংসারে বসেও হতে পারে। আমাদের নেত্রকোণার লোকসাধক জালালের গানেও

আছে: সংসারের মধ্যে থেকেও মদ না খেয়েই মাতাল হয়ে থাকা যায়। পুত্রকন্যার মধ্যে থেকেও নিরুদ্দেশ হয়ে থাকা যায়। তো,এই যে মাতাল হয়ে থাকা। এই মাতালত্ব শরাব পেয়ালা সাকি এসবের সঙ্গে আইন আদালত অশ্লীলতা অপরাধের মুখস্ত-প্রশিক্ষিত ধ্যারণাগুলো যায় না। এগুলোর সঙ্গে আছে আর্টের যোগাযোগ। ব্যাখ্যা-অসম্ভব, প্রশিক্ষণ-অযোগ্য শিল্পের যোগাযোগ।

বাসকিয়াতের কথা বলি। আমার ইদানীংকার এক বইয়ের (সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩) মলাট বানাতে গিয়ে ভয়ংকর এই ছেলের একটা চিত্রকর্ম ব্যবহার করেছিলাম। ছেলেই বলছি। মাত্র ২৭ বছর বয়সে মারা গেছে সে। সেই কবে। ১৯৮৮ সালে। এতো দিনে ভূত হয়ে গেছে হয়ত। তার নাম জন মিশেল বাসকিয়াত। ওর বাবা আমারিকা মহাদেশের হাইতির মানুষ। হাইতির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-টন্ত্রী ছিলেন। মিনিস্ট্রি অব ইন্টিরিয়র। মা পুয়ের্তোরিকোর কালো মানুষ। বড়ো হয়েছে সে আমেরিকাতে। বড় হয়ে উঠেছে স্বভাবজাত স্ট্রিট-আর্টিস্ট হিসেবে। ছোটবেলাতেই বিখ্যাত হয়ে উঠেছে সে গ্রাফিক্সের জন্য।দেয়ালে স্প্রে দিয়ে ছবি আঁকার জন্য। মানে দেয়ালে চিকা মারার জন্য। আমরা যেটাকে চিকামারা বলি আর কি। আঁকতে আঁকতে এমন জায়গায় সে যায় যে অচিরেই, অতি অল্প বয়সের মধ্যেই, বড় বড় শিল্প-পত্রিকায়, বড় বড় মেইনস্ট্রিম পত্রিকায় তাকে নিয়ে কাভার স্টোরি হতে থাকে। আর সে ফুটপাতে চানাচুর বেচে বেচে, কলা বেচে বেচে জীবনধারণ করতে থাকে। এবং ড্রাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মারা যায়। হেরোইন এবং কোকেন এক সঙ্গে খাওয়ার এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে। দীর্ঘদিন ধরেই এক্সপেরিমেন্টটা করেছে সে মরার আগে। হেরোইন-কোকেন মিশিয়ে খেতে খেতে যে গুবলেট হয়ে যায়, সে আজকের যুগের নিও এক্সপ্রেশনিস্ট ধারার আর্টের গুরু হিসেবে নন্দিত। স্বীকৃত। সে মারা যাবার পর তার একটা ছবি বিক্রি হয় ১৫ মিলিয়ন ডলারে।

আচ্ছা, বাসকিয়াতের কথা বলাটা না হয় খুব হাই আর্টের একটা ব্যাপার হয়ে গেল। বরং আমাদের রতনের কথাই একটু বলি। জেলখানায় পরিচয় আমার সাথে রতনের। কুড়ির কোঠায় বয়স ওর। নিজের ঘনিষ্ট আত্মীয়ার ওপর অ্যাসিড নিক্ষেপের মতো বিশ্রী মামলার আসামি সে। এক-এগারোর যুগান্তরে আমরা ভদ্রলোকেরা যখন রাষ্ট্রের জামাই আদরে জেলের ফার্স্ট ডিভিশন আসামি হিসেবে পিকনিকে ব্যস্ত, তখন আমাদের সেবাযত্নের জন্য 'ফালতু' হিসেবে নিয়োগ পায় তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদি রতন। তত দিনে বেশ ক বছর জেল খেটে ফেলেছে। মামলার সুরাহা হওয়া ছাড়াই। এমনই সে গানের পাগল যে গান গাওয়ার জন্য জেলখানার আইনকানুন ভেঙে রাতের গোপনে সে মোমবাতি আর খাতা-কলমের মতো মারাত্মক সব অস্ত্রপাতি ব্যবহার করত গোপনে। রেডিও শুনে শুনে গান লেখার জন্য।

রসিকতা নয়। ধরা পড়লে বাজে শাস্তি অপেক্ষমান। তো, সেই রতনের গানের গলা, গানের আকুতি দেখার মতো। শোনার মতো। অলস দুপুরে যখন সমস্ত কঠিন পরিশ্রমের একটু ফাঁক সে বের করত খুঁজে, তখন এসে বসত গানের পাখি তার গলায়। তন্ময় হয়ে শুনত যত সব ''ক্রিমিন্যাল' কয়েদিরা। আমাদের মতো 'শিল্প-বোধসম্পন্ন' মানুষেরা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যেত। সুরেলা গলা আর ততধিক সুরেলা হৃদয় ও আচরণের জন্য জেলখানার মুয়াজ্জিনের পদে নিয়োগ পায় সে। আর অমোচনীয় দাগ কাটে সে আমাদের মনে।

এখন এই জন মিশেল বাসকিয়াত নামের ছেলেটাকে নিয়ে আপনি কী বলবেন! রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টারের গুণমুগ্ধ রতন নয়, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের রতনকে নিয়ে কী বলবেন আপনি! প্রশিক্ষণজাত শিল্পবোধ দিয়ে একে ব্যাখ্যা করা যায় না। কোনো প্রকার আইনসম্মত শিল্পবোধের ধারণা দিয়ে একে বোঝানো যায় না। কাজে-কাজেই সিনেমা নিয়ে কথা বলার সময়, সিনেমার ভালোমন্দ নিয়ে কথা বলার সময়, সিনেমার অশ্লীলতা-অপরাধ নিয়ে কথা বলার সময় বাসকিয়াত বা রতনের কথা আমাদের মাথায় আসে না। আমাদের মাথায় আসে আইন-আদালত-প্রশিক্ষণের মেকি, দীক্ষায়িত শিল্পকলার ছলাকলা।

শিল্প অথবা শিল্পবোধ নিয়ে তাই কোনো প্রকার বাইনারি ক্যাটেগরির আলাপে আমি যেতে চাই না। বরং সাইয়ীদ ভাইয়ের যাপিত জীবনের, প্রকৃত শিল্পযাপনের পথ ধরেই হাঁটতে চাই আমি। সেটাই শিল্পের জায়গা। মানুষের নিজের জায়গা। স্ব-অধীনতার জায়গা। নিজের সঙ্গে নিজে মুখোমুখি দাঁড়ানোর জায়গা। যাবতীয় কর্তৃত্বতন্ত্র এবং তার রচিত শাস্ত্র থিওরি দীক্ষায়ন মন্ত্র ঐ জায়গাটার চিরায়ত প্রতিপক্ষ। কেননা প্রকৃত শিল্পবোধ কোনো শাস্ত্রীয় ঘটনা নয়। প্রশিক্ষণের ঘটনা নয়। একান্তই স্বাধীনতার ঘটনা। মনুষ্য-স্বাধীনতারই আরেকটা অভিপ্রকাশের নাম শিল্পসৃজন। শিল্পবোধ। এ হচ্ছে মানুষের চিরায়ত প্রজাতিসত্তা।

রচনা: সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৩। দৈনিক *বণিক বার্তা* এবং দৈনিক *সোনার দেশ পত্রিকায়* যুগপৎভাবে ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৩, ৫ই অক্টোবর ২০১৩, ১২ই অক্টোবর ২০১৩, ২৬শে অক্টোবর ২০১৩, ২রা নভেম্বর ২০১৩, এবং ৯ই নভেম্বর ২০১৩ তারিখে ছয় কিস্তিতে প্রকাশিত। পরিমার্জিত পুনর্মুদ্রণ: *যোগাযোগ*, সংখ্যা ১১, ডিসেম্বর ২০১৩।

সংগঠন বন্ধুত্ব বিপ্লব: এ রেভোলিউশন টু লিভ !

Activists protest policies of the World Bank in Washington, DC

> আমাদের আত্মবলিদান দরকার যে বিপ্লবের তা আসলে আব্বুদের বিপ্লব
> প্যারিস-বসন্ত, ১৯৬৮-র অন্যতম দেয়াল-লিপি (কেন ন্যাব, ২০০৬)

৩৩.১ এ রেভোলিউশন টু লিভ

সম্প্রতি একটা লেখা লিখেছিলাম। রচনাটার আদি সংক্ষিপ্ত পাঠ ছাপা হয়েছিল রাজশাহীর দৈনিক সোনার দেশ পত্রিকার গত ৫ই এপ্রিল শুক্রবারের সংখ্যায়। কিন্তু আমারই গাফেলতিজনিত সময়াভাবে সেখানে কিছু টুকটাক বানান-বাক্য সমস্যা থেকে গিয়েছিল। পরে তার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পাঠ দিতে চেয়েছিলাম ফেসবুক -নোট আকারে। দিতে গিয়ে দেখি লম্বা হয়ে গেছে। ফেসবুকে স্বতন্ত্র একটা নোট

হিসেবে আঁটলো না। তাই আমার নিজের ওয়েবসাইট (salimrezanewton.com) থেকে ফেসবুকে শেয়ার দিতে হয়েছিল। দৈনিক সোনার দেশের ঐ লেখাটার শিরোনাম ছিল: 'স্বাধীনতা সহিষ্ণুতা চিন্তাপুলিশ'। ফেসবুকে শেয়ার দেওয়ার সময় দেখলাম সেটা ঠিক যুৎ লাগছে না। তাই সেটাকে পাল্টে দিয়ে করলাম: 'স্বাধীনতা সহিষ্ণুতা সংগঠন'। তো যা-ই হোক, আরো অনেকের পাশাপাশি সদাসঙ্গী সুস্মিতা চক্রবর্তীও ঐ লেখাটার ফেসবুক-লিংক তাঁর স্ট্যাটাসে শেয়ার করেছিলেন। শেয়ার করার সময় সুস্মিতা তাঁর স্ট্যাটাসে নিচের অংশটুকুর উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন আমার লেখাটা থেকে:

> ... 'হয় বিপ্লব না হয় মৃত্যু'র সাথে 'মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী'র পার্থক্য কোথায়? বিশেষত তরুণদেরকে তাই সতর্ক হতে হবে বৈকি। যিনি জানেন না সামনের দিনগুলোতে কী করে আন্দোলন-সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, যিনি জানেন না নতুন সমাজের জন্য লাগাতার অজস্রমুখী কাজ কীভাবে করতে হয়, যিনি জানেন না প্রচলিত রাজনৈতিক ভণ্ডামীর বিকল্প তৎপরতার ভিশন কী হতে পারে, তাঁরা মরার আবেগের রাজনীতি ছাড়া পথ দেখেন না। কিন্তু এখন আসলে মরার টাইম নাই। মরার জন্য বিপ্লব অনেক হয়েছে। সামনের দিনের বিপ্লব হবে বেঁচে থাকার বিপ্লব: 'এ রেভোলিউশন টু লিভ!'

সুস্মিতার শেয়ার করা সেই স্ট্যাটাস-লিংকের নিচে মন্তব্যের ঘরে 'বাঁচা-মরা' নিয়ে আমার পুরোনো বন্ধু হাবিবুজ্জামান চুনীর টুকরা কয়টা কথা ধরে আজকের এই রচনা। উপলক্ষ সামান্য। কিন্তু তাৎপর্য সামান্য নয়।

৩৩.২ ব্যারিকেড ও বন্ধুত্ব

সুস্মিতার দেওয়া ওপরে বর্ণিত আমার উদ্ধৃতিটার পরিপ্রেক্ষিতে চুনী বলছিলেন: 'সবার বাঁচার জন্য কাউকে কাউকে মরার ঝুঁকি নিতে হয়'। চুনী আমার দীর্ঘদিনের একান্ত বন্ধু। আমরা তখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি। আমি নাটোরে। চুনী রাজশাহীতে। দুজনেই ছাত্র ইউনিয়ন করি। সেই সূত্রে পরিচয় ছিলই। আবার, আমরা দুজনেই সিপিবি করতাম। নাটোর-সিপিবি তখনও জেলা-পার্টির মর্যাদা পায় নি। নাটোর-পার্টি ছিল তখন রাজশাহী জেলা সিপিবি'র অধীনস্ত। তো সেই সময় রাজশাহী-সিপিবি একটা বড়ো প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। সেখানে নাটোর থেকে অন্যদের সাথে আমিও যাই। আর সেখানেই বন্ধুত্ব হয় বাবু আর চুনীর সাথে। গোটা আশির দশক আমাদের প্রজন্মের কেটেছে সামরিক বুটের তলায়: ব্যরিকেডে আর বন্ধুত্বে।

শরীফুল ইসলাম বাবু ছিলেন রাজশাহী জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি। পরে রাজশাহী কলেজের দুর্দান্ত জনপ্রিয় ভিপি। এখন দীর্ঘকাল ধরে তিনি রাজশাহীর সাহেববাজার এলাকার ব্যাপক জনপ্রিয় কাউন্সিলর এবং বাকি ৩০টা ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের ভোটে নির্বাচি প্যানেল-মেয়র। বাবু এখন কোনো রাজনৈতিক দল করেন না। আর চূনী ছিলেন রাজশাহী জেলা ছাত্র ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। রাজশাহী মেডিকেলের খালেক ভাই, পিংকু দা (পিনাকী ভট্টাচার্য, ছাত্র ইউনিয়নের দাপুটে নেতা হিসেবে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের তখনকার ভিপি), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলালউদ্দিন, আব্রাহাম লিংকন, হাসিব ভাই, মুকুল ভাই, এবং আরো এক গাদা অতি-উজ্জ্বল নেতাকর্মীতে তখন রাজশাহী-পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়ন গিজগিজ করছে। তার মধ্যে বাবু-চুনী এরশাদের পতন পর্যন্ত রাজশাহীর ঘাঁটি আগলে রেখেছিলেন দোর্দণ্ড প্রতাপে অসাধারণ প্রজ্ঞায়। বাবুর প্রতাপ আর চুনীর প্রজ্ঞা ছিল তাকিয়ে দেখার মতো ব্যাপার। আর আমি তত দিনে ঢাকায়। ছাত্র ইউনিয়নের জাতীয় পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী পার হয়ে সিপিবি-কেন্দ্রীয় কমিটির গোপন ছাত্র-সাব কমিটির সদস্য।

পরে আবার যখন আমি রাজশাহীতে ফিরলাম, বাবু তখনই জনপ্রিয় কমিশনার। চুনী ব্যবসা কর্মে সিরিয়াস। আমি সিপিবি'র জেলা কমিটির সহসভাপতি (কার্যত সভাপতি, কেননা সভাপতি থাকতেন পুঠিয়ায়, তাঁর বয়স তখন ৭৩, চলাফেরা তেমন করতে পারেন না), আর বাবু পার্টির নেতৃত্বের নানবিধ কর্মকাণ্ডে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে দূরে সরার পথে। জনপ্রতিনিধিত্ব করে আলাদা সময়ও পান না মোটে। তবু তখনও তিনি জেলা-পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর মহাগুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

সামরিক আইন বিদায় করে তারপর আমরা সবাই আস্তে আস্তে ছাত্র ইউনিয়ন ছাড়লাম। পার্টি ছাড়লাম। কিন্তু বন্ধুত্ব গেল না। বাবু তো এখনও রাজশাহীতেই, বলেছি। ব্যবসার কাজে বহুদিন ধরে সারা বাংলাদেশ চরকি মেরে অবশেষে চূনী এখন ঢাকায়। ব্যবসায় আরো সিরিয়াস। প্রায় ফুলটাইম। দেখা-সাক্ষাৎ আমার সাথে হয়ই না বলতে গেলে। মাঝেমধ্যে কথা হয় বৈকি। কণ্ঠস্বর বলে দেয় সেই চুনীই আছে। নিউটনও নিউটনই – কিন্তু বিশেষত চিন্তাধারা বাঁক নিয়েছে বিপুলভাবে। তার পুরোটা খবর আমার পুরোনো বন্ধুদের প্রায় কেউই পুরোটা রাখতে পারে নি। কারণ আমার লেখাগুলো ছাপা হচ্ছিল, হয় কোনাকাঞ্চিতে। বইও বার করতে পারি নি। চুনী যত দিন ছিলেন ততদিন বাবু-চুনী, আর এখন বাবু আর তাঁর অজস্র বন্ধুকে রাজশাহীতে আমার সম্পদে-বিপদে পাশে পাই।

৩৩.৩ রক্তপাত, মর্ষকামিতা ও পুরোনো দিনের বিপ্লব

এবার মনে মনে সামনে বসিয়ে বন্ধু চুনীর সাথে কথা বলতে বলতে লেখাটা আগাবো। সুস্মিতার দেওয়া ওপরের ঐ উদ্ধৃতিটার পরিপ্রেক্ষিতে চুনী তুমি বলছিলে: 'সবার বাঁচার জন্য কাউকে কাউকে মরার ঝুঁকি নিতে হয়'। এর উত্তরে আমি লিখেছিলাম:

> মরার ঝুঁকি তো সারা বছর ধরেই আছে। শুধু সড়ক দুর্ঘটনাই যথেষ্ট। মানুষ তো মরবেই। কিন্তু মর্ষকামিতা অন্য জিনিস। এ হলো মৃত্যুকে মহিমান্বিত করা। মরার জন্য অন্যকে উৎসাহিত করা। যেন সের দরে রক্ত ঢেলে দিলেই 'বিপ্লব' গজিয়ে উঠবে। বিপ্লব রক্ত দিয়ে হয় না। চিন্তা দিয়ে হয়। এবং চিন্তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ চর্চার মধ্য দিয়ে।

তখন তুমি লিখলে:

> আর একটা কথা বলি, আশা করি তুমি ব্যক্তিগতভাবে নেবে না। কিছু মানুষের রক্ত দেয়ার ফলে এই আজ তুমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে নৈরাজ্যবাদের চর্চা করতে পারছ।

না। একদম খারাপ অর্থে নিই নি, চুনী। ভালো লেগেছে। তোমার এই কথা যুক্তিপূর্ণ। ষোলো আনা সত্য। কিন্তু একটু খেয়াল করবে প্লিজ: আমি কিন্তু 'মরার ঝুঁকি'কে অস্বীকার করি নি। ব্যক্তিগতভাবে আমিও মরার ঝুঁকিতে বহুকাল ধরে ছিলাম, তুমি জানো, এখনও আছি। বর্তমান পৃথিবীতেও, চিরকালই, স্বাধীনতা-পিপাসুরা তো রক্ত দিয়েই চলেছেন। অত্যাচার, বিষোদ্গার, কারাগার নিয়েই তো তাঁরা যথাসম্ভব স্বাধীন আছেন। রাষ্ট্রশক্তি, ভাইস-চ্যান্সেলর, মাফিয়া-রাজনীতির হুমকিকে মোকাবেলা করেই তাঁরা আছেন। বলপ্রয়োগের আর হুকুমতন্ত্রের এই বদ্ধচিন্তার সমাজে কেউ স্বাধীনতার চর্চা করবেন আর কোনো মূল্য দিতে হবে না – তাই কখনও হয়? স্বাধীনতার সাধকদের জন্য মৃত্যু কোনো ঘটনা না। মৃত্যু কোনো তারিখ উদযাপনের উপলক্ষ্য না। মৃত্যু কোনো ভাস্কর্য নির্মাণের পুরস্কারপ্রাপ্তিও নয়। মৃত্যুর ঝুঁকি তাঁদের স্বাধীনতার গ্যারান্টি মাত্র।

বিপ্লবের জন্য রক্ত দেওয়া হারাম – আমি তাও বলি নি। আমি নিন্দা করেছি 'মর্ষকামিতা'র, 'মরার আবেগের রাজনীতি'র। নিন্দা করেছি ক্ষমতার লোভে কর্মী-দেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে 'মৃত্যুকে মহিমান্বিত' করে নেতাদের আজীবন বেঁচে

থাকার বাসনার। এই মর্ষকামিতা নিয়ে কিছু বলবে কি?

তথাকথিত অক্টোবর বিপ্লবের জন্য (যা ছিল আসলে অলরেডি সংঘটিত সামাজিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে লেনিনীয় রাজনৈতিক প্রতিবিপ্লব) লেনিনকে মরতে হয় নি। পরে না মারা গেলে তিনি সুরক্ষিত ক্ষমতায়ই থাকতেন আজীবন। (তাঁকে প্রতি-বিপ্লবের পরে গুলি করা হয়েছিল জাতীয়তাবাদী ক্ষমতা-হানাহানিতে, রুশ জমির বিনিময়ে জার্মানির সাথে 'শান্তিচুক্তি' করার অজুহাতে।) চীন-বিপ্লবের জন্য মাও সেতুংকে মরতে হয় নি। কিউবার বিপ্লবের জন্য ক্যাস্ত্রোকে মরতে হয় নি। উনিও আজীবন ক্ষমতায়। চে খুন হয়েছিলেন বটে। তবে বলিভিয়ায় বিপ্লব রপ্তানী করতে গিয়ে। সেটা ছিল বালসুলভ রোমান্টিক একটা অ্যাডভেঞ্চার মাত্র। চে গুয়েভারার ডায়েরি পড়লেই তা বোঝা যায় (চে গুয়েভারা, ২০০৮)।[১] আমাদের মুক্তিযুদ্ধের জন্য জীবন দিতে হয় নি শেখ মুজিবকে। তিনিও নিজেকে আজীবন রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছিলেন – মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে পাওয়া সংবিধানকে কেটে। তাঁকে জীবন দিতে হয়েছে ক্ষমতার হানাহানিতে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে। বাংলাদেশ-বিপ্লব করতে জন্য নয়। আওয়ামী লীগের কয় জন কেন্দ্রীয় নেতা, কয় জন এমপি শহীদ হয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে? সিপিবি'র কোনো জেনারেল সেক্রেটারি কোনোদিন সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন?

সেলিম ভাই, মঞ্জু ভাই, জামান ভাই, রনো ভাই, মেনন ভাইরাও আজীবন নেতা। এই পার্টিগুলো নাকি 'মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজ' গঠন করবেন! যাঁদের নিজেদের পার্টিতেই গণতন্ত্র নেই। বাকস্বাধীনতা নেই। এমনকি নেতা হওয়ার স্বাধীনতাও নেই। এমনকি বন্ধুত্বও নেই। নেতারা নিজ দলের কর্মীদেরকেও বিশ্বাস করেন না। উপদল করেন। পার্টি ভাঙেন। 'চিন্তার ঐক্য, কথার ঐক্য, কাজের ঐক্য' এঁদের মূলমন্ত্র। এককাট্টা, একশিলা-পার্টির সাধানা এঁদের সাধনা। অথচ বৈচিত্র্য, অটোনমি বা স্ব+অধীনতা, পরস্পর-সহযোগিতা প্রকৃতির ধর্ম। প্রাণের ধর্ম।

ক্ষমতার রাজনীতিতে নেতার জীবনের মূল্য কর্মীর জীবনের মূলের চেয়ে হাজার গুণ বেশি। ক্ষমতার রাজনীতি বলতে আমি লিবারালবাদ-লেনিনবাদ-লাদেনবাদ সবই বুঝাচ্ছি। এঁরা সবাই ভ্যানগার্ডপন্থী। নিজেরা ভ্যানগার্ড, সত্য-আবিষ্কার। আর জনগণ মূর্খ ভেঁড়ার পাল। আর কে না জানেন, ভ্যানগার্ডের জীবনের মূল্য সাধারণ

---

১ কিউবার বিপ্লব কিন্তু আলাদা পদার্থ ছিল। ওটা চে'র বলিভিয়া-অভিযানের মতো গণবিচ্ছিন্ন বস্তু নয়। এটা ছিল দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা গণবিপ্লব। মূলত জাতীয়তাবাদী বিপ্লব। অজস্র শক্তি ও দল তাকে রূপায়িত করেছিল। পরে রুশ-মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধের চাপে এবং চে'র দূতিয়ালিতে কিউবা বলশেভিক রাশিয়ান সাম্রাজ্যের পেটের ভেতর ঢুকে যায়। ক্যাস্ত্রো মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শাস্ত্রধর্ম গ্রহণ করেন বিপ্লবের অনেক পরে।

শ্রমিকের জীবনের চেয়ে বেশি। আবার মার্কসীয় তত্ত্বে কারখানা শ্রমিকের মূল্য দোদুল্যমান 'পেটিবুর্জোয়া' কৃষি-শ্রমিকের চেয়ে বেশি। এইসব তত্ত্ব নোংরা। এগুলো এক মানুষের ওপর অন্য মানুষের শ্রেয়ত্ব, প্রভুত্ব আর আধিপত্যের পাটাতন তৈরি করে এইসব মর্ষকামী তত্ত্ব।

বিপ্লবের জন্য রক্ত দেওয়া হারাম – আমি তা বলি নি বটে, কিন্তু এখন বলছি, বিপ্লবের জন্য যদি সার্বিক চিন্তাভাবনাদর্শনগত সম্মতির বদলে দীর্ঘকালের রক্তপাতের ওপর বেশি নির্ভর করতে হয়, সেই বিপ্লব টেকে না, নতুন শাসকদের (ভেতরের এবং বাইরের) অত্যাচার-জুলুম-কারাগার-রক্তপাতের মধ্য দিয়েই তার ধ্বংস ঘটে। উদাহরণ লাগবে? রাশিয়া, চীন, বাংলাদেশ ...

৩৩.৪ নৈরাজ্যবাদ নয়: স্বাধীনতা, নৈরাজ্য

তোমার জন্য একটা সংশোধনী, চুনী। আমি নৈরাজ্যবাদের চর্চা করি না। কারণ আমি আরেকটা ডগমা বা অন্ধ-মতবাদ চাই না। আমি সাধনা করি স্বাধীনতা-সাম্য-সংহতি-সৃজনশীলতার ভিত্তিতে মুক্ত মানুষদের মুক্ত সমিতিসমূহকে কেন্দ্র করে গঠিত উন্নত সমাজের। সে সমাজ নৈরাজ্যবাদীরা কায়েম করতে চান না। খোদ জনসাধারণকেই তা কায়েম করতে হয়। জনগণের রক্তের বিনিময়ে নেতা-হুজুর-মোল্লা-ঠাকুর-অধ্যাপক-ব্যবসায়ীদের স্বাধীনতা আমি চাই না। কেননা সাম্য ছাড়া স্বাধীনতা প্রিভিলেজ মাত্র; আর স্বাধীনতা ছাড়া তথাকথিত সাম্য মানে স্রেফ দাসত্ব।

নিজেকে আমি নৈরাজ্যবাদী বলি না। তবে আমি নৈরাজ্যের চর্চা করি বটে। নৈরাজ্য একটা পথ। স্বাধীনতা-সাম্য-সংহতি-সৃজনশীলতার পথ। পথ কখনও মুখস্ত পথ হয় না। এই পথ আমাদেরকে সবাইকে মিলে ট্রায়াল অ্যান্ড এররের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করে যেতে হবে। নৈরাজ্য আমার কাছে স্বাধীনতার অপর নাম। নৈরাজ্য স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে একটা স্বাভাবিক-সামাজিক প্রবণতা মাত্র। এটা কোনো থিওরি না। মতবাদ না। রণনীতি-রণকৌশল না। নৈরাজ্যের তাই হাজারো নাম, অজস্র অভিপ্রকাশ: সুফি-সহজিয়া-তন্ত্র-তাও-জেন-বুদ্ধ-জৈন-তলস্তয়-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ। এসব নিয়ে আমি আমার 'নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য' গ্রন্থে (সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩-খ) আলোচনা করেছি।

৩৩.৫ বন্ধুত্ব বৈচিত্র্য বিপ্লব

আরেকটা কথা, চুনী। তুমি লিখেছ: 'নিউটন, তোমার লেখাগুলো পড়ি, কিন্তু

পাবলিকলি আমার মতামত দিতে চাচ্ছি না। বিপ্লবের চিন্তা রক্ত দেওয়া ছাড়া কোথাও কখনো বাস্তবায়ন হয়েছে বলে আমার জানা নাই।' কিন্তু আমার মতামত নিয়ে পাবলিকলি মতামত দিতে তুমি চাচ্ছ না কেন, বল তো? তুমিও কথা বলো বলো, প্লিজ! প্রকাশ্যেই বলো। কথা তো আমাদের শুরু হয়েইছে। নির্দ্বিধায় চলুক। তোমার সাথে কথা বলতে পারা আমার সৌভাগ্য। প্রকাশ্য আলোচনার চেয়ে ভালো পদ্ধতি খুব বেশি নাই। আমাদের লুকানোর কিছু নাই। মানসম্মানের কিছু নাই। জাত-কুল-মান জলাঞ্জলি না দিলে গৌর পাবে কোথায়? প্রেম হবে কী করে? বন্ধুত্ব থাকবে কী করে? আর পার্টির মধ্যে রেনিগেড হওয়া, পরিবারের মধ্যে অদ্ভুত পদার্থ হওয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপজ্জনক মাস্টারে পরিণত হওয়া, ব্যবসার মধ্যে বন্ধুত্বের 'অচিন' নেটওয়ার্ক রচনা করা কিংবা বন্ধুদের মধ্যে 'বেয়াড়া প্রশ্রয়' পাওয়া তো তোমার-আমার জন্য নতুন নয়। তুমি ছিলে আমাদের উজ্জ্বল তত্ত্ববিশারদদের এক জন। রাস্তার সবচেয়ে সাহসী সংগঠকদের এক জন। সেই ছোটবেলা থেকেই, আমার কাছে তোমার মতামতের মূল্য কতোটা তুমি নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারো। সেই জন্যই এত কথা বলা। ভিন্নমত সহকারে বন্ধুত্বই তো বন্ধুত্ব। ভিন্নমতবিহীন বন্ধুত্ব তো রোবোটিক চিন্তাপ্যারেড মাত্র। 'বন্ধু তো সে, যে তোমাকে পেতে দেয় পূর্ণ স্বাধীনতা যেন তুমি হয়ে ওঠো তুমিই নিজে।'[২] সুতরাং নাথিং ইজ ইম্পসিবল।

আর একসাথে বসে দীর্ঘ আড্ডা মারতে পারলে তো কথাই নাই। তাই না? সেই আড্ডা তো অচিরেই হবে। জম্পেশ হবে। বহুকাল পরে তোমার অসাধারণ প্রাণোচ্ছল, সুতীব্র বন্ধুত্বে সিক্ত হবো আমি। আমার তর সইছে না। চলো সেই আড্ডা আমরা হুবহু রেকর্ড করি এবং 'আনকাট' অবস্থায় প্রকাশ করি। আমাদের আড্ডায় আরো বন্ধুরা তাহলে যুক্ত হতে পারবে। আর যদি নিতান্তই সময় না পাও (সময়াভাবের কথা তুমি অবশ্য বলো নি, বলেছ প্রকাশ্যে আলাপ করতে চাও না), তাহলে তো আড্ডা মহান। অরাজপন্থীদের কাছে আড্ডাই সংগঠনের প্রাণ। বিপ্লবের বাস্তব অনুশীলন।

আমলাতান্ত্রিক আর উচ্চনিচক্রমকর্তৃত্বওয়ালা হুকুমতান্ত্রিক পার্টির জায়গায় আমাদের চাই মুক্ত বন্ধুত্বের সংগঠন। এ হলো আত্মার বন্ধন। প্রেমের বন্ধন। এ বন্ধন কৃত্রিম পার্টি-সদস্যপদের বন্ধন নয়। 'চিন্তার ঐক্য, কথার ঐক্য, কাজের ঐক্যের' চিন্তাপ্যারেড নয়। এ কোনো আরোপিত বন্ধন না। এ হলো বাস্তব সমাজ-সম্পর্করাশির ভেতর থেকে স্বাভাবিক-সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা 'স্বাভাবিক সংগঠন' (ন্যাচারাল গ্রুপ)। তথাকথিত 'অ্যানার্কিস্ট'রা এ নামেই একে ডাকেন। কৃত্রিমভাবে

২ জিম মরিসনের গান: এ ফ্রেন্ড ইজ সামওয়ান হু লেটস ইউ হ্যাভ টোটাল ফ্রিডম টু বি ইওরসেল্ফ ...

পরস্পরের অপরিচিত লোকজন নিয়ে গায়েবী মতবাদের ওপর ভিত্তি করে আমলাতন্ত্র হতে পারে, সত্যিকারের সামাজিক সংগঠন হয় না। প্রকৃত সামাজিক সংগঠন মানেই তাই স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক সংগঠন। এজন্যই 'স্বাভাবিক সংগঠন' (বা ন্যাচারাল গ্রুপ) নামটা আসে।

একে কোষ-সংগঠনও (Cell) বলে। স্বাধীন-স্বতন্ত্র-পরস্পরনির্ভর অজস্র কোষ মিলে নতুন সমাজের দেহ গঠন করতে থাকে। কালকে যে নতুন সমাজ যেমন চাই, আজকেই তার চর্চা শুরু করা দরকার। এই কোষগুলো ভবিষ্যতের স্বাধীন সমাজেরই এই মুহূর্তের চর্চা। প্রতিটা কোষ কিন্তু স্বতন্ত্র-স্বাধীন প্রাণসত্তা। প্রতিটা কোষ স্বেচ্ছায় পরস্পরের সহযোগিতা ও সমন্বয়ে চলে। সমন্বয়কারীও কোনো একক কোষ নয়। অজস্র কোষের নিরবচ্ছিন্ন লেনদেনের মধ্য দিয়ে সার্বিক সমন্বয় সাধিত হয়। কেননা মস্তিষ্ক নিজেও কোটি কোটি কোষের সমাহার। প্রত্যেকটা কোষের মঙ্গলামঙ্গলের ওপরই নির্ভর করে গোটা দেহের মঙ্গলামঙ্গল। বিপরীতটা নয়। কেননা কোষ ছাড়া দেহ হয় না। কিন্তু শুধু একটা কোষ নিয়ে দেহ রচিত হতে পারে। কোনো একটা কোষেও যদি কোনো ঝামেলা হয়, পুরো দেহ বিপদের ঝুঁকিতে পড়ে। পুরো দেহ মিলে তখন ঐ কোষটার মেরামতি-চিকিৎসা-যত্নআত্তি নিতে থাকে। ফলে সার্বিক দেহ এবং স্বতন্ত্র কোষের সুরসঙ্গতিই শারীরিক সুস্থতার অপর নাম।

নৈরাজ্যিক/নৈরাজ্যপ্রবণ/অরাজক/স্বাধীন সংগঠন এবং সমাজও তাই। ব্যক্তিই সমাজের প্রাণ। ব্যক্তিই সমাজ। কথাটা এমনকি খোদ কার্ল মার্কসেরই। বহু দিন আগে এক লেখায় কোট করেছিলাম। খুঁজলেই পেয়ে যাবো। ব্যক্তি ছাড়া সমাজ হয় না। ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং তাঁর অনুকূল সমাজবিন্যাসের সামাজিক-ব্যক্তিক স্বাধীনতার কনসার্ট রচনা করে। ব্যক্তি ভালো থাকলে সমাজ ভালো থাকে। সমাজ ভালো থাকলে ব্যক্তি ভালো থাকে। কিন্তু ব্যক্তি ছাড়া সমাজই হয় না। অথচ সমাজ-ছাড়া ব্যক্তি এমনকি বনে গিয়েও বাস করতে পারে। কিছু দিনের জন্য হলেও। আর যদি তাঁর একটা মাত্র সঙ্গীও জুটে যায়, তাহলে তো কথাই নেই। আস্ত একটা নতুন সমাজের পত্তনেরই একেবারে সম্ভাবনা তৈরি হয়।

এ ধরনের সংগঠনকে 'ব্লক' বলেও ডাকা হয়। অনেকগুলো ব্লক মিলে বৃহত্তর, বহুমাত্রিক 'দালান' গড়ে ওঠে। বিল্ডিং ব্লকের মতোই এই ব্লকগুলো পরস্পরের মধ্যে প্রয়োজন ও পছন্দ অনুসারে স্বেচ্ছায় নানান নকশায় বিন্যস্ত-পুনর্বিন্যস্ত হতে পারে। আমাদের প্রাচীন 'তন্ত্র' থেকে ধার করে একে 'চক্র'ও বলা যেতে পারে। চক্র হলো সদাপ্রসারমান সমাজবৃত্তের ছোট ছোট কেন্দ্র। একাধিক বিন্দু নিয়েই বৃত্ত বা চক্র গঠিত হয়। বিন্দু ছাড়া বৃত্ত অচল। ব্যক্তি-বিন্দুর স্বাধীনতার মাত্রাই সমাজ-বৃত্তের স্বাধীনতার মাপকাঠি।

এই ধরনের সংগঠনে ৫ থেকে শুরু করে ১৫/২০ জন পর্যন্ত পরস্পর-পূর্বপরিচিত ব্যক্তি নিয়ে এ ধরনের একেকটি সংগঠন গড়ে ওঠে। এই ছোট্ট গ্রুপটাই স্বাধীন-সার্বভৌম একটা সংগঠন। এর সদস্যরা সবাই আগে থেকেই (জন্মসূত্রে, কর্মসূত্রে, পেশাসূত্রে, অবস্থানসূত্রে, পছন্দ-অপছন্দের সূত্রে, আড্ডার সূত্রে) পরস্পরের সাথে বন্ধুত্বে বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এই সংগঠন বাইরে থেকে তো স্বাধীনই, ভেতর থেকেও স্বাধীন।

বাইরের বৃহত্তর নেটওয়ার্ক বা ফেডারেশন কোনো সদস্য-সংগঠনের ওপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে না। আর কোষ-সংগঠনের ভেতরের কোনো ব্যক্তির ওপর 'মেজরিটির' মতা চাপানোর তো প্রশ্নই আসে না। সিদ্ধান্ত হয় সর্বসম্মতভাবে। কোনো মেজরিটি-মাইনরিটির বন্দোবস্ত নাই। ফলে গ্রুপিং নাই। রিক্রুটমেন্ট নাই। কারণ এটা ন্যাচারাল গ্রুপ। এখানে সবাই সবার সাথে সামাজিক সম্পর্কসূত্রে টিউনড। বন্ধুত্বের সূত্রে হারমোনাইজড। রিক্রুটমেন্ট তো করে আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী, বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে বহিষ্কারও নাই। কারণ কৃত্রিম 'শৃঙ্খলা'র শৃঙ্খল নাই। আছে স্ব-আরোপিত নীতিবোধ। পারস্পরিক মমত্ববোধ। আর দায়িত্ববোধ। বহিষ্কারের জন্য তো অথরিটি লাগে। আরোপিত নেতা লাগে। মাতব্বর লাগে। এখানে কোনো অথরিটি নাই। সবাই স্বাধীন এবং পরস্পরনির্ভরশীল। কোনো একজনের অমত থাকলেই আর সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। প্রত্যেকের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। প্রত্যেকের মতকে অ্যাকোমোডেইট করার জন্য, ধারণ করার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের কোনো একটা প্রস্তাব ক্রমাগত কম্প্রোমাইজের মধ্যে দিয়ে যায়। বিরামহীন মডিফিকেইশনের মধ্যে যায়। এক পর্যায়ে সর্বসম্মতি আসে। সহজেই আসে।

যে প্রশ্নে সর্বসম্মত হওয়া যায় সেটুকুই সংগঠনের সিদ্ধান্ত। আর যেসব প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকে সেসব প্রশ্নে সবাই স্বতন্ত্র। সেসব ক্ষেত্রে নিজের নিজের মতো করে কাজ করা যায়। সংগঠনের চূড়ান্ত দিশাগত প্রশ্নে, সাধারণ মূলনীতি আর বিশ্বাস-সমূহের প্রশ্নে সাংঘর্ষিক কোনো কাজ কিনা করলেই হলো। কেউ তা করেও না। কারণ এখানে কেউ ক্ষমতাচর্চার জন্য আসে না। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা-কর্তৃত্বের প্রতি বিতৃষ্ণাই এখানে সবার সমবেত হওয়ার আদি ভিত্তি।

এটা আসলে বন্ধুত্বের সংগঠন। ভাতৃত্বের সংগঠন। এখানে সবাই সবার স্পন্দন বোঝে। পালস্ বোঝে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের শক্তি আর সীমাবদ্ধতা বোঝে। এখানে কেউ তো মেশিন না! সবাই মানুষ। সবাই তাই সবার আবেগ বোঝে। অকাট্য যুক্তিকে গ্রাহ্য করে। ফলে সংগঠন ভাঙে না। টুকরা টুকরা হয়ে সবাই নিজেকে অভ্রান্ত বলে দাবি করার মূঢ়তা দেখায় না। কেননা সবাই জানে: যাবতীয় মতপার্থক্য সত্ত্বেও

এখানে সবাই সবার বন্ধু। সকলেরই উদ্দেশ্য শুভ, মঙ্গল, কল্যাণ, স্বাধীনতা, সাম্য।

আর যদি দিনের পর দিন সর্বসম্মত হওয়া না যায়, তাহলে ধরে নিতে হয় এই সংগঠনের সদস্যদের আত্মার বন্ধন টুটে গেছে। কোথায় জানি তার ছিঁড়ে গেছে। সুর কেটে গেছে। কাটা জিনিস, ফাটা সম্পর্ক জোড়া লাগে না। তখন সেই সংগঠনটাকে শত মনোকষ্ট সত্ত্বেও বিলুপ্ত করে দিতে হয়। ঐ সংগঠনের নাম নিয়ে তখন কেউ আর আলাদা কাজ করে না। এটা হাইব্রিড নয়। কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত শঙ্কর-সংগঠন নয়। এ হলো অর্গানিক সংগঠন। জৈবসত্তা। প্রাণের মতো। প্রাকৃতিক-স্বাভাবিক সম্পর্কের মতো। আপনা থেকে গড়ে ওঠা সমাজের মতো।

অরাজপন্থীরা প্রায় দুই শ বছর ধরে এ ধরনের সংগঠনের বাস্তব চর্চা করে আসছেন। প্রথম আন্তর্জাতিকের সময় থেকে ইউরোপ জোড়া শ্রমিকদের মধ্যে কোষ-সংগঠন কাজ করেছে। তাঁদের নেটওয়ার্ক, ফেডারেশন, পরে পৃথক ইন্টারন্যাশনাল গড়ে উঠেছে। ফ্যাসিবাদের উত্থানের বিরুদ্ধে স্প্যানিশ বিপ্লবের সময় এরকম অজস্র কোষ-সংগঠন গড়ে উঠেছিল। সেগুলোকে বলা হতো 'জান্তা'।

জান্তা মানে ঐ 'আড্ডা' গোছেরই একটা কিছু। স্প্যানিশ 'জান্তা'র অর্থ কাউন্সিল বা পরিষদ ইত্যাদি স্থানীয় সংস্থা বিশেষ। রুশ ভাষায় এ জিনিসকে বলে 'সোভিয়েত'। আর বাংলায় একেই বলে পঞ্চায়েত বা সভা বা সমিতি, বা 'সঙ্ঘ'। প্রকাশান্তরে একেই বলে (গ্রামসি-কথিত) 'কারখানা কমিটি'। এ থেকেই আসে 'কাউন্সিল-কমিউনিজম' এর ধারণা। সাথে বলে রাখি বাংলায় 'আড্ডা' শব্দটার মূল অর্থ: 'সমবেত হওয়া; একসঙ্গে মেলা'; 'কার্য্যবিশেষের নিমিত্ত তৎসংক্রান্ত লোকদিগের সম্মিলনস্থান'।[৩]

ষাট-সত্তরের দশকের প্যারিস-বসন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে, পরে

---

৩ 'সভা'র আদি এবং বুৎপত্তিগত অর্থ হলো: যেখানে সবাই সমভাবে 'ভাত' বা 'প্রতিভাত' তথা 'আলোকিত' থাকেন। কেউ আলাদা কোনো সিংহাসন-চেয়ারে বসেন না। কোনো কর্তা-কর্তৃপক্ষ অন্যের ওপর ছড়ি ঘোরান না। আজকের মতো সভার লাইমলাইট শুধু বিশেষ হুজুরদের ওপর ফোকাস করা হয় না। 'সমিতি' কথাটার বুৎপত্তিগত অর্থ হলো: 'সহ (সমান) মিত যাহার'; 'সমপরিমাণ' (অর্থাৎ সমমাপের)। সমিতি তাহলে এমন প্রতিষ্ঠান যেখানে সকলের পরিমিতি বা মূল্য সমজাতীয়। অন্য দিকে 'সঙ্ঘ' প্রসঙ্গে বুদ্ধসঙ্ঘের কথা স্মরণ করা যেতে পারে, যেখানে গুরুশিষ্যের সমঅধিকার ছিল, সমান ভোটের ব্যবস্থা ছিল। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকায়ত দর্শন' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের 'সংঘ ও নিয়তি' প্রবন্ধটি। সাথে বলে রাখি বাংলায় 'আড্ডা' শব্দটার মূল অর্থ: 'সমবেত হওয়া; একসঙ্গে মেলা'; 'কার্য্যবিশেষের নিমিত্ত তৎসংক্রান্ত লোকদিগের সম্মিলনস্থান'। (শব্দার্থগুলোর জন্য হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-ক এবং হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-খ দ্রষ্টব্য।)

প্রধানত মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ-আন্দোলন, র‍্যাডিক্যাল নারী-আন্দোলন, পরিবেশ-আন্দোলন, আশির দশকের পরমাণু-অস্ত্রবিরোধী-আন্দোলন, নব্বই-দশকের যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন, কর্পোরেট-বিশ্বায়নবিরোধী গ্লোবাল জাস্টিস মুভমেন্ট, সিয়াটল-আন্দোলন, জেনোয়া-আন্দোলন, কানকুন-আন্দোলন, এবং আজকের একবিংশ শতকের উইকিলিকস-আন্দোলন আর অকুপাই-আন্দোলনের মতো বিশাল বিশাল গণআন্দোলন আর গণজাগরণের সাংগঠনিক প্রাণ-সত্তা ছিল এই ধরনের কোষ-সংগঠন।

৩৩.৬ ব্যক্তি-রাষ্ট্র-সমাজ: এ রেভোলিউশন টু লিভ!

মস্কোর প্রগতি-প্রকাশনের পুরাতন পাঠ মোতাবেক একদিন ঘুমের থেকে উঠে হঠাৎ করে বিপ্লব হয় না, চুনী। অ্যানার্কির কাছে আজকের স্বাধীন-সহযোগিতাপরায়ণ সংগঠন-সমবায়ই ভবিষ্যতের স্বাধীনতা-সাম্য-সংহতির সমাজের বীজ। আজকের বীজ গঠিত না হলে, পরিপুষ্ট না হলে, তারপর একদিন উপ্ত না হলে ভবিষ্যত বল-শেভিকদের মতো কারাগারে আচ্ছন্ন অন্ধকার। নৈরাজ্য-ভাবনা বা অরাজ-চিন্তা মনে করে, এখন সারাজীবন ধরে হুকুমতন্ত্রের আমলাগন্ধী অনুশীলন করে যাবো, আর হঠাৎ একদিন 'কোনো এক ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন হুজুর' বা 'ইতিহাসের নায়ক' এসে বিপ্লব করে ফেরার পর আমরা পরের দিন থেকে স্বাধীন-স্বতন্ত্র-পরস্পরনির্ভর সমাজ চালাতে শুরু করব: এটা অলীক চিন্তা।

মানুষের বিপ্লব মানুষকেই করতে হয়। তিল তিল করে বিপ্লব রচনা করতে হয়। প্রতিদিন। বিপ্লবের মধ্যেই বাঁচতে হয়। শুধু মিছিল-মিটিং-সভা-সমিতি করে বিপ্লব হয় না। ক্ষমতা-দখল হতে পারে মাত্র। নতুন রঙের, নতুন ঢঙের লাঠিয়াল শাসক শ্রেণী মসনদে আসতে পারে মাত্র। বিপ্লবের জন্য প্রাণবন্ত জীবনযাপন। স্বাধীন, বৈচিত্র্যপূর্ণ, অজস্রমুখী ধারায় জীবনকে প্রতি মুহূর্তে আস্বাদন করা। একা এবং বন্ধু-দেরকে নিয়ে। একেই বলে 'এ রেভোলিউশন টু লিভ!' আজকে যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য-মাস্টারি-চাকরির জন্য জীবন উচ্ছন্নে দিচ্ছেন, প্রতিযোগিতা-প্রতিহিংসা-প্রতিশোধের রাজনীতি করছেন, ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রী-সন্তান-সম্পত্তি-পরকীয়া নিয়ে প্রতিনিয়ত 'গৃহযুদ্ধ' করছেন, তাঁরা কালকে বিপ্লব করবেন? কেননা তাঁরা পার্টিকে চাঁদা দেন, মাঝেমধ্যে মিছিল করেন, স্লোগান দেন আর মনে মনে মতবাদের প্রতি অন্ধ 'ঈমান' রাখেন বলে ভাবেন? এ কখনো হয়?!

কোনো মতে প্রাণ বাঁচানোর বিপ্লব নয় – নতুন জমানার বিপ্লব হচ্ছে বাঁচতে বাঁচতে বিপ্লব। আজকের সিয়াটলের বিপ্লব, জেনোয়ার বিপ্লব, অকুপাইয়ের বিপ্লব গড়ে ওঠে সারা বছর ধরে অজস্র মতপথের অজস্র ছোট ছোট সংগঠনের সার্বক্ষণিক

বৈপ্লবিক নেটওয়ার্কিং-কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। আজকের এই যুগ কর্পোরেট দানবের যুগ। এটা ডাইনোসরের যুগ। রাষ্ট্রসোরাস-কর্পোসোরাস-কর্তৃসোরাস-পার্টিসোরাস-আমলাসোরাস-অস্ত্রসোরাসদের যুগ এটা। এবং এটা আবার 'ডাইনোসরের যুগে অ্যানার্কি'রও (কিউরিয়াস জর্জ ব্রিগেড, ২০০৩) যুগ বটে। এই যুগ আড্ডা নাচ-গান-কবিতা-ছবি-সিনেমা-লেখা-কার্টুন-অ্যানিমেশন আর অডিওভিজুয়াল অ্যানার্কির যুগ। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতের বেলা ডাইনোসর-দানবেরা যখন ঘুমায়, তখন কোথায় যেন মিটিমিট করে জোনাকির মতো আলো জ্বলে। ছোট্ট ছোট্ট এক ধরনের প্রাণী ডাইনোসরের পায়ের ফাঁকে নাচতে থাকে। ঐ প্রাণীগুলোই মানুষ। এ যুগের বিপ্লব হলো: এ রেভোলিউশন টু ড্যান্স!

এই সমাজে আজ সবকিছুই রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আমলা-কমিটি হয়ে গেছে। মন্ত্রি-সভা হয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি হয়ে গেছে। কর্তৃত্ব দূষিত করছে গোট সমাজ -জীবন, সমাজশক্তি, আত্মনিয়ন্ত্রণ। আত্মকর্তৃত্ব। আত্মশক্তি। তথা স্বাধীনতা। কিন্তু রাষ্ট্র তো কোনো চেয়ার-টেবিল-মসনদ না যে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলা যাবে। রাষ্ট্র একটা হুকুমতান্ত্রিক সম্পর্কপ্রণালী। রাষ্ট্র একটা 'আইনসম্মত' জীবনপ্রণালী। আমরাই তো রাষ্ট্র। রাষ্ট্র-সম্পর্কপ্রণালী মোতাবেক জীবনযাপন সম্মতি প্রদানের মধ্য দিয়ে আমরাই একে টিকিয়ে রেখেছি। রাষ্ট্রকে, তথা রাজনৈতিক সম্পর্করাজিকে, প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে শুধুমাত্র আরেক ধরনের সম্পর্কপ্রণালী দিয়ে। সামাজিক সম্পর্কপ্রণালী দিয়ে।[৪] তারই জন্য আরোপিত ও মৃত অক্ষরের 'আইনের' বদলে আমাদের চাই আত্মীয়তার বিনিসুতার মালা। হুকুমের বদলে চাই আত্মকর্তৃত্ব ও পরস্পর-সহযোগিতা। দালিলিক চুক্তির বদলে চাই প্রেম-ভালোবাসা-বন্ধুত্ব: মুক্ত মানবিক সম্পর্ক। আজকের বিপ্লব মানে নিজের মতো বাঁচো। একা এবং একত্রে। নতুন সমাজ গড়ো। নতুন সংগঠন গড়ো। নতুন সম্প্রদায় গড়ো। প্রেমে পড়ো। আড্ডা মারো। জীবনকে ভালোবাসো। রিক্লেইম দ্য স্ট্রিট। স্ট্রিট-পার্টি আয়োজন করো। এনক্রিপশন অকুপাই করো। কম্পিউটার অকুপাই করো। তার জন্য ক্রিপ্টো-পার্টি আয়োজন করো। মোড়ল নয়, মুরুব্বি নয়, মোল্লা নয়, মিডিয়া নয়, মতবাদ নয়: ডু ইট ইওরসেল্ফ। নিজের জীবন নিজের দখলে নাও।

তাই বলছি: ভিন্নমত নিয়ে একসাথে কাজ করতে পারা, জীবনযাপন করতে পারাই স্বাধীনতার চ্যালেঞ্জ। বন্ধুত্বের চ্যালেঞ্জ। মনুষ্যত্বের চ্যালেঞ্জ। ভিন্নমতের জন্য কিংবা মতবাদের জন্য, যদি বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বলতে হবে জ্যান্ত মানুষের

---

৪ রাষ্ট্র বিষয়ক এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দ্রষ্টব্য জামান নৈরাজ্যপথিক গুস্তাভ ল্যানডাওয়া'র *রেভোলিউশন অ্যান্ড আদার রাইটিংস্* শীর্ষক রচনাসংগ্রহের ১৯১০ সালের 'উইক স্টেটসমেন, উইকার পিপল্' প্রবন্ধটি – গুস্তাভ ল্যান্ডাওয়া, ২০১০।

চেয়ে মৃত মতবাদই বড়। আমি জানি তুমি তা মনেও করো না। মনে করতে পারো না। কারণ তুমি হাবিবুজ্জামান চুনী। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে আমি কিছু বলে ফেলতে পারলাম।

ভালোবাসা জেনো। ভালোবাসাই বন্ধুত্ব। ভালোবাসাই বিপ্লব। ভালোবাসাই জীবন – এ রেভোলিউশন টু লিভ!

দৈনিক *সোনার দেশ*, ১২ই এপ্রিল ২০১৩। দৈনিক *বণিক বার্তা*, ২০শে এপ্রিল

শাহবাগের স্বাধীনতাই শাহবাগের পথ

৩৪.১ ভূমিকার পরিবর্তে শাহবাগের কবিতা: অভিনন্দন, সবাইকে

সমবেত সুধীমণ্ডলী,
আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।
কেউ এই সভা ছেড়ে যাবেন না।
বিষয়টা জরুরী।
তবে ঘাবড়াবেন না।
মূলত আপনাদের অভিনন্দন জানাতে এসেছি।

এই যে অধ্যাপক,
আপনার চলে যাওয়ার বিজ্ঞ ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে
শোনার অভ্যাস আপনার ধাঁতে নেই।
দাঁড়ান।
গত বছর আপনাকে যে পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছিল
সেটা ঠিকই ছিল।

কিন্তু কারণটা ছিল ভুল।
ওটা ছিল চৌর্যবৃত্তিতে আপনার সর্বোৎকৃষ্ট প্রশিক্ষণের স্বীকৃতি।
জাতিকে এক ঝাঁক দক্ষ চোর উপহার দেওয়ার জন্য আপনাকে অভিনন্দন!
(দেশ তাঁদের বিদ্যার সফল প্রয়োগে সন্তুষ্ট।)

এই যে কবি,
অন্যমনস্কতার ভান করে কোথায় চলে যাচ্ছেন?
আপনিও দাঁড়ান।
নৈরাশ্য আর নারীর শরীর নিয়ে নিরন্তর চিন্তা করে
আপনার মনোজগতের উপর দিয়ে বেশ ধকল যাচ্ছে নিশ্চয়ই।
আপনার 'গাধার আত্মকথন' কবিতাটা কিন্তু বেশ ভালই হয়েছে।
আপনার নতুন উদ্ভাবিত কাব্যতত্ত্ব দিয়ে
কুকুরের প্রভুভক্তিকেও হার মানিয়েছেন বলে
মানবকুলের পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন!

এই যে চিকিৎসক,
আপনিও দাঁড়ান।
ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আপনার রোগী দেখতে যাওয়ার দরকার নেই।
আপনি না গেলে বরং রোগীটা হয়ত বেঁচে যাবে।
আপনার কুশলী হাত দেখে মনে হচ্ছে
আপনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্যে
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন!

মান্যবর শিল্পপতি,
আপনি আঙ্গুল চুষছেন কেন? (শোষণে বিরতি সম্ভব?)
আপনি কি ক্ষুধার্ত?
তবুও দাঁড়ান।
আপনার বিরহে কোনো শ্রমিক নিশ্চয়ই অনশনে যাবেন না।
দিন-রাত অমানুষিক পরিশ্রম করে আপনি দেশের সবকিছুকে (এমনকি দেশকেও)
যে রপ্তানিযোগ্য করে তুলেছেন সে জন্য
রপ্তানী-উন্নয়ন ব্যুরোর পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন!

মাননীয় রাষ্ট্রপতি,
অধৈর্য হবেন না।
আরেকটু দাঁড়ান।
আপনি দাঁড়িয়ে থাকলে বরং দেশের লাভ।
দেশ উদ্ধারের জন্য গত বছর ইউ.এন.ও. আপনাকে যে পুরস্কার দিয়েছিল
ওটা ঠিকই ছিল তবে শব্দ ব্যবহারে সামান্য গোলযোগ ছিল।
'উজাড়' বলতে গিয়ে ওরা 'উদ্ধার' বলে ফেলেছিল।
সাম্রাজ্যবাদের খেদমতে দেশকে উজাড় করে দেওয়ার জন্যে
আপনার উদারতাকে অভিনন্দন!

একযোগে সবাইকে আবারও অভিনন্দন।
সবাই একটা করতালি।

কবি জাহিদ আকতার। **অভিনন্দন, সবাইকে**। ফেসবুক: ১১ই মার্চ ২০১৩

৩৪.২ অসংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ

এই রচনায় আমি যতবার আমি 'শাহবাগ' বলব ততবারই বোঝাব শাহবাগ-গণসমাবেশকে, ততবারই বোঝাব দেশব্যাপী বহুবিচিত্র মানুষের গণজাগরণ-আন্দোলনকে, ততবারই বোঝাব ঢাকার শাহবাগের খোদ শাহবাগ-আন্দোলনটাকে – একবারও বোঝাব না গুটিকয় ব্যক্তির স্বঘোষিত কেন্দ্রীয় গণজাগরণ-মঞ্চকে। এই রচনায় আমি যতবার আমি 'গণজাগরণ-মঞ্চ' বলব ততবারই বোঝাব ঢাকার শাহবাগে গঠিত 'কেন্দ্রীয়' গণজাগরণ-মঞ্চ-কমিটিকে। কেন এই সতর্কতা তা নিয়ে কথা হবে এ রচনার শেষের দিকে।

৩৪.৩ শাহবাগ-আন্দোলনের কাছে বাংলা-বসন্তের প্রত্যাশা

ঘোরতর শীতকালে শাহবাগের সূত্রপাত বাংলা-বসন্তের আবাহন দিয়ে। স্বাধীনতা দিয়ে শুরু হয়েছিল শাহবাগের পথ – শাহবাগের হাঁটা। আপাতত শেষ হয়েছে – থমকে গেছে বলাই ভালো – অন্ধত্ব দিয়ে। ঘোরতর মতবিদ্বেষ দিয়ে। চিন্তাচর্চা ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিপুল গণপরিসরে এতটা অন্ধত্বের পাইকারি প্রদর্শনী আগে আমরা দেখি নি তেমন। সামান্য মতপার্থক্য, মতদ্বৈততা বা মতবৈচিত্র্যকে চোখের পলকে দেওয়া হচ্ছে উপাধি: রাজাকার, পাকি, ছাগু, দালাল, বেঈমান, মৌলবাদী, শাহবাগী, নাস্তিক, হেফাজতী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী ইত্যাদি প্রভৃতি।

এই ঘোর অন্ধ-বিদ্বেষের আড়ালে ক্রমাগতভাবে রাক্ষস হয়ে উঠছে রাষ্ট্র। ক্রমবর্ধমান হিংস্র হয়ে উঠছে রাষ্ট্র-রাক্ষসের সরকারী শাখা এবং বিরোধী-বেসরকারী শাখা-প্রশাখা। আলবদর-রাজাকারদের বিচার, বিচারের বিরোধিতা, এবং বিচারের রায় বাস্তবায়নের সার্বিক সিস্টেমের ভেতর দিয়ে খোদ রাষ্ট্রকাঠামোটাই হয়ে উঠছে রাক্ষসের মতো আগ্রাসী। নিদারুণ আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ – অর্থাৎ তার সরকারী দল, তার বিরোধী দল, এইসব দলের ক্যাডার-বাহিনী এবং সর্বোপরি তার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ। রাষ্ট্রীয় দল-ক্যাডার-বাহিনীসমূহের বাছবিচারহীন বলপ্রয়োগের প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠছে: রাষ্ট্র তো যুদ্ধাপরাধ সামলাবে, কিন্তু রাষ্ট্র সামলাবে কে?

এক যুদ্ধাপরাধের বিচার করতে গিয়ে হুমকির মুখে পড়েছে নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান ও আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশ। বাংলাদেশ কোন পথে যাবে? সামনের দিনে এই মহাজোট সরকার ও তার অন্তর্গত পার্টিসমূহের সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে নতুন কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক দল-শক্তি-সংস্থার উন্মেষ ঘটার আশা আছে কি? আমাদের উদার, বহুদলীয়, বহুমতের সমাজগড়নটাকে বাঁচানোর ও বিকশিত করার কর্তব্য হাতে তুলে নেবেন কারা? সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালনায় তরুণ-যুবাদের ভূমিকার রাখার কোনো উপায় কি আর অবশিষ্ট থাকবে? গত শীতের জোয়ারভাসানো আন্দোলনের পরে আজকের শীতে ভাটার টান। এই শীতে এসে সবচেয়ে বেশি করে অনুভূত হচ্ছে শাহবাগের অভাব। ব্যক্তি-সামাজিক স্বাধীনতার পথে বিকশিত হলে শাহবাগই দেখাতে পারত বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার পথ ।

এই প্রত্যাশার উৎস আছে গেল-শীতের শাহবাগ-জাগরণের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে শনাক্ত করা দরকার। এগুলোর বিস্তারিত পর্যালোচনা দরকার। এ ছাড়া বোঝা যাবে না শাহবাগ ছেড়ে কেন চলে গেল সমুদ্র-জনতা। এ পর্যালোচনা থেকেই ইশারা পাওয়া যেতে পারে কীভাবে আমরা আমাদের এই বিকাশমান সমাজটায় বহুকাঙ্ক্ষিত বর্ষাবসন্তের ঐতিহাসিক নবায়ন ঘটাতে পারতে পারি, এবং/অথবা কীভাবে সে কাজে হতে পারি ব্যর্থ। স্বাতন্ত্র্য-শনাক্তকরণ, সার্বিক পর্যালোচনা এবং নবতর শাহবাগ-সংগঠনের কর্তব্য সমাধা করতে পারলে নবপর্যায়ে জেগে উঠবে শাহবাগ-আন্দোলন।

৩৪.৪ শাহবাগ-আন্দোলন কি নিতান্তই ফাঁসির আন্দোলন?

নতুন ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার দীর্ঘলালিত স্বপ্নই এ আন্দোলনের প্রাণের স্পৃহা। এ আন্দোলন অনাগত বাংলা-বসন্তের অলিখিত ইশতেহার। এ আন্দোলন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অসমাপ্ত কর্তব্য সমাধা করার গণআকাঙ্ক্ষার অভিপ্রকাশ। এ আন্দোলন

বৈষম্য-বঞ্চনা-বলপ্রয়োগহীন বাংলাদেশ অর্জনের লক্ষ্যে তরুণ-ছাত্র-যুবাদের গণযোগাযোগ। একাত্তরের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই ছিল এর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

বহুবর্ণিল এ আন্দোলনের রংধনু থেকে মিডিয়া ও স্বার্থবাদী মহল 'ফাঁসি চাই' ধ্বনিটাকেই বড় করে সামনে এনেছে। আড়াল করে রেখেছে এর গণআকাঙ্ক্ষা আর গণচরিত্রকে। আসলে নতুনতর চেতনার নব-উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে শাহবাগ-আন্দোলন। নতুন ভাষা, নতুন প্রকাশভঙ্গি, নতুন আকাঙ্ক্ষার বিপুল বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিপ্রকাশ এ আন্দোলন। এ একেবারে নতুন আওয়াজ। শাহবাগ-আন্দোলন দেখিয়েছে 'ইমাজিনেইশন আনবাউন্ড'-এর এক পশলা বর্ষণ। ঘটিয়েছে নবতর কল্পনাপ্রতিভার অবাধ স্ফূরণ। এ আন্দোলনের প্রধান একটা চরিত্র এর বহুস্বর ও বহুকেন্দ্র। এ আন্দোলন রাস্তার গণতন্ত্রের দরকারি দৃষ্টান্ত। এ আন্দোলন তারুণ্যের, যদিও বয়স্করা এর অংশ। এ আন্দোলন নতুনের। নতুন প্রজন্মের। মুখস্ত আন্দোলন এ নয়। এ আন্দোলন অচল প্রথার বিরোধী। বাংলাদেশের চর্বিতচর্বণ পার্টি-পলিটিক্সের দিশাহারা বৃত্তের একেবারে বাইরের এ আন্দোলন আমাদের বহু-কাঙ্ক্ষিত নতুন ধারার আন্দোলনের সত্যিকারের গণনমুনা। অন্য দিকে, শাহবাগ-আন্দোলন হলো দলীয় রাজনৈতিক বৃত্ত থেকে উদ্ধার করে মুক্তিযুদ্ধের ওপর জনমালিকানা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ দিক থেকে দেখলে এ আন্দোলন অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধের অমিমাংসিত প্রশ্নগুলোকে ফয়সালার করার জন্য স্রেফ সরকার এবং আদালতের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে নি, নিজেরা আলাপ-আলোচনা -তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে সেগুলোর মিমাংসা ঘটানোর কাজে এগিয়ে গেছে বহু দূর।

সরকার ও রাজনৈতিক দলের প্রতি ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সূত্রে প্রাপ্ত অনাস্থা এবং অবিশ্বাস থেকে সূত্রপাত ঘটেছিল এ আন্দোলনের। এ আন্দোলন দলীয় রাজনৈতিক চরিত্রকে সযত্নে পরিহার করতে চেয়েছে আগাগোড়া। নতুন ধারার রাজনীতির সূচনা ঘটাতে চেয়েছে এই আন্দোলন। দলীয় রাজনীতির নোংরামি, গণবিচ্ছিন্নতা, কাদা-ছোঁড়াছুড়ি ও সংকীর্ণতাকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছে এই আন্দোলন। সবাই এসব জানেন। জার্মান বেতার 'ডয়চে ভেলে'ও খেয়াল করেছিল তা: 'শাহবাগের আন্দোলনকে কিছুতেই রাজনীতিকরণ করতে দেবে না প্রতিবাদকারীরা। গত কয়েকদিনে রাজনীতিবিদরা সেখানে গিয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। অবস্থানকারীরা তাদের বক্তব্য শুনতে রাজি নন।'* এঁদেরই আরেকটা

---

* প্রতিবেদন: সঞ্জীব বর্মন / আরাফাতুল ইসলাম। সম্পাদনা: দেবারতি গুহ। তারিখ ০৮ই ফেব্রুয়ারি ২০১৩। www.dw.de/overlay_media/প্রজন্ম-চত্বরে-জনসমুদ্র/g-16583121।

প্রতিবেদনে এই আন্দোলনের রাজনৈতিক দল বহির্ভূত চরিত্রটা ফুটে উঠেছে ভালোভাবে:

> ''চারদিকে শুধুই মানুষ আর মানুষ, শত শত মানুষ, যাঁরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন....ঢাকার বাইরে থেকে মানুষরা এসে আমাদের এই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন।'' পুরো আন্দোলনটা কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচির রূপ ধারণ করতে চলেছে কিনা, এ প্রশ্নের জবাবে আবু সুফিয়ান বললেন, প্রতিবাদ সমাবেশে সব বয়সের, সব পেশার মানুষরা আছেন। ''এই সমাবেশ থেকে *রাজনৈতিক কোনো চিত্র আঁকাটা ঠিক হবে না* ... এই আন্দোলন দেশের আপামর জনসাধারণের ... যেখানে দেশের সব শ্রেণির মানুষ আছে ... *এটাকে রাজনীতিকরণ বা রাজনীতির 'প্লট' দেওয়াটা ঠিক হবে না*,'' বললেন আবু সুফিয়ান।
>
> এটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা কারণ বাংলাদেশের মানুষ প্রধান দুই বিরোধী দল ছাড়া কিছু চিন্তাই করতে পারে না। তাদের *রাজনৈতিক 'অ্যাজেন্ডা' বাদে বাংলাদেশের মানুষ অতীতে কিছুই করেনি, কিছুই চিন্তা করতে পারত না।*'' ('প্রজন্ম চত্বরে' 'বাংলাদেশের বসন্ত': [ব্লগার] আবু সুফিয়ান। সাক্ষাৎকার: অরুণ শঙ্কর চৌধুরী, সম্পাদনা: দেবারতি গুহ। ডয়চে ভেলে। তারিখ ০৭.০২.২০১৩। http://www.dw.de/বাংলাদেশের-বসন্ত/a-16580070। পার্মালিংক: http://dw.de/p/17ZEU। মোটা হরফ বর্তমান প্রাবন্ধিকের।)

তবু এই আন্দোলনটাকে দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন অনেকেই – একে সমর্থন করে, সাহায্য-সহযোগিতা-পাহারা যুগিয়ে, এর বিরোধীতা করে, এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে, এর ওপর সূক্ষ্ম ও স্থূল চাপ প্রয়োগ করে, এবং সর্বোপরি আন্দোলনটাকে হাইজ্যাক করার চেষ্টা করার মধ্য দিয়ে। সরকার, বিরোধীদল, যুদ্ধাপরাধী দল ও ক্যাম্পগুলো কেউই এই কাজে পিছিয়ে থাকেন নি। ব্লগারদের দুইটা ব্যানার – 'ব্লগার অ্যান্ড অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট নেটওয়ার্ক' এবং 'জাতীয় স্বার্থে ব্লগার অনলাইন একটিভিস্ট ফোরাম' – যথাক্রমে আওয়ামী লীগ এবং বর্তমানে আওয়ামী মহাজোট বহির্ভূত বলশেভিক-বাম ধারার প্রচ্ছন্ন প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এই দুই ধারার সাথে সমবেত হয়েছে ছাত্রলীগ এবং ছাত্রইউনিয়ন-ছাত্রমৈত্রী প্রভৃতি সংগঠন। শাহবাগে নিজেদের উপস্থিতি এবং গণজাগরণ-মঞ্চের সিদ্ধান্তগ্রহণ-প্রক্রিয়াকে যথাসম্ভব প্রভাবিত করার দিকে মনোনিবেশ করেছেন এঁরা সবাই। কিন্তু সরকার, ছাত্রলীগ, এবং (অন্তত যুদ্ধাপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে) সরকারের অন্যতম থিংকট্যাংক 'একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি' যেভাবে গণজাগরণ-মঞ্চ পকেটস্থ করার মধ্য দিয়ে

শাহবাগ-আন্দোলনকে সরকারের 'শাহবাগ-ফ্রন্ট' বানানোর কাজে মনোনিবেশ করেছেন তা এই আন্দোলনকে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ক্রমাগতভাবে গণজারণ-মঞ্চকে নিয়ে খেলেছে সরকার। নানাভাবে। তোয়াজ করেছে। ধমক দিয়েছে। সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে। ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দার শোভন খুন হবার পর তাঁর বাসায় গিয়ে এক ধরণের আচরণ, আবার হেফাজতে ইসলাম ও আমার দেশের প্রচারণার চাপে তরুণ ব্লগারদেরকে গ্রেপ্তার করার মতো আচরণ। ক্ষমতায় টিকে থাকার আন্তরিক কৌশল-বোধ ছাড়া বিশেষ কোনো নীতিবোধের নমুনা সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। সরকার তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে বারবার রাশ টেনে ধরার চেষ্টা করেছে এই আন্দোলনের। ছাত্রলীগকে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিকটু চেষ্টা, স্লোগান-আইকন লাকী আক্তারকে মঞ্চের ওপরই মারা, অন্যদেরকে চাপের ওপর রাখা – কিছুই বাদ যায় নি প্রায়। সর্বোপরি ৬ই এপ্রিলে এসে হেফাজতে ইসলামের ব্যানারে সংঘটিত সহিংসতা দমনের সাথে 'ভারসাম্যের পলিটিক্স' খেলতে গিয়ে তাঁরা শহীদ জননী জাহানারা ইমামের প্রতিকৃতি সরিয়ে ফেলেছেন, উচ্ছেদ করেছেন গণজাগরণ-মঞ্চকে শাহবাগের জমি থেকে, তাতে করে তাঁদের রাজকূট-নীতি এবং কূট-রাজনীতির চেহারাটাই ফুটে উঠেছে। এইসব নানা কিছু করে মঞ্চটাকেই পকেটে ভরা গেছে শুধু, কিন্তু সেটাও আমজনতাকে বাড়ি ফেরত পাঠানোর বিনিময়ে।

বাংলা পরীক্ষার দিন আরবি পরীক্ষার আলাপ তোলার সেই সংকীর্ণ আপত্তির কথা আমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই। শাহবাগ-আন্দোলনকে যাঁরা স্কুল-কলেজের কৃত্রিম পরীক্ষার সাথে তুলনা করে আন্দোলনের চোখটার বড় ওঠার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা আজকে স্বপ্নের সেই শাহবাগ-গণসমাবেশকে আর ডাইনেবাঁয়ে দেখতে পাচ্ছেন না বলে আফসোস করছেন মনে মনে। তাঁদের ডাইনেবাঁয়ে এখন অধিপতি ধারার কর্পোরেট-মিডিয়া, সরকারী পাহারা আর রাজনৈতিক মুরুব্বিরা ছাড়া কেউ নেই বললেই চলে।

দেশব্যাপী গণজাগরণ-আন্দোলনের মঞ্চবৈচিত্র্য বলে দেয় শাহবাগ-আন্দোলন আগে-থেকে-ছক-কষা সংকীর্ণ ঘোষণা-কর্মসূচির কোনো একপথু এন্টারপ্রাইজ ছিল না। এ ছিল সমাজের সর্বস্তরের সর্বধারার মানুষের বৈচিত্র্যময় সমাবেশ। এ ছিল আরণ্যক বসন্তের আভাস। বসন্ত শুধু ইউক্যালিপটাসে হয়। বিরাট বিরাট লোহার কাঁচি দিয়ে মাথাছাঁটা পাতাবাহারের সৈনিকসম সমরূপতার বিন্যাস দিয়ে বানানো বাগান হয় বড় জোর, বসন্ত হয় না। আসছে বাংলা-বসন্তের আগাম কোকিল হয়ে এসেছিল যে শাহবাগ তার সমাজ-অরণ্যে ছিল নানা মতের নানা পথের – এমনকি অপথ-বিপথের – নানা ধারার মানুষ। এ হয়েছিল জনসমুদ্র। সত্যিকারের জনসমুদ্র।

'জনসমুদ্র' এতদিন আমরা বইয়েই পড়েছি, বাস্তবে দেখি নি। কোনো দিন না। শাহবাগে সে প্রথম দেখা দিল – সমাজসমুদ্র।

শাহবাগ-আন্দোলনের পরীক্ষাটা ছিল আসলে সমাজপাঠের পরীক্ষা। জীবনের পরীক্ষা। কৃত্রিম ক্লাসরুমের মুখস্ত পরীক্ষা নয়, 'পৃথিবীর পাঠশালা'র বিনা-কোর্সের বিনা-সিলেবাসের পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় আমরা ডাহা ফেল করেছি। আমাদের প্রস্তুতি ছিল না। পুকুরে গোসল করা যাঁদের আজীবনের অভ্যাস, হঠাৎ সমুদ্র দেখলে তো তাঁরা ভড়কে যাবেনই। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার পুকুর বলতে এর পুকুর ওর পুকুর ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। এমনকি বর্ষার উপচে পড়া পুকুরের ভেসে যাওয়া মাছ নিয়েও এমনকি কাড়াকাড়ি করাটা যাঁদের স্বভাব তাঁরা শাহবাগ-সমুদ্রের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি-গোষ্ঠী-মালিকানা বজায় রাখার কায়দাকানুনের ওপরই জোর দিলেন। এই পক্ষও। ঐ পক্ষও। গণমালিকানা বা সামাজিক মালিকানার দৃষ্টিভঙ্গি কারোরই আছে বলে মনে হলো না। পরিণামে থমকে গেল শাহবাগ।

৩৪.৫ গণজাগরণ মঞ্চ, গণজাগরণ-আন্দোলন, এবং নবতর সংগঠনপ্রণালীর প্রয়োজনীয়তা

এ রচনার শুরুতেই বলেছিলাম আমি 'শাহবাগ' বলতে বুঝি শাহবাগ-গণ-সমাবেশকে, দেশব্যাপী অজস্র মানুষের গণজাগরণ-আন্দোলনকে, ঢাকার শাহবাগের শাহবাগ-আন্দোলনটাকে। বলছিলাম শাহবাগ বলতে আমি – গণজাগরণ -মঞ্চ-কমিটিকে বুঝি না। আমার কাছে, আরও অনেকের মতোই, গণজাগরণ মঞ্চ এক জিনিস, আর গণজাগরণ-আন্দোলন অন্য জিনিস। ভেঙ্গে বলা যাক।

'কেন্দ্রীয়' গণজাগরণ-মঞ্চ-কমিটি আর সারা দেশের জেলা-উপজেলা-শহর পর্যায়ে ও সারা বিশ্বের নানান জায়গায় ছড়িয়েছিটিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা গণজাগরণ-মঞ্চগুলোর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো এক নয়। কেন্দ্রীয় গণজাগরণ-মঞ্চ-কমিটি একেবারেই আলাদা ধরণের একটা সত্তা। এই কেন্দ্রীয় কমিটির হুকুমে কিন্তু পরিচালিত হয় না সারা দেশের ও সারা বিশ্বের গণজাগরণ-মঞ্চগুলো। প্রকৃতপক্ষে শাহবাগ-আন্দোলনের কোনো কেন্দ্র-প্রান্ত বা ঊর্ধতন-নিম্নতন কোনো কর্তৃত্বতান্ত্রিক কঠোর নাই। একেবারেই নাই। সম্পর্কটা স্বতঃস্ফূর্ত ধরণের, স্বেচ্ছা-সম্মতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা। কোনো বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে দাঁড়ানো সংগঠন-কাঠামো এটা নয়। শুরু থেকেই এটা কারো চোখ এড়ায় নি যে 'দেশ কাঁপানো এই গণজাগরণের পেছনে একক কোনো নেতৃত্ব নেই। আত্মার আহ্বানে মিছিলে আসা, বিক্ষোভে জমায়েত প্রতিটি কণ্ঠস্বর হয়ে উঠছে আন্দোলনের নেতা।' (চেতনার

আলো জ্বালানো সেই তরুণরা কালের কণ্ঠ, ঢাকা, রবিবার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, প্রথম পাতা) শাহবাগ-আন্দোলন কোনো একক সংগঠন নয় আসলে। এটা হচ্ছে সংগঠনসমূহের সংগঠন। আন্দোলনসমূহের আন্দোলন। অকুপাই-আন্দোলনের মতো। বৈশ্বিক ন্যায়বিচার-আন্দোলনের মতো। সিয়াটল-জেনোয়ার কর্পোরেট বিশ্বায়নবিরোধী আন্দোলনের মতো। ঐসব আন্দোলনের মতোই শাহবাগ-আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামোও অতিশয় শিথিল, বৈচিত্র্যশীল এবং বহুবিধ চিন্তা-মতামত-ধ্যানধারণার প্রতিনিধিত্বকারী।

শৈথিল্যে এবং বৈচিত্র্যেই শাহবাগ-আন্দোলনের শক্তি। কঠোরতা এবং বাধ্য-বাধকতা এবং হুকুমতান্ত্রিক অনুশীলনে এর দুর্বলতা। সৌভাগ্যবশত এ আন্দোলন এতই বহুধারা-ঋদ্ধ ও বৈচিত্র্যমুখর যে প্রচলিত কর্তৃত্বপরায়ণ ঘরানার কোনো কঠোর বাধ্যবাধকতাপূর্ণ হুকুমতান্ত্রিক 'শৃঙ্খলা'র অনুশীলন এ আন্দোলনে গড়েই উঠতে পারে নি। কখনোই না। সামান্যও না। শুরুতে না, পূর্ণ জোয়ারের সময় না, ভাটার টানেও না। তার মানে এই নয় যে ঐ জাতীয় কঠোর বাধ্যবাধকতাপূর্ণ হুকুমতন্ত্র কায়েমের কোনো আকাঙ্ক্ষা এই শাহবাগ-আন্দোলনের তথাকথিত কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ছিল না। থাকারই কথা। এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশের ডান-বাম-উত্তম-মধ্যম যাবতীয় দল-সংগঠনই মনে করে ঐক্যেই শক্তি। আর ঐক্য মানেই চিন্তা-কর্ম-সৃজন-শীলতার দিক থেকে বৈচিত্র্যহীন কঠোর ঐক্য। এঁদের কাছে ঐক্য মানে চিন্তার ঐক্য কথার ঐক্য কাজের ঐক্য। বলশেভিক ঘরানার পার্টিগুলোর মতো, এঁদের কাছে ঐক্য মানে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা-অনুসন্ধিৎসাবিহীন চিন্তাপ্যারেডের লেফটরাইট। হুকুমদার নেতারা 'সঠিক' সিদ্ধান্ত দেবেন আর 'ঐক্যবদ্ধ' অচিন্তাবাহিনী সেই সিদ্ধান্ত বাস্তায়ন করার জন্য নানা প্রকারের কৌতূহলশূন্য প্যারেড করতে থাকবে। 'মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী' অথবা 'হয় বিপ্লব না হয় মৃত্যু' মার্কা নানাবিধ প্যারেড। শাহবাগ এক মুহূর্তের জন্যও এরকম প্যারেডগ্রাউন্ডে পরিণত হয় নি। সেরকম সামান্যতম ইশারাও এতে ছিল না। এ থেকেই বোঝা যায় শাহবাগ অভিমান করে ফিরে উদ্যানের ভেতরে। সুতরাং, এই প্রবন্ধের পরিভাষায়, কেন্দ্রীয় গণজাগরণ-মঞ্চ-কমিটি হচ্ছে 'গণ-জাগরণ-মঞ্চ', আর সারা দেশের সারা বিশ্বের গণজাগরণ-মঞ্চসহ অজস্র ব্যক্তি-দল-গোষ্ঠী-মানুষ-ধারার যে বিপুলপ্রবাহ সেটিরই ডাক নাম গণজাগরণ-আন্দোলন ওরফে 'শাহবাগ-আন্দোলন'।

এই পার্থক্য জরুরি। শাহবাগ-আন্দোলনে পরিষ্কার দেখা গেছে, আন্দোলনের মাথার ওপর চেপে বসা আমলাতান্ত্রিক ও আনুষ্ঠানিক কমিটি নেতৃত্ব-কাঠামো এক জিনিস, আর এর মাঠ পর্যায়ের আপাত-নিরাকার, বহুমুখী, বহুবিচিত্র, অজস্র-অন্তপ্রাণ, স্বতঃস্ফূর্ত কর্মী-সংগঠকরা অন্য জিনিস। শাহবাগ-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

এর স্বনির্ভরতা, আত্মসংগঠন, আনুভূমিক নেটওয়ার্কিং। কেন্দ্র-প্রান্ত কর্তৃত্বতন্ত্র বা হায়ারার্কি এর বৈশিষ্ট্য নয়। এখানে মানুষ অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে আসেন নি। সংকীর্ণ ব্যক্তি-দলীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য আসেন নি আমজনগণ।

অন্য দিকে গণজাগরণ-মঞ্চ নামক কমিটিখানার বৈশিষ্ট্য বলতে গেলে ডিক্রি-ফরমান-ফতোয়া-ঘোষণা-দাবিনামা। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এখানে কেন্দ্রে। অন্যদের কাজ স্রেফ 'কেন্দ্রীয়' কর্মসূচী অনুসরণ করা। প্রকৃতপক্ষে, শাহবাগ-গণজোয়ারের এ সাইডে দাঁড়িয়ে নিজেকে শাহবাগ-আন্দোলনের স্রষ্টা-প্রতিভূ-কাণ্ডারি বলে দাবি করে চলেছে বিশেষ ধারার রাজনৈতিক মুরুব্বিদের পছন্দের একটা কমিটি। মঞ্চ-মাইক-মুরুব্বিদের ভোট-ক্ষমতা-রাজনীতির সংকীর্ণ হিসাবনিকাশ ব্যাহত করেছে মাঠ পর্যায়ের আমপাবলিকের সর্বমুখীন স্বরাজকে। বিঘ্নিত হয়েছে খোদ শাহবাগ-আন্দোলনের স্বতস্ফূর্ত গতিধারা।

শাহবাগ-আন্দোলনের দিকে তাকালে পরিষ্কার দেখতে যাওয়া যাবে: এর মঞ্চ-মাইক-মুরুব্বি-কমিটি এগিয়েছেন রাজনৈতিক যোগোযোগের বাহন মূলধারার মিডিয়ার আশ্রয়ের দিকে। আর শাহবাগের মাঠের আন্দোলন আগাগোড়াই থেকে গেছে ফেসবুক-সেলফোন-মুখোমুখি লেনদেনের সামাজিক যোগাযোগের আশ্রয়ে। যত দিন গেছে, মঞ্চ-মাইক-মুরুব্বি-কমিটির সহায় হয়ে উঠেছে মিডিয়া। রাজ-নৈতিক মিডিয়া।

খেয়াল করার মতো ঘটনা হলো: রাজনৈতিক মিডিয়া মাত্রেই কর্পোরেট মিডিয়া। বৃহৎ পুঁজির মিডিয়া। তথাকথিত 'নিওলিবারাল মুক্তবাজার' ওরফে কাছাখোলা-পুঁজিবাদের কারখানা-উৎপাদনবিমুখ আমদানি-রপ্তানি-ব্যাংক-বীমা-শেয়ার-বাজারনির্ভর ফটকা পুঁজিবাদের ধ্বজাধ্বারী সুশীল সমাজের এই মিডিয়ার নিজস্ব আর্থরাজনৈতিক কর্মসূচি। আছে গণস্বার্থবিরোধী এনজিও-চরিত্র। এরা রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা করলেও নিজেরা অরাজনৈতিক (অর্থাৎ সামাজিক) স্বার্থের সংরক্ষক নন। এরা সব গণবিরোধী বিদেশী দাতাসংস্থার, বিদেশী মাল্টিন্যাশনাল অর্থনৈতিক দানবের স্থানীয় এজেন্ট মাত্র। এদের প্রায় দুই দশকের (মূলত ১৯৯০ থেকে ২০০৭ সময়পর্বের) বিপুল প্রচারণাযজ্ঞের কল্যাণেই এদেশ বাস্তবায়িত হতে পেরেছিল মহাকুখ্যাত এক-এগারোর সুশীল-সামরিক জরুরি বিভীষিকা। এরাই ভর করেছিল শাহবাগ-আন্দোলনের নেতৃত্বের ওপর – প্রচ্ছন্নে, সমর্থনকারী বন্ধুর বেশে। শাহবাগ-আন্দোলনকে এগিয়ে দেওয়ার নামে এদের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল আন্দোলনটার বৈপ্লবিক রূপান্তরধর্মী চরিত্রকে যথাসম্ভব খর্ব করা। এটাকে স্রেফ একটা ফাঁসি-আন্দোলনে অধঃপতিত করা। এর লক্ষ্য ছিল এমনভাবে শাহবাগ-আন্দোলের ইমেজ তৈরি করা যাতে করে সত্যিকারের সমাজ-রূপান্তরের

প্রশ্নগুলোকে সামনে আনতে না-পারে শাহবাগ। আর ঠিক এই প্রশ্নে এঁদের স্বার্থের সাথে মিলে গিয়েছিল ছোটবড় কতিপয় রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা কুক্ষীগত করার স্বার্থটি। পার্টি-পলিটিক্সের চিরাচরিত ধারায় এরা করেছেন শুধু ভোটের রাজনীতির হিসাবনিকাশ। এইসব শক্তির সর্বাঙ্গীন কৃত্রিম, লাগাতার, একমুখিন প্রচারণা অযুত মানুষের অজস্রমুখীন আন্দোলনের 'মুখপাত্র' হিসেবে একজন মাত্র ব্যক্তিকে একচ্ছত্র নেতা বলে প্রতিষ্ঠা করে ছেড়েছে। শাহবাগ-আন্দোলনের কাঁধে চেপে বসা মঞ্চ-মাইক-মুরুব্বি-মুখপাত্র-কমিটি গজদন্ত-মিনারে বসে ঘোষণা করে গেছেন একের পর কর্মসূচী।

মাঠপর্যায়ের আন্দোলনের সূত্রপাত ও চটজলদি বিকাশ ঘটেছে সামাজিক মিডিয়াকে আশ্রয় করে। সামাজিক মিডিয়া বিকেন্দ্রায়িত। এই মিডিয়ার কোনো একক কেন্দ্র থাকে না। এই মিডিয়ার কোনো একচ্ছত্র সর্বমান্য 'পার্টিলাইন' থাকে না। এর মোদ্দা বৈশিষ্ট্য বহুমত-বহুপথের শতফুল-শতধারা। এর অন্তর্গত-অন্তর্জাত -অন্তসলিলা-অলিখিত মূল নীতি হলো 'শত ফুল ফুটুক, শত মত বিকশিত হোক'। এর মূল বৈশিষ্ট্য একের সাথে একের আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ। এ বস্তু সদাজীবন্ত, সদাপ্রাণ-চঞ্চল। এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো একক কেন্দ্র থাকে না। শাহবাগ-আন্দোলন সূত্রপাতের দিনটিতে এইসব বৈশিষ্ট্য ভাস্বর হয়ে হয়ে উঠেছিল শাহবাগে। বহুবছর ধরে নাটক-গান-কবিতা-রাজনীতি-সাহিত্য-সিনেমা-জগতের অজস্র কর্মী -সংগঠক-ব্যক্তির অজস্রমুখী কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে শাহবাগ নামক ভৌগোলিক জায়গাটাতে বাংলাদেশের নতুন সংস্কৃতির যে মুক্তাঞ্চলটা গড়ে উঠেছে তিল তিল করে তার মহাবৈচিত্র্যশীলতার মধ্যে স্বনির্মিত স্বভাটাই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল পরবর্তী কালের শাহবাগ-আন্দোলনের প্রথম দিনগুলিতে। শাহবাগের গড়ন-কাঠামোর এই আদি শনাক্তকরণ চিহ্নটাকে ক্রমাগতভাবে নস্যাৎ করেছে 'গণজাগরণ মঞ্চ' নামে পরিচিত হয়ে ওঠা একক-কেন্দ্রের দাবিদার আমলাতান্ত্রিক কমিটি-কাঠামোটি। যত বেশি এই কেন্দ্রায়ন প্রক্রিয়াটি শক্তি সঞ্চয় করেছে তত বেশি করে সরে গেছেন এর মাঠপর্যায়ের কর্মী-সংগঠকেরা। কিন্তু ভৌগোলিক ও মানসিক শাহবাগ এবং তার আশেপাশেই রয়ে গেছেন তাঁরা এখনও – নতুনতর আনুভূমিক গণজাগরণের অপেক্ষায়।

আপাতত নতুনতর পর্যায়ের নবজাগরণের পথে প্রধান বাধা হয়ে আছেন কর্পোরেট-মিডিয়া-নির্ভর, সরকারী সাহায্য-পাহারা-প্রটোকলনির্ভর 'নাই-হয়ে-যাওয়া আন্দোলন'-এর মঞ্চ-মাইক-মুখপাত্র-মুরুব্বিরা। অপর প্রধান বাধা স্বনির্ভর, স্বতন্ত্র, স্বপরিচালিত, গণআন্দোলন গড়ার ক্ষেত্রে শাহবাগ-সংগঠকদের অভিজ্ঞতার অভাব। অন্যদিকে তথাকথিত ডানবাম-মিল্লাতবামওয়ালাদেরকেও শিখতে হবে

মঞ্চ-মাইক-মুরুব্বি-মুখপাত্র মার্কা সংগঠন-কাঠামোটাই বর্ষার মতো অবারিত, বসন্তের মতো আলো-ঝলমলে সত্যিকারের গণআন্দোলন গড়ে তোলার পথে বাধা – তা সেই সংগঠন-কাঠামো ডান-বাম-উত্তম-মধ্যম যে রাজনৈতিক দলের হাতেই থাক না কেন তা থাকবে জনবিচ্ছিন্ন ওপরতলাতেই বন্দি। অন্য যেকোনো রাজনৈতিক দলের মতোই। রাজনৈতিক দল মানেই তো, আমি রাখাল তোমরা ভেড়ার পাল। রাখালের হাতে ভেড়ার পালের মুক্ত নাই এ কথা বুঝতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

গণজাগরণ-মঞ্চের কাঠামোটাই তৈরি হয়েছে পঞ্চ ম'য়ের পাঁচ খুটিতে। এই মঞ্চ ম হলো: মঞ্চ মাইক মুখপাত্র মুরুব্বি মিডিয়া। এই পাঁচ ম'য়ের একটা ম-ও মাটিতে প্রোথিত নয়। সবগুলোই লালিত-চর্চিত হয় ক্ষমতার ম ম গন্ধে। এই পঞ্চ ম আসলে যাবতীয় কেন্দ্রীভূত ক্ষমতারই পাঁচ খুটি। এ ছাড়া ক্ষমতা চলে না, ক্ষমতা বাঁচে না – ছোট ক্ষমতা বড় ক্ষমতা, খুচরা ক্ষমতা রাক্ষস ক্ষমতা – সকল প্রকার ক্ষমতা-রাজনীতির অভ্যন্তরীন গড়ন এই পঞ্চ ম নিয়ে। পঞ্চ ম থেকে সাবধান। এ পঞ্চ ম সনাতন-সদাতন-সুমহান তন্ত্রের পঞ্চ ম নয় যে! এ হলো পঞ্চ মায়া। মায়া মানে সেই অলিক উপবোধ যা আমাকে পথ দেখতে দেয় না। নিজের পথে নিজেকে নিজের মতো করে হাঁটতে দেয় না। যেকোনো প্রকৃত গণআন্দোলনের পথে পথে পদে পদে আমাদেরকে পথচ্যুত করে এই পঞ্চ ম। সারা পৃথিবীর ইতিহাস তা-ই বলে। বিশেষত বাংলার ইতিহাস। 'গণজাগরণ-মঞ্চ' এবং এর কমিটির সদস্যদের নিয়ে আমার সামান্যও বিরাগ নাই। এঁরা প্রত্যেকেই বিবিধ ঝুঁকি নিয়ে, আন্তরিকতা নিয়ে, পুরো দেহমন নিয়ে এই আন্দোলনে যা করা সঠিক বলে মনে করেছেন তা-ই করেছেন, করে চলেছেন। এই মঞ্চ শাহবাগ-আন্দোলনের ঐতিহাসিক অংশ বৈকি। মুশকিল এই মঞ্চের বিচার-ব্রতী ব্যক্তিদেরকে নিয়ে নয় মোটেও। একে অস্বীকার করার কোনোই উপায় নেই। অস্বীকারের উপায় তো নেই-ই, বরঞ্চ এর উপযুক্ত নির্মোহ পর্যালোচনার ভেতরেই আছে শাহবাগ-আন্দোলনকে দ্বিতীয় পর্যায়ের নবজাগরণের দিকে নিয়ে যেতে পারার অন্যতম চাবিকাঠি।

এই জন্যেই মঞ্চ নিয়ে আলাপ। কী ধরনের মঞ্চ আমরা চাই? যে মঞ্চ উঁচুতে মাথায় করে রাখবে আমলাতান্ত্রিক-কমিটি-নেতাদেরকে আর নিচুতে মাটিতে বসিয়ে রাখবে পিপড়ার সারির মতো অগণিত আমজনতাকে? নাকি আমরা মঞ্চ বলতে এমন কোনো প্লাটফর্মের ধারণাকে বুঝব যে প্লাটফর্ম প্রকৃতপক্ষে একটা বিশাল পাটাতনের মতো সমস্ত দল-শক্তি-ব্যক্তির সমমর্যাদাপূর্ণ সমাবেশ ঘটাবে? আলাপটা তাহলে সংগঠনের। কেননা নেতৃত্বকাঠামো নিয়ে আলাপ মানে সংগঠনকাঠামো নিয়ে আলাপ। আলাপটা উপায়ের। উপায়ের সাথের উদ্দেশ্যের সঙ্গতির। আমাদের

উদ্দেশ্য যদি হয় উন্নত বাংলাদেশ রচনার জন্য মাটি তৈরি করা, তাহলে তো আমরা অনুন্নত ও বিষাক্ত রাসায়নিক উপায়ে জমি রচনা করতে পারব না। তাহলে সেটা বিষাক্ত বাংলাদেশের দিকে নিয়ে যাবে আমাদেরকে। নিয়ে যাবে অনুন্নত বাংলাদেশের দিকে। যদিও আমরা – আন্তরিকতার সাথে – চেয়েছিলাম উন্নত বাংলাদেশে পৌঁছাতে। আলাপটা তাহলে মঞ্জিলে মোকামের সাথে পথের সঙ্গতির।

সমস্যাটা তথাকথিত নেতাদের আন্তরিকতার নয়, সমস্যাটা সংগঠন-পরিচালনাগত উপায়-প্রণালীর। সচিবালয় থেকে সংসদ থেকে বেসরকারী সংস্থা থেকে পাড়ার ক্লাব পর্যন্ত সমস্ত কিমিটর সমস্ত নেতাই তো আন্তরিক! আন্তরিকভাবে এটাসেটা করে তাঁরা 'নেতা' হয়ে উঠতে চান, আর বাদবাকি সক্কলকে বানাতে চান 'কর্মী'। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় আজীবন কমিউনিস্ট পার্টি করা এই আমরা আর আমাদের বন্ধুরাই খোদ পার্টির মধ্যে এরকম আমলা-কামলা বিভাজন দেখেছিলাম। তা নিয়ে কটাক্ষ করেছিলাম। আসলে আমাদের সকল প্রকার পলিটিক্যাল পার্টি এবং দল-মত-সংস্থা-সংগঠনই এই বিভাজনের ওপর দাঁড়ানো। কয়েক হাজার বছরের হুকুমতন্ত্রের আর কর্তৃত্বতন্ত্রের সাধনা আমাদেরকে হয় দাস না হয় তো দাস-মালিক হওয়ার দিকে ঠেলে দেয়। আমাদের আজীবনের আদতে সামরিক দীক্ষায়নের সমাজ-রাজনীতি-প্রশিক্ষণ আমাদেরকে এ বস্তুটিকে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক বস্তু বলে প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নিতে শেখায়। আর যে প্রশ্ন তোলে, নিজের মতো করে পথ খুঁজতে চায়, সকল মানুষের সমমর্যাদার স্বাভাবিক সত্যে বিশ্বাস করে তাকে উপাধি দেয় 'বেয়াদব'। কর্তৃত্বগিরির দূষিত বাতাসে আক্রান্ত পরিবার-বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছ থেকে সযত্নে লুকিয়ে রাখে এই সত্য যে মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস এক অর্থে বেয়াদবিরই ইতিহাস। (যেমন ধরুন গ্যালিলিওর চেয়ে বড় বেয়াদব কে ছিলেন?)

তো সমস্যাটা তাহলে আন্তরিকতার নয়। আমাদের পরিচিত মৌমাছির উপনিবেশগুলোতে 'রাণী-মৌমাছি' যেমন আন্তরিক, 'দাস-মৌমাছি'ও তেমনই আন্তরিক। এ বটে আন্তরিক দাসপ্রথা – মানতেই হবে। কিন্তু এও আমাদের জানা থাকা দরকার যে দাসত্ব-রাজত্বের প্রচল-প্রণালী মৌমাছি-জাতির জন্য প্রাকৃতিক বাধ্যতা নয়, চিরস্থায়ী নিয়তি নয়। এমন অনেক মৌমাছি-প্রজাতি আছেন যাঁরা দাসতন্ত্র-রাজতন্ত্রের সীমার বাইরে পথ খোঁজেন[১]। তাহলে মানুষের জেনেটিক

১ নিয়ে ইন্টারেস্টিং সমাজ-জীববৈজ্ঞানিক গবেষণা-আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে: অ্যান্ড্রু ব্যারন প্রমুখ, ২০০১; অ্যান্ড্রু ব্যারন এবং বেঞ্জামিন অলড্রয়েড, ২০০১; বি. পি. অলড্রয়েড প্রমুখ, ২০০১; ম্যাডেলিন বিকম্যান প্রমুখ, ২০০১; এবং ম্যাডেলিন বিকম্যান এবং বেঞ্জামিন অলড্রয়েড, ২০০১।

গড়নটা যে নিয়তিগতভাবে আন্তরিক পরাধীনতা-প্রথার নয় সে প্রশ্নে কি আমাদের কোনো দ্বিধা আছে? শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত অর্থে পূর্বনির্ধারিত, চির-অনতিক্রম্য নিয়তি বলে কিছু নাই। আমরা এবং মৌমাছিরা চাইলে নেজেদের মতো করে পথ খুঁজতে পারি, খোঁজার কথা ভাবতে পারি। স্রেফ এই ভাবনাটুকু পর্যন্ত আমাদের জিন-কোষে সঞ্চিত হয়ে বিদ্যমান অপরাজনীতি ও অপপ্রচারমাধ্যমের অপব্যবসায়ীরা সকলেই আন্তরিক। প্রতিটা খুনীই খুন করে আন্তরিকভাবে। না হলে সে ধরা পড়ে যাবে। সমস্যাটা তাই আন্তরিকতার নয়, যেনতেন প্রকারের যুক্তি-বৈধতা খাড়া করার নয়। সমস্যাটা উপায়-প্রণালী-পদ্ধতি-তরিকার। হাজার হাঁটাহাঁটি করলেও আমরা উড়তে পারব না। ওড়ার তরিকা আলাদা। তার জন্য ভিন্ন উপায়। যদি আমরা চাই সমাজকে জাগাতে তাহলে সমাজ-সংগঠনের বিন্যাস বদলাতে হবে। সামাজিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সমাজের অজস্র মানুষকে সমঅংশীদার করতে হবে। ভবিষ্যতের সমাজের মানুষদেরকে যদি আমি সক্ষম-সৃজনশীল-সংহতিপরায়ণ দেখতে চাই, তাহলে তার জন্য আমাদেরকে এখন থেকেই সক্ষম-সৃজনশীল-সংহতিপরায়ণ সংগঠনপ্রণালীতে চলার চেষ্টা করতে হবে। সক্ষম-সৃজনশীল-সংহতিপরায়ণ ব্যক্তির বিকাশ ছাড়া তো আর সক্ষম-সৃজনশীল-সংহতিপরায়ণ সমাজের বিকাশ ঘটবে না। এটা কাণ্ডজ্ঞান মাত্র।

তাহলে আমাদেরকে এমন সমাজ-সংগঠন-প্রণালীর কথা ভাবতে হবে যাতে করে ব্যক্তির ঐ ধরণের বিকাশ ঘটতে শুরু করে এখন থেকেই। এখন আমি চাইব ব্যক্তিরা সব আনুগত্যপরায়ণ, পদলেহী, অপ্রশ্ন-অনুসারী হয়ে চলুক কেননা এখন পরিস্থিতি ভালো না, আর ভাবব ভবিষ্যতে পরিস্থিতি ভালো হলে ব্যক্তি-মানুষরা সব স্বনির্ভর, আত্মমর্যাদাপ্রবণ, সপ্রশ্ন-পথাভিসারী হয়ে উঠবে তাহলে হয় আমরা আত্মঘাতী প্রক্রিয়া নিয়োজিত আছি, না হয় তো আসলে আমি কর্তৃত্বপরায়ণ একটা গড্ডলপ্রবাহিত সমাজের কথাই ভাবছি আসলে যে সমাজে ভালো মানুষ বলতে বোঝাবে অনুগত, অনুসারী, বিনাপ্রশ্নে-মেনে-চলা মানুষ যে লেফটরাইট করা ছাড়া আর তেমন কিছু করবে না। আর শ্রেষ্ঠ মানুষ বলতে বোঝাবে এমন মানুষ যাঁরা দক্ষ হাতে অন্য মানুষদের পিপিলীকা-প্রবাহকে পরিচালনা করতে সক্ষম। কিন্তু সৈনিকের মতো সারিবদ্ধ মানুষ কিংবা সেনাপতির মতো হুকুমদার মানুষ উন্নত-সক্ষম-সৃজনশীল-স্বাধীন-সংহতিপরায়ণ ব্যক্তি-মানুষের মঙ্গলময় নজির নন।

বন্ধু ফারুক ওয়াসিফ এক্কেবারে ঠিক কথাটা টুকে রেখেছিলেন: শাহবাগ-আন্দোলনের ছিলেন একটাই ইমাম – শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। সেই ইমাম মঞ্চ-মাইক-মুখপাত্রদের মতো মিডিয়া-মুরুব্বি বেষ্টিত কৃত্রিম ইমাম নন। নিকষ অন্ধকার স্রেফ নিজের আত্মার আগুন জ্বেলে পথ খোঁজার অভিযাত্রী-অগ্রপথিক

নেতা[২]। এ নেতা ন্যাচারাল লিডার। আমলাতান্ত্রিক কমিটির নেতা নন তিনি। এ নেতা একাত্তর-পূর্ববর্তী বাংলাদেশের অবিসম্বাদিত অগ্রপথিক শেখ মুজিবর রহমানের মতো নেতা। গোটা দেশের মানুষ যার সাথে সাথে হাঁটতে পারেন নিশ্চিন্তে। অনায়াসে। সহযাত্রীর মতো। বঙ্গবন্ধু বা শহীদ জননী আর আসবেন না। আমাদেরই প্রত্যেককে হয়ে উঠতে হবে একেক জন ন্যাচারাল লিডার।

৩৪.৬ আমরা ঠিকমতো চাইলে আবারও জেগে উঠতে পারে শাহবাগ-আন্দোলন

বাস্তবকে স্বীকার করার মতো সাহস থাকতে হবে আমাদের। আমাদের শাহবাগ-আন্দোলন হারিয়ে গেছে। হ্যাঁ, স্বীকার করতে আজ দ্বিধা নেই – কোকিল চলে গেছে। কিন্তু এ-ও তো সত্য যে থেকে গেছে তার মধুর যুগান্তর-ধ্বনি, কালান্তরের আওয়াজ। ফিরে আসবে আসবে শাহবাগ। যদি আমরা আবার তাকে ডেকে আনতে পারি। ডাকতে পারি বুঝেশুনে। নিশিরাতের সত্যিকারের স্বপনে সে প্রাণকোকিলার গান যাঁরা এখনও শুনতে পাচ্ছেন তাঁরা আবার সমবেত হবেন বৈকি। নতুন প্রস্তুতি নিয়ে। আরো বেশি আনন্দ নিয়ে। ব্যর্থতাই সাফল্যের চাবিকাঠি। কেন আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম তা যদি আমরা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করতে পারি, শুধুমাত্র তাহলেই সেসব সীমাবদ্ধতার উত্তরণ ঘটানো সম্ভব। আর কোনো উপায় নাই।

আমাদেরকে বুঝতে হবে: সরকারী স্পন্সরশিপে গণআন্দোলন হয় না। ফটোজেনিক-মিডিয়াজেনিক শোবিজ হয় বড় জোর। স্রেফ সমালোচনা-পর্যালোচনা দিয়েও গণআন্দোলন হয় না। তার জন্য লাগে উপযুক্ত, স্বাধীনতাশীল সংগঠন-প্রণালী। উপযুক্ত সংগঠন-প্রণালী থাকলে সমালোচনা-পর্যালোচনা-প্রকাশনা বদলে দিতে পারে ক্ষমতাওয়ালাদের ছককষা হিসেবনিকেশ। নেতৃত্বের একক কেন্দ্র বানাতে গেলে ভণ্ডুল হয় যায় সব। বহুস্বর, বহুমত, বহুকেন্দ্রই হবে আগামী দিনের গণআন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শতকেন্দ্রী শতধারার আন্দোলন লাগবে আমাদের যদি আমরা জনসমুদ্র রচনা করতে চাই পুনরায়। শাহবাগ-সমাবেশকে শিখতে হবে অকুপাই থেকে। নতুন ধারার আন্দোলনের জন্য চাই নতুন ধারার সংগঠন কাঠামো। স্বাধীন ও আত্মনির্ভর আত্মসংগঠন গড়া শিখতে হবে। এ ধরনের সংগঠনই গত দুই দশক জুড়ে বৈশ্বিক ন্যায়বিচার আন্দোলন, কর্পোরেট বিশ্বায়নবিরোধী আন্দোলন, সিয়াটলের আন্দোলন, অকুপাই-মহাআন্দোলনের মতো আন্দোলনগুলো গড়ে তুলতে পেরেছে। এগুলোকে বলে আন্দোলনসমূহের

---

২ নেতা = যিনি নীতিপথে হাঁটেন। কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী প্রণীত বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ।

আন্দোলন – মুভমেন্ট অফ মুভমেন্টস। এসব আন্দোলনের বটবৃক্ষের তৃণমূলে থাকে ৫ থেকে ১৫/২০ জনের একেকটা স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বপরিচালিত কোষ-সংগঠন। এইসব কোষ-সংগঠনের গঠনপ্রণালী নিয়ে আমি শাহবাগ-জাগরণের ভরা জোয়ারের দিনগুলোতে আলোচনা করেছি। এখান তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবো না। এরকম অজস্র সংগঠনের শত-হাজারটা নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলে বিকেন্দ্রায়িত সামাজিক শক্তির বিশালকায় জৈব শক্তি। এ জিনিস এস্তেমাল করার জন্য সারাদেশে শত শত ওয়ার্কশপ-আড্ডায় বসতে হবে আমাদেরকে। পড়তে হবে, বলতে হবে, ভিডিও দেখতে হবে। পরস্পরের কাছ থেকে হবে শিখতে।

শাহবাগ-আন্দোলনের প্রকৃত প্রাণপ্রবাহ স্বাধীনতার পথে। শাহবাগের স্বাধীনতাই শাহবাগের পথ। শাহবাগ-আন্দোলনের স্বাধীনতার স্পৃহাই আমাদের মুক্তির রাস্তা। এই মুক্তির কোনো শর্টকাট নাই। যাবতীয় নেতা-খেতা-হুজুর-বৈজ্ঞানিক-রাজবুদ্ধিজীবীদের আইন-কানুন-নির্দেশনা ও মুরুব্বিগিরির বাইরে এসে যদি আমরা স্ব-উদ্যোগে, স্ব-অধীনভাবে, স্ব-ইচ্ছায়, পৃথক পৃথক সত্তা-পরিচয় বজায় রেখে সক্কলে মিলে একটা আমব্রেলা-আন্দোলন-সংস্থা গড়ে তুলতে পারি পুনরুজ্জীবন ঘটবে শাহবাগের। আমরা যদি স্বাধীনতার যোগ্য হয়ে উঠি তবেই আমরা শাহবাগ-আন্দোলনের সুপ্ত-প্রচ্ছন্ন আত্মাকে আবার জাগিয়ে তুলতে পারব, দিই দিন আগে কিংবা পরে। মুক্তি কখনও আপনাআপনি আসে না। একদিন সত্যের ভোর আসবেই বলে গান গাইলেই সত্যের ভোর আসে না। দেশব্যাপী নিবিড়, দীর্ঘমেয়াদী সাংগঠনিক কাজ করতে হয় অনেক মানুষকে। সেকাজে আমরা যদি ব্যর্থ হই তাহলে শাহবাগ-আন্দোলন স্থায়ী একটি জাদুঘর-মঞ্চে পরিণত হবে। গুটিকতক রাজাকারের ফাঁসি শেষে সেই মঞ্চ বাড়ি ফিরবে খালি হাতে ফাঁসির দড়াদড়ি ঘাড়ে নিয়ে। কেউ কেউ মন্ত্রীত্বের মালাও পাবেন হয়ত দুই দিন আগে কিংবা পরে। বাংলাদেশের মানুষকে তখনও তার মুক্তির পথ খুঁজে যেতে হবে। প্রজন্মান্তরে। নবতর সেই প্রজন্মের জন্য শাহবাগ রেখে গেছে অজস্র কবিতা-গান-চিত্রকলা-নাটক-কারুকার্য। সে রকম একটা কবিতায় যে রাজনৈতিক রূপকল্প মূর্ত হয়ে উঠেছে অকুপাই-আন্দোলনের ধারায় তা শুধু অনাগত প্রজন্মের জন্যই বা শুধু কেন সামনের দিনগুলোর যেকোনো দিনে আবৃত্তি করে উঠতে পারে যে ধরণের কবিতা তা পড়ে শোনানোর মধ্য দিয়ে শেষ করব এই আলোচনা:

আমি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ –
তোমরা সংসদ ছেড়ে চলে যাও।
আমি গাইবান্ধার জলো বিল থেকে এসেছি-এই দ্যাখো আমার পায়ে কাদা।

আমি বরিশালের কীর্তনখোলা এসেছি-এই দ্যাখো আমার হাতে বৈঠা।
আমি দিনাজপুরের ধান ক্ষেত থেকে এসেছি-এই দ্যাখো আমার হাতে কাস্তে।
আমি কানছাটের মিছিল থেকে এসেছি-এই দ্যাখো আমার চোখে আগুন।
আমি চিলমারি, ভবদহ, নড়াইল, লক্ষ্মীপুর, ভোলা, রাঙ্গামাটি, জয়পুরহাট,
শ্যামনগর, মৌলভিবাজার, লাঙ্গলবন্দ থেকে এসেছি
আমি সমগ্র বাংলাদেশ থেকে এসেছি।

তোমরা এখনই, এই মুহূর্তে, অনতিবিলম্বে –
আবাসিক এলাকা, ক্যান্টনমেন্ট, সেক্রেটারিয়েট, বিশ্ববিদ্যালয়,
খাদ্যের গুদাম, অস্ত্র-কারখানা, হাইকোর্ট, ব্যাংক, শপিংমল
উদ্যান, উপাসনালয় ছেড়ে পালিয়ে যাও।
আমি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ –
তোমরা সংসদ ছেড়ে চলে যাও।

কোনো দাবি-দাওয়া নয়
বৈঠক নয়
সংলাপ নয়
স্মারকলিপি নয়
করমর্দন নয় –

পরাজিত হবার পর শত্রু যেভাবে হাত উচু করে থাকে
সেইভাবে
ধরা পড়ার পর চোর যেভাবে মাথা নিচু করে থাকে
সেইভাবে
সহসা আবির্ভূত ক্ষিপ্র চিল দেখে ইদুর যেভাবে ছুটে পালায়
ঠিক সেইভাবে
তোমরা সবকিছু ছেড়ে পালিয়ে যাও।
তোমরা সংসদ ছেড়ে চলে যাও।

তোমাদের ফ্রিজ, কালার টিভি দাও
আমার চাল-ডাল লাগবে।
তোমাদের ওয়ার্ডরোব, সোফাসেট দাও

আমার কাপড় লাগবে।
তোমাদের কসমেটিক্স, পারফিউম দাও
আমার ওষুধ লাগবে।
তোমাদের হেগেল, রবীন্দ্রনাথ দাও
আমার বর্ণ পরিচয় লাগবে।
তোমাদের অস্ত্র গুলো দাও
আমার কোদাল,শাবল লাগবে।
তোমাদের মন্ত্রণালয়গুলো দাও
আমার গোয়াল লাগবে।
তোমাদের সংবিধানের কাগজগুলো দাও
আমার শৌচাগারে লাগবে।
আমি উড়ে এসে জুড়ে বসিনি।
তোমাদের আর্য-স্পর্ধার আগে কয়েক সহস্রবার আমি জন্মেছি এখানে।
অশোকের তাম্র-শাসনের সময় আমি ছিলাম একজন ছুতোর মিস্ত্রি।
বঙ্গ-পুন্ড্র-বরেন্দ্র-সমতট-হরিকেল যুগপতভাবে আমার রক্তে প্রবাহিত।
চর্যাপদের বাদামী পাতাগুলো আমার বাড়ির তাতে বানানো।
বখতিয়ারের ঘোড়া ছুটে গিয়েছিল আমার ক্ষেতের উপর দিয়ে।
তেভাগার ঘাঁ এই দ্যাখো এখনো লেগে আছে আমার হাঁটুতে।
তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজের কামানের গোলা এসে লেগেছিল
আমার পাঁজরে।
আমি এখনো সোজা হয়ে দাড়াতে পারিনি।
আমি উড়ে এসে জুড়ে বসিনি।

তোমরা এখনই, এই মুহূর্তে, অনতিবিলম্বে –
সংসদ ছেড়ে চলে যাও।

কোনো দাবি-দাওয়া নয়
বৈঠক নয়
সংলাপ নয়
স্মারকলিপি নয়
করমর্দন নয় –

পরাজিত হবার পর শত্রু যেভাবে হাত উচু করে থাকে
সেইভাবে
ধরা পড়ার পর চোর যেভাবে মাথা নিচু করে থাকে
সেইভাবে
সহসা আবির্ভূত ক্ষিপ্র চিল দেখে ইদুর যেভাবে ছুটে পালায়
ঠিক সেইভাবে
তোমরা পালিয়ে যাও।

তোমরা ব্যঞ্জনা বোঝো
কথা বোঝো না?
বিমূর্ত বোঝো
আক্ষরিক বোঝো না?
প্রযুক্তি বোঝো
গননা বোঝো না?

আমি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ –
তোমরা সংসদ ছেড়ে চলে যাও।[৩]

রচনা: ১৯শে জানুয়ারি ২০১৪। কুমিল্লা সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৪-র একটা সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত এবং উৎসব-স্মরণিকায় মুদ্রিত। দৈনিক বণিক বার্তা: ৮ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

৩ জাহিদ আকতার। 'আমি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ – তোমরা সংসদ ছেড়ে চলে যাও'। ২৬শে মার্চ ২০১৩

মতাদর্শ নয়– পথ

Painting by Sohel Nadeem Rahman

৩৫.১ মতাদর্শের চক্করে বাংলাদেশ

অন্ধ-বিশ্বাস আর অন্ধ-অবিশ্বাসের চক্করে পড়েছে বাংলাদেশ। নতুন করে। এর কারণ মতাদর্শের মোহ। মুক্তচিন্তা, মুক্ত-পর্যালোচনা এবং মুক্তপ্রকাশের পথে বিপুল বিক্রমে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, নানা প্রকার ধর্ম-রাজনৈতিক গোষ্ঠী, এবং তাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যপ্রবণ নানান মহল। সব গোষ্ঠীই নিজের নিজের একটা করে অভ্রান্ত মতাদর্শ দাঁড় করিয়ে বাকি সবাইকে আদর্শ-বহির্ভূত জ্ঞান করছে – রাষ্ট্রের নামে, ধর্মের নামে, মুক্তিযুদ্ধের নামে, নানাবিধ জাতীয়তাবাদের নামে। এমনকি আমাদের বহু সাধের, অনেক স্বপ্নের প্রজন্ম-চত্বরও আস্তে-ধীরে আটকে পড়েছে মতাদর্শের জলাবদ্ধতায়। তার মতাদর্শ হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগ। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সম্প্রতি এলোমেলো করে লিখে রাখা কিছু কথা, চিন্তার কিছু টুকরা এক জায়গায় জড়ো করে রাখা দরকার বলে মনে হচ্ছে।

৩৫.২ মতাদর্শের মোহ

মতাদর্শের নাম আপনি যা-ই দেন না কেন, ওটা আসলে কোনো না কোনো প্রকারের কর্তৃত্বতন্ত্রই বটে। কোনো মতাদর্শই মনে করে না যে মানুষ নিজেই নিজেদেরকে পরিচালনা করতে পারে। কোনো মতাদর্শই মনে করে না স্ব-অধীনতা, স্বাধীনতা, স্বশাসন বা ব্যক্তি-সামাজিক আত্মকর্তৃত্ব দিয়ে সমাজ-সম্প্রদায় ভালোভাবে চলতে পারে। মতাদর্শের জন্য তাই দরকার পড়ে মহান রাখাল। মতাদর্শিক রাখালতন্ত্র মানব-সমাজকে স্রেফ একটা ভেড়ার পাল বলে গণ্য করে। আপনার মহান মতাদর্শের নাম আপনি দিতে পারেন গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্মতন্ত্র মঙ্গলতন্ত্র কল্যাণতন্ত্র কিংবা বিজ্ঞানতন্ত্র। আপনার যা খুশি। আপনার যেমন দরকার তেমন। কিন্তু ঘটনা হলো, আপনি আসলে ঐ মতাদর্শের 'শুদ্ধতার' জোরে বসতে চাচ্ছেন ক্ষমতায়। আপনি চাচ্ছেন ঐ মহাশুদ্ধ মতাদর্শটির 'সঠিক' বা 'বৈজ্ঞানিক' বাস্তবায়ন। এবং আপনার বিশ্বাস সিংহাসনে আরোহন না করে কোনো প্রকার কল্যাণতন্ত্রই আপনি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। শাসক ছাড়া তাই মতাদর্শ নাই। এরই নাম শাসনতন্ত্র। এরই নাম বলপ্রয়োগতন্ত্র। এরই নাম মতাদর্শতন্ত্র।

মতাদর্শের জন্য লাগে ট্রেনিং। ট্রেনিং আমাদের পিছু ছাড়ে না। অসীম শক্তি-সম্ভাবনাময় মনুষ্যসন্তানকে বনসাই করে রাখার চেষ্টা বহু কালের। গুটিকয় মানুষের হুকুম মোতাবেক গোটা একটা কওম-কমিউনিটি-রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। কোটি কোটি লোক নিজেরাই ভাববেন যে তাঁরা নিজেরা নিতান্ত অযোগ্য, অক্ষম। তাঁরা ছোট মানুষ। তাঁদের কাজ হলো স্রেফ যোগ্য নেতাটাকে খুঁজে বের করা। সেই নেতার বন্দনা -মূলক পালা-কীর্তন রচনা করা। আর নেতা-হুজুর-বিশেষজ্ঞ-বসের হুকুমতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। কেননা তাতেই মঙ্গল। তাতেই কল্যাণ। দাসত্বেই শৃঙ্খলা। দাসত্বেই মুক্তি।

বন্দুকের জোর ছাড়া গুটিকয়ের শাসনতন্ত্র পরিচালনার কোনো উপায় নেই ঠিকই, কিন্তু এই যে কোটি কোটি মানুষ, অসীমের আত্মার আলো বুকে করে জন্মানো অগণন মানুষ – এঁরা যদি নিজেরাই নিজেদেরকে অক্ষম ভেবে কুঁই কুঁই না করে, তাহলে স্রেফ বন্দুক দিয়ে তো আর এই জনসমুদ্রকে পুকুর বানানোর কোনো বুদ্ধি নাই! মানুষ নিজেই নিজেকে গুটিকয় 'উন্নত' মানুষের তুলনায় 'বানর' বলে ভাববে – তা তো আর আপনাআপনি সম্ভব না! তারই জন্য লাগে বিস্তারিত ট্রেনিং। আজন্ম-আমৃত্যু প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ-দীক্ষায়ন-অনুসরণ। যাবতীয় নেতাতন্ত্র, হুজুর-তন্ত্র, হুকুমতন্ত্র টিকে থাকার জন্য তাই কমপক্ষে দুইটা জিনিস লাগে। এক হচ্ছে বন্দুক-বলপ্রয়োগ। আরেক হচ্ছে শাস্ত্র-দীক্ষায়ন-প্রশিক্ষণ। একদিকে চড়-থাপ্পড়-

জেল-জুলুম-খুনখারাবি। অন্য দিকে আদর-সোহাগ-শাস্ত্র-মন্ত্র আর জুজুবুড়ির ভয়। ছোট বেলা থেকে আমরা না জেনে না বুঝেই এগুলো শিখে আসি। এই শিক্ষা অব্যর্থ। এই শিক্ষা অবিরাম। কর্তাতন্ত্র মোক্ষম।

যখন আমরা আমাদের জাতিগোষ্ঠীশ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত মুক্তির কথা ভাবি তখনও তাই আমরা আজন্ম ট্রেনিঙের আছর থেকে মুক্ত হওয়ার কথা ভাবি না। ট্রেনিংটা যে আদৌ ট্রেনিং তা তো আমরা খেয়ালও করি না। প্রশ্নাতীত প্রশিক্ষণ মোতাবেক আমাদের কাছে তাই ন্যায়বিচার মানে প্রতিশোধ। তুমি আমার ভাইকে মেরেছ। আমি অথবা আমার গোষ্ঠী অথবা আমাদের সুমহান আইনের শাসন তোমাকে মারবে। আমাদের কাছে তাই যুদ্ধ মানেই শান্তি। যুদ্ধে 'ভয়াবহ' সব শত্রুদেরকে চির-পরাস্ত না করলে তো শান্তি আসবে না দেশে। 'লাল কমিউনিস্ট'দেরকে সমূলে বিনষ্ট করতে না পারলে গোটা পশ্চিমা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। 'ইসলামী সন্ত্রাসবাদী'দেরকে চিরতরে বিধ্বস্ত করতে না পারলে মনুষ্য-সভ্যতা বলে কিছু থাকবে না পৃথিবীতে। কিংবা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তিকে ফাঁসিকাঠে না ঝোলালে বাংলাদেশ বলে কিছু থাকবে না আর। এটা পাকিস্তান হয়ে যাবে (যদিও পাকিস্তান নিজেই ইদানীং 'পাকিস্তান' হিসেবে টিকে থাকতে হিমশিম খাচ্ছে। আবার ভারতের দালাল ও নাপাক-নাস্তিক 'আওয়ামী' শক্তিকে এই দেশ থেকে চিরতরে উৎপাটন না করলে বাংলাদেশ পরিণত হবে ভারতের অঙ্গরাজ্যে।

মতাদর্শ আদতে ভ্রান্তচেতনা। মিথ্যা চেতনা। ফল্‌স্ কনশাসনেস। কিন্তু শাসক-বৃন্দের দিক থেকে হিংসাকে জায়েজ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে অভ্রান্ত মতাদর্শের দোহাই। সঠিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার দোহাই। নির্মূল-বিনাশ-উৎপাটন ও হিংসাই কর্তাতন্ত্রের প্রাণভোমরা। এর এক নম্বর কথা হচ্ছে অসৎ, অযোগ্য, বেদ্বীন, প্রতিবিপ্লবী, মৌলবাদী কর্তা-নেতা-হুজুরদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে 'আমাদের' (অর্থাৎ সঠিক) মানদণ্ড মোতাবেক সৎ, যোগ্য, ধর্মপরায়ণ, বিপ্লবী ও প্রগতিশীল মুক্তিযুদ্ধের বা তৌহিদী জনতার সপক্ষের কর্তা-নেতা-হুজুরতন্ত্রকে ক্ষমতায় বসানো।

এই খায়েশ এমনকি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ভেতরেও ছিল। আশৈশব দীক্ষায়নের এই টনটনে ট্রেনিং আদি ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা-তন্ত্রের মধ্যেও ছিল। মার্কস-এঙ্গেলসদের মধ্যেও ছিল। এই ট্রেনিংতন্ত্র মানুষের ইনবিল্ট-বিচারবুদ্ধির ওপর আস্থা রাখে না। বরং মানুষের অন্তর্জাত-সহজাত বিবেক-বুদ্ধির বিশ্লেষণী ক্ষমতাকেই তার সবচে বড় ভয়। মতাদর্শ চায় মানুষ শিখুক মুখস্ত ভালোমন্দ। মতাদর্শ চায় মানুষ শুধু অনুকরণ করুক। অনুসরণ করুক। ঠেকে না শিখুক। ভুল করতে করতে না শিখুক। শুধু মেনে চলুক। অভ্রান্ত মতাদর্শের প্রশ্নাতীত শিক্ষাকে চিরকাল অভ্রান্ত মনে করুক। মানুষের কাজ

দাসত্ব করা। পুঁজে ভরা পুঁজি-প্রশিক্ষণের দাসত্ব অথবা দাম্ভিক বিজ্ঞানীর 'দাস ক্যাপিটাল'-এর দাসত্ব।

মতাদর্শ সবসময়ই মানুষের চেয়ে বড় মনে করে নিজেকে। 'মানুষ' বলতে মতাদর্শ কখনো তাজা, রক্তমাংশের ব্যক্তি-মানুষকে বোঝে না। 'মানুষ' বলতে মতাদর্শ বোঝে একটা বিমূর্ত ধারণাকে। কারণটা হলো: এই মুহূর্তে প্রাণবন্ত মানুষকে খুন না করে, তার ওপর দমনপীড়ন জোর-জবরদস্তি না করে, কোনো মতাদর্শই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। মতাদর্শ এসব জেলজুলুম-খুনখারাবি করে বিমূর্ত ভবিষ্যতের 'শুভ ও সুন্দর মানবসমাজ' প্রতিষ্ঠার নামে। আসলে যা সে করে তা হলো মতাদর্শের পুরুৎঠাকুরদেরকে শাসনক্ষমতায় বসানো। এই পুরুৎঠাকুর হতে পারেন বলশেভিক প্রতিবিপ্লবের মহামতি লেনিন-ট্রটস্কি-স্টালিনরা। এই পুরুৎঠাকুর হতে পারেন জেহাদি ইসলামের বিন-লাদেন বা আল-জাওয়াহিরিবৃন্দ। এই পুরুৎ-ঠাকুর হতে পারেন সেকুলার বিজ্ঞানতন্ত্রের অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিকবৃন্দ কিংবা গণতান্ত্রিক মালিক-শাসকপক্ষও। মতাদর্শ মানে তাই মারাত্মক মতিভ্রম। মতাদর্শ মানে তাই মুক্তিবিনাশী মোহ।

৩৫.৩ গুরু-গোঁসাই-গ্রন্থ এবং গুপ্তজ্ঞান প্রসঙ্গে

যেকোনো পাঠের একাধিক অর্থ থাকবেই। অর্থ নির্ভর করে বক্তার ওপরে নয়, শ্রোতার ওপর। কোনো গ্রন্থই এর ব্যতিক্রম নয়। মানুষের বিচার-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা দিয়েই মানুষকে তার জীবন ও জগৎ সম্পর্কে উপলব্ধি করতে হয়। কোনো টেক্সটেরই কোনো অনড় অর্থের দোহাই দেওয়ার মানে হয় না। জীবন-জগৎ অনড় নয়। সদাপরিবর্তনশীল। মানুষ তো মানুষ, অন্য প্রাণীরাও কোনো অনড় যান্ত্রিক শৃঙ্খল মেনে লেফটরাইট করে জীবনযাপন করতে পারে না। পশুপাখির জিন পর্যন্ত বদলায়। জিনের মিউটেশন হয়। জড় তো বদলায়ই।

একটা মাত্র গ্রন্থ দিয়ে পৃথিবীর তাবৎ কিছুকে ব্যাখ্যা করতে পারার দাবি কোনো মহাগ্রন্থই নিজে করে না। আমাদের লাগে অজস্র গ্রন্থ। অজস্র পাঠ। মানুষের জন্য শেষ বলে কিছু নেই। প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা-কৌতূহল-অনুসন্ধান ইত্যাদি প্রভৃতি সব বেতাল জিনিসপত্র দিয়েই মানুষ গড়া। মানুষের এই গড়নকে অস্বীকার করার মানে হয় না। সুতরাং ভালোবাসা-সহিষ্ণুতা-উদারতা-স্বাধীনতা-সংহতি-সৃজনশীলতা জাতীয় প্রাথমিকতম মানবিক মূল্যবোধগুলোর ওপর আস্থা রাখার চেয়ে ভালো কোনো বিকল্প আছে বলে মনে হয় না।

সত্য এক, কিন্তু তার প্রকাশ সীমাহীন ধরনের বিচিত্র। এটাই সত্যের স্বরূপ।

জগৎ একশিলা বা মনোলিথিক জিনিস নয়। বিচিত্র বিষয়ে ভরা। এটাই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সত্য। যিনি নিজে সত্য, সত্য শুধু তিনিই জানেন। কিন্তু কোনো এক বা একাধিক জনের জানাটাকেই 'চূড়ান্ত সত্য' বলে দাবি করতে গেলে জবরদস্তি আসে। জোর-জবরদস্তি করে মঙ্গল হয় না।

সত্যের কোনো সদাপ্রস্তুত ম্যানুয়াল নাই; রেডিমেড দণ্ডবিধি নাই। প্রত্যেককে তাঁর নিজের মতো করে আপন আপন জীবন-জগত-সমাজের সত্য উপলব্ধি করতে হয়। কোনো গুরু-গোঁসাই-গ্রন্থই কাউকে পূর্বনির্ধারিত কোনো সদা-সত্য-উপলব্ধি গিলিয়ে দিতে পারে না। আমি কোনো গোপন গুরুতন্ত্রে বিশ্বাস করি না। 'গুরু' কোনো আগাম-নির্দিষ্ট বা আমলাতান্ত্রিক বা কর্তৃত্বক্রমতান্ত্রিক পদ হতে পারে না। মানুষের অজস্র শিক্ষক থাকেন, গুরু থাকেন। মানুষ মানুষের কাছ থেকে শেখে। প্রকৃতি-জীবজন্তু থেকে শেখে। যা দেখা যায় না তা থেকেও শেখে।

শিক্ষার সার্থকতা আমলে-অনুশীলনে-চর্চায়। 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও'-এর চেয়ে ভালো কোনো পদ্ধতি আছে বলে মনে হয় না (দ্রষ্টব্য: কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত')। এ হচ্ছে শেখার এবং শেখানোর মুক্তিপরায়ণ তত্ত্ব। মুক্তিপরায়ণ শিক্ষাতত্ত্ব। শিক্ষার সার্থকতা শেয়ারিঙে। যত বেশি শেয়ারিং করা যায় ততই মঙ্গল। আমি আপনার কাছ থেকে শিখি। আপনি আমার কাছ থেকে শেখেন। বোঝাপড়া-শিক্ষা-উপলব্ধি একমুখী রাস্তা নয়। কিন্তু গুরুতন্ত্র একমুখী কর্তৃত্ব দাবি করে। এই দাবি প্রতিষ্ঠা পায় গোপন জ্ঞানের (গুপ্তধনের মতো গুপ্তজ্ঞানের) একচ্ছত্র মালিকানার ওপর।

সংগুপ্ত সত্যের, গুপ্তজ্ঞানের তত্ত্বে আমি বিশ্বাস করি না। সত্যকে গোপন রাখার কোনো মঙ্গলজনক যুক্তি আমার কাছে নাই। যা আমি ভালো বলে উপলব্ধি করেছি তার প্রকাশ্য অনুশীলনই আমার কাম্য। তার জন্য মূল্য দিতেও আমি প্রস্তুত। আবার, যাহা সংগুপ্ত তাহাই তো প্রকাশ্য। কে কীভাবে দেখছেন তার ওপর নির্ভর করে মাত্র। শাসনতান্ত্রিক/আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দিক থেকে দেখলে দেখা যায়, নানা ধরনের সত্যকে সিক্রেসি দিয়ে ঢেকে রাখে শাসকরা (দ্রষ্টব্য জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ, ২০০৬)। সিক্রেসি ছাড়া শাসন-তন্ত্র চলতে পারে না। কথিত 'গণ-তান্ত্রিক' শাসকদেরকে তো গোপনীয়তার সাংবিধানিক শপথ পর্যন্ত নিতে হয়। গুরুতন্ত্র তাই শাসনতন্ত্রই বটে।

গুরুতন্ত্রের গুরু আসলে কর্তৃত্বতন্ত্রের একচ্ছত্র কর্তা। (গুরুর ধারণা আদিতে একেবারেই আলাদা ছিল বলে আমার ধারণা। সেটা ছিল মাতৃতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটের সামাজিক ঘটনা। পরে এর মধ্যে পুরুষতন্ত্র এবং কর্তৃত্বতন্ত্র বাসা বেঁধেছে। এসব নিয়ে আরেক দিন কথা বলা যাবে।) গুরুতন্ত্র কায়েম করে গোপনীয়তাভিত্তিক কর্তৃত্বতন্ত্র।

গোপনীয়তা বলতে এখানে 'সিক্রেসি' বোঝাচ্ছি, 'প্রাইভেসি' নয়। দ্রষ্টব্য: বর্তমান লেখকের 'প্রাইভেসি কী বস্তু')। আদি, আসল ও সহি সত্যের মালিকানা দাবি করে গুরুতন্ত্র, যাজকতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র, প্রফেসরতন্ত্র, মোল্লাতন্ত্র, রাষ্ট্রতন্ত্র এবং যাবতীয় কর্তৃত্বতন্ত্র। এরকম মালিকানা দিয়ে মানুষকে চিন্তাদাসই বানানো যায় বড় জোর। গুরু ছাড়া, কর্তা ছাড়া, মালিক ছাড়া দাসতন্ত্র দাঁড়ায় না। আবার, দাস ছাড়া, গোলাম ছাড়া, আবাল-অনুগত অনুচর ছাড়া গুরুতন্ত্র-কর্তৃত্বতন্ত্র-মালিকতন্ত্র টেকে না। এ এক পরস্পরনির্ভর বা মিথোজীবিতাকেন্দ্রিক দ্বিমুখী প্রক্রিয়া: 'গোলাম মালিক খোঁজে, মালিক গোলাম' (কবীর সুমনের গান)।

আলাপ-আলোচনার ধারা যদি উন্মুক্ত হয়, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, সত্যের একচ্ছত্র মালিকানা দাবি করার দিকে ঝুঁকে না পড়ে, তাহলে যার যা বোঝার সেটুকু বুঝে নেওয়ার মতো অবকাশ তৈরি হয়। আমি যা বলি তা আমারই উপলব্ধি মাত্র। আমারই সত্য মাত্র। কিন্তু এই উপলব্ধিকে আমি সহি সত্য বলে, বা একমাত্র সত্য বলে দাবি করি না। যত কাল্লা তত আল্লা। যাঁরা একমাত্র সত্য বা চূড়ান্ত সত্য জানেন বলে দাবি করেন, তাঁরাই 'সত্যহীন'দেরকে শাসন করার, পরিচালনা করার 'যোগ্যতা' অর্জন করেন। তাঁরা লেনিনবাদী-লাদেনবাদী-লিবারালবাদী। আমার সংশয় হয়: আর যা-ই হোক, সত্য নিয়ে কারবার তাঁদের নয়। আমি অরাজপন্থার মানুষ। অরাজ আমার পন্থা; স্বরাজ আমার স্বভাব। আমি কাউকে পরিচালনা করি না, আমাকে পরিচালনা করার সুযোগও কাউকে দিতে চাই না। অন্যের কাছ থেকে নিরন্তর শিখি। আগ বাড়িয়ে শেখাতে যাই না। বাধ্যতামূলক কোনো শিক্ষাও গ্রহণ করি না অন্তরে।

৩৫.৪ তর্কবিতর্ক-পর্যালোচনার পদ্ধতি প্রসঙ্গে

কারো কারো কথায় অস্পষ্ট একটা ধারণা আমার মনে জন্মায়: গুরুতন্ত্র সম্পর্কে যাঁর সংশয় আছে তিনি আবার গুরু নিয়ে বা গুরুতন্ত্র নিয়ে আদৌ কথা তোলেন কোন যুক্তিতে? প্রশ্নকর্তা যেন কোনো অসঙ্গতির দিকে আঙুল তুলছেন বলে মনে হয়। যেন তিনি বলতে চাইছেন, যিনি নিজে বিবাহ করেছেন, তিনি আবার বিবাহ নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মুশকিল নিয়ে কথা বলেন কীভাবে? আলোচ্য বিবাহিত ব্যক্তিটি যেন এক প্রকার সুবিধাবাদী অবস্থান নিচ্ছেন এক্ষেত্রে।

এই ধারার সমালোচনা বা প্রশ্নের পেছনকার যুক্তিবোধ আমার কাছে স্পষ্ট হয় না। পরিবারপ্রথার সমস্যা নিয়ে কথা তুলতে গেলে আমাকে পরিবারবহির্ভূত হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হবে? কেন্দ্রীভূত কর্তৃপক্ষ (যথা বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামো বা রাজ-

নৈতিক দল) আমি পছন্দ করি না বলে এসব বস্তু নিয়ে কিছু বলাই যাবে না? রাষ্ট্রের বাইরে গিয়ে কথা বলতে হবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা প্রণালীর সমস্যা নিয়ে কথা বলা যাবে না? তার জন্য এই প্রশ্ন উঠবে যে: নিজে ঠিকই বিশ্ববিদ্যালয়-অধ্যাপনার সব সুযোগসুবিধা নিয়ে আবার বিশ্ববিদ্যালয়েরই বদনাম করা হচ্ছে? আবার, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নন, তিনি বিদ্যমান কর্তৃত্বপরায়ণ অধ্যাপনাতন্ত্র তথা বিদ্যা-বুরোক্র্যাসি নিয়ে কথা তুললে হয়ত বলা হবে, যিনি নিজে অধ্যাপক নন তিনি অধ্যাপনাতন্ত্রের ভালোমন্দ নিয়ে কী বোঝেন? এই সব প্রশ্ন-সমালোচনা বিদ্রুপ আসলে চিন্তার ও পর্যালোচনার মুক্ত-প্রকাশের পথে অন্তরায় মাত্র। প্রশ্ন-পর্যালোচনা চিন্তাভাবনার কোনো পূর্বশর্ত থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

আরেকটা মুশকিলও খেয়াল করছি। কোনো সামাজিক প্রপঞ্চ নিয়ে জিজ্ঞাসা-কৌতূহল-পর্যালোচনা হাজির করলে অনেকে প্রায় ধরেই নেন পর্যালোচক ঐ প্রপঞ্চটিকে 'মানেন না'। রাষ্ট্র নিয়ে কথা তোলা মানে আমি রাষ্ট্র মানি না। এর চেয়ে আজগুবি দৃষ্টিভঙ্গির কথা অনুমান করাও কঠিন। মানা বা না মানার তো প্রকৃত কোনো পর্যালোচনার বিষয়ই হতে পারে না। আমি আমার বিশ্বাসের কথা আমার ধারণার কথাটুকুই বলতে পারি মাত্র। সেটা কতটুকু ঠিক তা বাস্তব পরিস্থিতি-পরীক্ষণ-প্রয়োগ থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে মাত্র। 'মানি না' বললে অপ্রয়োজনীয় ধরনের মুখোমুখি একটা অবস্থা দাঁড়ানোর সুযোগ তো থাকেই, উপরন্তু সুযোগটা আমিই দিয়েছি বলে ভাবার অবকাশ থাকে। আমি আসলে সেটা চাই না।

আমি ঠিক তর্কবিতর্ক করতে চাই না। 'মানি না' বললে কেমন প্রতিবাদ প্রতিবাদ শোনায়। ইদানীং আমি আর বিবাদী-প্রতিবাদী হতে চাই না। স্রেফ বাদী হতে চাই। ইতির ওপর জোর দিতে চাই। নেগেটিভ এনার্জি খরচ করতে চাই না। এতে করে আমার মনের শান্তি অক্ষুণ্ন থাকে। বিবাদ-প্রতিবাদ করতে গেলে আমার অস্থির লাগে। ভালো লাগে না। নিজের বেলায় আমার মনে হয়, নিজের কথাটুকু যুক্তি-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গসহকারে বললেই তো হয়, অন্যের মতের প্রতিবাদ করার, কিংবা অন্যের মতের অসারতা প্রতিপন্ন করার কী দরকার আমার। আমি যদি কারো মতের প্রতিবাদ করতে চাই, কাউকে অসার প্রতিপন্ন করতে চাই, তাহলে তাঁকেও আমার মতটার প্রতিবাদ করতে, আমাকে অসার প্রতিপন্ন করতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তখন ক্যাচাল বাধে। ভালো লাগে না। ইদানিং আমি তাই নির্দিষ্ট কারো কোনো কথা ধরে কোনো আপত্তি তুলতে চাই না। আমার নিজের কথাটুকু জানিয়ে রাখি শুধু। আর অন্যেরা আমার কথা যদি কিছু বুঝে না থাকেন, এবং সেটা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি শুধু সেটুকুর একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে পারি। ব্যস্।

আর কিছু না।

আরেকটু ভেঙে বলা যাক। অন্যের সাথে আমার যা মেলে না তা নিয়ে এখন আমার আগ্রহ কাজ করে না। (যদিও সবসময়ই ভিন্নমতগুলোকে আমি নিজের মতো করে ধৈর্য নিয়ে বুঝতে চাই। ভালো করে বুঝতে চাই। ভাবি, আলাদা আলাদা মত তো থাকবেই। কোনো মানুষ নিজের মতামত নিয়ে খোলা মনে চিন্তার করার মতো মানুষ হলে তাঁর যা বোঝার তা ঠিকই বুঝে নেবেন। খুঁজে নেবেন। তবে যদি এমন হয় যে অমিলের জায়গাটা আমার মধ্যে প্রশ্ন বা কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে, তাহলে আমি তাতে আগ্রহী হয়ে উঠি। সে ক্ষেত্রে নিজেই ভাবি। খুঁজি। যদি দেখি যাঁর সাথে অমিল, তিনি কমবেশি খোলা মনের মানুষ, তাহলে তাঁকে প্রশ্ন করে করে আরো ভালো করে তাঁর ভিন্নমতটা বুঝে নিতে চাই। কিন্তু তাঁর সাথে তর্কে যাই না। যেতে চাই না। না যাওয়ার চেষ্টা করি অন্তত। সবসময় সফল হই না, বলা বাহুল্য। এ রকম অসফলতা আমার মনে অশান্তি সৃষ্টি করে।

আবার, অন্যের সাথে যা আমার মেলে তা নিয়ে আমি স্বস্তি পাই, যদি তিনি আমার বিবেচনায় যুক্তিশীল-বুঝদার-খোলামনা হয়ে থাকেন। তখন আগ্রহও পাই। ভাবি এ ব্যাপারে আরো কিছু জানাবোঝার সুযোগ হবে হয়ত। এক সাথে কাজ করার আনন্দ পাওয়ার অবকাশও তৈরি হবে হয়ত। এমনকি তাঁর মিথ্যা-মিথ্যা 'প্রতিপক্ষ' সেজে প্রশ্ন করে করে তাঁর মতটার পক্ষের (মানে এ ক্ষেত্রে আমারই মতের পক্ষের) যুক্তিগুলোকে আরো ঝালাই করে নেওয়া যাবে হয়ত। কিন্তু যাঁর সাথে আমার মিলল, তিনি যদি সেরকম মুক্তমনা মানুষ না হন বলে আন্দাজ করি, তাহলে অস্বস্তি হয়, বিব্রত বোধ করি, কথা বাড়াই না।

অনেকে আমাকে অনেক দিন থেকেই জানেন। তাঁরা বুঝবেন: আমার এসব উপলব্ধি খুব বেশি দিনের না। অতীতে আমি তর্কপ্রিয় ছিলাম। নানা জনের সাথে তর্ক করেছি। তুমুল তর্ক। শেষে দেখেছি ভালো লাগে না। মলিন হয় মন। মলিন মানে মলে আচ্ছন্ন। ভালো লাগে না সত্যি। ইত্যাকার অভিজ্ঞতা থেকে আমি এসব নিয়ে নতুন করে ভেবেছি। নতুন করে শিখেছি মনে হয়।

৩৫.৫ মতাদর্শের মোহ নয়, মুক্তিমুখীন পথ

মতাদর্শ এমন এক মহান ঘটনা, যা দিয়ে আপনি যেকোনো প্রতিপক্ষকে অবৈধ-অসিদ্ধ-অমতাদর্শিক প্রতিপন্ন করতে পারবেন। এ দিয়ে আপনি প্রতিপক্ষের ভালো কাজকেও নাপাক নাজায়েজ বলে চালিয়ে দিতে পারবেন। প্রতিপক্ষকে প্রয়োজন মতো আপনি রাষ্ট্রদ্রোহী, দেশদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী, গণতন্ত্রবিরোধী, সমাজবিরোধী,

মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করতে পারবেন। তারপর সেই উপাধির সম্মান রক্ষার জন্য আপনি এমনকি, আপনার সাধ্যমতো, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যেকোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারবেন। মতাদর্শ এমন এক মহান ঘটনা, যা দিয়ে আপনি নিজের যেকোনো কাজকে বিধিসিদ্ধ বা জায়েজ বলে চালিয়ে দিতে পারবেন। আপনার লাগবে শুধু একটা বলপ্রয়োগকারী বাহিনী, একপাল স্তাবক-বুদ্ধিজীবী, আর প্রচারণামাধ্যম।

সাধারণ যুক্তিবুদ্ধি, ইনবিল্ট-বিবেকবুদ্ধি, কিংবা তথ্যভিত্তিক ও অনুমান-পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণজাত বিচার-বিবেচনা নিতান্তই অবান্তর হয়ে পড়ে মতাদর্শের সামনে। সে দোহাই শুধু শাস্ত্রের। ধর্মগ্রন্থের। আইনের। সংবিধানের। মৃত অক্ষরের। ধর্মগ্রন্থ বা আইনসংহিতার অন্তর্ভুক্ত অক্ষরের স্বাধীন ও জীবন্ত পাঠ-অর্থ-ব্যাখ্যা তার জন্য বিভীষিকা। কার্ল মার্কসের বই পড়ে কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডিয়াম যে অর্থ নির্ধারণ করবে সেটাই হবে একমাত্র আদর্শ অর্থ, অর্থাৎ অনুকরণীয় অর্থ। এভাবে আজকের প্রেসিডিয়াম, পলিটব্যুরো, মজলিশে শুরা হয়ে উঠতে থাকে মধ্যযুগের চার্চ। যাজকতন্ত্র-হুজুরতন্ত্র-নেতাতন্ত্রই হয় মতাদর্শের মুরুব্বি। বাকিরা সবাই হবে নাবালক, অনুগত, অনুসরণকারী – এই হয় মতাদর্শের কামনা। স্বাধীন ব্যক্তি তার চরম অপছন্দ। মানুষ নিজেই নিজের মুরুব্বি হবে কেন? শাসক-মোড়ল-অভি-ভাবকের তাহলে কী হবে? চার্চতন্ত্র ছাড়া, শাসক-যাজকতন্ত্র ছাড়া শাস্ত্রের হেফাজত করবে কে? শাসক হয়ে হয়ে ওঠেন শাস্ত্রের মালিক। ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ঘোষিত বা অঘোষিত প্রতিনিধি। মুরুব্বি ছাড়া মতাদর্শ বাঁচে না। ঈশ্বরবিশ্বাসের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে শাসক-যাজক-মুরুব্বির প্রতি আস্থা।

মতাদর্শ টিকে থাকে হিংসার ওপর। হনন করিবার ইচ্ছার ওপর। প্রতিপক্ষকে দমন করবার আকাঙ্ক্ষার ওপর। প্রতিশোধপরায়ণতাই মতাদর্শের প্রাণ। মতাদর্শ টিকে থাকে মিথ্যার ওপর। বিমূর্ত বিচারে সত্য এক হলেও, তার মূর্ত প্রকাশ বহু-বিচিত্র। যেকোনো একটা বা একসেট প্রকাশকেই শুধু সত্য বলে ঘোষণা করলে তা মিথ্যার নামান্তর হয়। মতাদর্শ সত্যের বহুবিচিত্র, অনন্ত প্রকাশকে সহ্য করতে পারে না। নিজের বিবেচনাবোধ ছাড়া আর কারো বিবেচনাবোধের ওপর সে আস্থা রাখতে পারে না। অন্যকে সন্দেহ করাই তার কাজ। অন্যকে ভ্রান্ত মনে করাই তার কাজ। আত্ম-অনুসন্ধানের সাথে পরিচয় থাকে না মতাদর্শের।

মতাদর্শ মানেই চোখের ঠুলি। উল্টা-ইমেজ। ক্যামেরা-অবস্কিউরা। মতাদর্শ মানেই সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের মাতব্বরি। কোড অব কন্ডাক্ট। মতাদর্শ মানেই শাস্ত্র। শাস্ত্র চিরকাল শাসন-সাধনের উপায়-যন্ত্র-হাতিয়ার। মানুষের ওপর মানুষের শাসন আমার কাছে অগ্রহণযোগ্য। তা সে যে শাস্ত্র-মতাদর্শ-থিওক্রেসির দোহাই দিয়েই

চালানো হোক না কেন। মতাদর্শ লাগে যেহেতু শাসনের জন্য, মতাদর্শ মানে তাই শাস্তির ভয় এবং পুরস্কারের লোভ। এই সূত্রে মতাদর্শ মাত্রেই সম্ভাব্য দণ্ডবিধি। আল্লাহ মানুষকে বিচার-বিবেক-বিবেচনা যুক্তি-বুদ্ধি সহকারে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেছেন। কাউকে উত্তম কাউকে অধম হিসেবে পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুসারে মানুষ সৃজিত হয় নি। বাস্তবে মানুষ কী হবে, কেমন হবে তা নির্ভর করে ব্যক্তিক-জাগতিক-আত্মিক-মানসিক-আর্থসামাজিক অনেক কিছুর ওপর। আমার ধারণা, শাসন-প্রণালীর বদলে মানুষেরা নিজেরা-নিজেরা নিজেদের চালাতে পারে। অটোনমি-সংহতি-সৃজন-শীলতার ভিত্তিতে। স্বাধীন বোঝাপড়া ও স্বাধীন চুক্তি দিয়ে। এটাই আমার চোখে উত্তম পদ্ধতি। ইতিহাস ও বিবর্তন থেকে আমি এর নমুনা পাই। নিশানা পাই। আল্লাহর ইশারা পাই।

যেকোনো থিওক্রেসিই মতাদর্শ। মতাদর্শ নিজেকে বা নিজের কোনো অংশকে সম্ভাব্য-ভ্রান্ত বলে ধরে নিতে পারে না কখনোই। নিজেকে অভ্রান্ত ভাবাই মতাদর্শের লক্ষণ। এতে করে পথ রুদ্ধ হয়। শাসন পোক্ত হয়। মানুষের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। দাসত্বের সূচনা ঘটে। মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হতে থাকে। মানুষের অপমান হয়। খোদার ওপর খোদগারি করা হয়। আল্লাহর সর্বময়-সার্বভৌম ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হয়। শেরেকি করা হয়। আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করাই শেরেকি। তা সে রাষ্ট্রই হোক, পার্টিই হোক, বা কোনো মতাদর্শই হোক।

উদাহরণত বলা যায়, ইসলাম আমার কাছে মতাদর্শ নয়। বদ্ধতা নয়। আমার কাছে ইসলাম একটা পথ। পথ মানেই খোলা। পথ মানে উন্মুক্ত উদ্দেশ্য, এবং তা হাসিলের উন্মুক্ত উপায়। ইসলাম আমার কাছে অনেক পথের একটা পথ। একমাত্র পথ নয়। অবিকল্প অন্তরায় নয়। সকল পথই আল্লাহর তরফে। সকল পথই তাঁর উদ্দেশে। সব তরিকাই তাঁর তরিকা। যেকোনো পথেই হোক, হাঁটলেই তাঁকে পাওয়া যায়। আন্তরিকভাবে হাঁটলে। অনুসন্ধিৎসা নিয়ে হাঁটলে। জানবাজি-আত্মাবাজি ধরে হাঁটলে। পথিকের মতো হাঁটলেই শুধু ইঙ্গিত মেলে তাঁর। মুখস্ত আবৃত্তির চর্বিত-চর্বণে জগতসত্তাকে বোঝা যায় না। চেনা যায় না। নিজের কর্তব্যও নির্ধারণ করা যায় না অতএব।

পথ মানে বাঁধানো পথ নয়। পথিক মানে টিকেট-কাটা-প্যাসেঞ্জার নয়। আগে থাকতে শানবাঁধানো সড়ক তো রাজপথ স্রেফ। রাজার রাস্তা। শাস্ত্রের সড়ক। শাসকের সত্য। মানুষের পথ সদা-অনির্ধারিত। মানুষের সত্য ভুলে ভরা আবিষ্কার-সাপেক্ষ। পা এবং আত্মা রক্তাক্ত হওয়া সাপেক্ষ। মুসাফিরের পথই তাই পথ। বাকি সবই পথের নামে শাস্ত্র-মতাদর্শ-থিওক্রেসি আর দণ্ডবিধি। শয়তানের চোখ-মারা। ইবলিসের ইশারা। সেই ইশারায় ভড়কে গিয়ে ভুল-ঠিকের আত্মঘাতী ও আত্মরতি-

শীল মানদণ্ড বিনির্মান এবং সেই মানদণ্ডের ভিত্তিতে কল্পিত বেঠিকের বিনাশই মতাদর্শের দণ্ডনৈতিক কর্তব্য, শাস্ত্রীয় কর্মসূচি।

কিন্তু প্রকৃতিতে ভুল কোনো ফুল নেই। সব ফুলই পুষ্প। আমি তাই রামকৃষ্ণ পরমহংসের গলায় বলি: 'যত মত তত পথ'। সুফি সাধকদের জিকিরে আত্মা মিলিয়ে বলি: 'যত কাল্লা তত আল্লা'। এমনকি বন্দুকের নলকে সমস্ত ক্ষমতার উৎস হিসেবে গ্রহণ না করেও আমি চীনের কমরেড মাও সেতুঙের সাথে পথ হাঁটতে হাঁটতে বলি: 'শত ফুল ফুটুক, শত মত বিকশিত হোক', শত পথ উদঘাটিত হোক।

বিভিন্ন খসড়া: ১৭ই মে, ১৯শে মে, ১০ই জুন ২০১৩। আদি পরিমার্জনা: ১২ই সেপ্টেম্বর ২০১৩। সর্বশেষ পরিমার্জনা: ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৩। দৈনিক *বণিক বার্তা*: ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০১৩।

বইপত্রের হদিস

অ্যাডোর্নো এবং হোর্খেইমার, ১৯৪৪। Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, 'The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception' (pp. 94-136) in *Dialectic of Enlightenment : Philosophical Fragments*, Stanford University Press, Stanford, California, 2002 (Edited by Gunzelin Schmid Noerr, Translated by Edmund Jephcott).

অ্যানার্কোপিডিয়া, ২০০৮। *Anarchopedia*. International Workingmen's Association. www.en.anarchopedia.org/International_Workingmen's_Association. This page was last modified on 23 November 2008, at 09:41.

অ্যান্ড্রু ব্যারন এবং বেঞ্জামিন অলড্রয়েড, ২০০১। Andrew B. Barron and Benjamin P. Oldroyd (2001), "Social Regulation of Ovary Activation in 'Anarchistic' Honey-Bees (Apis mellifera) ", *Behavioral Ecology and Sociobiology*, Vol. 49, No. 2/3 (Jan., 2001), pp. 214-219, (Published by: Springer), Stable URL: http://www.jstor.org/stable/4071877.

অ্যান্ড্রু ব্যারন প্রমুখ, ২০০১। Andrew B. Barron, Benjamin P. Oldroyd and Francis L. W. Ratnieks (2001), "Worker Reproduction in Honey-Bees (Apis) and the Anarchic Syndrome: A Review ", *Behavioral Ecology and Sociobiology*, Vol. 50, No. 3 (Aug., 2001), pp. 199-208 (Published by: Springer), Stable URL: http://www.jstor.org/stable/460-1955.

অ্যামস্টার ও অন্যান্য, ২০০৯। Randall Amster, Abraham DeLeon, Luis A. Fernandez, Anthony J. Nocella II, and Deric Shannon. *Contemporary Anarchist Studies: An introductory anthology of anarchy in the academy*. London and New York: Routledge.

আজিজুল হক রাসেল, ২০০৭। বিতর্কিত সান্ধ্য-কোর্স বাতিলের দাবীতে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ধর্মঘট। ইউকেবেঙ্গলি। http://www.ukbengali.com/NewsMain/Archive NewsMain/MNews20070214.htm।

আন্টন পানেকুক, ১৯২০। Anton Pannekoek, *The new Blanquism*, From Collective Action Notes. Originally in *Der Kommunist* (Bremen), No. 27, 1920 http://libcom.org/library/new-blanquism-anton-pannekoek.

আন্টন পানেকুক, ১৯৩৬। Anton Pannekoek, "Party and class", http://marxists.org/archive/pannekoe/1936/party-class.htm.

আন্টন পানেকুক, ১৯৪৬। Anton Pannekoek, *Workers' Council*. The Dutch edition

was published as "De arbeidersraaden" by the Communistenbond Spartacus in Amsterdam in 1946 under the pseudonym P. Aartsz. The first English edition was published by J. A. Dawson in 1950. http://marxists.org/archive/pannekoe/1947/workers-councils.htm.

আন্টন পানেকুক, ১৯৭০। Anton Pannekoek, "Five Theses on the Class Struggle", The Mass Strike in France May-June 1968, Informations et Correspondance Ouvrieres (ICO), *Root and Branch Pamphlet* 3, July 1970, http://libcom.org/library/mass-strike-france-ico.

আবু সাইয়ীদ, ২০১৩। 'চলচ্চিত্রের দর্শকপ্রিয়তায় নির্মাতার দায়'। *ম্যাজিক লণ্ঠন*, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আরিফ রেজা মাহমুদ টিটো ও পার্থ প্রতীম দাস, ২০০৮। 'মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন: জরুরী পর্বের একটি জরুরী পাঠ ও বিবেচনা' (আরিফ রেজা মাহমুদ টিটো ও পার্থ প্রতীম দাসের মধ্যে সওয়াল-জবাব); *ওঙ্কার: ক্ষমতা, মিডিয়া ও সক্রিয়তা বিষয়ক চিন্তা-অনুশীলন প্রচেষ্টা* (মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন: জরুরি পর্ব সংখ্যা); রেজাউর রহমান, সারোয়ার হোসেন সুমন, মেহেদী হাসান প্রান্ত, মোহাম্মদ আলী রুবেল, রেজাউল পারভেজ, গোলাম রাব্বানী, আরিফ রেজা মাহমুদ, এবং রীমা পারভিন কর্তৃক সম্পাদিত; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৫ এপ্রিল ২০০৮।

আরিফ রেজা মাহমুদ টিটো, ২০০৮। 'আন্দোলনের কর্তৃত্ব-বিরোধী ধারা: ইশতেহারের মূল প্রস্তাবনা'; *ওঙ্কার: ক্ষমতা, মিডিয়া ও সক্রিয়তা বিষয়ক চিন্তা-অনুশীলন প্রচেষ্টা* (মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন: জরুরি পর্ব সংখ্যা); রেজাউর রহমান, সারোয়ার হোসেন সুমন, মেহেদী হাসান প্রান্ত, মোহাম্মদ আলী রুবেল, রেজাউল পারভেজ, গোলাম রাব্বানী, আরিফ রেজা মাহমুদ, এবং রীমা পারভিন কর্তৃক সম্পাদিত; রাবি; ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৫ এপ্রিল ২০০৮।

আহমদ রফিক, ২০১২। '২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩: নগ্নপদ প্রভাতফেরি', পৃষ্ঠা ৮, একুশের ৬০ বছর, বিশেষ সংখ্যা, প্রথম আলো, ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১২।

ইগনাটিয়াস জেসুডাসান, ১৯৮৭। Ignatius Jesudasan. *A Gandhian Theology of Liberation*. Gujarat Sahitya Prakash: Ananda India, pp 236-237. Originally a Ph.D. thesis in Marquette University, USA, 1980.

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, ২০১৩। "Preamble, Constitution, & General Bylaws of the Industrial Workers of the World". As Amended Through January 1, 2013. English PDF File. http://www.iww.org/about/official.

উইকিপিডিয়া, ২০১৩। "Direct Action". en.wikipedia.org/wiki/Direct_action. This page was last modified on 28 December 2013 at 01:11.

উইলিয়াম পল, ১৯১৭। William Paul. *The State: Its Origins and Functions*. The

Socialist Press, Scotland.

উমবার্তো ইকো, ১৯৬৭। Umberto Eco , "Towards A Semiological Guerrilla Warfare" (oroginally published in 1967), *Faith in Fakes: Travels in Hyperreality*, Minerva, 1986, Download link http://www.american-buddha.com/lit.toward semiologicalguerrilla.htm. http://www.kareneliot.de/downloads/UmbertoEco_TowardsaSemiologicalGuerrillaWarfare.pdf.

কলিন ওয়ার্ড, ২০০৪। Collin Ward. *Anarchism: A Very Short Introduction*. Oxford, UK: Oxford University Press.

কলিম খান, ১৯৯৫। মৌল বিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে। কলকাতা: হাওয়া ঊনপঞ্চাশ প্রকাশনী।

কলিম খান, ২০০১। পরমা ভাষার সংকেত: ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি ও ভাষাতত্ত্বের নতুন দিগন্ত। ঢাকা: প্যাপিরাস।

কার্ল কর্শ, ১৯১৯। Karl Korsch, "On Socialization," in Branko Horvat, Mihailo Marković, Rudi Supek (eds.), *Self-Governing Socialism*, Vol. One. New York: International Arts and Sciences Press. 1975.

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৮। 'লেনিন ও সাংবাদিকতা।' সংকলন ও অনুবাদ। কলকাতা: মনীষা গ্রন্থালয়।

কিউরিয়াস জর্জ ব্রিগেড, ২০০৩। The Curious George Brigade. *Anarchy in the Age of Dinosaurs* (http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy_in_the_Age_of_Dinosaurs). Written by the Curious George Brigade (http://en.wikipedia.org/wiki/Curious _George_Brigade), an anar-chist collective in the CrimethInc. network. Mosinee, Wisconsin 54455: Yellow Jack Distro, PO Box 244. Web: http://zinelibrary. info/files/anarchy-in-the-age-of-dinosaurs.pdf (accessed on 30 January 2013).

কে. জে. কেনাফিক, ১৯৪৮। Kenneth Joseph Kenafick. *Michael Bakunin and Karl Marx*. Printed by A. Maller, Melbourne, Australia. [Freedom Press, 1948.]

কেন ন্যাব, ২০০৬। Ken Knabb, "May 1968 Graffiti", *Situationist International Anthology*, Revised and Expanded Edition, Edited and translated by Ken Knabb, Bureau of Public Secrets.

গাই ডেবর্ড, ১৯৬৭। Guy Debord. *The Society of the Spectacle*. Translation: Ken Knabb, January 2005, Rebel Press.

গাজীউল হক, ২০১২। '২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২: আমতলা', পৃষ্ঠা ১, একুশের ৬০ বছর, বিশেষ সংখ্যা, *প্রথম আলো*, ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১২।

গুস্তাভ ল্যান্ডাওয়া (২০১০)। Gustav Landaur, *Revolution and Other Writings: A Political Reader*; Edited and translated by Gabriel Kuhn; Oakland, CA: PM Press.

চে গুয়েভারা, ২০০৮। *চে গুয়েভারার ডায়েরি*। ভূমিকা: ফিদেল ক্যাস্ত্রো, অনুবাদ ও সম্পাদনা: জাকির শামীম, ঢাকা: নালন্দা।

জি. এম. স্টেক্লফ, ১৯২৮। G. M. Stekloff. *History of The First International*. First published: in England 1928. Published: London, Martin Lawrence Limited. Translated: from the 3rd Russian edition, with notes from the 4th edition, by Eden and Cedar Paul. Printed: and made in England by the Dorrit Press, Ltd, London S.E.1. Transcribed: by Andy Blunden. Proofed: and corrected by Chris Clayton. Marxist Internet Archive. http://www.marxists.org/archive/steklov/history-firs t-international/.

জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ, ২০০৬। Julian Assange. "Conspiracy as Government". Posted originally in his blog IQ.org (http://iq.org/conspiracies.pdf) linking to *Cryptome* (cryptome.org/0002/ja-conspiracies.pdf).

জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ, ২০১২। Julian Assange (with Jacob Applebaum, Andy Muller-Maguhn and Jeremie Zimmermann). *Cypherpunks: Freedom and the Future of the Internet*. New York and London: OR Books.

জোশ ফাত্তাল, ২০০৬। Josh Fattal, 'Was Gandhi An Anarchist?', *Peace Power* (Berkeley's Journal of Nonviolence & Conflict Transformation), Volume 2, Number 1, Winter 2006.

জ্যাক র‍্যানসিয়া, ২০০৬। Jacques Ranciere, 'Our police oorder: What can be said, seen and done', Interview with Truls Lie in *Le Monde Diplomatique*, France.

ডেভিড গ্রেইবার, ২০০৪। David Graeber. *Fragments of an anarchist anthropology* (2nd pr. ed.). Chicago: Prickly Paradigm Press.

ডেভিড গ্রেইবার, ২০০৯। David Graeber. *Direct Action: An Ethnography*. AK Press.

ডেভিড গ্রেইবার, ২০১১-ক। David Graeber, "Origins of Occupy Wall Street and Prefigurative Politics", *The Daily Kos*, Oct 03, http://www.dailykos.Com/story/2011/10/03/1022528/-Origins-of-Occupy-Wall-Street-and-Prefigurative-Politics#.

ডেভিড গ্রেইবার, ২০১১-খ। David Graeber, 'Occupy Wall Street's Anarchist Roots', *Al Jazeera*, 'Opinion' section, 30 Nov.

ডেভিড গ্রেইবার, ২০১১-গ। Dabid Graeber, 'Situating Occupy', *Adbusters*, 2 Dec.

ডেভিড গ্রেইবার, ২০১২-ক। David Graeber, "The New Anarchists", *New Left Review*

13, Jan.-Feb. newleftreview.org/II/13/david-graeber-the-new-anarchists.

ডেভিড গ্রেইবার, ২০১২-খ। David Graeber, "The 'Cancer' In Occupy? An Anarchist Reponds", *The Occupied Wall Street Journal*, 3 June.

ডেভিড গ্রেইবার, ২০১৩। *The Democracy Project: A History, A Crisis, A Movement*. New York: Spiegel & Grau.

তলস্তয়, ১৯৩৭। Leo Tolstoy. 'Gandhi Letters'. Recollections & Essays by Leo Tolstoy. Oxford University Press.

তলস্তয়, ১৯৯০। Leo Tolstoy. *Government is Violence: Essays on Anarchism and Pacifism*. Edited by Savid Stephens. Phoenix Press.

নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০২ বঙ্গাব্দ। *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

নৈবেদ্য চট্টোপাধ্যায়, ২০০৭। 'আমেরিকার কারাগারতন্ত্র'। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত *নতুন দিগন্ত*, পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ঢাকা: সমাজ রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্র।

নোম চমস্কি, ১৯৭০। 'ভবিষ্যতের সরকার', 'নিউ ইয়র্কের যুবক-যুবতীদের হিব্রু সমিতি'র কবিতা-কেন্দ্রে ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত শ্রুতি-সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা, মূল অডিও: www.chomsky.info/audionvideo/19700216.mp3, বক্তৃতাটির ইংরেজি অনুলিখন: http://tangibleinfo.blogspot.com/2006/11/noam-chom। বঙ্গানুবাদ: সেলিম রেজা নিউটন। *মাওরুম*। ঢাকা।

নোম চমস্কি, ১৯৮৯। "Education as a system of indoctrination of the young". An excerpt of a 1989 lecture. Published in *Youtube* on 1 June 2012. https://www.youtube.com/watch?v=JVqMAlgAnlo.

নোম চমস্কি, ২০০০। http://www.chomsky.info/letters/20001210.htm "Propaganda and Indoctrination", *Znet*, 10 December.

নোম চমস্কি, ২০০৫। Noam Chomsky. *Chomsky on Anarchism*, Selected and edited be Barry Pateman. Edinburgh, Oakland and West Virginia: AK Press.

পার্থ প্রতীম দাস, ২০০৮। 'কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষার স্ব-দায়িত্ব'। *ওঙ্কার: ক্ষমতা, মিডিয়া ও সক্রিয়তা বিষয়ক চিন্তা-অনুশীলন প্রচেষ্টা* (মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন: জরুরি পর্ব সংখ্যা); রেজাউর রহমান, সারোয়ার হোসেন সুমন, মেহেদী হাসান প্রান্ত, মোহাম্মদ আলী রুবেল, রেজাউল পারভেজ, গোলাম রাব্বানী, আরিফ রেজা মাহমুদ এবং রীমা পারভিন কর্তৃক সম্পাদিত; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৫ এপ্রিল ২০০৮।

পিওতর ক্রপোৎকিন, ১৮৮৬। *Law and Authority*. London: William Reeves. New Temple Press.

পিওতর ক্রপোৎকিন, ১৮৮৭। *In French and Russian Prison*. London: Ward and Downey.

পিওতর ক্রপোৎকিন, ১৮৯৭। *The State: Its Historical Role*. London: Freedom Office (১৯০৮). বর্তমানে প্রচলিত ইংরেজি অনুবাদ: ভার্নন রিচার্ডস (ফ্রিডম প্রেস, লন্ডন, ১৯৬৯)।

পিওতর ক্রপোৎকিন, ১৯০২। *Organised Vengeance Called Justice*. London: Freedom Press.

পিওতর ক্রপোৎকিন, ২০০৯। 'কারাগার কি দরকারি?' (লন্ডন থেকে ওয়ার্ড অ্যান্ড ডাউনি কর্তৃক ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত *রুশী ও ফরাসি কারাগারে* গ্রন্থের সমাপ্তি-অধ্যায়, বাংলা অনুবাদ: সেলিম রেজা নিউটন) বিধান দাশগুপ্ত (সম্পা.), *অঞ্জলি*: শারদীয় ১৪১৬, ঢাকা: মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি।

পিটার মার্শাল, ২০০৮। Peter Marshall. *Demanding the Impossible: A History of Anarchism*. London, New York, Toronto and Sydney: Harper Perennial.

পিটার লাডলো, ২০০১। Peter Ludlow. *Crypto Anarchy, Cyberstates, and Pirate Utopias*. The MIT Press , Cambridge, Massachusetts , London, England.

পিয়েরে ক্লস্ত্রে, ১৯৮৯। Pierre Clastres. *Society Against the State: Essays in Political Anthropology*. Translated by Robert Hurley in collaboration with Abe Stein. New York: Zone Books .

পিয়েরে জোসেফ প্রুধোঁ, ১৮৪০। Pierre-Joseph Proudhon. *What is Property? Or, an Inquiry into the Principle of Right and Government*. Translated from the French by Benjamin R. Tucker. Dover, New York, 1970. (The Dover edition is an unabridged and unaltered republication of the English translation originally published by Humboldt Publishing Company in 1890.) http://www.gutenberg.org/cache/epub /360/pg360.txt.

ফরহাদ মজহার, ২০০১। 'দল বেঁধে পিটিয়ে ও কুপিয়ে মানুষ মারা'। বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম। জুলাই ১৯।

ফিগিস ও লরেন্স, ১৯০৭। "Letter to Bishop Mandell Creighton". 5Th April 1887. In *Historical Essays and Studies* edited by *J.N.* Figgis and R.V. Lawrence. London: MacMillan.

বি. পি. অলড্রয়েড প্রমুখ, ২০০১। B. P. Oldroyd, T. C. Wossler and F. L. W. Ratnieks (2001), "Regulation of Ovary Activation in Worker Honey-Bees (Apis mellifera): Larval Signal Production and Adult Response Thresholds Differ between

Anarchistic and Wild-Type Bees", *Behavioral Ecology and Sociobiology*, Vol. 50, No. 4 (Sep., 2001), pp. 336-370 (Published by: Springer), Stable URL: http://www.jstor.org/stable/4601977.

বিনয় ঘোষ, ১৯৯৯। *মেট্রোপলিটন মন-মধ্যবিত্ত-বিদ্রোহ*। ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা।

বিপ্রতীপ, ২০০৯। 'অন্ধকারে লণ্ঠনের আলো'। *আমার ব্লগ*। ১০ই আগস্ট। https://www.amarblog.com/index.php?q=biproteep/posts/75701.

ব্যারান প্রমুখ, ১৯৮৪। Barran et al. *Self, Symbols and Society: An Introduction to Mass Communication*. New York: Random House.

ব্রিটানিকা বিশ্বকোষ, ২০১৩। *Encyclopaedia Britannica*. First International. Retreived on the 5th December of 2013. http://www.britannica.com/Ebchecked/topic/290583/First-International.

ভল্টারিন ডি ক্লিরা, ১৯১২। Voltairine de Cleyre. "Direct Action". Anarchy Archives: An Online Research Center on the History and Theory of Anarchism. http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bright/cleyre/direct.html.

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, ১৯০৫। V. I. Lenin. "Party Organisation and Party Literature". Published: *Novaya Zhizn*, No. 12, November 13, 1905. Source: *Lenin Collected Works*, Progress Publishers, 1965, Moscow, Volume 10, pages 44-49.

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, ১৯৭১। *সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব*। মস্কো: প্রগতি প্রকাশন।

মাইকেল রাডেলেট এবং ট্রেসি লেইকক, ২০০৯। Michael L. Radelet and Traci L. Lacock, "Do Executions Lower Homicide Rates?: The Views Of Leading Criminologists", *The Journal of Criminal Law & Criminology*, (Copyright © 2009 By Northwestern University, School Of Law) Vol. 99, No. 2 , Printed In U.S.A.

মার্কস-এঙ্গেলস, ১৮৭২। Marx and Engels (1872). "Fictitious Splits in the International". Written by Marx and Engels between January and March 5, 1872. Adopted by the General Council of the International Workingmen's Association as a private circular. Published in Geneva 1872. Progress Publisher translation. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1872/03/fictitious-splits.htm#p1.

মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, ১৯৬৩। Martin Luther King, Jr. "Letter from Birmingham Jail", April 16, 1963. http://abacus.bates.edu/admin/offices/dos/mlk/letter.html.

মিখাইল বাকুনিন, ১৮৬৯। Mikhail Bakunin. "The Organization of the International". *Marxist Internet Archive*, http://www.marxists.org/reference

/archive/bakunin/works/writings/ch02.htm.

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩০। Mohandas Karamchand Gandhi, "Letter to Narandas Gandhi" (Tuesday morning, September 16, 1930), *The Collected Works of Mahatma Gandhi* (Electronic Book), VOL.50: 23 AUGUST, 1930 - 5 JANUARY, 1931, New Delhi, Publications Division of Government of India, 1999, in 98 Volumes.

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৩। Mohandas Karamchand Gandhi, "Five Questions on Varnadharma" (*Harijan Sevak*, 21-4-1933), *The Collected Works of Mahatma Gandhi* (Electronic Book), VOL. 60 : 10 MARCH, 1933 - 26 APRIL, 1933, New Delhi, Publications Division of Government of India, 1999, in 98 Volumes.

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-ক। Mohandas Karamchand Gandhi, "Interview to Nirmal Kumar Bose" (Interviewed: November 9/10, 1934). (Published first in The *Modem Review* and then reproduced in *The Hindustan Times*, 17-10-1935). *The Collected Works of Mahatma Gandhi*, Volume 65.

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-খ। Mohandas Karamchand Gandhi, "Speech at A.I.C.C. Meeting, Patnaĺ. (Published in The Bombay Chronicle, 20-5-1934 and 21-5-1934). *The Collected Works of Mahatma Gandhi, Volume 63.*

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৪৬। Mohandas Karamchand Gandhi, "Congress Ministries and Ahimsa", *Harijan Sevak*, 15-9-1946. (A translation of this was also published in Harijan, 15-9-1946). *The Collected Works of Mahatma Gandhi*, Volume 92.

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৯৯। Mohandas Karamchand Gandhi, T*he Collected Works of Mahatma Gandhi* (Electronic Book), New Delhi, Publications Division of Government of India, 1999, in 98 Volumes.

ম্যাডেলিন বিকম্যান এবং বেঞ্জামিন অলড্রয়েড, ২০০১। Madeleine Beekman and Benjamin P. Oldroyd (২০০৩), "Different Policing Rates of Eggs Laid by Queenright and Queenless Anarchistic Honey-Bee Workers (Apis mellifera L.), *Behavioral Ecology and Sociobiology*, Vol. 54, No. 5 (Sep., 2003), pp. 480-484 (Published by: Springer), Stable URL: http://www.jstor.org/stable/25063293.

ম্যাডেলিন বিকম্যান প্রমুখ, ২০০১। Madeleine Beekman, Stephen J. Martin, Falko Drijfhout and Benjamin P. Oldroyd (2007), "Higher removal rate of eggs laid by anarchistic queens—a cost of anarchy? ", *Behavioral Ecology and Sociobiology*, Vol. 61, No. 12 (October 2007), pp. 1847-1853 (Published by: Springer), Stable URL: http://www.jstor.org/stable/27823571.

রেজাউর রহমান প্রমুখ, ২০০৮। সম্পাদকীয়; ওঙ্কার: ক্ষমতা, মিডিয়া ও সক্রিয়তা বিষয়ক চিন্তা-অনুশীলন প্রচেষ্টা (মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন: জরুরি পর্ব সংখ্যা); রেজাউর রহমান,

সারোয়ার হোসেন সুমন, মেহেদী হাসান প্রান্ত, মোহাম্মদ আলী রুবেল, রেজাউল পারভেজ, গোলাম রাব্বানী, আরিফ রেজা মাহমুদ, এবং রীমা পারভিন কর্তৃক সম্পাদিত; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৫ এপ্রিল ২০০৮।

সেলিম রেজা নিউটন, ২০০৮-ক। 'কর্তৃত্ব কারাগার দেবরাজ'। অপ্রকাশিত রচনা।

সেলিম রেজা নিউটন, ২০০৮-খ। 'আইনের শাসন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ', *ওঙ্কার: ক্ষমতা, মিডিয়া ও সক্রিয়তা বিষয়ক চিন্তা-অনুশীলন প্রচেষ্টা* (মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন: জরুরি পর্ব সংখ্যা); রেজাউর রহমান, সারোয়ার হোসেন সুমন, মেহেদী হাসান প্রান্ত, মোহাম্মদ আলী রুবেল, রেজাউল পারভেজ, গোলাম রাব্বানী, আরিফ রেজা মাহমুদ, এবং রীমা পারভিন কর্তৃক সম্পাদিত; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৫ এপ্রিল ২০০৮।

সেলিম রেজা নিউটন, ২০০৮-গ। ''মঙ্গলগ্রহের আক্রমণ' শীর্ষক গবেষণার পর্যালোচনা: সমাজে মিডিয়ার প্রভাব সংক্রান্ত সরলপাঠের বিপদ''। *সোশ্যাল সায়েন্স জার্নাল*। চতুর্দশ সংখ্যা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। পৃষ্ঠা ১৫-২৯।

সেলিম রেজা নিউটন, ২০১০। *বিদ্রোহের সপ্তস্বর: বিডিআর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়*। ঢাকা: যেহেতু বর্ষা।

সেলিম রেজা নিউটন, ২০১১। 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার: প্রসঙ্গ শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি। *যোগাযোগ*। সংখ্যা ১০, জানুয়ারি ২০১১। পৃষ্ঠা ৯-৬৪।

সেলিম রেজা নিউটন, ২০১২। 'মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট: কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজতন্ত্রের প্রচ্ছন্ন রূপকল্প'। *দেশলাই*। ২য় সংখ্যা: শ্রাবণ ১৪১৯ আগস্ট ২০১২।

সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩-ক। 'ধর্ষণ বলপ্রয়োগ বলাৎকার'। দৈনিক *ইত্তেফাক*, 'খর বায়ু বয় বেগে' কলাম, 'দৃষ্টিকোণ' পাতা, ২৯শে জানুয়ারি।

সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩-খ। *নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য: এম. এন. রায়ের মুক্তিপরায়ণতা প্রসঙ্গে*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩-গ। 'বাংলা-বসন্ত: উদ্দেশ্য ও উপায়'। দৈনিক *ইত্তেফাক*, দৃষ্টিকোন পাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩-ঘ। 'জর্জ অরওয়েলের ১৯৮৪: তোমার দ্বেষ আমার দ্বেষ বাংলাদেশ বাংলাদেশ'। *প্রাইম খবর*, ৬ই মার্চ ২০১৩।

সেলিম রেজা নিউটন, ২০১৩-ঙ। 'রাজা এবং রাষ্ট্রের ধর্ম: দণ্ডনীতির উৎপত্তির গল্প'। দৈনিক *ইত্তেফাক*, 'খর বায়ু বয় বেগে' কলাম, 'দৃষ্টিকোণ' পাতা, ১৪ই মার্চ।

স্যার শঙ্করন নায়ার, ১৯২২। Sir C. Shankaran Nair. *Gandhi and Anarchy*. 2nd edition. Madras: Tagore & Co.

হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-ক। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। চতুর্থ মুদ্রণ। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি।

হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-খ। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। চতুর্থ মুদ্রণ। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি।

হুডল্ফ হকার, ১৯৩৮। Rudolf Rocker. *Anarcho-Syndicalism.* Original edition: Martin Secker and Warburg Ltd, London, UK, 1938. Second edition: Modern Publishers, Indore, India, 1947. Third edition: Gordon Press, USA, 1972. Fourth edition: Phoenix Press, London, UK, 1987. Fifth edition: Pluto Press, London, UK, 1989 (Preface by Noam Chomsï, Introduction by Nicholas Walter). Sixth edition: AK Press, Oakland, Canada, 2004 (first published 1972). Manoosh Network home edition: Rajshahi, December 2006.

হুডল্ফ হকার, ২০১১। 'নৈরাজ্যবাদ: এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য'। *অ্যানার্কো সিন্ডিক্যালিজম* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়। তরজমা: সেলিম রেজা নিউটন। *বাউণ্ডুলে* (রাসেল মাহমুদ সম্পাদিত)। খুলনা। ফেব্রুয়ারি ২০১১। পৃষ্ঠা ৪৭-৬৩।

ছবি: লালন সুস্মিতা মীরা

মানুষ নেটওয়ার্ক গ্রন্থমালা

অকুপাই-উইকিলিকস-অ্যানার্কি সিরিজ

সেলিম রেজা নিউটন

নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য: এম এন রায়ের মুক্তিপরায়ণতা প্রসঙ্গে

আগামী প্রকাশনী ঢাকা ২০১৩

অরুন্ধতী রায়

অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট

অনুবাদ ও সম্পাদনা: সুস্মিতা চক্রবর্তী

আগামী প্রকাশনী ঢাকা ২০১৩

সেলিম রেজা নিউটন

অচেনা দাগ: সম্পর্ক স্বাধীনতা সংগঠন

আগামী প্রকাশনী ঢাকা

প্রকাশিতব্য বইয়ের তালিকা

বিডিআর-বিদ্রোহ: পর্যালোচনা ও নথি

সেলিম রেজা নিউটন

অকুপাই-আন্দোলন: নৈরাজের নৃতত্ত্ব

ডেভিড গ্রেইবার। অনুবাদ: বখতিয়ার আহমেদ

অকুপাই

নোম চমস্কি। অনুবাদ: বদরে মুনীর

ঊনিশ শ চুরাশি

জর্জ অরওয়েল। অনুবাদ: বখতিয়ার আহমেদ

সাইফারপাঙ্কস: ইন্টারনেটের স্বাধীনতা ও ভবিষ্যত

জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ। অনুবাদ: সেলিম রেজা নিউটন

শাহবাগ: পথ ও পরিস্থিতি

সেলিম রেজা নিউটন সম্পাদিত

অরাজপন্থা

সেলিম রেজা নিউটন

Salim Reza Newton

The Trail of the Unknown

Relationship - Liberty - Organization

সাধু। মুরগি কেহ জবাই করিলে ব্যথিত হইব। কী পৈশাচিক! সুস্বাদু মুরগির মাংশ দেখিয়া জিহ্বায় জল আসিবে। কী নান্দনিক!

অসঙ্গতি। অসঙ্গতিকে কি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিব? অসঙ্গতিকে মানিয়া লইয়া ক্রমাগত বলিয়া চলিব নম অসঙ্গতি, নম অসঙ্গতি, নম অসঙ্গতি? যাঁহারা অসঙ্গতিকে আইন বলিয়া মান্য করেন এই বইকে তাঁহারা পাঠ্য করিবেন না।

ইচক দুয়েন্দে

The Trail of the Unknown

AGAMEE PRAKASHANI

মানুষ নেটওয়ার্ক

MANOOSH NETWORK BOOKS:
OCCUPY-WIKILEAKS-ANARCHY SERIES: 03

Cover design andrewbath.com

9 789840 416196